কাব্যালোক

প্রথম খণ্ড

KABYALOK

PART ONE

(Bengali Poetics)

Price Rupees Eight only.

কাব্যালোক

প্রথম খণ্ড

স্কটিশ্‌চার্চ কলেজের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা-বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, এম. এ., পি.-এইচ. ডি.

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ, পৌষ, ১৩৬৫

মূল্য : ৮'০০ (আট টাকা মাত্র)

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত

বাঙ্গালার বিদ্যোৎসাহী

বরেণ্য পুরুষ

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের কর-কমলে

ভূমিকা

বাঙ্গালা সাহিত্য আজ নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যকে সম্যক্ উপলব্ধি করিবার জন্য প্রয়োজন তাহার ইতিহাস, ভাষা-তত্ত্ব এবং কাব্য-তত্ত্ব অর্থাৎ Poetics বা অলঙ্কারশাস্ত্র। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ও বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ সুধীগণ পর্যালোচনা করিয়াছেন। এখন আবশ্যক বাঙ্গালা সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব পর্যালোচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের নিজস্ব রূপ উপলব্ধি-পূর্বক বিশ্লেষণী ও সংগঠনী প্রতিভা লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বরূপ ও রূপ বিচার। বাঙ্গালার প্রতিভা পিতৃস্থানীয় সংস্কৃতের বিপুল অলঙ্কার-শাস্ত্র হইতে রিকৃথ-স্বরূপ প্রচুর ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছে, এবং সাধনাদ্বারা পাশ্চাত্ত্য হইতেও অনেক বিত্ত আহরণ করিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন উপাদানে গঠিত ও বিভিন্ন রসে পুষ্ট হইলেও বাঙ্গালার সজীব মন একটি, বাঙ্গালার সজীব সাহিত্য-ধর্ম একটি, এবং তাহা কতকাংশে স্বতন্ত্র, উপাদান ও প্রভাবের বৈচিত্র্য তাহার মনের বিচিত্রতা পোষণ করিয়াছে মাত্র। সেই অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যের অলঙ্কারশাস্ত্র বা Poetics চাই।

৮৩ বৎসর পূর্বে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় যে কাব্যনির্ণয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতে কাব্যের আসল বস্তু রস, ভাব ও ধ্বনির বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনও আলোচনা নাই; ছন্দের যে আলোচনা আছে, তাহা এই যুগের কাব্য বুঝিতে কিছুমাত্র সাহায্য করে না। অলঙ্কার-প্রকরণ এখনও পঠিত ও পাঠিত হয়; কিন্তু উহা যে এখনও চলে, তাহা গ্রন্থের গৌরব অপেক্ষা পরবর্তী যুগের বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের ঔদাসীন্য ঘোষণা করে বেশী। ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয় ইংরেজী ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের History of Sanskrit Poetics নামে মূল্যবান ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তাহা মুখ্যতঃ ইতিহাসই, আলঙ্কারিকগণের কাল-নির্ণয় এবং যুগ-বিভাগ আমরা তাহা হইতে গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু উপযুক্ত সমালোচনা এবং নূতন সূত্র-রচনা তাহাতে থাকিবার কথা নয়। পণ্ডিত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের রচিত 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র হইলেও সুলিখিত, তাহা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্বন্ধে বাঙ্গালী পাঠকের ভীতি নিরসন ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া কাব্য-জিজ্ঞাসুর অনেক উপকার করিয়াছে। গ্রন্থখানি প্রকৃত পক্ষে অলঙ্কার-শাস্ত্র

পাঠের মূল্যবান্ ভূমিকা। ইহার পর ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'কাব্য-বিচার' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, উহার মুখ্য উদ্দেশ্য সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্য-বিচার-পদ্ধতি সংস্কৃতবিদ্যার্থী এবং প্রসঙ্গতঃ সাহিত্য-জিজ্ঞাসুদের গোচর করা। ইহা ছাড়া বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক যোগ্য ব্যক্তি সাহিত্য-সম্বন্ধে খণ্ড খণ্ড ভাবে নানা উপাদেয় আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও আমরা স্মরণ করি। পূর্বসূরি-গণের সকল লেখা হইতেই অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করি। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থ রচনায় আমাদের লক্ষ্য অনেক ব্যাপক ও স্বতন্ত্র।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মন্তব্য করিয়াছেন,—প্রাচীন কোনও আলঙ্কারিকের বিচার ও মীমাংসা "বিশ্লেষণের নিপুণতায় ও অন্তর্দৃষ্টির গভীরতায় কাব্য-তত্ত্বের প্রাচীন বা নবীন কোনও আলোচনার চেয়ে কম উপাদেয় নয়।"

শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত কাব্য-বিচারের প্রস্তাবনায় প্রথমেই মন্তব্য করিয়াছেন,—"ভরত হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পর্যন্ত কি জগন্নাথ পর্যন্ত আমাদের দেশে সাহিত্য-বিচার সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা সংস্কৃত অলঙ্কার-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আলোচনা অন্য কোন ভাষায় আজ পর্যন্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।"

জগন্নাথের কাল সপ্তদশ শতাব্দী, তাঁহার পর আর কেহ অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে উল্লেখ-যোগ্য কোন বিশেষ আলোচনা করেন নাই।

প্রাচীন এই সাহিত্যাচার্যগণের যে সকল সিদ্ধান্ত কালজয়ী, বিশ্বজনীন ও সকল-কাব্য-সাধারণ, বিশেষতঃ আমাদের বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে সমান ভাবে প্রযোজ্য, আমরা আলোচ্য গ্রন্থে যথাসম্ভব ঐতিহাসিক ক্রমানুযায়ী তাহাদের উপস্থিত করিয়াছি, তাহাদের মূল্য বিচার করিয়াছি, আবশ্যক স্থলে নূতন ব্যাখ্যান দিয়াছি, এবং সমালোচনা-প্রসঙ্গে দোষ-ত্রুটি যাহা আছে দেখাইয়া, আমাদের নিজস্ব অভিমত, সিদ্ধান্ত ও সূত্র দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি; এবং এই উপলক্ষে যেখানেই আবশ্যক হইয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক নানা মনস্বী ও কবিগণের সুচিন্তিত অভিমত-সমূহ উল্লেখ ও তাহাদের সহিত তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া সমগ্র ধারণাকে স্পষ্ট করিতে চাহিয়াছি। যেখানে যেখানে আবশ্যক হইয়াছে, সাধারণতঃ বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে এবং কখনও বা সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্য হইতে উদাহরণ-মালা সংগ্রহ করিয়াছি। সংস্কৃত বা ইংরেজী হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা প্রায়ই পাদটীকায় না রাখিয়া মূলগ্রন্থ-কলেবরে সন্নিবিষ্ট

করা হইয়াছে, এবং সর্বদাই তৎসঙ্গে বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। অভিপ্রায় এই, কাব্যজিজ্ঞাসুগণ ঐ সকল অংশ মূলগ্রন্থ হিসাবেই পাঠ করেন। ইহা ব্যতীত অনেক স্থলে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রয়োজন বিচার করিয়া আমরা সাক্ষাৎ ভাবে অনেক বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা করিয়াছি। যে সকল বিষয় আমরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতে লাভ করিয়াছি, তাহাদের আলোচনাও সমান শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত সম্পন্ন করা হইয়াছে।

মুদ্রিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাঁহারা অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ দুই একটি প্রশ্ন করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন,—গ্রন্থে সংস্কৃতের উদ্ধৃতি বড় বেশী। এই শ্রেণীর পাঠকদের উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্য আরও স্পষ্ট করিয়া নিবেদন করিতেছি।

আমরা একখানি পরিপাটী 'টেক্স্‌ট্‌ বুক' বা পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। দর্শন ও মনস্তত্ত্ব-সম্মত সমুদয় আলোচনা পরিহার করিয়া এবং প্রায় সমান-সংখ্যক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেড়শতাধিক গ্রন্থের বিশ্লেষণ ও উদ্ধৃতি একেবারেই উপস্থিত না করিয়া, সকল কথা নিজের ভাষায় প্রকাশ করিলে অপেক্ষাকৃত সহজপাঠ্য বই হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের দীর্ঘ স্থায়ী কোন উপকার সাধনে সমর্থ হইত না, মূল উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হইত।

আমাদের লক্ষ্য ও সাধনা আমরা তাই গুছাইয়া বলিতেছি,—

(১) আত্ম-বিস্মৃত আমরা, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই আমাদের অতীত মুছিয়া যায় নাই। মনস্বী সি, এস্, লুই প্রেমের রূপক আলোচনাপ্রসঙ্গে যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন,[১]—

(১) মূলের অংশটি সমস্তই নিম্নে দেওয়া হইল :—

"Humanity does not pass through phases as a train passes through stations: being alive, it has the privilege of always moving yet never leaving any thing behind. Whatever we have been, in some sort we are still. Neither the form nor the sentiment of this old poetry has passed away without leaving indelible traces on our minds. We shall understand our present and perhaps even our future the better, if we can succeed by an effort of the historical imagination, in re-constructing that long-

ট্রেন যে প্রকার বিভিন্ন স্টেশনের উপর দিয়া চলিয়া যায়, মানব-জাতি সেই প্রকারে বিভিন্ন যুগ অতিক্রম করে না। জীবন্ত বলিয়া ইহা যেমন সর্বদাই অগ্রসর হইবার সুবিধা পায়, তেমনই ইহা কিছুই পশ্চাতে ফেলিয়া যায় না। আমরা যাহা ছিলাম, কোন-না-কোন প্রকারে আমরা এখনও তাহা আছি। আমাদের মনের উপর দুরপনেয় চিহ্ন না রাখিয়া কিছুই অতীতের বিষয় হয় নাই। আমরা যদি ঐতিহাসিক কল্পনাশক্তির বলে আমাদের দীর্ঘ-বিস্মৃত মনোভাবকে পুনর্গঠন করিতে পারি, তাহা হইলে কেবল আমাদের বর্তমান নয়, হয়তো ভবিষ্যতেরও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব।

আমাদের আত্মপরিচয় ও যথার্থ পরিচয় চাই। সে পরিচয় হইতে পারে কেবলমাত্র পূর্ববর্তী আচার্যগণের শ্রেষ্ঠ চিন্তারাশির উপলব্ধি ও স্বীকৃতি দ্বারা। পাশ্চাত্ত্যের সহিত তুলনা হইতে আসিবে আমাদের আত্মপ্রত্যয় এবং ঘটিবে শক্তি-বৃদ্ধি। বিশেষতঃ অলঙ্কারশাস্ত্র বা কাব্যশাস্ত্র এমন একটি বিষয়, যাহাতে ভারতীয়গণের গৌরব বোধ করিবার অনেক কারণই বর্তমান। কোন কোন ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্যে যে তত্ত্বের আলোচনার প্রারম্ভিক অবস্থা, সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার পরিপক্ব সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। আর পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক যুগের অনেক বিস্ময়কর আলোচনা ভারতীয় আচার্যগণ আটশত বা দশশত বৎসর পূর্বে অনেকাংশে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও মিলে। ব্র্যাড্‌লে কিংবা রিচার্ড্‌স্ আজ যে কথা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা যদি হাজার বৎসরেরও পূর্বে প্রায় পূর্ণাঙ্গ মতরূপে আনন্দবর্ধন বা অভিনবগুপ্তের আলোচনায় পাওয়া যায়, এবং ওয়াল্টার পেটারকে যদি নয়-শত বৎসরের পূর্ববর্তী কুন্তকের পথেই বিচরণ করিতে দেখা যায়, তবে আনন্দ হয় না কি, এবং সে আনন্দ হইতে আত্মশক্তির উদ্বোধন হয় না কি?

(২) সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের যে সকল মৌলিক সিদ্ধান্ত স্বীয় প্রভা ভবিষ্যৎকালেও বিচ্ছুরিত করিতেছে এবং এক বিশ্বজনীন শাশ্বত রূপ লাভ করিয়াছে, অনেক স্থলেই বিচার পদ্ধতি-সহ তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে; এবং প্রায় সকল উদ্ধৃতির মূলের পরিচয় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথম,

---

lost state of mind for which the allegorical love poem was a natural mode of expression."

—*The Allegory of Love, Ch. I., p. I ;*
by C. S. Lewis (1936)

পাঠার্থিগণ মূল দেখিয়া নিজেরা উপলব্ধি করুন এবং শক্তি লাভ করুন। দ্বিতীয়, ভবিষ্যৎ কালে যাঁহারা গবেষণা বা আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের শ্রমের লাঘব হউক, তাঁহারা মৌলিক চিন্তাগুলি এক গ্রন্থে লাভ করিয়া সহজেই অগ্রসর হইতে পারিবেন, এবং আবশ্যক মত প্রসঙ্গ-পরিচয় দেখিয়া মূল-গ্রন্থের আলোচনাও করিতে পারিবেন।

সমস্ত উদ্ধৃতিরই অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে; যাহাদের সংস্কৃতের অথবা ইংরেজীর সহিত পরিচয় অল্প, তাহাদেরও বিশেষ অসুবিধা হইবার কথা নয়।

সংস্কৃতে বহু অলঙ্কারগ্রন্থ আছে। বলা বাহুল্য, ইহাদের কতকগুলি গ্রন্থ চর্বিত-চর্বণ মাত্র; তাহাদের মৌলিকতা নাই, অথবা প্রাচীন চিন্তার নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী ও নূতন বিন্যাস-ভঙ্গীও নাই। সেই জন্য এই গ্রন্থে কেবল মাত্র প্রামাণ্য মৌলিক গ্রন্থগুলির আলোচনা করা হইয়াছে। নূতন কথা কেহ কোথাও বলিয়া থাকিলে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহা শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। একটি বিষয়ে অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভবপর হইলেও অনাবশ্যক ও অশোভন বলিয়া দেওয়া হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থসমূহ সম্বন্ধেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। গ্রন্থকার ও গ্রন্থ এবং উদ্ধৃতির সংখ্যা কম রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। একটি সার্থক উদ্ধৃতির পর অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় উদ্ধৃতি দেওয়া হয় নাই।

(৩) বিজ্ঞানের জগতের ন্যায় কাব্য-জগতেও অনেকগুলি সত্য সার্বজনীন, সর্বদেশ ও সর্বকাল-সাধারণ, এমন কি বিভিন্নদেশে তাহাদের প্রকাশ-ভঙ্গীর আশ্চর্য সাদৃশ্যও বর্তমান। সেই জন্য অলঙ্কারশাস্ত্রেও প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীক্ আচার্যগণের সিদ্ধান্তের, এবং প্রাচীন ভারতীয় ও আধুনিক পাশ্চাত্ত্য আচার্যগণের সিদ্ধান্তের বিস্ময়কর মিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই সত্য ও সিদ্ধান্তগুলি প্রায়শঃ সাহিত্যের মৌলিক তত্ত্ববিষয়ক। আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশের এবং অতীত ও বর্তমান যুগের সদৃশ স্থলগুলি পাশাপাশি স্থাপন করিয়া তুলনা-সূত্রে আলোচ্য বিষয়কে স্পষ্টতর করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। আমাদের প্রাচীন অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনেক অমূল্য রত্নের সন্ধান জানি না বলিয়া আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশের আধুনিক বা প্রাচীন কাব্যশাস্ত্র হইতে সেই সকল আহরণ করিয়া থাকি, এবং সেই জন্য গৌরব-বোধও করিয়া থাকি। সংস্কৃত ভাষার দুরধিগম্যতা থাকিলেও একান্ত আত্মবিস্মৃতির ফলেই এইরূপ ঘটনা সম্ভবপর হয়। যেখানে প্রয়োজন, সেখানে অবশ্য যে কোনও জাতি বা যে কোনও দেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করা চলে। জ্ঞানের জাতিভেদ বা দেশ-ভেদ নাই; জ্ঞানী পুরুষগণ এই এক বিশাল পৃথিবীর অধিবাসী এবং নিখিল মানবজাতির মস্তিষ্ক-স্বরূপ।

আমরাও তাই অকুণ্ঠিত চিত্তে জ্ঞানের পার্শ্বে জ্ঞানকে বসাইয়া সাদৃশ্য বা পার্থক্য বিচার করিয়া উভয়ের মূল্য নির্ধারণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। পার্থক্য বিচারের প্রশ্ন সেখানেই উঠিয়াছে, যেখানে সাংস্কৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা-হেতু দুই জাতি বা দুই যুগের দৃষ্টি ও আস্বাদনের পার্থক্য ঘটিয়াছে।

(৪) জাতিকে বড় হইতে হইলে তাহার ঐতিহ্য চাই। কাব্যশাস্ত্র-বিষয়ে আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য আছে, তাহাকে বুঝিয়া লইয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের যাহা আছে, সেই সকলের জন্য অপরের কাছে হাত পাতিব কেন? আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেন,—ঐতিহ্য ছাড়িও না, উহা রক্ষা কর, যাহা নূতন সৃষ্টি করিতেছ, উহার সহিত যোজনা কর,—

> "তস্মাৎ সতাম্ অত্র ন দূষিতানি
> মতানি তান্যেব তু শোধিতানি।
> পূর্বপ্রতিষ্ঠাপিত-যোজনাসু
> মূল প্রতিষ্ঠা-ফলম্ আমনন্তি॥"

—অতএব সজ্জনগণের মত-সকল কেবল দোষ প্রদর্শন করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে না। সেই সকল মতই শোধন করিয়া নির্দোষ করিয়া লইতে হইবে। পূর্বে যাহা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাহাতে পরবর্তী কালে আবশ্যকীয় যোজনা করিলে মূলের সমগ্ররূপ প্রতিষ্ঠারই ফল পাওয়া যায়।

ইহাই আমাদের অবলম্বিত নীতি।

আমাদের দেশে মূল সূত্রকে মান্য করিয়া উক্ত, অনুক্ত ও দুরুক্ত অর্থ বিচার করিবার জন্য বার্তিক রচনা করা হইত, মণ্ডন ও খণ্ডন করিবার জন্য ভাষ্য রচনা করা হইত।

(৫) আমরা তাই গত দুই সহস্র বৎসরের আলঙ্কারিক আলোচনা-রাশির মধ্যে যাহা কিছু অম্লান ও উজ্জ্বল লক্ষ্য করিয়াছি, সার্বকালীন ও সার্বজনীন বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রয়োজনানুযায়ী সেই সকলই যথাক্রমে উপস্থিত করিয়াছি। পুরাতন বলিয়া তাহাদের মর্যাদা বাড়িয়াছে, বিন্দুমাত্রও কমে নাই নিশ্চয়।

কালিদাসের যুগে বলা হইত পুরাণ হইলেই সাধু হয় না, এবং নূতন হইলেই নিন্দনীয় হয় না। বর্তমান যুগে বলিতে ইচ্ছা হয় পুরাণ হইলেই নিন্দনীয় হয় না, এবং নূতন হইলেই সাধু হয় না। বাস্তবিক পক্ষে পুরাণের পট-ভূমিতে নূতনের স্থাপন

করিয়া যে দৃষ্টি, তাহাই পূর্ণ ও পরিশুদ্ধ দৃষ্টি। তাই যেখানে সঙ্গত মনে হইয়াছে, সেখানে নূতন ব্যাখ্যান ও নূতন উদাহরণ দ্বারা পুরাতনকে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

(৬) কিন্তু আবশ্যক স্থলে পুরাতনের কেবল ছোট খাট দোষ-ত্রুটি নয়, পূর্বাচার্যগণের মৌলিক তথ্য ও সিদ্ধান্ত-সমূহের অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি বা অন্যবিধ দোষ প্রদর্শন করিয়া বর্তমান সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নিজস্ব নূতন সূত্র ও সিদ্ধান্ত স্থাপনে পশ্চাৎপদ হই নাই। অধ্যায়গুলির মুখ্য বিষয়বস্তু সংক্ষেপে নিম্নে উল্লিখিত হইল; তাহা হইতেই আমাদের অভিপ্রায় ও লক্ষ্য স্পষ্ট হইবে :—

(ক) প্রথম অধ্যায়ে (কাব্য-সংজ্ঞা, দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য) :—

আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত, মম্মটভট্ট এবং বিশ্বনাথ প্রভৃতি আচার্যগণ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায় সকলের স্বীকৃত রসবাদের, অর্থাৎ কাব্যের আত্মা রস—এই মতবাদের দোষ দেখাইয়া উহাকে আমরা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে স্বীকার করিয়াছি, রসের ন্যায় এক জাতীয় কাব্যের আত্ম-ভূত রম্যবোধকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। এই জন্য রস ও রম্যবোধ উভয় বর্জন করিয়া উর্ধ্বস্থিত সংবিদানন্দ দ্বারা কাব্য-সংজ্ঞা, এবং নিম্নস্থিত দ্রুতি ও দীপ্তি গুণদ্বারা কাব্যের মূলগত দুইটি ভেদ স্থাপন করিয়াছি। উপযুক্ত দার্শনিক আলোচনা এবং বিভিন্ন পণ্ডিতগণের সুচিন্তিত উক্তি ও সমুচিত উদাহরণমালা দ্বারা সিদ্ধান্তগুলি সমর্থন করা হইয়াছে। দ্রুতিগুণাত্মক রসোক্তির ও ভাবোক্তির ন্যায় দীপ্তিগুণাত্মক গৌরবোক্তি ও বক্রোক্তি কাব্যের কথা বলিয়াছি; আধুনিক কাব্যসাহিত্যে অনেক সময়ে উহাদেরই প্রাধান্য দেখা যায়।

আমরা মনে করি সৃষ্টির এক অংশের উপলব্ধি চিন্তাদ্বারা এবং অপর অংশের উপলব্ধি অনুভূতি দ্বারা সম্পন্ন হয়। দর্শন দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহা যেমন শ্রবণ দ্বারা হয় না, সেইরূপ চিন্তা দ্বারা যে উপলব্ধি হয় তাহা অনুভূতি বা ভাব দ্বারা হইতে পারে না। তাই ভাবালম্বনে সৃষ্টির এক দিকের প্রকাশে যেমন কাব্যরস স্ফূর্ত হয় এবং দ্রুতি-গুণে হৃদয় বিগলিত হয়, চিন্তা বা রম্যার্থের অবলম্বনে সৃষ্টির অপর দিকের প্রকাশে তেমনই কাব্যের রম্যবোধ স্ফূর্ত হয় এবং দীপ্তি-গুণে বুদ্ধি দ্যুতিময় হয়, যেন ঝলকিয়া উঠে! এই চিন্তা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-বিচার নহে, ইহা কবির প্রতিভান বা সাক্ষাৎ দর্শন। বলা বাহুল্য, চিন্তামাত্রই কাব্য নয়, ভাবমাত্রও অবশ্য কাব্য নয়। প্রথম অধ্যায়ে যথাস্থানে এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করা হইয়াছে। এই ভাবেই আমরা কাব্যের দুইটি মৌলিক ভাগের কথা বলিয়াছি।

(খ) দ্বিতীয় অধ্যায়ে (রস ও ভাব) :—

রসবাদের উৎপত্তি হইতে প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সমুদয় স্তর দেখাইয়া আবশ্যক স্থলে উদাহরণ-সহ আমাদের বিশদ ব্যাখ্যান দিয়াছি। আচার্য মম্মটভট্ট বা ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত যাঁহারই ব্যাখ্যায় ত্রুটি দেখা গিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। অবশেষে রস-সম্বন্ধে আমাদের সংজ্ঞা দিয়া তাহারও ব্যাখ্যান করিয়াছি।

বুচার-কৃত আরিস্টটলের ব্যাখ্যা এবং অভিনবগুপ্ত-কৃত ভরতের ব্যাখ্যা—উভয়ের মধ্যে বিশদ তুলনা করিয়া রসবাদকে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কবি ও পণ্ডিতগণের আলোচনাও তুলনার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে।

এই ভাবেই প্রাচ্য রস-তত্ত্ব ও পাশ্চাত্ত্য সৌন্দর্য-তত্ত্বের মধ্যে তুলনা মূলক আলোচনা করা হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে সৌন্দর্য-সম্বন্ধে অনেক প্রকার মত আছে। আমরা কেবল মাত্র রসবাদের অনুকূল একটি মত—আধুনিক মত লইয়াই আলোচনা করিয়াছি।

ইহার পরে ভাব-সম্বন্ধেও অনুরূপ মৌলিক দৃষ্টি লইয়া বিশ্লেষণ করিয়া ভাব, স্থায়ী ভাব ও ব্যভিচারী ভাবের বিচিত্র স্বরূপ ও সম্পর্ক বুঝিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

এই অধ্যায়ের শেষভাগে ভাব ও রসের বিচিত্র সম্বন্ধ বিচার করিয়া আমরা সঞ্চারী রস, আধিকারিক রস ও প্রাসঙ্গিক রস, নাট্যরস ও কাব্যরস, অথবা অভিনেয় রস ও অভিধেয় রস ব্যাখ্যা করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক রস এবং কাব্যরস বা অভিধেয় রস প্রকৃতপক্ষে এই সর্বপ্রথম বিশেষভাবে আলোচিত ও স্থাপিত হইল।

অতঃপর নূতনভাবে বিচার করিয়া কয়েকটি নূতন স্থায়ী ভাব এবং নূতন রসের কথা বলিয়াছি। বস্তুতঃ স্থায়ী ভাব ও রসের সংখ্যা ও পরিচয় যুক্তি-সম্মত নূতন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হইয়াছে। নূতন সিদ্ধান্ত সর্বত্রই উপযুক্ত উদাহরণ দিয়া সমর্থন করা হইয়াছে।

একেবারে শেষভাগে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া গীতি-কাব্যের রস, কবি-গত রস এবং রস-সম্বন্ধে নিসর্গ-কবিতা আলোচনা করা হইয়াছে।

এই বৃহৎ অধ্যায় শেষ করা হইয়াছে বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে রস ও শাক্ত পদ-সাহিত্যে রসের আলোচনা দ্বারা। ভারতীয় রসতত্ত্বে বৈষ্ণবগণের কোন মৌলিক দান আমরা পাই নাই; তাঁহারা মাত্র কাব্যরসের ভক্তিভাবতা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাও করিয়াছেন দাক্ষিণাত্যবাসী ভক্তপণ্ডিতগণ। শাক্তপদের রসতত্ত্বও বাঙ্গালা সাহিত্যে এই প্রথম বিচার করা হইল; আমরা বিভিন্ন শাক্তপদ বিশ্লেষণ করিয়া পাঁচটি রসের সন্ধান পাইয়াছি এবং উদাহরণ-সহ তাহাই দেখাইয়াছি।

(গ) তৃতীয় অধ্যায়ে (ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি) :—

ব্যঞ্জনা ও ধ্বনির উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস দেখাইয়া প্রাচীন আচার্যগণের ব্যাখ্যাত আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে উদাহরণ লইয়া বুঝান হইয়াছে। অতঃপর ব্যঞ্জনা ও ধ্বনির স্বরূপ ও বিচিত্র ভেদ ইংরেজ পণ্ডিতগণের আলোচনায় কি ভাবে কতদূর ধরা পড়িয়াছে, তাহা কিছু বিশদ ভাবেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অধ্যায়ের শেষভাগে বর্তমান কাব্য-সাহিত্যের পটভূমিকায় আমাদের অভিমত-অনুযায়ী ধ্বনি ও ধ্বনন ব্যাপার, কবির ধ্বনন ও পাঠকের ধ্বনন, ধ্বনন ও চিন্তন, অন্তর্লোক ও বাসনালোক, শব্দ-গত বাক্য-গত ও প্রবন্ধ-গত ধ্বনি প্রভৃতি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। এখানেও আমরা হৃদয়-গত দ্রুতিগুণাত্মক ভাব ও বুদ্ধি গত দীপ্তিগুণাত্মক অর্থ ধরিয়া ভাবধ্বনি ও অর্থধ্বনি বলিয়া ধ্বনিকে প্রাচীনদের পন্থা পরিহার করিয়া নূতন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছি। বর্তমান সাহিত্য বিশ্লেষণ ও আস্বাদন করিবার পক্ষে এই পন্থাই কেবল আধুনিক নয়, সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

(ঘ) চতুর্থ অধ্যায়ে (বস্তু ও বিভাব) :—

বস্তু ও বিভাব আলোচনায় আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্যের আবশ্যকীয় অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এবং আমাদের নিজস্ব অভিমত প্রদর্শিত হইয়াছে। অনুকরণ-তত্ত্ব, রূপ ও রস, রূপনির্মাণ, সত্য, তথ্য, ঔচিত্য, রসেই রসের সার্থকতা (Art for Art's sake), জীবন ও সাহিত্য, কবি, ঋষি-কবি, বাস্তবতন্ত্র, রোমান্টিক তন্ত্র প্রভৃতি কোন বিষয়ই বাদ যায় নাই। সর্বত্রই আমাদের অভিমত প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের বিশিষ্ট মতামত পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা হইয়াছে।

(ঙ) পঞ্চম অধ্যায়ে (শব্দ ও অর্থ) :—

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, কি আপেক্ষিক নিত্য—এই বিষয়ে প্রথমে বিচার করা হইয়াছে। সাহিত্য-পদটির ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-গত সম্বন্ধ এবং বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ ঐতিহাসিক ক্রমানুযায়ী দেখান হইয়াছে ; কুন্তক-কৃত শব্দ, অর্থ ও সাহিত্যের সংজ্ঞা এবং মনস্বিতাপূর্ণ ব্যাখ্যান বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ওয়াল্টার পেটার-প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের এবং আমাদের অভিমত উপস্থিত করা হইয়াছে। তাহার পর শব্দ ও অর্থ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা এবং শব্দের গীতধর্মিতা ও অর্থের চিত্রধর্মিতার বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের শেষভাগে আমরা প্রমাণ করিয়াছি অলঙ্কারশাস্ত্র প্রকৃত পক্ষে কাব্যসৌন্দর্য-বিজ্ঞান,

উপমাদি অলঙ্কার বিশিষ্ট সৌন্দর্য মাত্র। উপমাদি অলঙ্কারের বিচারে আমরা ধ্বনিবাদীদের সংজ্ঞাই মান্য করিয়াছি, এবং পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের সমর্থক উক্তিদ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে উপযুক্ত উদাহরণ লইয়া আমাদের অভিমত স্পষ্ট করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। সমাপ্তি-অংশে কাব্য-ধারণায় ও এই গ্রন্থ-রচনায় ঐক্য-রূপটি প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং কাব্যের মৌলি-ভূত প্রয়োজন যে অলৌকিক আনন্দ, তাহাই পুনরায় উল্লিখিত হইয়াছে।

(৭) বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্য বলিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি। কিন্তু কাব্য ও কথাসাহিত্য বাদ দিলে আর কোনও বিষয়েই, বিশেষতঃ মননময় বিদ্যা-সম্পর্কে বাঙ্গালীর কোন বিশিষ্ট দান নাই। কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কেই ইংরেজী ভাষায় যে সকল মৌলিক আলোচনা হইয়াছে ও বর্তমানে হইতেছে, আমাদের ভাষায় সেরূপ মনস্বিতাপূর্ণ আলোচনা সুলভ নহে। অর্থতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ব-সম্মত ইংরেজী গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থই বা বাঙ্গালা ভাষায় কোথায়? আমাদের ঐতিহ্যের লোপই ইহার মুখ্য কারণ। যে দেশে এখনও সংস্কৃত না জানিয়া বাঙ্গালায় পণ্ডিত হওয়া অগৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করা হয় না, সে দেশের বিদ্যা-চর্চার অবস্থা আর অধিক ভাল কি হইতে পারে? ইংলণ্ডে ক্ল্যাসিকাল অর্থাৎ লাতিন বা গ্রীক্ ভাষা না জানিয়া ইংরেজী ভাষা জানিতে পারে, ইহা কেহ বিশ্বাস করিবে না। ইউরোপের বিবিধ ভাষায় আরিস্টটলের Poetics গ্রন্থের কত অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে; ইংরেজী ভাষায় সেদিনও নূতন অনুবাদ বাহির হইয়াছে।

বস্তুতঃ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পারদর্শিতার জন্য সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষা ও সাহিত্যের সহিত কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যক। উভয়ই শক্তিশালী এবং সম্পন্ন ভাষা। ইংরেজী ভাষার সাহিত্য বা সংসর্গ বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্যের কারণই বলিতে হইবে। কিন্তু আমরা সুকুমার সাহিত্যের রস-সৌন্দর্য ভিন্ন ইংরেজী সাহিত্যের বিপুল, বলিষ্ঠ ও বিচিত্র মনন-শক্তির বিশেষ কোন সন্ধান রাখি না।

(৮) বিধাতার অভিপ্রেত হইলে কাব্যালোকের দ্বিতীয় খণ্ডে কাব্যের স্বরূপ নয়, কাব্যের বিচিত্র রূপ ও শক্তি লইয়া যে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে, তাহাতে সাহিত্যের সুপরিচিত আধুনিক দিক্ অনেকাংশে পরিস্ফুট হইতে পারে।

আশার কথা, বাঙ্গালা সাহিত্যের নানা দিকে ও নানা ক্ষেত্রে নূতন নূতন আলোচনা আরম্ভ হইতেছে; বাঙ্গালার কৃত-বিদ্য অধ্যাপক ও সুধী ছাত্রমণ্ডলী এই দিকে অবহিত হইলে অচিরেই বাঙ্গালার মননময় সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে, —এই ভরসায় এত কথা লিখিলাম।

বিনীত
গ্রন্থকার

কাব্যালোক

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

(২)

ভরতমুনি-কথিত নাট্যরস ও রসের বিবিধ ব্যাখ্যা

(৩)

আমাদের প্রদত্ত রসের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

(৪)

রসতত্ত্ব-সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ

রস ও 'Beauty'

(১)

ভাবের স্বরূপ লক্ষণ

(২)

আধিকারিক রস ও প্রাসঙ্গিক রস

(৩)

নাট্যরস ও কাব্যরস

অভিনেয় রস ও অভিধেয় রস

(৪)

স্থায়ী ভাব ও রসের সংখ্যা ও পরিচয়

(৫)

গীতিকাব্যের রস ও কবি-গত রস

(৬)

রস-সম্বন্ধে নিসর্গ-কবিতা

(৭)

বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে রস

(৮)

শাক্ত পদ-সাহিত্যে রস

তৃতীয় অধ্যায়

(১)

ধ্বনিবাদের উপস্থাপন

(২)

ব্যঞ্জনা ও ধ্বনির প্রাচীন মতে ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণ

(৩)

ধ্বনিবাদ-সম্বন্ধে ইংরেজী সাহিত্যে আলোচনা

(৪)

ধ্বনির ব্যাপক তাৎপর্য

চতুর্থ অধ্যায়

বস্তু ও বিভাব ২৮৬-৩৩১

(১)

বস্তু

(২)

বিভাব

(৩)

অনুকরণ

(৪)

রূপ ও রস

(৫)

বিভাব ও রূপনির্মাণ

(৬)

ঔচিত্য, সত্য ও তথ্য

(৭)

রসেই রসের সার্থকতা

(৮)

কবি ও বিভাব

পঞ্চম অধ্যায়

শব্দ ও অর্থ ৩৩২-৩৭৮

(১)

শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক

(২)

শব্দ ও অর্থের সাহিত্য

(৩)

শব্দ

(৪)

(৫)

অলঙ্কার-শাস্ত্র ও অলঙ্কার

(৬)
সমাপ্তি

নির্ঘণ্ট

কাব্যালোক

প্রথম অধ্যায়

দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য

(১)

কাব্য-সংজ্ঞা

কাব্যের একটি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দান করিতে গিয়াই ধরা পড়ে, কাব্যের শরীর যে শব্দার্থ, তাহার অসম্পূর্ণতা কতখানি। আমাদের জীবনের ন্যায় জীবনের অঙ্গভূত আমাদের চিন্তা এবং বাক্যও এক নাটকীয় প্রবাহ, মুহূর্তে মুহূর্তে তাহার রূপ খুলিতেছে, সে ক্রমাভিব্যক্তি লাভ করিতেছে। চিন্তা সূক্ষ্ম, বেগময় তাহার প্রবাহ; বাক্য স্থূল, চিন্তার পথ অতিক্রম করিতে তাহার অনেক প্রয়াস ও সময় লাগে। তাহা ছাড়া আমার মনের সাংস্কৃতিক পরিবেশে যে চিন্তা কয়েকটি মাত্র শব্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে, অপরের মনের পরিবেশে সে চিন্তা কখনও সেই কয়টি শব্দে সার্থক ও সমগ্র রূপ লাভ করিতে পারে না। তাই অপরের মনের কাছে ব্যাখ্যানের বেলা শব্দ বা বাক্যের অর্থোপলব্ধির জন্য লক্ষণা, ব্যঞ্জনা, ধ্বনি, বাসনালোক, আবার অনুমান, কল্পনা, কত প্রকার শক্তির আশ্রয় লইতে হয়। এই কথা স্মরণে রাখিয়া কাব্য বুঝাইবার জন্য ক্রমশঃ ছোট, কয়েকটি সংজ্ঞা লইয়া বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে।

কাব্য কাহাকে বলে ?

(১) কবি তাঁহার অপূর্ববস্তু-নির্মাণক্ষমা প্রতিভার বলে সহৃদয় সামাজিক বা পাঠকের অন্তরে অলৌকিক আনন্দনিস্যন্দী অন্তর্জগৎ বা বহির্জগতের ব্যাপারময় যে শব্দার্থের সহযোগ সৃষ্টি করেন, তাহার নাম কাব্য।

(২) কবিপ্রতিভা-সৃষ্ট যে শব্দার্থের বলে পাঠকের অন্তরে অলৌকিক আনন্দের প্রকাশ হয়, তাহাই কাব্য।

(৩) অলৌকিক আনন্দময় শব্দার্থই কাব্য।

(৪) আনন্দময় বাক্যই কাব্য।

শেষোক্ত সংজ্ঞাটি প্রথমটিরই সংক্ষিপ্ততম রূপ। উহাতে কেবল কাব্যের লক্ষ্য ও উপাদান—আনন্দময়ত্ব ও বাক্যত্ব, এই দুইটি মূল বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, উহার মধ্যেই কাব্যের স্রষ্টা কবি আছেন; কবির সহচর রূপেই আসেন কাব্যের পাঠক বা শ্রোতা অর্থাৎ সহৃদয় সামাজিক। কাব্যের প্রয়োজন লোকোত্তর আনন্দ, উপায় রস বা রম্যবোধ অথবা ধ্বনি, আলম্বন অন্তর্জগৎ বা বহির্জগতের বিচিত্র বস্তু, এবং সর্বশেষে সর্বাধিক আলোচ্য কাব্যের উপাদান শব্দার্থ—এই সকলই ক্ষুদ্র সংজ্ঞাটির অন্তর্গত। প্রথম সংজ্ঞায় সমুদয় বিষয়ই মোটামুটি উল্লেখ করিয়া কাব্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া হইয়াছে। কাব্যের রস, ধ্বনি, বস্তু, শব্দার্থ বা বাক্য শেষ চারিটি অধ্যায়ে পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইবে। বর্তমান প্রবন্ধে কাব্যের মৌলি-ভূত প্রয়োজন উল্লেখ করিয়া কাব্যের সংজ্ঞা-নির্দেশ করা হইয়াছে এবং কাব্যের মুখ্যভেদ কয়টি উদাহরণ-সহ প্রদর্শিত হইয়াছে।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে 'কাব্য' ও 'সাহিত্য' শব্দ একার্থবাচক। 'কাব্যপ্রকাশ' বা 'সাহিত্যদর্পণ' একই জাতীয় গ্রন্থের নাম। সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রাচীনকালে একমাত্র 'কাব্য' শব্দই ব্যবহৃত হইত। 'কাব্য' অর্থে 'সাহিত্য' শব্দের প্রচলন হইয়াছে মধ্যযুগ হইতে। বলা বাহুল্য,—'কাব্য' বা 'সাহিত্য' শব্দ অতি প্রাচীনকাল হইতেই নাট্য, কাব্য বা কথা-সাহিত্যের যাবতীয় শিল্প- ও রূপ-ভেদ বুঝাইয়া আসিতেছে।

কবির বাঙ্-নিমিতিই কাব্য। কবির নিপুণ কর্ম বা সৃষ্টি বলিয়াই শব্দময় শিল্পের নাম কাব্য। যে শক্তিবলে কবি এই সৃষ্টি করেন, তাহার নাম প্রতিভা। আচার্য অভিনবগুপ্ত প্রতিভার লক্ষণ বলিয়াছেন,—

অপূর্ববস্তু-নির্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞা।—ধ্বন্যালোক, ১।৬, টীকা

—'যে প্রজ্ঞার দ্বারা অপূর্ব বস্তু নির্মাণ করা যায়, তাহাই প্রতিভা।'

কবি তাঁহার আশ্চর্য প্রতিভা-বলে বস্তু-রাশি শব্দে সমর্পিত করিয়া বিধাতার সৃষ্ট দৃশ্যমান জগতের বাহিরে যেন এক বিচিত্র মায়ার জগৎ নির্মাণ করেন। কাব্য-জগৎ তাই অলৌকিক, অপূর্ব; ইহা আমাদের নিকট সৎও নয়, অসৎও নয়, ইহা অনির্বচনীয়।

অগ্নিপুরাণ বলেন,—

অপারে কাব্য-সংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ।
যথা বৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে॥—অগ্নিপুরাণ, ৩৪৫।১০

—'অপার এই কাব্যরূপ সংসারে কবিই প্রজাপতি। এই বিশ্ব তাঁহার নিকট যেমন প্রীতিকর বলিয়া মনে হয়, তেমনিই তাহা পরিকল্পিত হইয়া থাকে।'

আচার্য মম্মটভট্ট কিন্তু 'কাব্য-প্রকাশে'র প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, কবিসৃষ্টি প্রজাপতির সৃষ্টি অপেক্ষাও চারুতর। কারণ কবির বাণী 'হ্লাদৈকময়ী' এবং 'নবরস-রুচিরা,' অর্থাৎ একমাত্র আনন্দস্বরূপা ও নবরসে মনোহরা। প্রজাপতির সৃষ্টিতে সুখ থাকিলেও দুঃখ আছে, মোহ আছে, সত্ত্ব-রজ-স্তমঃ তিন গুণেরই বিলাস আছে। কবির সৃষ্ট কাব্যজগৎ পাঠককে দেয় কেবল আনন্দ; দুঃখও নয়, মোহও নয়, দেয় নব রসের বিচিত্র সুখময় অপূর্ব আস্বাদ।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী।"

—সাহিত্য, সাহিত্যের তাৎপর্য

শেলি বলিয়াছেন,—

"Poetry is indeed something divine."—*A Defence of Poetry*

—কাব্য প্রকৃতপক্ষে একটি দৈব ব্যাপার।

শ্রেষ্ঠ কবি কাব্য রচনা করেন প্রাণময় বা মনোময় শরীরের উর্ধ্বে নিজ বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্তায় অধিষ্ঠিত হইয়া। সৃষ্টির নব নব উন্মেষপূর্ণ সেই আনন্দলোক এক দিব্যলোক, সে লোকের বাণী দৈববাণী, সে লোকের ব্যাপার দৈব ব্যাপার। দেবতা বাহিরে নয়, রজস্তমোমুক্ত প্রতিভার অমল সত্তাই দৈবসত্তা, এখানে কবিসত্তা। কবির মানুষী সত্তা এবং কবিসত্তা এক হইয়াও ভিন্ন। কবির সত্যকার শরীর দিব্যশরীর, ভামহ যাহাকে বলিয়াছেন,—

কান্তং কাব্যময়ং বপুঃ।—ভামহালঙ্কার, ১।৬

—'কাব্যময় কান্ত বপুঃ।'

কবি সেই দিব্য ভূমি হইতে স্বাভাবিক ভূমিতে অবতরণ করিলে তাঁহার চিন্ময় সত্তাও আবৃত হয় এবং তিনি হ'ন দোষগুণময় সুখদুঃখ-সমাচ্ছন্ন মানুষমাত্র। তখন স্বরচিত কাব্যের নানা ব্যঞ্জনাময় সূক্ষ্ম অর্থসমূহ দেখিয়া তিনি নিজেই পরম বিস্ময়ে অভিভূত হন। "ভবানী-ভ্রূকুটীভঙ্গং ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ"—ভবানীর ভ্রূকুটী-ভঙ্গে কি মহিমা, তাহা ভূধর জানেন না, জানেন তাঁহার প্রাণপতি ভব, মহাদেব। কাব্যের স্রষ্টা ও পাঠক সম্বন্ধে এই উপমা সর্বথা সঙ্গত না হইলেও ইহার মধ্যে কিছু সত্য আছে, সন্দেহ নাই।

কাব্য কবির কৃতি হইলেও এক হিসাবে তাহা পাঠকেরও সৃষ্টি। সহৃদয় পাঠকচিত্তে প্রবেশ করিতে না পারিলে কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়? নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে হয় সুদূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া। সূর্যের প্রকাশক যেমন চক্ষু, পাঠকচিত্তও তেমনি কাব্যের প্রকাশক বলিলে অনেক কথাই বলা হয় না। কবির রচিত শব্দার্থ পাঠকের বাসনা-লোকের বিচিত্র স্ফুরণ জন্মাইয়া ভাবার্থ ও রসসৌন্দর্যের সম্পাদনা দ্বারা কাব্যত্ব লাভ করে। কবির মানুষ-জন্ম তুচ্ছ, কবি এক অমর জন্ম—সার্থক জন্ম লাভ করেন পাঠকচিত্তে, তাঁহার দেশও জাতির মানস-লোকে। কবি-চিত্তের সহিত পাঠক-চিত্তের গভীরতম আশ্লেষের ফলে জাতীয় মহাকবির জন্ম হয়, তাহারই ফলে সৃষ্ট হয় আসল কাব্য, তখন পূর্ব-রচিত শব্দ-কাব্য নব নব মহিমা লাভ করে। আমাদের হৃদয় ও মন দ্বারা আদর ও অনুশীলন করিয়া আমরা পূর্ণরূপে গ্রহণ করি কবিসত্তাকে; এমন কি নব ঐতিহ্যসৃষ্টি, ভাষ্যপ্রচার ও নব নব আস্বাদন দ্বারা বৃহত্তর ও মহত্তর মহাকবিকে নিত্যকাল প্রকাশ করিতে থাকি। মানুষ দ্রোণাচার্য বড়, না একলব্যের চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইয়াছেন যে অস্ত্রগুরু, তিনি বড়?

কাব্যবিচারের ব্যাপারে কাব্যাস্বাদ-তৃপ্ত পাঠক-চিত্তের পরিচয় সর্বাগ্রে প্রয়োজন, কবি-চিত্তের পরিচয় তাহাতে অনেকখানি সহজ হইয়া আসে।

কাব্যের ভোক্তা বা আস্বাদয়িতা হইতেছেন দেশ-কাল-পরিচ্ছিন্ন আমি বা আমার ব্যক্তি-পুরুষ, যিনি সহৃদয় সামাজিক বলিয়া কথিত হন। হৃদয় আছে যাঁহার, অর্থাৎ শিক্ষার সৌকুমার্য ও সুরুচি এবং তাহা হইতে জাত কাব্যের সুনিপুণ বাসনা আছে যাঁহার, তিনি সহৃদয়। সমাজচিত্তের সহিত সুনিবিড় যোগ আছে যাঁহার, তিনি সামাজিক। হৃদয়বত্তা লইয়া তিনি যদি সমাজের সুস্থরুচি নিজ মধ্যে প্রতিফলিত করিয়া সমাজের প্রতিনিধি-স্থানীয় হন, তবে তাঁহাকে বলে সহৃদয় সামাজিক। আচার্য অভিনবগুপ্ত সহৃদয়ের সংজ্ঞা দিয়াছেন—

যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়-তন্ময়ীভবন-যোগ্যতা, তে হৃদয়সংবাদ ভাজঃ সহৃদয়াঃ।—ধ্বন্যালোক, ১।১, টীকা

—'কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে মনোরূপ দর্পণ নির্মল হইলে যাঁহারা কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুর সহিত তন্ময়তা পাইতে পারেন, তাঁহারাই হৃদয়-সংবাদ-শালী, তাঁহারাই

সংবাদো হ্যন্য-সাদৃশ্যম্ ।—ধ্বন্যালোক, ৪।১২
—'সংবাদ হইতেছে অন্য-সাদৃশ্য। একস্থলে যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছে, অন্যত্রও তদ্রূপ দর্শন অর্থাৎ একরূপতা।'

'হৃদয়-সংবাদ' অর্থ অন্য হৃদয়ের সহিত সাদৃশ্য; পাঠক হৃদয়ের সহিত কাব্যের আলম্বন-বিভাব যে নায়কাদি, তাহাদের হৃদয়ের সাদৃশ্য অর্থাৎ উভয় হৃদয়ের একরূপতা। ইহাকেই পূর্বে বলা হইয়াছে পাঠকের নির্মল মনোমুকুরে বর্ণনীয় বস্তুর প্রতিবিম্বন বা তন্ময়ীভাব। অতএব সহৃদয়তা এবং হৃদয়-সংবাদ-শালিতা একই কথা। অন্যত্র অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন,—

অধিকারী চাত্র বিমল-প্রতিভানশালিহৃদয়ঃ।—নাট্যসূত্র, ৬।৩৪, ভাষ্য
—'নাট্য বা কাব্য আস্বাদনের অধিকারী হইতেছেন তিনি, যাঁহার হৃদয় বিমল প্রতিভান-শালী।'

প্রতিভান শব্দের অর্থ তিনিই লিখিয়াছেন, 'সাক্ষাৎকার'। যাঁহার হৃদয় বস্তুর বিমল সাক্ষাৎকার পায়, তিনিই সহৃদয় এবং তিনিই কাব্যপাঠের অধিকারী।

গ্রীক সাহিত্যেও নাট্য ও কাব্য-বিচারে সহৃদয় সামাজিকের স্থান প্রধান। প্লেটো বলেন, আনন্দদ্বারা কাব্য বিচার করিতে হইলে, সে আনন্দ হইবে এমন এক ব্যক্তির আনন্দ যিনি সংস্কৃতি ও শিক্ষায় অতিমহান্—

"One man pre-eminent in virtue and education—"
Laws ii, 658 *E*

আরিস্টটলের অভিমত ব্যাখ্যা করিয়া বুচার বলেন,—

"To the ideal spectator or listener, who is a man of educated taste and represents an instructed public, every fine art addresses itself; he may be called 'the rule and standard' of that art, as the man of moral insight is of morals;"
—*Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art*, 4th Edn., p. 213

—'প্রত্যেক সুকুমার কলা এমন এক আদর্শ প্রেক্ষক বা শ্রোতার নিকট আবেদন জানায়, যিনি মার্জিতরুচিসম্পন্ন এবং শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তি; নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তি যেমন নীতিশাস্ত্রের, সেইরূপ তাঁহাকেও সেই সেই কলাশাস্ত্রের 'নিয়ম এবং প্রমাণ' বলা যাইতে পারে।'

উভয় দেশের কাব্য-বিচারেই দেখা গেল কাব্য ব্যক্তিবিশেষের নয়, সমাজের। এক সামাজিক উহা প্রকাশ করেন, অপর সামাজিকেরা আস্বাদ করেন। আমিই

সেই সহৃদয় সামাজিক, এখানে কাব্যের শ্রোতা বা পাঠক, অথবা নাট্যাভিনয়ের দর্শক।

আমরা বিচরণ করি দুইটি জগতে, এক আমাদের অনুভূত অন্তর্জগৎ, অপর দৃশ্যমান এই বহির্জগৎ। আমার জ্ঞানে ও অনুভূতিতে এই উভয় জগৎ সত্তাবান্, বিধৃত ও প্রকাশিত। এই আমি যেমন আমার এই দেহেন্দ্রিয়-বুদ্ধি-সত্তাময় অন্তর্জগতের কেন্দ্র, তেমনি রূপরসগন্ধাদিময় ও প্রাণময় বহির্জগতেরও কেন্দ্র। সেই আমির শুদ্ধ স্বরূপ হইতেছে সত্তা, সংবিৎ বা চিৎ এবং আনন্দ। তমোগুণের আবরণ ও রজোগুণের বিক্ষেপহেতু চিদানন্দময় আমির অবাধিত প্রকাশ হয় কদাচিৎ। মানবের যাবতীয় কর্ম ও জ্ঞান-প্রচেষ্টা এবং অন্তর্বেদনা এই শুদ্ধ আমিকে সহজরূপে প্রকাশ ও উপলব্ধি করিবার জন্য। কাব্যপাঠ অথবা নাট্য-দর্শনের সার্থকতার সত্য পরিমাপ হইবে আমাদের সংবিৎ ও আনন্দের আবরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নিজ শুদ্ধ স্বরূপকে প্রকাশ ও আস্বাদন করিবার ক্ষমতায়।

কাব্যের লক্ষণ-বিচারে কাব্যের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যই সর্ব্বাগ্রে আলোচনীয়।

কাব্যের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য আনন্দ। যশোলাভ, ব্যবহার-জ্ঞান, কান্তা-সম্মিত মধুর উপদেশ দান বা নীতিপ্রচার প্রভৃতি গৌণ লক্ষ্যও থাকিতে পারে, তাহাতে কিছু যায় আসে না। শব্দার্থের সাহায্যে মূল লক্ষ্য সিদ্ধ না হইলে রচনার কাব্যত্ব হয় না। আমাদের প্রদত্ত শেষ সংজ্ঞাটিতে "আনন্দময়" শব্দের অর্থ আনন্দাত্মক বা আনন্দ-স্বভাব।

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষের কর্ম-যোগে, ভক্তি-যোগে বা জ্ঞান-যোগে যে প্রকার, ভারতবর্ষের শিল্প-যোগে বা কাব্য-যোগেও সেই প্রকার অনুভূত হয়। রাগদ্বেষ ত্যাগ করিয়া কর্ম- বা ভক্তি-সহায়তায় পরমানন্দ প্রাপ্তির সাধনাই কর্মযোগ বা ভক্তিযোগ। বস্তুতঃ কাব্য-পাঠও ঐ একই উদ্দেশ্যের আনুকূল্য করে; মানুষের পরিমিত ব্যক্তিত্বের অন্ততঃ আংশিক অবসান ঘটাইয়া তাহার সত্ত্বগুণে প্রতিবিম্বিত আনন্দ-চৈতন্যের ক্ষণিক প্রকাশ-রূপ কাব্যানন্দ দান করে। এই জন্যই সুধীগণ বলিয়া থাকেন,—

সংসার-বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে।
কাব্যামৃত-রসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ ॥

—'সংসাররূপ বিষবৃক্ষের মাত্র দুইটি মধুর ফল, একটি কাব্যামৃত-রসাস্বাদ, অপরটি সাধুজনের সহিত মিলন।'

কাব্য পাঠের আনন্দ লোকোত্তর আনন্দ বা অলৌকিক আনন্দ। পুত্রলাভ হইয়াছে, যশোলাভ হইয়াছে—ইহাতে যে আনন্দ, তাহা বিষয়ানন্দ, তাহাই হইতেছে লৌকিক আনন্দ। পরিবার-পরিধিতে নিজ নিজ ব্যক্তি-সত্তায় অধিষ্ঠিত হইয়া আমরা অজস্র প্রকার সুখদুঃখ, ভালমন্দ, অনুকূল বা প্রতিকূল বেদনীয়ের সঙ্গে এই লৌকিক আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। আর দেশ-কালের ব্যবচ্ছেদ বিস্মৃত হইয়া বিশিষ্ট ব্যক্তি-সত্তার ঊর্ধ্বে রজস্তমোগুণের মলিনতা-মুক্ত চিত্তে আমরা ভোগ করিয়া থাকি এই লোকোত্তর কাব্যানন্দ। এই জন্য কাব্যানন্দকে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, 'পরব্রহ্মাস্বাদ-সচিবঃ' (ধ্বন্যালোক, ২।৪, টীকা) এবং বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, 'অখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ' ও 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ' (সাহিত্য-দর্পণ, ৩।৩৫)।

কাব্য-পাঠের পরম লাভ আমাদের সমগ্র-পুরুষীয় সত্তার উদ্বোধন এবং ক্রমে আনন্দ-সত্তায় বিহার। ঋষিগণের মতে পাঁচটি সত্তা লইয়া আমাদের সমগ্র-পুরুষীয় সত্তা। তাহারা হইতেছে,—অন্নময় সত্তা, প্রাণময় সত্তা, মনোময় সত্তা, বিজ্ঞানময় সত্তা ও আনন্দময় সত্তা। কাব্য-আস্বাদনে অথবা সৌন্দর্যময় যে কোন শিল্পের অনুশীলনে আমাদের বিজ্ঞানময়, বিশেষতঃ আনন্দময় স্বরূপের উপলব্ধি হয়, ভাঙ্গিয়া যায় লৌকিক মোহাবরণ! পশু-সাধারণ আমাদের স্থূল জীবত্ব মুখ্যতঃ অন্নময় ও প্রাণময় সত্তা লইয়া; মানুষ-সম্পর্কে মনোময় সত্তাও সমান প্রধান। অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত মানুষ এই তিন সত্তায় পুষ্টিলাভ করিলেই চরিতার্থতা বোধ করে। কিন্তু যে পরিণত পূর্ণশক্তি মানুষ মনোময় সত্তার অতীত বিজ্ঞানময় সত্তার বোধদ্যুতি এবং আনন্দময় সত্তার বিপুল পুলক-সম্ভার পাইয়াছে এবং সেই স্ব-ভূমিতেই বিহার করিয়া নিরন্তর আত্মসুখ আস্বাদন করিতে চায়, যাহাকে আমরা কাব্যের ভাষায় বলিয়াছি বিদগ্ধ সহৃদয় সামাজিক, তাহার কথা একেবারে ভুলিলে চলিবে কেন? তাহারাই তো ক্রম-বিবর্তনের পথে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, তাহারাই তো পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করিবে, মানবের মধ্যে মানব-কল্পিত পরিপূর্ণ দেব-মহিমার উদ্ঘাটন করিবে! জীব-সত্তার স্থূল প্রয়োজন মিটায় অন্নজল; মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান এবং ভোগাত্মক রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ, স্থূল বিষয়-সমূহ। কেবল ইহারা তো তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না, তাহাকে বাঁচাইতেও পারে না। সেখানে সে কেবলই দেখে ভয়, সেই অপূর্ণতা অল্পতার মধ্যে সে হাঁপাইয়া উঠে। সে চায় তার পূর্ণ ভূমা স্বরূপকে। চায় সে সৌন্দর্য, রস, নব নব আনন্দ, কাব্য, সঙ্গীত,

নৃত্য, চিত্র, বিচিত্র কলা; চায় সে স্বার্থবিলোপী পরম বোধি—শুক্লধর্ম, তত্ত্বদর্শন, আধ্যাত্মিকতার নিশ্চিত শ্রেয়ঃকে। এক কথায় তাহার বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্তার জন্য শিল্পকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিচিত্রবিদ্যার প্রয়োজন। অপ্রয়োজনের আনন্দ, অবসরের বিলাস, উপরি পাওনা বলিয়া সৃষ্টিতে কিছু নাই। কে চাহিতেছে? কি তাহার স্বরূপ? কতটুকু তাহার প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা? সে কি হৃদয়বত্তায় ও উচ্চতর জ্ঞানধর্মে মানুষ, না শুধু আকৃতিতেই মানুষ? কত জিজ্ঞাসা লইয়া তবে সমাধানের কথা উঠিবে।

অন্ন প্রাণ মন লইয়া যেমন বিজ্ঞান ও আনন্দ, তেমনই বাস্তব জগৎকে লইয়া লোকোত্তর কাব্যজগৎ, যেন মৃৎ-পঙ্ক-জলের উপর শতদলের শোভা। পদ্ম পঙ্ক হইতে উপাদান লইয়াও আকর্ষণ করে সূর্য-প্রভা, ফুটিয়া উঠে পরিপূর্ণ আনন্দে। এই আনন্দ যেমন পদ্মের লোকোত্তর আনন্দ, যে বস্তু হইতেই উৎপন্ন হউক না কেন, অন্ন প্রাণ ও মনোলোকের অতীত বলিয়া কাব্যানন্দও সেইরূপ লোকোত্তর আনন্দ। এই আনন্দই সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য, অপরোক্ষ লক্ষ্য। এ যেন কূপজল ত্যাগ করিয়া সমুদ্রস্নান, ক্ষুদ্র নীড় পরিহার করিয়া মহাকাশে উড্ডয়ন! কি সে আনন্দ যাহার মহিমায় সহৃদয় পুরুষ আকৃষ্ট হইয়া প্রবেশ করে সেই অলৌকিক কাব্যজগতে, প্রাকৃত জগতের আছে যেখানে সকলই—সেই দুঃখ, বেদনা, ক্রোধ, ভয়; আছে ঈর্ষ্যাদ্বেষ, অসূয়ার হলাহল জ্বালা; আছে রতি-শোকের বাস্তব বিকার; আছে প্রতিদ্বন্দ্বি-সংঘর্ষ, জীবন-সংগ্রাম, আত্মম্ভরিতা ও জিগীষা। কিন্তু কবি-প্রতিভার মায়াবলে পাঠকচিত্তে সে ভাব উদ্বুদ্ধ হইয়াও জাগায় শুদ্ধ আনন্দ, এক অনির্বচনীয় আস্বাদ; দেহেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-জনিত ব্যক্তিত্ব-বোধের অবসান ঘটাইয়া আনে এক আবরণ-শূন্য, চিন্ময়, বিস্ময়ময় আনন্দসত্তার বিরাট বিপুল স্পর্শ! ইহাই এক আত্মোপলব্ধি, আত্মার এক অপূর্ব স্ফুরণ ও বিলাস। সদ্যঃ পরনির্বৃতি লাভ, অর্থাৎ কাব্যপাঠ মাত্র সদ্য সদ্য পরমানন্দলাভই কাব্যের মৌলিভূত প্রয়োজন, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য—ইহাই ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের প্রথম ঘোষণা।

এই আত্মোপলব্ধি বা পরমানন্দ-লাভের পর আর কিছু নাই। এই আনন্দকে তাই পূর্বেই বলা হইয়াছে, 'পরব্রহ্মাস্বাদ-সচিব' এবং 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর'। আত্ম-লাভের পর আর কি আছে? শ্রুতি বলেন,—

আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে।

—'আত্ম-লাভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।'

আমাতেই আমার পরম বিশ্রাম এবং চরম প্রতিষ্ঠা।

বাস্তবিক আমার স্বরূপের আংশিক উপলব্ধির পর একমাত্র পূর্ণোপলব্ধির প্রশ্ন উঠিতে পারে ; আর যে কোন প্রশ্নই অবান্তর। কাব্যের তাই মূলীভূত প্রয়োজন আনন্দ ; এই আনন্দ-লাভই কাব্যপাঠের শ্রেষ্ঠ ফল। এই আনন্দ স্বতন্ত্র মহিমায় বিরাজমান, আনন্দেই আনন্দের সার্থকতা। ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল আর কিছু নাই ; অন্য সমুদয় ফলই গৌণ।

পাশ্চাত্ত্য সুধীগণের অভিমতও এ সরল সত্যটিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে। আরিস্টটলের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বুচার বলেন,—

"The object of poetry, as of all the fine arts, is to produce an emotional delight, a pure and elevated pleasure."

—*Aristotle's Theory of Poetry & Fine Art*, p. 221.

—'সকল সুকুমার কলার ন্যায় কাব্যেরও উদ্দেশ্য ভাব-সমুখ আনন্দ, বিশুদ্ধ এবং উর্ধ্বভূমির আনন্দ সৃষ্টি করা।'

বুচার অন্যত্র এই আনন্দকে বলিয়াছেন,—

'A sane and wholesome pleasure'—*Ibid*, p. 226.

—'ধীর এবং হিতকর আনন্দ।'

উক্ত গ্রন্থের 'The End of Fine Art' প্রবন্ধে তিনি শেষ কথাটি স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

"Each is a moment of joy complete in itself, and belongs to the ideal sphere of supreme happiness."—*Ibid*, p. 202.

—'প্রত্যেকটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ এক আহ্লাদের মুহূর্ত, এবং পরম আনন্দের আদর্শ-লোকে তাহার বাস।'

এই প্রসঙ্গে বুচার হেগেলের *Philosophy of Fine Art*-এর ভূমিকা হইতে তুলিয়া হেগেলের অনুরূপ মত প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। হেগেল বলিতে চাহেন, কলানুশীলন দ্বারা সাধারণ আমোদ-প্রমোদ, আমাদের জীবনের বহিরঙ্গের তৃপ্তি সাধন এবং আমাদের চিত্ত বিনোদনও করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে,—

"In this mode of employment art is indeed not independent, not free, but servile."—*B. Bosanquet : Introduction to Hegel's Philosophy of Fine Art*, p. 202.

—'এইরূপ নিয়োগে সুকুমারকলা বস্তুতঃ স্বতন্ত্র থাকে না, স্বাধীন থাকে না, থাকে তাহার দাস-কল্প।'

সুকুমারকলা তাহার উপায় ও উদ্দেশ্য বিষয়ে সর্বদা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকিবে এবং তখনই সে তাহার সর্বোত্তম লক্ষ্য লাভ করিবে। সেই লক্ষ্যই পরম আনন্দ, নিজেতেই তাহা সম্পূর্ণ।

এই স্থূল ব্যক্তি-স্বরূপের বিস্মরণ ও আত্মানন্দের উপলব্ধি কেবল কাব্যশিল্পেরই চরম ফল ও পরম লক্ষ্য নয়; বস্তুতঃ অভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্য বা চিত্রকলা যাবতীয় সুকুমার শিল্পেরই ঐ এক লক্ষ্য। পাশ্চাত্ত্য সুধীগণও এই পরিমিত ব্যক্তিত্বের বিস্মৃতি-রূপ পরমাশ্চর্য ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়াছেন। দার্শনিকপ্রবর বার্গসোঁ বলেন,—

"The aim of art, indeed, is to put to sleep the active powers of our personality, and so to bring us to a perfect state of docility, in which we sympathise with the emotion expressed."

—'বাস্তবিক আর্টের লক্ষ্য হইতেছে, আমাদের ব্যক্তি-পুরুষের কর্মচঞ্চল শক্তিগুলিকে ঘুম পাড়াইয়া রাখা এবং আমাদিগকে এমন এক শান্ত পরিশুদ্ধ অবস্থায় লইয়া আসা, যে অবস্থায় আমরা অভিব্যক্ত ভাবানুভূতির সমান অনুভূতি লাভ করি।'

সাধারণী-করণ নামক যে মানস ব্যাপারের ফলে ইহা সম্ভবপর হয়, তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে উদাহরণ-সহ বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

উপরের বর্ণনা হইতে কাব্যানন্দকে কেহ ব্রহ্মানন্দ বলিয়া ভুল করিবেন না।

কাব্যানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এই উভয়ের মূল কথা আনন্দ। উভয়ের সজাতীয়ত্ব থাকিলেও পার্থক্যও বড় কম নয়। কাব্যানন্দ কাব্যকে অবলম্বন করিয়া কাব্য-বর্ণিত-ভাবাভিষিক্ত চিত্তে নিজ স্বরূপের আনন্দাংশের প্রকাশ; তাই যতক্ষণ কাব্যার্থের অবলম্বন ও ভাবের আস্বাদন, বা তাহার ধ্বনির আলোড়ন, ততক্ষণ তাহার প্রকাশ বা স্থায়িত্ব। ভাব বা রম্যার্থের অবলম্বন বিনা কাব্যানন্দের প্রকাশ হইতে পারে না। তাই সর্বদাই উহা চিত্ত-গত, চিত্তের সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, অতএব কিছু অসম্পূর্ণ এবং অবিশুদ্ধ। শুদ্ধ ব্রহ্মানন্দে এই দুইটি সীমার কোনটিই নাই। কাব্যার্থের ন্যায় তাহার কোন বাহিরের আলম্বন নাই, তাহা নিরালম্বন; এবং চিত্তও সেখানে কার্যশীল থাকে না, থাকে স্বকারণে লীন। স্বয়ংপ্রভ সূর্যের ন্যায় ব্রহ্মানন্দ সর্বদাই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মানন্দ তাই অদ্বৈত, নির্বিকল্প, অস্পর্শযোগগম্য এবং ত্রিগুণাতীত। কাব্যানন্দ সজাতীয় হইলেও ভিন্ন ও নিম্নস্তরের, যেমন সূর্য ও তাহার আলোকে

আলোকিত চন্দ্র। ব্রহ্মানন্দ দুর্লভ বস্তু; কিন্তু কাব্যকে আশ্রয় করিয়া বাগ্-ধেনুর রস-দুগ্ধ সকলেই আস্বাদন করিতে পারেন।

(২)

সংজ্ঞা-বিচার

কাব্যের লক্ষ্য, প্রয়োজন বা ফল বুঝাইতে আনন্দ শব্দ প্রয়োগ না করিয়া আলঙ্কারিকগণ অনেকেই হ্লাদ, আহ্লাদ, নির্বৃতি, চমৎকার, কেহ কেহ রস শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। আমাদের সাহিত্যে রস শব্দেরই বহুল প্রচলন হইয়াছে। আনন্দবর্ধন কাব্যের সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

সহৃদয়-হৃদয়াহ্লাদি শব্দার্থময়ত্বমেব কাব্য-লক্ষণম্।—ধ্বন্যালোক, ১।১ বৃত্তি

—'যে শব্দার্থময় রচনা সহৃদয়ের হৃদয়ে আহ্লাদ জন্মায়, তাহাই কাব্যের লক্ষণ।'

'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ' (ধ্বন্যালোক, ১।১)—কাব্যের আত্মা ধ্বনি,—এই মত সম্পর্কে আমাদের বিরূপ মন্তব্য থাকিলেও উক্ত সংজ্ঞানির্দেশ মোটামুটি আমাদের মনঃপূত। তবে কেবল আহ্লাদ নয়, হৃদয়াহ্লাদ বলিয়া কাব্যকে রস-লক্ষণেই স্ফুট করা হইয়াছে। জগন্নাথ সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্।—রসগঙ্গাধর, ১।১

—'যে শব্দ রমণীয় অর্থের প্রতিপাদক, তাহাই কাব্য।'

তিনি রমণীয়তার অর্থ করিয়াছেন,—

—লোকোত্তরাহ্লাদ-জনক-জ্ঞানগোচরতা।

—'এমন জ্ঞানের গোচরতা—যাহা লোকোত্তর আহ্লাদ জন্মায়।'

আমাদের মনে হয়, লোকোত্তর আহ্লাদই যখন অর্থের বা কাব্যের শ্রেষ্ঠ ফল, তখন উহা বৃত্তিতে না রাখিয়া মূল সূত্রেই সাক্ষাৎভাবে স্থাপন করা উচিত; এবং লোকোত্তর আহ্লাদের সহিত সম্পর্ক দেখাইয়া রস-প্রধান, বস্তু-প্রধান, অলঙ্কার-প্রধান বা অন্যবিধ কাব্যের কাব্যত্ব নির্ণয় করা সঙ্গত। আচার্য মম্মটভট্ট প্রকৃত পক্ষে কাব্যের লক্ষণ দ্বিতীয় ও চতুর্থ এই দুইটি কারিকায় নির্দেশ করিয়াছেন। কারিকা দুইটি হইতেছে এই:

কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতর-ক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে॥—কাব্যপ্রকাশ, ১।২

—'কাব্য রচিত হয় যশের নিমিত্ত, অর্থের নিমিত্ত, লোক-ব্যবহার পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, অমঙ্গল বিনাশের নিমিত্ত, সদ্যঃ পর নির্বৃতি বা পরম আনন্দ লাভের নিমিত্ত এবং কান্তা-সম্মিত উপদেশ প্রয়োগের নিমিত্ত।'

তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি।—কাব্যপ্রকাশ, ১।৪

—'কাব্য হইতেছে দোষহীন গুণযুক্ত শব্দার্থযুগল, যাহা কখন কখন অলঙ্কার-শূন্যও হইয়া থাকে।'

প্রথম সূত্রে কাব্যের লক্ষ্য বা প্রয়োজন এবং দ্বিতীয় সূত্রে কাব্যের উপাদান উল্লেখ করা হইয়াছে। কাব্যের প্রকৃত সংজ্ঞা হইবে প্রয়োজন ও উপাদান এই উভয় লক্ষণের সমন্বয়ে। প্রথম সূত্রের বৃত্তিতে আচার্য নিজেই সকল প্রয়োজনের মৌলিভূত প্রয়োজন বলিয়াছেন সদ্যঃ পরনির্বৃতি বা সদ্যঃ পরম আনন্দ-লাভকে। দ্বিতীয় সূত্রে কাব্যের উপাদান বলা হইয়াছে শব্দার্থকে; দোষরাহিত্য বা গুণশালিতা উহারই বিশেষণ মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আনন্দময় শব্দার্থযুগলই আচার্যের মতে কাব্যের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণসংজ্ঞা। পূর্বে তিনি প্রারম্ভ-শ্লোকে মুখপাতে কবির বাণীকে বলিয়াছেন 'হ্লাদৈকময়ী'—একমাত্র হ্লাদস্বরূপা।

চমৎকার শব্দের অর্থ চিত্তের বিস্ফার বা বিস্তাররূপ বিস্ময়। সাধারণভাবে কাব্যের অলৌকিকত্ব বুঝাইতে শব্দটি মন্দ নয়; কিন্তু ইহাতে কাব্যের লক্ষ্য-ভূত পরমানন্দ বস্তুটি অন্তরালে থাকিয়া যায়। চিত্ত-বিস্ফারেরও যাহা কারণ, তাহা হইতেছে আমাদের আনন্দঘন স্বরূপেরই এক বিস্ময়কর প্রকাশ। আমাদের সমগ্র সত্তার মূলীভূত আনন্দময় স্বভাব ধরিয়াই কাব্য বা শিল্পসমূহের মূল লক্ষণ নির্দেশ করা সঙ্গত।

সাহিত্যদর্পণ-প্রণেতা কবিরাজ বিশ্বনাথের কাব্যসংজ্ঞা অতিপ্রচলিত এবং সাধারণভাবে সর্বত্রই স্বীকৃত। সংজ্ঞাটি হইতেছে,—

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্—সাহিত্যদর্পণ, ১।৩

—'রসাত্মক বাক্যই কাব্য।'

আমাদের প্রদত্ত সংজ্ঞায় আনন্দ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এখানে হইয়াছে রস শব্দ। উভয় শব্দের তাৎপর্য বিচার করিয়া সাবধানে সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক।

আচার্য মম্মটভট্ট কাব্যপ্রয়োজন-বিচারে পূর্বোল্লিখিত 'সদ্যঃপরনির্বৃতয়ে' পদের ব্যাখ্যায় নিজেই লিখিয়াছেন,

সমনন্তরমেব রসাস্বাদন-সমুদ্ভূতং বিগলিত-বেদ্যান্তরম্ আনন্দম্।

—'কাব্যপাঠের সঙ্গে রসাস্বাদন হইতে সমুদ্ভূত আনন্দ, যাহার প্রকাশে অন্য সমুদয় বেদ্য বা জ্ঞেয় বিষয় তৎকালের জন্য বিগলিত হইয়া যায়।'

এখানে রস ও আনন্দ শব্দের কুশল প্রয়োগ লক্ষণীয়। আচার্য মনে করেন, রস ও আনন্দ সর্বথা এক নয়। রস আস্বাদন করিতে হয়; আস্বাদনকালে অন্য বেদ্য বিষয়সমূহ বিগলিত হয় এবং আনন্দের প্রকাশ ঘটে। রসের সহিত চিত্তের ভাবসিক্ত অবস্থা এবং আস্বাদনক্রিয়ার সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে।

আনন্দ রসাস্বাদনের ফল, রসেরও উর্ধ্বে প্রকাশ-স্বভাব সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপ। আনন্দ কাব্যের "অব্যভিচার তটস্থ লক্ষণ" হইলেও আত্মার খাঁটি স্বরূপলক্ষণ-বাচক শব্দ। বাস্তবিকও রস ও আনন্দ শব্দ সবথা সমার্থক শব্দ নয়। মম্মট-ভট্ট বা বিশ্বনাথ উভয়েই যাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, সেই আচার্য আনন্দবর্ধন বলেন,—

বিভাবত্বেন চিত্তবৃত্তি-বিশেষো হি রসাদয়ঃ।—ধ্বন্যালোক ৩।৪২, ৪৩, বৃত্তি।

—'রসাদি হইতেছে বিভাব-জনিত চিত্তবৃত্তি-বিশেষ।'

আমরা বলিতে পারি, ইহা আলম্বন-বিভাবাদি হইতে জাত ভাবময় চিত্তবৃত্তিতে আনন্দ-স্বরূপের প্রকাশ। ধ্বন্যালোক ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লোচন-টীকার প্রথম ভাগেই আচার্য অভিনবগুপ্ত রসের সংজ্ঞা করিয়াছেন—

("শব্দসমর্প্যমাণ-হৃদয়সংবাদ-সুন্দর-বিভানুভাব-সমুদিত-প্রাঙ্‌নিবিষ্টরত্যাদিবাসনা-নুরাগ-সুকুমার-**স্বসংবিদানন্দ-চর্বণব্যাপার-রসনীয়রূপো রসঃ**।")

—ধন্যালোক, ১।৪, টীকা

পরবর্তী অধ্যায়ে রসের বিশদ আলোচনা হইবে। এখানে উদ্ধৃত বচনের শেষাংশ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, রস হইতেছে নিজ সংবিদানন্দ বা চিদানন্দের আস্বাদন-ব্যাপারের একটি রসনীয় রূপ। সোজা ভাষায় নিজ আনন্দের আস্বাদনরূপ ব্যাপারই রস।

এখানে একটি সংশয় জাগিতে পারে। মম্মটভট্ট বলিয়াছেন, রসাস্বাদন হইতে সমুদ্ভূত হয় আনন্দ; আবার অভিনবগুপ্ত বলিতেছেন, আনন্দের আস্বাদন হইতেছে রস। এই দুই উক্তির সামঞ্জস্য কোথায়? বাস্তবিক পক্ষে দুই আচার্য দুই দিক হইতে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। মম্মটভট্ট ভাবকে মনে রাখিয়া রসকে ধরিয়া আনন্দকে লক্ষ্য করিতেছেন; তাঁহার প্রয়োজন হইতেছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নির্বৃতি বা আনন্দ, ইহা বুঝান। অভিনবগুপ্ত উদ্দেশ্য বিচারে বসেন নাই।

তিনি রসের সংজ্ঞা দিতেছেন এবং সেই জন্য সংবিদানন্দের কথা আগে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ভাব-তন্ময় চিত্তে আনন্দের প্রতিফলন বা প্রকাশই রস ; আনন্দ ঊর্ধ্বে বর্তমান, তাহা শব্দার্থজাত ভাবদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলে রস হয়। প্রকাশ যদি চর্বণা বা আস্বাদন হয়, তাহা হইলে আনন্দের চর্বণা-ব্যাপারই রস। মম্মট রসাস্বাদনকে আগে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাতে সমুদ্ভূত বা প্রকাশিত যে আনন্দ, তাহাই কাব্যের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আমাদের উদ্দেশ্য আনন্দ ও রস যে পৃথক্, ইহা বুঝান এবং আনন্দ ভাবাবলম্বন ব্যতীত অন্য অবলম্বনেও জন্মিতে পারে, ইহা বুঝান। বস্তুতঃ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে আনন্দ ও রস এক বলিয়াও মনে হইতে পারে। কাব্যপ্রকাশের 'প্রদীপ' টীকা-কার গোবিন্দঠক্কর "রসাস্বাদন-সমুদ্ভূতম্ আনন্দম্"-এর অর্থ লিখিয়াছেন, "রসাস্বাদনস্বরূপম্ আনন্দম্।" ধনঞ্জয়ও কি ভাবে কাব্যের আনন্দ উদ্ভূত হয়, কি বা তাহার স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া লিখিতেছেন,—

স্বাদঃ কাব্যার্থ-সম্ভেদাদ্ আত্মানন্দ-সমুদ্ভবঃ।—দশরূপক, ৪।৪৩

—'কাব্যদ্বারা যে অর্থসমূহ প্রকাশিত হয়, তাহাদের সম্মেলনে আত্মস্বরূপ যে আনন্দ সমুদ্ভূত বা সমুদিত হয়, তাহাই স্বাদ অর্থাৎ রস।'

এখানেও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে আনন্দ ও রস এক মনে করা হইয়াছে।

কাব্যের প্রয়োজন বুঝাইতে গিয়া হেমচন্দ্র আনন্দেরই প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন,—

কাব্যমানন্দায় যশসে কান্তাতুল্যোপদেশায় চ।—কাব্যানুশাসন, ১।৩

—'কাব্য লেখা হয় আনন্দের নিমিত্ত, যশের নিমিত্ত, কান্তা-তুল্য উপদেশ-লাভের নিমিত্ত।'

পরে আনন্দ কি বুঝাইতে যাইয়া বৃত্তিতে লিখিতেছেন,—

সদ্যো রসাস্বাদজন্মা নিরস্ত-বেদ্যান্তরা ব্রহ্মাস্বাদসদৃশী প্রীতিরানন্দঃ।

—কাব্যানুশাসন, ১।৩

—'আনন্দ সদ্য রসাস্বাদ হইতে জাত হয়, তখন অন্য কোন বেদ্য বিষয় থাকে না ; উহা ব্রহ্মাস্বাদের ন্যায় একপ্রকার প্রীতি-বিশেষ।'

এখানে আনন্দ ও রসের সূক্ষ্ম পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে।

আনন্দ ও কাব্যের রসকে অনেকে একার্থক মনে করেন বলিয়া আলোচনা কিছু দীর্ঘ করিতে হইল।

বাস্তবিকই রস ও আনন্দ শব্দ দুইটি মৌলিক অর্থে এবং অর্থের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় এক নহে। রস কেবলমাত্র ভাবাশ্রিত আনন্দ, কিন্তু ভাবাশ্রয় ছাড়াও

রম্যার্থ ও অলঙ্কার প্রভৃতির আশ্রয়ে আনন্দ প্রকাশ পাইতে পারে এবং প্রকাশ পাইয়া থাকে। রস সাধারণতঃ emotional pleasure, আনন্দ emotional pleasure, intellectual pleasure বা অন্যবিধ pleasure-ও হইতে পারে।

কাব্যানন্দ বুঝাইতে ইংরেজ সমালোচক ও কবিগণ সাধারণতঃ pleasure শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন। পূর্বে বুচারের যে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইবে তিনি কাব্যানন্দকে বুঝাইয়াছেন 'delight' বা 'pleasure' শব্দ দিয়া। লী হাণ্ট্ 'What is poetry ?' নামক প্রবন্ধে কাব্য কি বলিতে গিয়া আগেই উহার লক্ষ্য নির্দেশ করিয়াছেন,—

"...and its ends, pleasure and exaltation."

—'ইহার উদ্দেশ্য আনন্দ এবং উদ্দীপনা।'

ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ তাঁহার 'Poetry and Poetic Diction' প্রবন্ধে লিখিতেছেন,—

"...whatever passions he communicates to his Reader, those passions, if his Reader's mind be sound and vigorous, should always be accompanied with an overbalance of pleasure."

—'যে যে ভাবই তিনি পাঠকের নিকট পরিবেশন করুন না কেন, পাঠকের চিত্ত শুদ্ধ ও সতেজ থাকিলে ঐ সকল ভাবের সহিত সর্বদাই নিরতিশয় আনন্দ অনুস্যূত থাকে।'

এখানে কেবল pleasure শব্দের প্রয়োগ নয়, passion বা ভাবাবেগ যে pleasure বা আনন্দকে আকর্ষণ করিতেছে তাহাও লক্ষণীয়। সমাজের উপর কাব্যের প্রভাব বুঝাইতে গিয়া শেলি তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধে প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"Poetry is ever accompanied with pleasure."

—'কাব্য সর্বদাই আনন্দ দ্বারা অনুস্যূত থাকে।'

ক্রোচে কিন্তু কাব্যের এই অপূর্ব ফল বুঝাইতে 'pure poetic joy'—বা বিশুদ্ধ কাব্যানন্দ, এই শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন। এই 'joy' শব্দই সমধিক সঙ্গত মনে হয়। কবি কীট্স্ও "A thing of beauty is a joy for ever" বলিয়া সৌন্দর্যোপলব্ধির বিশিষ্ট আনন্দকে 'joy' শব্দদ্বারা বুঝাইয়াছেন।

উপনিষদের ঋষিগণ প্রায় সর্বত্রই ব্রহ্মকে বা আত্মাকে আনন্দ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশে রস শব্দের স্পষ্ট প্রয়োগ মাত্র—

রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।

—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ব্রহ্মানন্দবল্লী ২।৭

—এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রটিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রটির অনুবাদ—

'রসই তিনি, কারণ রসকেই লাভ করিয়া এই পুরুষ (জীব) আনন্দীভূত হন।'

এখানেও রস শব্দ ঠিক আনন্দ-বাচক বলিয়া মনে হয় না। 'বৈ' শব্দ দৃষ্টে আস্বাদনাত্মক রসের সঙ্গে তুলনার ভাব যেন লক্ষ্য হইতেছে।

রস্ ধাতুর মূল অর্থ আস্বাদন করা।

রস্যতে ইতি রসঃ।—সাহিত্যদর্পণ, ১।৩

যাহা রসিত অর্থাৎ আস্বাদিত হয়, তাহাই রস। আস্বাদন করা (to taste) হইতে অনুভব করা (to feel), এবং পরে ভালবাসা (to love) অর্থেও রস্ ধাতুর বহুলপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ইহা সাধারণ স্বাদ; কটু, অম্ল, কষায়, লবণ, তিক্ত ও মধুর—এই ছয় রকম বিশিষ্ট স্বাদ; ইচ্ছা, ভাব, সৌন্দর্য, গুণ, স্নেহ, প্রেম, সুখ, আনন্দ, রতি; শৃঙ্গার প্রভৃতি আট প্রকার নাট্য বা কাব্য রস; অমৃত, মধু, ইক্ষুরস, স্বর্ণ, সার, বীর্য, দুগ্ধ, দ্রবপদার্থ, জল, রসনা, পারদ, ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকজনিত প্রথম পরিণতি, মদ্য, এমন কি বিষ এবং আরও কতিপয় অর্থে সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার প্রয়োগ পাওয়া যায়। রস শব্দের মূল অর্থ যে স্বাদ, তাহা হইতেই এত বিভিন্ন ও বিচিত্র অর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। অলঙ্কারশাস্ত্রেও ইহা সর্বদাই আস্বাদনার্থক বা আস্বাদনাত্মক। নাট্যশাস্ত্রে ভরত মুনি নাট্যরস উপলক্ষে রস শব্দের যে বিশিষ্ট প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহারও ব্যাখ্যানকালে স্পষ্ট ভাষায় রসের স্বাদন-ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন,—

অত্রাহ, রস ইতি কঃ পদার্থ? আস্বাদ্যত্বাৎ।—নাট্যশাস্ত্র, ৬।৩৫

—'রস কোন্ পদার্থকে বলে?—যাহা আস্বাদিত হয়।'

আবার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন—

যথাহি নানা-ব্যঞ্জনৌষধি-দ্রব্য-সংযোগাদ্ রস-নিষ্পত্তিঃ।—নাট্যশাস্ত্র, ৬।৩৫

—'যে প্রকার নানা ব্যঞ্জন ও ঔষধি দ্রব্যের সংযোগে রস-নিষ্পত্তি হয়।'

মুনি আরম্ভেই রসের এই সাধারণ ধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিয়াছেন,—

—নহি রসাদ্ ঋতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে।—নাট্যশাস্ত্র, ৬।৩৪

—'রস ভিন্ন কোন বিষয়ের প্রবর্তনা হয় না।'

পরবর্তী আচার্যগণও কেহ—

পানক-রস-ন্যায়েন চর্ব্যমাণঃ—কাব্যপ্রকাশ, ৪।২৮

—'পানা বা সরবতের রসের ন্যায় আস্বাদ্যমান',

কেহ বা

সর্বোঽপি রসনাদ্ রসঃ—সাহিত্যদর্পণ, ৩।৪২

—'রসন বা আস্বাদন হেতু সকলই রস,'

এইরূপ নির্দেশ করিয়া ঐ একই কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যাহাই হউক, কাব্যশাস্ত্রে বিশ্বনাথের ন্যায় অনেক আলঙ্কারিক পণ্ডিত রস-শব্দ দ্বারা কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। বিশ্বনাথের অনেক পূর্বে আচার্য অভিনবগুপ্ত ধ্বন্যালোকের লোচন-টীকায় স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

নহি তচ্ছূন্যং কাব্যং কিংচিদস্তীতি।—ধ্বন্যালোক ২।৩, টীকা

—'রস-শূন্য কোনও কাব্যই নাই।'

রসবাদের যিনি পুনর্জীবন দিয়াছেন এবং ধ্বনিবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই আনন্দবর্ধন কিন্তু কাব্য-লক্ষণ নির্দেশে রস শব্দ প্রয়োগ না করিয়া আহ্লাদ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আনন্দবর্ধনের পূর্বে কাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশে ভামহ, বামন, দণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ শব্দার্থের সাহিত্য বা দোষ-গুণ-রীতি দ্বারা উপাদানের উল্লেখ ভিন্ন কাব্যের লক্ষ্য বা প্রয়োজন বিষয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই। ভামহ সাধারণ ভাবে মাত্র কলানৈপুণ্য, কীর্তি ও প্রীতিকে সাধুকাব্যের ফল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মনে হয়, আচার্য আনন্দবর্ধন কাব্যের লক্ষণ-বিচারে সর্বপ্রথম আনন্দ-জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করেন এবং সসঙ্কোচে শব্দার্থের "সহৃদয়-হৃদয়াহ্লাদি" বিশেষণ ব্যবহার করিয়া কাব্যের এই স্বরূপধর্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হয়তো ধ্বনিবাদ হইতেই তিনি এই ব্যঙ্গ্য আহ্লাদের বিশেষ সন্ধান পাইয়াছিলেন; সে আহ্লাদ সর্বত্রই রস কি না তাহা স্ফুটরূপে কিছু বুঝা যায় না। তবে 'হৃদয়াহ্লাদ' শব্দ প্রয়োগ করায় রসই লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়।

যাহাই হউক, ইহা মধ্যপথ কিন্তু প্রথম সার্থক ইঙ্গিত। আনন্দবর্ধনের পর আচার্য অভিনবগুপ্ত রসবাদকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রসশূন্য কাব্যের অস্তিত্ব নাই, ইহাই ঘোষণা করিলেন। এ অতি সাহসের কথা। তাঁহার পরবর্তী আচার্য মনস্বী মম্মটভট্ট স্পষ্ট কিছু বলিলেন না, কিন্তু প্রকারান্তরে 'রসাত্মক বাক্যই কাব্য' এই মতবাদের ভূমিকা স্থাপন করিলেন। কাব্যের প্রয়োজন বুঝাইতে যাইয়া পরনির্বৃতি অর্থ তিনি করিয়াছেন, রসাস্বাদন-সমুদ্ভূত আনন্দ, অন্যবিধ আনন্দ নহে। অন্য ভাষায় বলা চলে,

মম্মটভট্টের মতেও ভাবাশ্রিত রসাস্বাদনই কাব্যের প্রয়োজন। মম্মটের অনুসরণকারী বিশ্বনাথ ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া স্পষ্টরূপেই নির্দেশ করিলেন,—রসাত্মক বাক্যই কাব্য। পরবর্তী প্রায় সকল আলঙ্কারিক এই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

কেবল সপ্তদশ শতাব্দীতে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ তাঁহার 'রসগঙ্গাধর' গ্রন্থে এই মতের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, দেখা যায়। সে সমালোচনায় অনেকে মনোযোগী না হইলেও তাহা যে সম্পূর্ণ যুক্তি-সহ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জগন্নাথ রসশব্দ অলঙ্কার-শাস্ত্রে প্রযুক্ত অর্থে গ্রহণ করিয়া মন্তব্য করিলেন,—

যত্তু 'রসবদেব কাব্যম্' ইতি সাহিত্য-দর্পণে নির্ণীতম্, তন্ন। বস্ত্বলঙ্কার-প্রধানানাং কাব্যানাম্ অকাব্যত্বাপত্তেঃ। ন চ ইষ্টাপত্তিঃ। মহাকবি-সম্প্রদায়স্য আকুলীভাব-প্রসঙ্গাৎ। তথা চ জলপ্রবাহ-বেগনিপতনোৎপতন-ভ্রমণানি কবিভি র্বর্ণিতানি কপিবালাদি-বিলসিতানি চ। ন চ তত্রাপি যথাকথংচিৎপরম্পরয়া রসস্পর্শোঽস্ত্যেব ইতি বাচ্যম্। ঈদৃশরসস্পর্শস্য 'গৌশ্চলতি', 'মৃগোধাবতি' ইত্যাদৌ অতিপ্রসক্তত্বেন অপ্রযোজকত্বাৎ। অর্থমাত্রস্য বিভাবানুভাব-ব্যভিচার্যন্যতমত্বাৎ ইতি দিক্।

—রসগঙ্গাধর, ১।১, বৃত্তি

—'সাহিত্য-দর্পণে যে রসবৎ বাক্যই কাব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না। তাহাতে বস্তু-প্রধান ও অলঙ্কার-প্রধান কাব্যসমূহ অকাব্য হইয়া যায়। ইহা তো অভিলষিত হইতে পারে না। তাহাতে মহাকবি-সম্প্রদায় আকুল হইয়া উঠিবেন। এইরূপে কবিগণের বর্ণিত জল-প্রবাহ, বেগে নিপতন বা উৎপতন, ভ্রমণ অথবা কপি-বিলাস (১) বা বালক প্রভৃতির বিলাসও অকাব্য হইয়া যায়। এই সকল স্থলেও যে কোন প্রকার পরম্পরাক্রমে রসের স্পর্শ আছে, ইহা বলা উচিত নয়। তাহা হইলে 'গোরু চলে', 'হরিণ দৌড়ায়' ইত্যাদি বাক্যেও অতিপ্রসক্ততা-হেতু এইরূপ

(১) মনে হয়, সীতার সংবাদ লইয়া হনূমান্ প্রত্যাগমন করিলে হৃষ্ট কপিকুলের মধুবনে যে বিলাস, তাহারই বিষয় এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। বাল্মীকি-রামায়ণের ঐ অংশ নিম্নে দেওয়া হইল,—

"গায়ন্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচিৎ নৃত্যন্তি কেচিৎ প্রণমন্তি কেচিৎ।
পঠন্তি কেচিৎ প্রচরন্তি কেচিৎ প্লবন্তি কেচিৎ প্রলপন্তি কেচিৎ॥
পরস্পরং কেচিদ্ উপাশ্রয়ন্তি পরস্পরং কেচিদ্ অতিক্রবন্তি।
দ্রুমাদ্ দ্রুমং কেচিদ্ অভিদ্রবন্তি ক্ষিতৌ নগাগ্রাৎ নিপতন্তি কেচিৎ॥

রসের স্পর্শ প্রযুক্ত হইতে পারে ; কিন্তু তাহা হয় না। তাহা ছাড়া অর্থমাত্রই কোন-না-কোন-প্রকার বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে।'

পূর্বাচার্যগণের শিক্ষা-অনুসারেই জগন্নাথ রসের লক্ষণ লিখিয়াছেন,—

রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ। —রসগঙ্গাধর, ১৬, বৃত্তি

—'রত্যাদি-বিশিষ্ট ভগ্নাবরণ চিৎ-স্বরূপই রস।'

চিত্তের রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা বিশিষ্ট হওয়ায় সাধারণীকরণের ফলে আবরণ ভাঙ্গিয়া যায়, তখন চিৎ বা চৈতন্য-স্বরূপই রস-রূপে প্রকাশ পায়। সোজা কথায় সত্ত্বগুণপ্রধান চিত্তের ভাব-তন্ময় অবস্থায় আত্মচৈতন্যের প্রকাশই রস। এই রস তাহা হইলে যে প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে, মাত্র তাহাই কাব্য নামে পরিচিত হইবে ; অর্থাৎ যে রচনা নায়ক-নায়িকারূপ বিভাবাদির আলম্বনে চিত্তে কোন স্থায়ী ভাব জন্মাইতে পারিবে না, তাহা রসাত্মক রচনা হইবে না এবং তাহা কাব্যও হইবে না। এই স্থায়ী ভাব আবার সাধারণতঃ আট প্রকার মাত্র ; যথা—রতি, শোক, উৎসাহ, ক্রোধ, জুগুপ্সা, হাস্য, বিস্ময় ও ভয়। রসের সীমা হইল দুইটি,

মহীতলাৎ কেচিদ্ উদীর্ণবেগা মহাদ্রুমাগ্রাণ্যভিসংপতন্তি।
গায়ন্তমন্যঃ প্রহসন্নুপৈতি রুদন্তমন্যঃ প্ররুদন্নুপৈতি ॥
তুদন্তমন্যঃ প্রণুদন্নুপৈতি সমাকুলং তৎ কপিসৈন্যমাসীৎ।
ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব মত্তো ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব দৃপ্তঃ ॥"

—সুন্দরকাণ্ড, ৬১।১৬-১৯

—'বানরগণ কেহ কেহ গান করে, কেহ বা হাসে, কেহ নাচে, কেহ বা করে প্রণাম। কেহ করে পাঠ, কেহ বা প্রচার ; কেহ দেয় লম্ফ, কেহ বকে প্রলাপ। কেহ কেহ পরস্পরের কাঁধে চড়ে, কেহ কেহ পরস্পরে করে ঝগড়া! বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে কেহ ধায় বেগে, কেহ কেহ বৃক্ষের অগ্র হইতে পড়ে মাটিতে! কেহ কেহ উদীর্ণবেগে মহীতল হইতে এক লম্ফে উঠে বড় বড় বৃক্ষের অগ্রভাগে! কেহ গান করে, অন্য কেহ তাহার দিকে অট্টহাসি হাসিতে হাসিতে ছোটে! কেহ কেহ কাঁদে, অন্য কেহ তাহার দিকে আরও উচ্চে কাঁদিতে কাঁদিতে ধায়! কেহ অন্যকে ব্যথা দেয়, অন্য কেহ আবার তাহাকে পীড়ন করিতে ছোটে; সেই সমস্ত কপি সৈন্য উৎকট চেষ্টায় অধীর হইয়া উঠিল! এখানে এমন কেহ ছিল না যে মত্ত নয়, এমন কেহ ছিল না যে দৃপ্ত নয়!'—বাল্মীকির রচনায় ছন্দের ও বর্ণনার চমৎকারিত্ব সহজেই মন হরণ করে।

তাহা চিত্তের ভাব-প্রধান অবস্থায় জাত এবং এই ভাব মাত্র আট বা নয় বা দশ প্রকার। জগন্নাথই প্রশ্ন করিয়াছেন, যে সমুদয় রচনায় ভাব প্রধান না হইয়া বস্তু বা অলঙ্কার প্রধান হইবে এবং স্বভাব-বর্ণন-মূলক যে সমুদয় রচনায় কোন মনুষ্যভাব সাক্ষাৎ ভাবে থাকিবে না, তাহারা কি তবে অ-কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে?

এই-জাতীয় প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই সূত্রকার বিশ্বনাথ নিজ ব্যাখ্যানে লিখিয়াছেন—

রস্যতে ইতি রস ইতি ব্যুৎপত্তি-যোগাদ্ ভাব-তদাভাসাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে।

—সাহিত্যদর্পণ, ১।৩

—'আস্বাদ করা যায় যাহা, তাহা রস,—এই ব্যুৎপত্তির বলে ভাব ও ভাবাভাস প্রভৃতিও গৃহীত হইবে।'

কিন্তু ইহার সীমা কোথায়? জগন্নাথ বলেন, কোন প্রকার বিভাব অনুভাব সর্বত্রই দেখানো যায় এবং শেষ পর্যন্ত 'গোরু চলে', 'হরিণ দৌড়ায়' এই বাক্যগুলিও কাব্য হইয়া দাঁড়ায়।

যাঁহারা সংজ্ঞা করিলেন, রস যে বাক্যের আত্মা অর্থাৎ 'সাররূপ' বা 'জীবনাধায়ক', কেবল মাত্র তাহাই কাব্য, তাঁহারা শেষে সংজ্ঞার মর্যাদা রক্ষার জন্য ব্যাখ্যা করিলেন, পারিভাষিক রস নয়, সাধারণ রস অর্থাৎ স্বাদের সম্পর্ক-মাত্র কোন বাক্যে থাকিলেই তাহা কাব্য বলিয়া গৃহীত হইবে। রসাত্মক বাক্য নয়, রস-স্পৃষ্ট বাক্য হইলেও কাব্য হইবে। রসের স্পর্শ কি বাক্যের কাব্যত্বের কারণ হইতে পারে? অর্থ, বস্তু, অলঙ্কার, রীতি, সকল অংশেই দুর্বল হইয়া রসের কিঞ্চিৎ স্পর্শে বাক্য কাব্য হয় না। সুতরাং এইরূপ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যান অশ্রদ্ধেয়।

সংজ্ঞাটির অব্যাপ্তি দোষ পরিস্ফুট। রসাত্মক বাক্য কাব্য, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু বস্তু-প্রধান বা অলঙ্কার-প্রধান রচনা, স্বভাবোক্তি বা স্বভাববর্ণন অথবা নিসর্গ-কবিতা এবং আধুনিক কালের বিচিত্র ভাবাশ্রয়ী গীতিকবিতা, এমন কি বুদ্ধিদীপ্ত এবং বাগ্‌ভঙ্গী-প্রধান সাম্প্রতিক কবিতাও কাব্য। এমন সংজ্ঞা প্রয়োজন, যাহা অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষ পরিহার করিয়া সকল প্রকার কবি-বাঙনির্মিতিকেই বুঝাইতে পারে।

বাস্তবিক যে গুণ বা ধর্মের জন্য যে রচনার প্রাধান্য, সেই গুণ বা ধর্মকে লক্ষ্য করিয়াই সেই রচনার স্বরূপ স্বীকৃত হওয়া উচিত। সংস্কৃত-সাহিত্যের মহাকাব্য বা নাট্যকাব্যের কথাই ধরা যাক। তাহাতে এমন অনেক শ্লোক আছে, যাহাদের কিছুমাত্র রস-প্রাধান্য নাই। ভারবি, মাঘ, এমন কি কালিদাসের কাব্যেরও রসোজ্জ্বল

শ্লোক—কখনও পর পর একক্রমে, কখনও বা রচনা-প্রবাহের মধ্যে মধ্যে সজ্জিত আছে। বাকী শ্লোকগুলি কোথাও অর্থগৌরবে, কোথাও বা অলঙ্কার, গুণ ও রীতি-সম্পদে, কোথাও কেবলমাত্র শব্দ ও ছন্দের অপূর্ব ধ্বনিসম্পদে আখ্যান বা ঘটনাকে চালাইয়া লইয়াছে। এই রচনাসমূহ কি কাব্য নয়? ভারবির কিরাতার্জুনীয় হইতে দুইটি শ্লোক লওয়া যাক্,—

উদারকীর্তে রুদয়ং দয়াবতঃ
প্রশান্তবাধং দিশতোঽভিরক্ষয়া।
স্বয়ং প্রদুগ্ধেঽস্য গুণৈ রুপস্নুতা
বসূপমানস্য বসূনি মেদিনী॥—১।১৮

—'উদারকীর্তি দয়াবান্ দুর্যোধন বাধাসমূহ প্রশমন করিয়া সকল দিক রক্ষা-পূর্বক রাজ্যের অভ্যুদয় সাধন করিতেছেন; কুবেরোপম সেই রাজার দয়াদিগুণে দ্রবীভূত হইয়া বসুমতী স্বয়ংই তাঁহার জন্য ধন দোহন করিতেছেন।'

দ্বিতীয়টি,

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্
অবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্।
বৃণতে হি বিমৃশ্যকারিণং
গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ॥—২।৩০

—'সহসা কোন কার্য করিবে না, অবিবেচনা পরম বিপদের কারণ হয়; যিনি চিন্তা করিয়া কার্য করেন, গুণলুব্ধ সম্পদ স্বয়ংই তাঁহাকে বরণ করে।'

এই শ্লোক দুইটির কাব্যত্ব কোথায় প্রণিধান করিলেই উল্লিখিত মন্তব্য উপলব্ধি হইবে। কালিদাসের কুমার-সম্ভব কাব্যে হিমালয়-বর্ণনা অথবা রঘুবংশ কাব্যের গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম-বর্ণনায় কি রস আছে? বিস্ময়-স্থায়িভাব অদ্ভুতরসের কথা বলিয়া নিশ্চয়ই সমস্ত নিসর্গ-কবিতাকে রসোত্তীর্ণ করা যায় না। বিস্ময়ভাবের মধ্যে পড়ে মানুষের যাবতীয় ভাব; যেখানে তাহার বিশেষ প্রকাশ, সেইখানেই মাত্র তাহা উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এ যুক্তি বিশ্বনাথ দেন নাই। ঠিক এই প্রশ্ন উঠাইয়া তিনি যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহা আমরা তুলিয়া দেখাইতেছি। প্রথমাংশে কিছু তথ্য থাকিলেও মোটের উপর তাহা যে কত দুর্বল ও অসার পড়িলেই বুঝা যাইবে; আমাদের আর খণ্ডন করিবার প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

বিশ্বনাথ লিখিতেছেন,—

"নন্থ তর্হি প্রবন্ধান্তর্বর্তিনাং কেষামপি নীরসানাং পদ্যানাং কাব্যত্বং ন স্যাদ্ ইতি চেৎ। রসবৎপদ্যান্তর্গত-নীরসপদানামিব পদ্যরসেন, প্রবন্ধরসেন এব তেষাং রসবত্তাঙ্গীকারাৎ। যত্তু নীরসেষ্বপি গুণাভিব্যঞ্জকশব্দার্থ-সদ্ভাবাদ্ দোষাভাবাদ্ অলঙ্কার-সদ্ভাবাচ্চ কাব্য-ব্যবহারঃ, স রসাদিমৎ-কাব্যবন্ধ-সাম্যাদ্ গৌণ এব।"—সাহিত্যদর্পণ, ১।২, বৃত্তি

—'আচ্ছা, তবে প্রবন্ধান্তর্বর্তী কতকগুলি নীরস পদ্যের কাব্যত্ব হয় না, এই বলা হইলে? রসযুক্ত পদ্যের অন্তর্গত নীরস পদগুলি যেমন সমগ্র পদ্যের রসদ্বারা রসবান্ হয়, ঠিক তেমনই সমগ্র প্রবন্ধের রসদ্বারা তাহাদের রসবত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে। নীরস পদ্যসমূহও যে গুণাভিব্যঞ্জক শব্দার্থ থাকায়, দোষ না থাকায় এবং অলঙ্কারের প্রাচুর্য থাকায় কাব্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়, তাহা কিন্তু উহাদের রসাদিযুক্ত কাব্যবন্ধের সাদৃশ্য-হেতু করা হইয়া থাকে; উহা গৌণ, সন্দেহ নাই।'

পণ্ডিত বিশ্বনাথের মতে সমগ্র রচনায় রস থাকিলেই তাহার প্রত্যেক অংশে রস আছে ধরিয়া লইতে হইবে; এবং যে সকল রচনায় রস নাই, তাহা গুণালঙ্কারসমৃদ্ধ, শব্দার্থ-মহিমাপূর্ণ এবং দোষ-শূন্য হইলেও প্রকৃত কাব্যপদবাচ্য নহে।

বাল্মীকি, বেদব্যাস, অথবা শেক্‌স্‌পীয়র বা মিলটন, কিংবা আমাদের মধুসূদন দত্ত অথবা রবীন্দ্রনাথের রচনায় এমন অনেক অংশ আছে, যাহা প্রাচীনদের কথিত রসগুণে উজ্জ্বল নহে; তাহাদের কাব্যত্বের কারণ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়াই আমরা কাব্যের সংজ্ঞায় রস শব্দের পরিবর্তে আনন্দ শব্দ নির্বাচন করিয়াছি।

রস কেবলমাত্র স্থায়িভাবাশ্রয়ী। আনন্দ যেমন আলঙ্কারিকদের কথিত স্থায়ী ভাব, তেমনি অন্য ভাব অথবা অলঙ্কার, বস্তু, অর্থগৌরব, বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্-বৈদগ্ধ্য, কিংবা স্বভাবোক্তি, অথবা সৌন্দর্যাদিজাত অন্য যে-কোন প্রকার চমৎকারিত্ব আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতে পারে। আনন্দ আত্মার শুদ্ধ স্বরূপ বলিয়া আনন্দোপলব্ধির জন্য যাবতীয় কর্ম-প্রচেষ্টা ও কাব্য-প্রচেষ্টা। উপনিষদে ও বেদান্তে আত্মার লক্ষণ-স্বরূপ পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে বলিয়াও এই শব্দটির প্রতি আমাদের বিশেষ ঝোঁক। আনন্দ আত্মার শুদ্ধ ধর্ম বলিয়া চিত্তভাব প্রভৃতির নিরপেক্ষ ভাবে তাহার অবস্থান স্বতঃসিদ্ধ। কাব্যে প্রকাশের বেলায় চিত্তের ভাবের অবলম্বন বা তদ্রূপ অন্য কোন অবলম্বন চাই। এই অবলম্বন বা আশ্রয়-ভেদে কাব্যের ভেদ স্বীকৃত হইবে। কাব্য কেবলমাত্র শব্দার্থের আনন্দময়ত্ব-ধর্মে দীপ্যমান থাকিবে।

চিন্তা করিলে দেখা যায়, শব্দার্থের উপাদানে মৌলি-ভূত লক্ষ্য আনন্দ উপলব্ধির জন্য প্রধানতঃ দুই প্রকার উপায় বা অবলম্বন বা আশ্রয় হইতে পারে। তাহাদের অনুযায়ী কাব্যেরও দুই প্রধান বিভাগ স্বীকৃত হইবে।

(৩)

সমগ্র কাব্য-ধারণা

বিষয়টিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য আমাদের সমগ্র কাব্য-ধারণাকে দার্শনিক প্রথায় উপস্থিত করিব এবং চিত্রাঙ্কন-দ্বারা যথাসম্ভব স্পষ্ট করিবার চেষ্টা পাইব।

ভারতীয় দর্শনের মতে আমাদের নিজস্বরূপ হইতেছে সত্তা, সংবিৎ ও আনন্দ। আমাদের এই নিজস্বরূপই 'আত্মা'। সংবিৎ অর্থ চৈতন্য বা চিৎ। আত্মার শুদ্ধ স্বরূপ হইতেছে সত্তা-মাত্র, চৈতন্য-মাত্র এবং আনন্দ-মাত্র। এই তিনই কিন্তু এক, অবিভিন্ন, অপরিচ্ছেদ্য; বুঝাইবার সুবিধার জন্য তিনটি শব্দের ব্যবহার হয়। অহঙ্কার, বুদ্ধি, হৃদয় ও মন প্রভৃতি লইয়া যে অন্তঃকরণ, তাহাকে ভারতীয় দর্শনে একটি মাত্র শব্দদ্বারা বলা হয় চিত্ত। চিত্তের আশ্রয়ে আত্মা সমুদয় বিষয় ভোগ করে। বিষয়ের অবলম্বনে আত্মার নিজস্বরূপের উপলব্ধিই আত্মার ভোগ। আত্মা অন্তঃকরণ বা চিত্তকে অর্থাৎ অন্তর্জগৎকে সাক্ষাৎভাবে ভোগ করে; আবার চিত্তের সাহায্যে এই দৃশ্যমান বহির্জগৎ—মানবজগৎ, অন্যপ্রাণীর জগৎ, নিসর্গ-জগৎ অর্থাৎ চেতন ও জড়, সূক্ষ্ম বা স্থূল, অথবা চল ও অচল নিখিল বস্তুকে ভোগ করে। এই আত্মাই শুদ্ধ আমি শব্দের লক্ষ্য। তাহা হইলে আত্মা বা আমিই সমুদয় অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের কেন্দ্র, আমাতেই উহারা বিধৃত, আমার সত্তায় উহারা সত্তাবান্ এবং আমার প্রকাশে প্রকাশশীল।

এই আত্মা বা 'আমি' যে চিত্তের মধ্য দিয়া জগন্ময় ব্যাপ্ত হয়, ভারতীয় দর্শনে তাহার তিনটি গুণের কথা স্বীকৃত হইয়াছে,—সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ। সত্ত্বগুণের ধর্ম প্রখ্যা বা প্রকাশশীলতা, রজোগুণের ধর্ম প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া অথবা পরিবর্তনশীলতা, এবং তমোগুণের ধর্ম স্থিতি বা জাড্য অর্থাৎ প্রকাশ ও ক্রিয়া-ধর্মের রোধনশীলতা। সত্ত্বগুণের ধর্মে চিত্ত সমুদয় বিষয় জানে, জ্ঞানগোচর করে, অনুভব করে, উপলব্ধি করে, আস্বাদন করে, আনন্দলাভ করে,—চিত্ত বিচার করে, চর্বণা করে, আহ্লাদিত হয়, এবং এই রূপে সকল বিষয় প্রকাশ করে; এবং এই প্রকাশ করিবার পথে চিত্ত

নিজে যেন বিকশিত হয়, যেন বিগলিত হয়, যেন বা দীপ্ত হয়। সত্ত্বগুণময় চিত্ত তাই অনেকটা শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ; প্রকাশ ও আনন্দই তাহার মুখ্য ধর্ম। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের cognition এবং feeling দুই-ই এই সত্ত্বগুণের ধর্ম।

রজোগুণের ধর্মে চিত্ত চঞ্চল হয়, বিপুল কর্মশক্তি প্রকট করে, ক্রিয়ার স্বভাবে নিয়ত নব নব রূপ লাভ করে; চিত্ত আত্মার স্বরূপকে প্রকাশ না করিয়া নানাবিধ বিক্ষেপ আনয়ন করে। তমোগুণের ধর্মে চিত্ত থাকে স্তম্ভিত, প্রকাশ ও ক্রিয়া-ধর্মকে নিরুদ্ধ করে, জড় নিঃস্পন্দ হইয়া মূঢ়াবস্থায় আত্মার এক মোহের আবরণ রচনা করে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের willing হইতেছে রজোগুণের ধর্ম। তমোগুণ সত্ত্ব ও রজঃ এই উভয়গুণের বিপরীতধর্মবিশিষ্ট।

তমোগুণের আবরণ ও রজোগুণের বিক্ষেপ হেতু জীবের মধ্যে শুদ্ধ আমির অর্থাৎ নিজ আনন্দ-স্বরূপের প্রকাশ হয় ক্বচিৎ। আবরণ ও বিক্ষেপ প্রবল হইলে সত্ত্বগুণ থাকে দুর্বল, তাই তাহাতে আত্মস্বরূপের অবাধিত প্রকাশ হইতে পারে না; ধূলিলিপ্ত দর্পণে দেহের প্রতিবিম্বনের ন্যায় মলিনচিত্তে আত্মানন্দের আভাস হইয়া যায় ব্যর্থ। তখন বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্তা পড়ে ঢাকা এবং জীব হয় আত্মবিস্মৃত—অল্প, তাহার থাকে না কোন সুখ, কোন বিলাস। শাশ্বত মানুষ তাই প্রতিনিয়ত ছুটিতে থাকে অনল্প ভূমার সন্ধানে, পূর্ণ স্বরূপের লক্ষ্যে। ভূমাই যে সুখ!

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।—ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৭।২৩।১

—'যাহা ভূমা, তাহাই সুখ; অল্পে সুখ নাই।'

ভূমার সন্ধানে সুখের লক্ষ্যে তাই জীবজগতে এত গতি, এত ক্রিয়া, এত দ্বন্দ্ব, এত ছন্দ। মানবের যত যত কর্ম-প্রচেষ্টা জ্ঞান-প্রচেষ্টা বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের অমেয় অন্তর্বেদনা সকলই আমিকে—শুদ্ধ আমিকে সহজরূপে পাইবার জন্য। এই পাওয়াই স্বরূপানন্দের প্রকাশ ও উপলব্ধি। শ্রুতি বলেন,—

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। —বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৩।৯।২৮

—'বিজ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ এই ব্রহ্ম।'

আনন্দো ব্রহ্মেতি। —তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ভৃগুবল্লী

—'আনন্দই ব্রহ্ম।'

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ব্রহ্মানন্দবল্লী

—'রসস্বরূপই তিনি। সেই রস-স্বরূপকে লাভ করিয়া জীব আনন্দই হইয়া যায়।'

সেখানেই তাহার বিশ্রাম, স্বরূপে স্থিতি, আত্মোপলব্ধি। আনন্দই জীবের শুদ্ধ স্বরূপ, আনন্দই ব্রহ্মের পূর্ণ স্বরূপ!

এই আনন্দ অর্থাৎ আমার স্বরূপ আত্মানন্দই তাই অন্যান্য কর্মপ্রচেষ্টার ন্যায় আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টারও মুখ্য লক্ষ্য। কাব্য-শ্রবণ বা অভিনয়-দর্শন তখনই সত্য ও সার্থক বলিয়া মনে হইবে, যখন তাহা চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপের আবরণ ভাঙ্গিয়া দিয়া সত্ত্বগুণময় চিত্তে তাহার প্রকাশ ঘটাইবে। এই প্রকাশই আত্মোপলব্ধি বা আনন্দোপলব্ধি। কাব্যের মহান্ লক্ষ্য হইতেছে শব্দার্থের আশ্রয়ে এই আনন্দের প্রকাশ।

বলা বাহুল্য, এই আনন্দের মধ্যে সত্তা-লক্ষণ সর্বদাই অনুস্যূত রহিয়াছে, চৈতন্য-লক্ষণও রহিয়াছে। কাব্যপাঠে চৈতন্য অপেক্ষা আনন্দাংশের প্রকাশ বেশি বলিয়া আমরা পুনঃ পুনঃ আনন্দ শব্দের প্রয়োগ করিতেছি। আনন্দ অর্থই চৈতন্যযুক্ত আনন্দ বা সংবিদানন্দ, অর্থাৎ প্রকাশশীল আনন্দ; কখনও চৈতন্যরহিত জড় বা মূঢ় আনন্দ নহে।

কাব্য-বিচার মুখ্যতঃ কাব্যের এই লক্ষ্য-বিচার নহে, ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টি হইতে তাহার একটি বিশেষ উল্লেখ ও স্বীকৃতি মাত্র প্রয়োজন; এবং সর্ববিধ সাহিত্যালোচনার ফল ঐ একই আনন্দ,—ইহারও যথার্থতার উপলব্ধি প্রয়োজন।

আনন্দ প্রকাশ পায় সত্ত্বগুণাশ্রিত চিত্তে, এই চিত্তই এখন বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। কাব্যের লক্ষ্য আনন্দ, উপায় চিত্ত অর্থাৎ চিত্ত-গত ভাব ও অর্থ, উপাদান শব্দার্থ। চিত্তকে বিশ্লেষণ করিয়া কাব্যোপলব্ধির দুইটি ধারাকে বুঝিতে পারা যাইবে। এই দুই ধারা-অনুসারে কাব্যের মূলগত দুই বিভাগ স্বীকৃত হইবে, এবং তাহাদেরও অবান্তর বিভাগ দৃষ্ট হইবে। ভাব ও অর্থ লইয়া যে বস্তু, তাহার মধ্যে আমরা জীবনের বহু-ভঙ্গিম ছন্দ, প্রাণশক্তির দুর্বার আবেগ, চলমান বিশ্বজগতের নিত্য নব নব রূপের অভিনব প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এই বস্তুর মধ্যেই উপলব্ধি করি সাহিত্যের প্রাণধর্ম ও গতিধর্ম। চিত্তবিশ্লেষণে পাওয়া যাইবে সাহিত্যের স্বরূপ বা শাশ্বতধর্ম। স্বরূপবিচার শেষ করিলে রূপের বিচার সহজ হইয়া আসিবে।

চিত্ত-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আগে বলিয়া লওয়া দরকার। কাব্য বা সাহিত্য প্রকাশধর্মী বলিয়া সত্ত্বগুণ-প্রধান চিত্ত লইয়া আমাদের সমগ্র আলোচনা হইবে। কাব্যপাঠে সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত ও উপচিত অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিলে রজোধর্মের বিক্ষেপ এবং তমোধর্মের আবরণ ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে থাকে; এবং সঙ্গে সঙ্গে

চিত্ত-সত্ত্বে স্বরূপানন্দের প্রকাশ ঘটে। প্রকাশ অর্থ আস্বাদন ও জানা উভয়ই। অভিনবগুপ্ত বলেন—

রসনা চ বোধ-রূপা এব। —নাট্যশাস্ত্র, ৬।৩৪, ভাষ্য

—রসনা বা আস্বাদন নিশ্চয়ই বোধরূপা।

বোধ হইতেছে জানা। চিত্তের যেমন আছে ভাবাস্বাদনী শক্তি, তেমনই আছে অর্থবোধ বা উপলব্ধির শক্তি। আস্বাদন ও জানা একই চিত্তের ক্রিয়া, উভয় উভয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে। নিছক আস্বাদনের মধ্যেও জানা ক্রিয়া কিছু থাকে, আবার নিছক জানা ক্রিয়ার মধ্যে আস্বাদন ক্রিয়া কিছু থাকে। আমরা বলি আস্বাদন হয় প্রধানতঃ হৃদয়বৃত্তি দিয়া এবং জানা ক্রিয়া হয় প্রধানতঃ বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া। এই হৃদয়বৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি উভয়ই কিন্তু আমাদের উল্লিখিত যে চিত্ত, তাহারই বৃত্তি। অন্তঃকরণই চিত্ত; তাই চিত্তের বাহিরে হৃদয় বা বুদ্ধির ব্যাপার বলিয়া কিছু নাই। বুদ্ধির নিজ কাজ বিচার করা, অর্থোপলব্ধি করা। যেখানে ভাবের আস্বাদন অপেক্ষা গৌরবপূর্ণ অর্থের অথবা বিচিত্র বাগ্‌ভঙ্গীর জন্য বুদ্ধির আলোড়ন অর্থাৎ বুদ্ধির চমক ও ঝলকানি হয় বেশি, সেখানেই বলা হয় বুদ্ধির ব্যাপার চলিতেছে। কাব্যালোচনার সময়ে এই হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি চিত্তের আশ্রয়ে একই বস্তু লইয়া সমকালে আস্বাদন ও জানা উভয় ক্রিয়াই চালায়। কিন্তু উভয় কখনও সমান প্রবল হয় না। আস্বাদন প্রবল হইলে আমরা বলি, চিত্ত আস্বাদন করিতেছে, হৃদয়বৃত্তির ব্যাপার চলিতেছে; আবার জানা ক্রিয়া প্রবল হইলে বলি, চিত্ত উপলব্ধি করিতেছে, কিঞ্চিৎ বুদ্ধির ব্যাপার চলিতেছে। অন্য দৃষ্টিতে বিচার করিয়া আমরা চিত্তের দুইটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করিতে পারি,—দ্রুতিগুণ ও দীপ্তিগুণ। দ্রু+করণবাচ্যে ক্তি—দ্রুতি, এই দ্রুতিগুণের ফলে ভাব-বশে চিত্ত দ্রবীভূত, বিগলিত হয়; তখন চিত্তের উদ্রিক্ত ভাবের প্রকাশ ও আস্বাদন চলে। দীপ্‌+করণবাচ্যে ক্তি—দীপ্তি, এই দীপ্তিগুণের ফলে অর্থের আলোড়নে চিত্ত দীপ্ত হইয়া উঠে, যেন জ্বলিয়া উঠে; তখন চিত্তের আশ্রিত অর্থের প্রকাশ ও উপলব্ধি হয়। চিত্তের দ্রুতি-গুণ মুখ্যতঃ হৃদয়ের ধর্ম, তাহার দ্বারা ভাব জাগে এবং ভাবের ও রসের আস্বাদন হয়। চিত্তের দীপ্তিগুণ মুখ্যতঃ বুদ্ধির ধর্ম, তাহার দ্বারা অর্থের স্ফুরণ ও রম্যবোধের প্রকাশ হয়।

চিত্তের এই ভাব ও অর্থের স্বরূপ কি, ইহাই এখন প্রশ্ন।

কাব্যবর্ণিত পাত্র-পাত্রীকে ও স্থান-কালকে বলা হয় কাব্যের বিভাব। দুষ্মন্ত শকুন্তলা, কণ্ব-আশ্রম, বসন্তকাল প্রভৃতি শকুন্তলা নাটকের বিভাব। বাহ্যজগতের

বস্তুই কাব্যজগতের বিভাব। এই বস্তুই কাব্য-নাটকের অবলম্বন। এই বস্তু যে ভাবে চিত্তের বাসনা-লোককে আলোড়িত করিয়া চিত্তে রূপ গ্রহণ করে, তদনুযায়ী তাহার দুইটি বিশিষ্ট ধর্ম পরিলক্ষিত হয়। বস্তুর ভাবধর্ম ও অর্থধর্ম। চিত্তে ভাব সঞ্চার করিলে বস্তু হয় ভাবময়, চিত্তে অর্থ সঞ্চার করিলে বস্তু হয় অর্থময়। ভাবের সঙ্গে সর্বদাই অর্থের কিছু দ্যোতনা থাকে, অর্থের সঙ্গেও ভাবের কিছু প্রকাশ থাকে। ভাব হইতেছে সাধারণতঃ emotion অথবা feeling; অর্থ হইতেছে সাধারণতঃ thought, meaning, character প্রভৃতি। আখ্যানবস্তু হইতে এক দিকে ভাব অর্থাৎ emotion বা feeling জাগে, অপর দিকে অর্থ অর্থাৎ thought ও character প্রভৃতি জাগে। এই অর্থ কবি-কল্পিত বস্তুর বলিয়া সর্বদাই রমণীয় অর্থ বা রম্যার্থ। ভাবও কবিকল্পিতবস্তু-জাত বলিয়া সর্বদাই রমণীয় ভাব বা রম্য ভাব। বিজ্ঞান বা দর্শনে সাধারণতঃ ভাব থাকিতে পারে না বলিয়া কাব্যের ভাবকে রমণীয় ভাব বলিয়া চিহ্নিত করিবার প্রয়োজন নাই। অর্থ কিন্তু বিজ্ঞানেও থাকিতে পারে, দর্শনেও থাকিতে পারে, তাই কাব্যার্থকে রম্যার্থ বলিয়া বিজ্ঞান ও দর্শনের অর্থ হইতে বিশিষ্ট করা হইল।

রমণীয়তা, রম্যতা অর্থাৎ æsthetic quality কাব্যের ভাব ও অর্থ উভয়েই বর্তমান। ভাবের রম্যতা হইতেছে æsthetic feeling, অর্থের রম্যতা হইতেছে æsthetic sense।

অর্থ যখন দার্শনিকের, তখন তাহার উৎপত্তি হয় বিচারাত্মক চিন্তা বা discriminative thought হইতে; উহা বৈজ্ঞানিকের হইলে বলা চলে উহা জন্মে বিশ্লেষণাত্মক পর্যবেক্ষণ বা analytic observation হইতে। কিন্তু কবির অর্থের উপলব্ধি হয় প্রত্যক্ষ দর্শন বা vision হইতে। কবি হইতেছেন বস্তুস্বরূপের দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টা বলিয়া স্রষ্টা। কুন্তক কাব্যের অর্থের লক্ষণ বলিয়াছেন,—

অর্থঃ সহৃদয়াহ্লাদকারি-স্বস্পন্দসুন্দরঃ। —বক্রোক্তিজীবিত, ১।৯

—'কাব্যের অর্থ সহৃদয়ের আহ্লাদ জন্মায় এবং নিজ স্পন্দ অর্থাৎ স্ব-ভাবেই সুন্দর হইয়া থাকে।'

এই 'সহৃদয়াহ্লাদকারী' এবং 'স্বস্পন্দসুন্দর' অর্থকেই আমরা রমণীয় অর্থ, রম্যার্থ বা অর্থ বলিতেছি। এখন হইতে এই রমণীয় অর্থ বুঝাইতে রম্যার্থ বা কেবল অর্থ শব্দ প্রয়োগ করা হইবে। ভারবি 'অর্থ-গৌরব' শব্দে যে অর্থ বুঝিয়াছেন, (১)

(১) ন চ ন স্বীকৃতমর্থগৌরবম্। —কিরাতার্জুনীয়, ২।২৭

—অর্থগৌরব যে স্বীকৃত হয় নাই, তাহা নহে।

তাহা এই অর্থ শব্দের অন্তর্গত। অর্থ দ্বারা বস্তুও বুঝায়, আমরা বস্তু বুঝাইতে বস্তু শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ প্রয়োগ করিব না এবং অর্থ শব্দ কেবল মাত্র পূর্ব-ব্যাখ্যাত রম্যার্থ বুঝাইতে প্রয়োগ করিব।

তাহা হইলে কাব্যের বিভাবাশ্রিত চিত্তে বস্তুর দুইটি অংশ আছে,—ভাব ও অর্থ। ইহারা কিন্তু পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে বাস করে না। বস্তুতঃ ভাব ও অর্থ নিত্য সহচারী। ভাবহীন অর্থ নাই, আবার অর্থহীন ভাবও নাই। মানুষের চিত্তক্ষেত্রে ইহাদের একটি অপরটির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া আছে। তবে ইহাদের এক একটির এক এক সময়ে আপেক্ষিক প্রাধান্য থাকে। সাধারণতঃ চিত্তে ভাবধর্ম (emotional aspects) প্রবল হইলে, অর্থধর্ম (intellectual aspects) দুর্বল হইবে ; আবার অর্থধর্ম প্রবল হইলে ভাবধর্ম দুর্বল হইবে ; কিন্তু দুইটি ধর্মই সর্বদা একই বস্তুতে বা একই চিত্তে দেখা যাইবে। প্রাধান্য-অনুযায়ী উভয়ের জাতিভেদ ও নামকরণ হইয়াছে। এখন নির্ভয়ে বলা যায়,—

চিত্তে হৃদয়বৃত্তির প্রাবল্যে দ্রুতিশক্তির স্ফুরণে জাগে বস্তুর ভাবময় স্বরূপ অথবা ভাব। চিত্তের ভাব-তন্ময় অবস্থায় পরিমিত ব্যক্তিত্বের বিস্মরণ হইলে সংবিদানন্দের চর্বণা হয়, এবং জাগে রস। অথবা বিগলিত-বেদ্যান্তর চিত্তের ভাব-তন্ময় অবস্থায় রসাস্বাদন হইতে সমুদ্ভূত হয় সংবিদানন্দ অথবা আত্মানন্দ বা আনন্দ। ইহাই কাব্যের প্রথম ভেদ এবং শ্রেষ্ঠ ভেদ।

অপর দিকে—

চিত্তে বুদ্ধি-বৃত্তির প্রাবল্যে দীপ্তি-শক্তির স্ফুরণে জাগে বস্তুর রম্যার্থময় স্বরূপ অথবা রম্যার্থ। চিত্তের রম্যার্থতন্ময় অবস্থায় পরিমিত ব্যক্তিত্বের বিস্মরণ হইলে তখনই সংবিদানন্দের চর্বণা হয় এবং জাগে এক রম্যবোধ। রসাস্বাদন ও রম্যবোধ কিন্তু এক নয়। ভাবসিক্ত চিত্তে আত্মানন্দের প্রকাশ হইতেছে রস। রম্যার্থ-দীপ্ত চিত্তে আত্মানন্দের প্রকাশ হইতেছে রম্যবোধ বা বোধময় রমণীয়ত্ব। সুতরাং বলা চলে, বিগলিত-বেদ্যান্তর চিত্তের রম্যার্থ-তন্ময় অবস্থায় রম্যবোধের উপলব্ধি হইতে সমুদ্ভূত হয় সেই একই আনন্দ, আত্মানন্দ বা সংবিদানন্দ। ইহাই কাব্যের দ্বিতীয় ভেদ। কাব্যের আর যত ভেদ আমরা দেখাইব, তাহা এই দুই ভেদেরই অন্তর্গত। এখানেও সুস্পষ্ট বলা উচিত, এই রস এবং রম্যবোধ পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়। রস ছাড়া রম্যবোধ নাই, রম্যবোধ ছাড়া রস নাই। বাস্তবিকপক্ষে রস কিয়ৎপরিমাণে বোধ-স্বরূপ এবং রম্যবোধও কিয়ৎপরিমাণে আস্বাদন-স্বরূপ।

পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া নিজ লক্ষণে রস বা রম্যবোধ আপেক্ষিক প্রাধান্য লাভ করে ও নিজ নিজ নামে পরিচিত হয়।

এখন নিম্নের অঙ্কিত চিত্রটি দেখিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হইবে,—
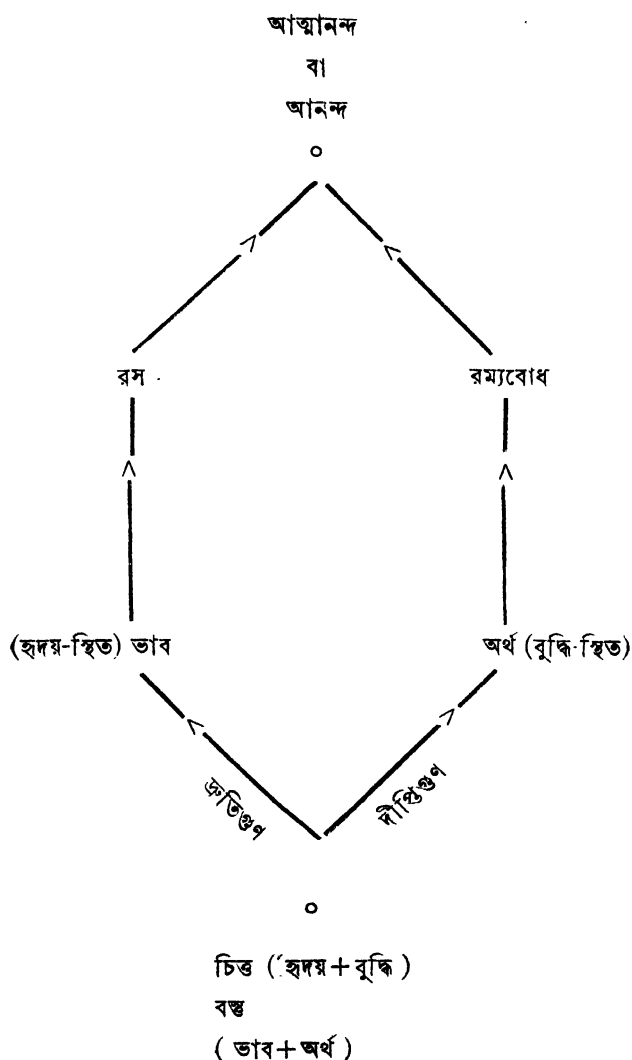
শ্রীঅরবিন্দ কাব্যালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিতেছেন,—

"For in all things that speech can express there are two elements, the outward or instrumental and the real or spiritual. In *thought* for instance, there is the intellectual idea, that which the intelligence make precise and definite to us, and the *soul-idea*, that which exceeds the intellectual and brings us into nearness or identity with the whole reality of the thing expressed. Equally in *emotion*, it is not the mere emotion itself the poet seeks, but the *soul of the emotion*, that in it for the delight of which the soul in us and the world desires or accepts emotional experience." (ইটালিক্‌স্‌ আমাদের দেওয়া)

—*The Future Poetry, the Essence of Poetry*

—'বাক্য দ্বারা প্রকাশ-যোগ্য সমুদয় বস্তুতে দুইটি উপাদান আছে,—বাহ্য বা ঔপায়িক এবং আসল বা আত্মিক। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে—চিন্তার মধ্যে রহিয়াছে বুদ্ধি-গত অর্থ বা বোধ, যাহা বুদ্ধি আমাদের নিকট যথাযথ এবং সুনির্দিষ্ট করিয়া তুলে ; আর রহিয়াছে আত্ম-ভূত বোধ, যাহা বুদ্ধির ব্যাপারকে অতিক্রম করে এবং আমাদিগকে অভিব্যক্ত বস্তুর সমগ্র আসল সত্তার সান্নিধ্যে বা সারূপ্যে আনয়ন করে। একই রূপে ভাবের বিষয়েও বলা চলে, ইহা কেবলমাত্র ভাবই নহে, যাহা কবি সন্ধান করেন ; কিন্তু ভাবেরও আত্মা বা স্বরূপ, যাহার নিজস্ব আনন্দের জন্যই আমাদের এবং জগতের আত্মা ভাবানুভূতিকে কামনা করে বা স্বীকার করে, তাহাও সন্ধান করেন।'

এখানে শ্রীঅরবিন্দ **thought** ও **emotion** এই দুইটিকে কাব্যের বাহ্য উপাদান বলিয়াছেন, আমরা ইহাদের নাম দিয়াছি 'অর্থ' ও 'ভাব'। ইহাদেরই পরিণত বা পরিপক্ক রূপকে তিনি বলিয়াছেন soul idea এবং **soul of the emotion,** এই দুইটিকে তিনি আসল উপাদান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; আমরা ইহাদিগকে বুঝাইয়াছি 'রম্যবোধ' ও 'রস' শব্দ দ্বারা। অর্থ হইতে জন্মে রম্যবোধ, যেমন ভাব হইতে জন্মে রস। শ্রীঅরবিন্দের কথায় ইহাও স্পষ্ট যে, কাব্যের soul বা স্বরূপ হইতেছে রম্যবোধ ও রস, অর্থ ও ভাব নয়।

পূর্বাচার্যগণ রসময় কাব্যের স্বরূপধর্মের নিপুণতম বিশ্লেষণ করিয়া কাব্যের রসবত্তা প্রমাণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের নির্মল প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন। রম্যবোধময় বা রম্যার্থময় কাব্য তাঁহারা অলঙ্কার, রীতি, গুণ প্রভৃতির লক্ষণে অর্থাৎ উক্ত কাব্যের

উপাদান-ধর্মের লক্ষণে নিখুঁত বিচার করিয়াছেন; কিন্তু স্বরূপধর্মের কেহ কোন প্রকার বিশ্লেষণ বা বিচার করেন নাই; এমন কি এই দ্বিবিধ কাব্যের ভিন্ন স্বরূপ কেহ স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করেন নাই। কাব্যের জাতি একটিমাত্র, এই বলিয়া অপর জাতি কাব্যকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ দ্বিবিধ কাব্যের কথা স্বীকার করিয়া তাহাদের ঠিক উচ্চ নীচ জাতি-ভেদ করেন নাই বটে, কিন্তু স্বরূপধর্মে কেবলমাত্র রসময় কাব্যেরই বিশ্লেষণ করিয়াছেন। উভয়বিধ কাব্যই পাঠকের আত্মানন্দের প্রাপক এবং কবির আত্মানন্দ হইতে সমুদ্ভূত, ভারতীয় সংস্কৃতির এই মূল দৃষ্টিভঙ্গী কেহ সম্যক্ উপলব্ধি করেন নাই।

কাব্যের মূল দুই জাতি প্রমাণিত হইল, দ্রুতিগুণাশ্রয়ে রসময় কাব্য বা দ্রুতিকাব্য এবং দীপ্তিগুণাশ্রয়ে রম্যবোধময় কাব্য বা দীপ্তিকাব্য।

(৪)

দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য

কাব্যের এই দুই জাতির নাম রসকাব্য ও রম্যবোধকাব্য না রাখিয়া চিত্তের দুই বিশিষ্ট গুণানুযায়ী দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য রাখা সঙ্গত বোধ করি; ইহাতে কাব্যের ভেদ ও তাহার কারণ নিঃসংশয়ে স্পষ্ট হইয়া উঠে। দ্রুতিময় কাব্য দেয় চিত্তে আস্বাদন, অবলম্বন তার হৃদয়-গত ভাব; দীপ্তিময় কাব্য দেয় চিত্তে রম্যবোধ, অবলম্বন তার বুদ্ধি-গত রম্যার্থ।

দ্রুতিকাব্য মুখ্যতঃ তিন প্রকার,—রসকাব্য বা রসোক্তি, ভাবকাব্য বা ভাবোক্তি এবং স্বভাবকাব্য বা স্বভাবোক্তি। শব্দার্থের অবলম্বনে ভাব যদি রসে পরিণত হয়, তবে কাব্য হয় রসকাব্য বা রসোক্তি। বলা বাহুল্য ইহাই শ্রেষ্ঠকাব্য ও স্থায়ী কাব্য। যেখানে শব্দার্থের অবলম্বনে ভাব উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রধান হইয়াছে, কিন্তু রসোত্তীর্ণ হয় নাই, সেখানে ভাব-প্রধান বলিয়া কাব্যের নাম দেওয়া হইল ভাবকাব্য বা ভাবোক্তি। প্রাচীনগণ 'উদ্বুদ্ধমাত্র স্থায়ী', 'অঞ্জিত ব্যভিচারী' বা 'সঞ্চারিণঃ প্রধানানি' বলিয়া যে ভাবের কথা বলিয়াছেন, তাহা এই ভাবকাব্যের অন্তর্গত। যেখানে বস্তু নিজ স্বভাবধর্মে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, সেখানেও পাঠকের প্রীতি-প্রসন্ন চিত্ত কিছু বিগলিত হয় এবং বস্তু তাহার ভাবধর্মেই সেখানে প্রকাশিত হয়; এই জন্য এই জাতীয় রচনার নাম স্বভাবকাব্য বা স্বভাবোক্তি। ইহা স্পষ্টতঃ দ্রুতিকাব্যের অন্তর্গত; কিন্তু

স্বভাবোক্তির ভাব পূর্ববর্ণিত ভাব হইতে কিছু বিশিষ্ট হওয়ায় তাহার জন্য পৃথক্ শ্রেণী নির্দেশ করা হইল। দ্রুতিকাব্যের মুখ্যভাগ এই তিনটি। কিন্তু প্রত্যেক ভাগের আবার উপভাগ আছে। স্থায়ী ভাবানুযায়ী রসকাব্যের উপভাগ হইতে পারে, বিভিন্ন ভাবানুযায়ী ভাবকাব্যের উপভেদ দৃষ্ট হইতে পারে ; এবং নিসর্গজগৎ কি প্রাণিজগৎ লইয়া রচিত এই হিসাব করিয়া স্বভাব-কাব্যেরও দুই ভাগ হইতে পারে।

দীপ্তিকাব্য মুখ্যতঃ দুই প্রকার,—গৌরবকাব্য বা গৌরবোক্তি এবং বক্রকাব্য বা বক্রোক্তি। গৌরব অর্থ হইতেছে চরিত্র-গৌরব বা অর্থ-গৌরব, অর্থাৎ চরিত্র বা চিন্তার মহত্ত্ব, সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি। গৌরবপূর্ণ উক্তি গৌরবোক্তি। কাব্যে অর্থগৌরব প্রধান হইলে কাব্য হইবে গৌরবকাব্য বা গৌরবোক্তি। এই প্রকার কাব্য সকল দেশের সকল ভাষায়ই প্রাচীনকাল হইতে পাওয়া যায়। বক্রোক্তির সহযোগে এই কাব্য অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। বক্র অর্থাৎ বক্রতাপূর্ণ উক্তি বক্রোক্তি। কাব্যে যেখানে রচনার বক্রতা অর্থাৎ বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভঙ্গীই প্রধান, সেখানে কাব্য হইবে বক্রকাব্য বা বক্রোক্তি। বক্রোক্তিকে আবার অর্থ-বক্রোক্তি ও অলঙ্কার-বক্রোক্তি এই দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে। বক্রতা প্রধানতঃ অর্থকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ অর্থের স্বকীয় গৌরব নহে, কেবল কল্পনাময় বিন্যাস-ভঙ্গীর চমৎকারিত্ব থাকিলে রচনা হইবে অর্থবক্রোক্তি। আর যেখানে অর্থ মুখ্য নয়, কেবল অলঙ্কারই মুখ্য, বক্রতা কেবল অলঙ্কারের ঝঙ্কারে, সেখানে রচনা অলঙ্কার-বক্রোক্তি। নিম্নে চিত্রদ্বারা বিভাগগুলি প্রদর্শিত হইল :—
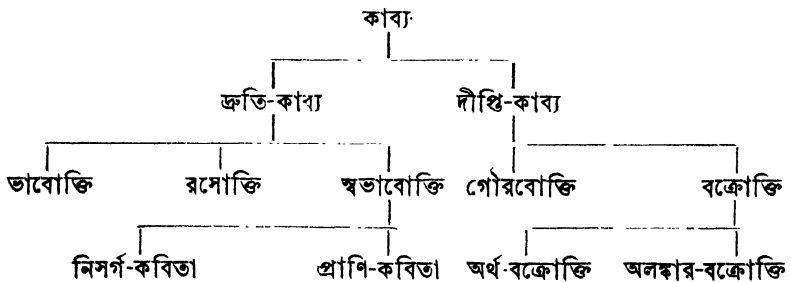
লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে এই পাঁচ প্রকার কবিতার মধ্যে স্বভাবোক্তি ছাড়া কোন শ্রেণীর সহিত কোন শ্রেণীর প্রকৃত বিরোধ নাই। ভাবোক্তির পরিণতি হইতেছে রসোক্তি, কাজেই এখানে বিরোধের প্রশ্ন উঠে না। রসোক্তি, গৌরবোক্তি ও বক্রোক্তি, রসোক্তি ও গৌরবোক্তি, অথবা রসোক্তি ও বক্রোক্তি, কিংবা

গৌরবোক্তি ও বক্রোক্তি এক সঙ্গে থাকিয়া কাব্যকে সাধারণতঃ অপরূপ শ্রীতে মণ্ডিত করিয়া থাকে। ইহার কোনওটি যদি প্রধান হয়, তবে তাহার পরিচয়েই কাব্যের মুখ্য পরিচয় হইয়া থাকে। স্বভাবোক্তি সাধারণতঃ নিজ স্বাতন্ত্র্যে শোভমান, তবে তাহাতে সহজ অনুপ্রাস বা উপমা থাকিতে পারে। সহজ অনুপ্রাস ও উপমা বর্ণনার প্রায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; বক্রোক্তির মধ্যে উহাদের গণ্য না করিলেও চলে। এখানে বলা উচিত, রসোক্তি ও গৌরবোক্তি এই উভয়-প্রধান কাব্য হৃদয় ও বুদ্ধিকে যুগপৎ দ্রবীভূত ও দীপ্ত করে, কিন্তু এরূপ কাব্য শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনায়ও সুলভ নহে।

বাগ্‌দেবীর বীণায় অনেক তন্ত্রী, এক এক তন্ত্রীর এক এক ঝঙ্কার, কিন্তু দেবী স্বাভাবিক উল্লাসে অনেক সময়েই দ্বিতন্ত্রী বা ত্রিতন্ত্রীর ঝঙ্কার তুলিয়া থাকেন।

যে কাব্যে চিত্তের স্থায়ী ভাব অবলম্বনে আনন্দের প্রকাশ ঘটে, তাহা রস-প্রধান কাব্য বা রস-কাব্য। ইহাই রসাত্মক বাক্য, ইহাকে রসোজ্জ্বলা উক্তি বা রসোক্তিও বলা যাইতে পারে। স্থায়ী ভাব অবলম্বনে সৃষ্ট বলিয়া ইহাই স্থায়ী কাব্য, সর্বকালে সর্বজন-সমাদৃত শ্রেষ্ঠ কাব্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে, রচনা ভাবোত্তীর্ণ হইয়া রসে পরিণত না হইলে তাহাকে বলা যায় ভাবোক্তি বা ভাব-কাব্য। এক প্রকার আস্বাদন আছে বলিয়া ইহাও কাব্য, কিন্তু ইহা দ্বিতীয় স্তরের কাব্য, মহাকবির রচনা হইলে ইহাতেও বিচিত্র আস্বাদন থাকে। রসাত্মক বাক্য অথবা রস লইয়া আমাদের মুখ্য আলোচনা; পরবর্তী অধ্যায়ে এই আলোচনা করা হইবে এবং সেই সময়ে সর্বপ্রকার ভাব-সম্বন্ধে আমাদের বিশ্লেষণ ও অভিমত ব্যাখ্যাত হইবে। বর্তমান গীতিকাব্য বা লিরিক কাব্যের অবলম্বনও যে কতকগুলি বিশিষ্ট ভাব এবং তাহা হইতে জাত রসও যে নাট্য বা কাব্যরসের তুল্য, তাহাও প্রদর্শিত হইবে; এইজন্য এখানে এই বিষয়ে কোন আলোচনা করা হইল না।

প্রত্যেক নিসর্গবস্তু ও মানবীয় বস্তুর একটি নিজস্ব মহিমা আছে, সেই নিজস্বত্বে তাহারা সৃষ্টির মধ্যে অতুলনীয়। কবিচিত্তের অনুরঞ্জন দ্বারা বস্তু রঞ্জিত হইয়া যেন বিকৃত হয়, বর্ণনার অলঙ্কার-শ্রী ও ভঙ্গী-সৌষ্ঠব যেন তাহার স্বরূপকে আবৃত করে। অলকানন্দার সুনির্মল জলধারা কোন কিছুর স্পর্শে আসিলেই এমন কি ঊর্ধ্বগগনের সুনীল ছায়াপাতেও যেন অম্লান সৌন্দর্য-লোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। মোহমুক্ত কবির প্রসন্ন চিত্তে সাধারণ ভাবে অধিবাসিত হইয়া কখন কখন এই বস্তু বিধাতার সৃষ্টির পরিপূর্ণ সৌন্দর্য লইয়া ফুটিয়া উঠে। যে ভাষায় বিহঙ্গ গান

গায়, নদী-নির্ঝর ছুটিয়া চলে, প্রভাতের আলোক পুষ্পবালার ঘুম ভাঙাইয়া দিয়া শুভ্র শ্রীতে তাহাকে বিকসিত করে, সেই ভাষায় কখন কখন কবিকণ্ঠে স্বভাবের সৌন্দর্যস্তোত্র রচিত হয়। ইহাই সত্যকার স্বভাবোক্তি। রসধর্মে প্রবল হইলে রচনা হইয়া যায় রসোক্তি, তাহা চিত্তকে করে ভাবসিক্ত। বর্ণনার সজ্জাবাহুল্যে ভূষিত হইলে রচনা হয় বক্রোক্তি। এই উভয় সীমা পরিহার করিয়া বস্তুর অবলম্বনে কবিচিত্তকে উদ্বুদ্ধ না করিয়া কবিচিত্তের অবলম্বনে বস্তু স্বমহিমায় দ্যোতমান হইলে রচনা হইবে স্বভাবোক্তি। যে রম্যতা ইহার প্রাণ, সে রম্যতা সর্বদা রসের নয়, বক্র বর্ণনারও নয়; সে রম্যতা বস্তুর প্রাণধর্মের অভিনব স্পন্দন, তাহারই সজীব চিন্ময় স্পর্শ। মন তাহাতে মুগ্ধ হয়, আবিষ্ট হয়, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে একবার অন্তরে একবার বাহিরে দৃষ্টিপাত করে। এই বর্ণনা চিত্তকে দীপ্ত করা অপেক্ষা বিগলিত করে বেশি, তাই ইহাকে দ্রুতিকাব্যের অন্তর্গত করা হইল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই রচনা সম্বন্ধে বলা যায়,—

আমার এ গান ছেড়েছে তা'র
সকল অলঙ্কার;
তোমার কাছে রাখেনি আর
সাজের অহঙ্কার।
অলঙ্কার যে মাঝে পড়ে,
মিলনেতে আড়াল করে,
তোমার কথা ঢাকে যে তা'র
মুখর ঝঙ্কার। —গীতাঞ্জলি

ভাবের, সাজের এবং অহঙ্কার ও অলঙ্কারের মুখর ঝঙ্কার স্বভাবোক্তির স্বভাবরূপ প্রাণটিকে একেবারে বিনষ্ট না করিলেও তাহাকে আচ্ছন্ন করে এবং সহৃদয়ের হৃদয়ের সহিত তাহার পূর্ণ মিলন ঘটিতে দেয় না।

অলঙ্কারাচার্য দণ্ডী স্বভাবোক্তিকে আদি বা প্রথম অলঙ্কার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরে অন্যান্য অলঙ্কারের কথা বলিয়াছেন। দণ্ডী বলিয়াছেন,—

নানাবস্থং পদার্থানাং রূপং সাক্ষাদ্ বিবৃণ্বতী।
স্বভাবোক্তিশ্চ জাতিশ্চেত্যাদ্যা সালঙ্কৃতি র্যথা॥—কাব্যাদর্শ, ২।৮

—'পদার্থসমূহের নানা অবস্থার স্বরূপ যাহাতে সাক্ষাৎভাবে বিবৃত হয়, তাহাই স্বভাবোক্তি বা জাতি, তাহাই আদ্য অলঙ্কার।'

মূলের 'রূপ' শব্দের অর্থ টীকাকারেরা করিয়াছেন,—

স্বরূপবিশেষম্ অসাধারণ-ধর্ম্মম্

—'স্বরূপবিশেষ, যাহা বস্তুর অসাধারণ ধর্ম।'

এই অর্থই অভিপ্রেত সন্দেহ নাই। জাতি শব্দের ব্যাখ্যায় কথিত হয়,—

নানাবস্থাসু জায়ন্তে যানি রূপাণি বস্তুনঃ।
স্বেভ্যঃ স্বেভ্যো নিসর্গেভ্যস্তানি 'জাতিং' প্রচক্ষতে॥

—সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ, ৩।৪

—'নিজ নিজ নিসর্গ হইতে বস্তুর নানা অবস্থায় যে সকল রূপ জাত হয়, তাহাদিগকেই জাতি বলে।'

দণ্ডী স্বভাবোক্তিকে আদ্য অলঙ্কার বলিয়া স্বভাবোক্তি কাব্য যে মনুষ্য-সমাজের আদিকাব্য তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বক্রোক্তি মানুষের শিক্ষার আভিজাত্য প্রকাশ করে, তাহা যে পরবর্তী সভ্যতার সৃষ্টি সন্দেহ নাই। স্বভাবোক্তি মানুষের প্রীতি-সিক্ত চিত্তে আপন প্রসন্নতায় ফুটিয়া উঠে, তাহা কেবল আদ্যকালের নয়, তাহা নিত্যকালের, তাহার সহিত অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে সহজ মানুষটির। অলঙ্কার শব্দ দেখিয়া শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। বাক্যের সৌন্দর্যই অলঙ্কার। বামন বলিয়াছেন—

"সৌন্দযমলঙ্কারঃ।" —কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি, ১।২

জেম্‌স্ হেন্‌রি লী হাণ্ট্ কাব্য কি বুঝাইতে যাইয়া এক জায়গায় বলিয়াছেন,—

'Nay, the simplest truth is often so beautiful and impressive of itself, that one of the greatest proofs of his genius consists in his leaving it to stand alone, illustrated by nothing but the light of its own tears or smiles, its own wonder, might, or playfulness."

—*What is Poetry?*

—'শুধু তাই নয়, সহজতম সত্যটি অনেক সময়ে এত সুন্দর এবং নিজেই এত হৃদয়গ্রাহী যে, কবির প্রতিভার একটি সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ হইতেছে, ইহাকে কেবল স্বভাবে থাকিতে দেওয়ায়; ইহা শুধু নিজ অশ্রু বা হাসির প্রভা, নিজ বিস্ময়, শক্তি এবং লীলাময়ত্বে নিজেই প্রকাশ পাইবে, আর কিছুতে নহে।'

স্বভাবোক্তি কাব্য-সম্বন্ধে ইহার পর আর কিছু বলিবার নাই।

স্বভাবোক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, নিসর্গ-কবিতা ও প্রাণি-কবিতা। নিসর্গ শব্দ সংস্কৃতে সর্গ বা সমগ্র সৃষ্টি বুঝাইলেও বাঙ্গালায় বৃক্ষ-লতা, নদী-পর্বত, মেঘ-রৌদ্র প্রভৃতি প্রত্যক্ষ প্রাণস্পন্দহীন, মূক ও দৃশ্যমান প্রকৃতি অর্থাৎ Nature অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই নিসর্গ বা Nature আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের এক প্রধান অবলম্বন। প্রাচীন নাট্য বা কাব্যেও তাহার অনাদর ছিল না। অভিজ্ঞানশকুন্তল বা বিক্রমোর্বশী অথবা উত্তররামচরিত নাটকে নিসর্গের অপূর্ব বিশিষ্টতার কথা কাব্য-রসিক মাত্রেই অবগত আছেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন,—

"অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে অনসূয়া প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন, তপোবন-প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র।" —প্রাচীন সাহিত্য, শকুন্তলা

আধুনিক গীতিকাব্যের যুগে নিসর্গসুন্দরী কবির আরাধ্যা দেবীতে পরিণত হইয়াছেন। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নিজেকে 'A worshipper of Nature' (*Tintern Abbey*)—প্রকৃতির পূজারী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বাস্তবিকই প্রকৃতি এখন কবির চক্ষে এক স্বতন্ত্র সত্তায় দীপ্যমান, যেন প্রাণধর্মে স্পন্দমান, কবির সহচরীরূপে কখন তাহাকে বশ করে, কখন তাহার বশীভূত হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে নিসর্গ-কবিতার ভাব ও রস-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। প্রাণিজগতের কাব্যে সহজেই ভাব ও রসের সঞ্চার হয়, কিন্তু কখন কখন বর্ণনায় স্বভাব-সৌন্দর্যই সমধিক পরিস্ফুট হয়; রস ও ভাব থাকিলেও তাহা স্বভাবোক্তি বলিয়াই সর্বাগ্রে চিত্তকে চমৎকৃত করে। শকুন্তলা নাটকের প্রারম্ভেই যে বেগে পলায়মান হরিণের বর্ণনা, তাহাতে ভয়ানকরস থাকিলেও বর্ণনার আশ্চর্য স্বাভাবিকতা বা স্বভাবোক্তি দ্বারাই মন হরণ করে। অনেক স্বভাবোক্তি-কাব্যে নিসর্গ ও মানুষ এবং অন্য প্রাণী অবিভিন্নভাবে থাকিয়া রচনার রমণীয়তা বৃদ্ধি করে।

দ্রুতিকাব্যের তুলনায় দীপ্তিকাব্য তুচ্ছ করিবার নয়; কারণ, সৎকবির রচনা হইলে ইহাও প্রতীয়মান অর্থদ্বারা আমাদের বাসনালোকে অথবা ব্যক্তিত্বের গভীরতর স্তরে বিচিত্র আলোড়ন তুলে, অমূর্তকে মূর্ত এবং অব্যক্তকে ব্যক্ত করে। আলঙ্কারিকদের ব্যাখ্যাত আটটি স্থায়ী ভাব অথবা মানব-মনের যে কোন প্রকার ভাব বা অবস্থা অবলম্বনে অর্থকে প্রধান করিয়া এই দীপ্তিকাব্য রচিত হইতে পারে, এবং রচিত হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের রুচি এবং অনেক সময়ে যুগবিশেষের রুচি এই দীপ্তিকাব্যকেই আদর করে ও করিয়াছে। আমাদেরই বাঙ্গালা সাহিত্যে রসাত্মক

কাব্য রচনায় ও পাঠে শ্রান্ত হইয়া প্রতিক্রিয়া-ধর্মে আধুনিক অনেক কবি দীপ্তি-কাব্যেই প্রতিভার চরিতার্থতা খুঁজিতেছেন। ইউরোপে রোমান্টিক যুগের পূর্ববর্তী যুগ ছিল মুখ্যতঃ এই দীপ্তিকাব্যের যুগ ; বর্তমানে আবার সেখানেও যেন রোমান্টিক যুগের প্রতিবাদে দীপ্তিকাব্যের অভিনব প্রসার হইতেছে। অবশ্য কোন জিনিসই পুরাপুরি পূর্বধর্ম লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয় না। দেশকাল ও মনুষ্যমনের পটভূমিকা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু যে কাব্য লিখিত হইতেছে, রচনার স্বরূপ-ধর্মে তাহা আমাদের ব্যাখ্যাত রম্যবোধময় কাব্য বা দীপ্তিকাব্য।

প্রশ্ন উঠিতে পারে,—অর্থকে প্রধান করিয়া রচনা করিলেও যদি কাব্য হয়, তবে কাব্যের সহিত দর্শন ও বিজ্ঞানের পার্থক্য রহিল কোথায়? এই প্রশ্ন বহু প্রাচীন কালে নানাদেশে আলোচিত হইয়াছে এবং তাহারই ফলে কাব্যের বিবিধ সংজ্ঞা ও লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। গ্রীস্‌দেশে আরিস্টট্‌ল্ সর্বপ্রথমে নীতিতত্ত্ব হইতে সৌন্দর্য-তত্ত্বকে পৃথক্ করিয়া কাব্য ও সুকুমার কলা বুঝিবার প্রয়াস পান। বুচার বলিতেছেন,—

"He maintains consistently that the end of poetry is a refined pleasure."—*Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art*, p. 238.

—'তিনি (আরিস্টট্‌ল্) সুসঙ্গতরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কাব্যের লক্ষ্য হইতেছে বিশুদ্ধ বা মার্জিত আনন্দ।'

এই বিষয়ে বুচার উক্ত গ্রন্থের Art and Morality প্রবন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন, উহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। ভারতবর্ষে এ প্রশ্ন কখনও সমস্যারূপে দেখা দেয় নাই। রামায়ণ ও মহাভারত, এই অপূর্ব গ্রন্থ দুইখানি কি ইতিহাস, না ধর্মশাস্ত্র, না কাব্য,—এই প্রশ্ন হয়তো একদিন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই, বাল্মীকি ও বেদব্যাসের জিজ্ঞাসার উত্তরে পিতামহ ব্রহ্মা কেবল প্রারম্ভেই উভয় গ্রন্থকে কাব্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইতিহাস বা ধর্মশাস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও এই দুই গ্রন্থে অপূর্ব মহাকাব্য-লক্ষণ সর্বাধিক পরিস্ফুট, এবং সে লক্ষণ হইতেছে সহৃদয়ের চিত্তে দ্রুতি ও দীপ্তি দ্বারা রস ও রম্যবোধের সহায়তায় অলৌকিক আনন্দ পরিবেশন। কাব্যদ্বয়ে বিচিত্র রস-ভাবের বিমল প্রকাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে গৌরবপূর্ণ গভীর অর্থের চমৎকার দ্যোতনা ভারতবাসীর চিত্ত নিত্যকাল জয় করিয়া রাখিয়াছে।

এখানে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে,—অর্থ বলিতে বুঝায় রম্যার্থ, যাহা কেবলমাত্র কাব্যের অবলম্বন হইতে পারে, দর্শন বা বিজ্ঞানের নয়। এই অর্থ এবং অর্থোপলব্ধির

প্রকার সম্বন্ধে পূর্বেই সুস্পষ্ট আলোচনা হইয়াছে। দ্বিতীয় কথা এবং শেষ কথা হইতেছে এই যে, প্রবন্ধ পাঠে আনন্দ না পাইয়া প্রভূত সত্য পাইলেও কেহ তাহা কাব্য বলিয়া ভ্রম করেন না; আবার কিছুমাত্র তত্ত্ব না থাকিলেও তাহা যদি আনন্দ দেয়, তবে সে রচনা কাব্য বলিয়াই আদৃত হয়। আনন্দ ও সত্য উভয় থাকিলে তাহা নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট কাব্য। কাব্যের মুখ্য প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য হইতেছে আনন্দ। এই শব্দার্থময় রচনার কাব্যত্বে আনন্দের বা স্বরূপানন্দের প্রকাশই মুখ্য কথা। দর্শন বা বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ প্রয়োজন এই আনন্দ নহে; সত্য, তথ্য বা তত্ত্বজ্ঞান। কাব্য পাঠের গাঢ় প্রসক্তির ন্যায় দর্শন বা বিজ্ঞান পাঠেও অনেকের সমান প্রসক্তি রহিয়াছে। পাঠার্থীর এই প্রসক্তি দ্বারা কাব্য বা দর্শনের ভেদবিচার হইতে পারে না। কি উদ্দেশ্য লইয়া বা কি ফল পাইবার নিমিত্ত আমরা গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাই মুখ্যতঃ দেখিতে হইবে। যদি কেহ দর্শন পাঠে তত্ত্বের কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল আনন্দই লাভ করেন, অথবা কাব্যালোচনায় আনন্দ না পাইয়া কেবল সত্য ও তত্ত্বের উদ্ধার করিতে থাকেন, তবে তাঁহার কাছে দর্শন হইবে কাব্য এবং কাব্য হইবে দর্শন এবং সেই পণ্ডিতবর হয়তো সত্য ও স্বাদ উভয় হইতেই হইবেন বঞ্চিত।

বাস্তবিক পক্ষে এখানে বিচার্য বিষয় ভাব-প্রধান ধ্রুতিকাব্যের ন্যায় অর্থ-প্রধান দাপ্তিকাব্যেও চিত্তের বাসনালোকে আলোড়ন উঠে কি না, পরিমিত ব্যক্তিত্বের বিস্মৃতি হয় কি না এবং আনন্দের অলৌকিকত্ব আসে কি না। বাসনালোক যাহার নাই, তাহার অপূর্ব-বস্তু-নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা থাকিতে পারে না; এবং সম বা সদৃশ বাসনা না থাকিলে কোন পাঠকের পক্ষে রচিত কাব্যের আস্বাদনও সম্ভবপর হয় না। বাসনা অর্থ বিচিত্র বস্তু অর্থাৎ ভাব ও অর্থের অতি সূক্ষ্ম সংস্কার; মানুষের স্মৃতির গভীরতর স্তরে তাহার স্থিতি, অনুরূপ অনুভূতির স্পন্দনে তাহাতে প্রতিস্পন্দন জাগে এবং ব্যক্ত বস্তু অব্যক্ত সৌন্দর্য-মহিমা লাভ করে। বাসনা অর্থ কেবল মাত্র ভাবের সংস্কার নয়; শুধু মাত্র ভাবের সংস্কার থাকিতেও পারে না। চিত্তে বাসনাত্মক অন্তর্ব্যাপারের স্ফুরণ হইতে জাগে বস্তু, জাগে অর্থ, জাগে ভাব এবং ক্রমে জাগে রস, জাগে অপূর্ব এক সৌন্দর্যবোধ বা রম্যবোধ। সাধারণতঃ রস ও রম্যবোধ দুইটি যুগপৎ প্রবল হয় না, একটিই হয় প্রবল। এই রম্যবোধ কেবলমাত্র চিত্তের ভাবভূমি হইতে জাগিতে পারে না; তাহার জন্য চাই শুদ্ধ জ্ঞানধর্মী নয়, রম্য-বোধ-ধর্মী চিত্তের অন্তঃস্থলে অনুকূল আলোড়ন। রিচার্ড্‌স্ তাঁহার 'Principles of Literary

Criticism' নামক গ্রন্থে রসানুকূল অন্তঃপ্রবৃত্তির নানা জাগরণকে কাব্যাস্বাদের প্রধান উপাদান মনে করিয়াছেন; emotion অর্থাৎ ভাব বা রসকে তাহার দ্যোতক বলিয়া স্বীকার করিলেও উহাকে প্রধান স্থান দেন নাই।

বাসনার আলোড়নে ভাবার্থের উদ্ভব-দ্বারা চিত্ত তন্ময় হইলে প্রমাতার পরিমিত ব্যক্তিত্ব-বোধ বিগলিত হইতে থাকে এবং সংবিদানন্দের চর্বণার ফলে এক অলৌকিক অনুভূতি জন্মে। ভাব-তন্ময় চিত্তের বেলায় এই অনুভূতির নাম দেওয়া হইয়াছে রস; ভাবাশ্রিত রম্যার্থ অবলম্বনে জাত চিত্তের এই অনুভূতির নাম দেওয়া হইয়াছে রম্যবোধ। এখানে বস্তুর অর্থ-মহিমা দ্যোতিত হইয়া চিত্তের বুদ্ধি-অংশের ঝলকে আনন্দকে দীপ্ত করে। ভাব ও অর্থ লইয়া মনুষ্য-জগতের অথবা প্রাণি-জগতের কারবার। বাকী রহিল নিসর্গ-জগৎ, কবিচিত্ত দ্বারা অধিবাসিত বা অনুরঞ্জিত হইলে সেখানেও সাধারণতঃ ভাব ও অর্থের প্রশ্নই উঠে। পূর্বেই কথিত হইয়াছে ভাব-হীন অর্থ নাই এবং অর্থ-হীন ভাব নাই। এই দুইটিই তাহা হইলে কাব্যরচনার শ্রেষ্ঠ মানসিক উপাদান। কবিচিত্তের অধিবাসনে কখনও ভাব হয় মহিমান্বিত, কখনও বা অর্থ হয় মহিমান্বিত। যে রচনায় ভাব প্রধান, তাহাই পরিণামে রস-রচনা; যে রচনায় রম্যার্থ প্রধান, তাহাই পরিণামে রম্যবোধময় রচনা। যে রচনায় ভাব ও রম্যার্থ উভয় উভয়কে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া পরস্পরের মহিমা উপচিত করিতে থাকে, সেখানে রস ও রম্যবোধের অপূর্ব সমন্বিত সৃষ্টিতে কাব্য হয় যুগপৎ দ্রুতিমান্ ও দীপ্তিমান্; তাদৃশ কাব্য ভুবনে সুদুর্লভ; পাঠক তখন তৃপ্ত তৃপ্ত, ধন্য ধন্য হইয়া রস-সাগরে ডুবিতে থাকেন, ডুবিতে ডুবিতে চতুর্দিকে হাজার মণিমাণিক্যের দিব্য ঝলকে দীপ্ত হইয়া উঠেন। মহাকবিগণও এই অপূর্ব কাব্য খুব বেশী সৃষ্টি করেন নাই।

কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের মতে বক্রোক্তিজীবিত-কার কুন্তক এবং পরবর্তী কালে রসগঙ্গাধর-প্রণেতা জগন্নাথ সৌন্দর্যকে একটি বিশেষ চিত্তভাব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সাধারণ অর্থে সৌন্দর্য যে চিত্তভাব, তাহাতে সংশয় করিবার কিছু নাই, কিন্তু ইহা রসকাব্যের অষ্টপ্রকার স্থায়ী ভাবের ন্যায় একটি ভাব নহে; ইহা স্থায়ী ভাবসমূহেও যেমন আছে, বিচিত্র অর্থ, অলঙ্কার বা রচনার নানাবিধ পারিপাট্যের মধ্যেও তেমনি আছে। দীপ্তিকাব্যের রম্যত্ব বলিতে এই সাধারণ সৌন্দর্য এবং আরও অনেক প্রকার চিত্তগ্রাহী ধর্ম বা গুণ বুঝায়। রসগঙ্গাধর-প্রণেতা জগন্নাথ ভরতমুনি-কৃত রস-সূত্রের আটপ্রকার ব্যাখ্যা দেখিয়া রসকেও শেষে রমণীয়তার জনক বলিয়া সমস্ত মতের সমন্বয় করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন,—

ইত্থং নানাজাতীয়াভিঃ শেমুষীভি র্নানারূপতয়া অবসিতোঽপি মনীষিভিঃ পরমাহ্লাদাবিনাভাবিতয়া প্রতীয়মানঃ প্রপঞ্চেঽস্মিন্ রসো রমণীয়তাম্ আবহতীতি নির্বিবাদম্। —*রসগঙ্গাধর, ১।৬, বৃত্তি*

—'রস এইরূপে নানাজাতীয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কর্তৃক নানারূপে ব্যাখ্যাত হইলেও মনীষিগণের দ্বারা পরমাহ্লাদের অবিনাভাবেই অর্থাৎ স্বরূপেই প্রতীয়মান হয় এবং কাব্যসমূহে রমণীয়তা আনয়ন করে ; অতএব সব নির্বিবাদ হইল।'

তিনি প্রথম সূত্রের বৃত্তিতেই বলিয়াছেন, রসাত্মক বাক্যের ন্যায় বস্তু-প্রধান ও অলঙ্কার-প্রধান রচনায়ও রমণীয়তা থাকে। তাই রমণীয়তাই তাঁহার মতে কাব্যের বা কাব্যাত্মক শব্দার্থের প্রধান লক্ষণ। কাজেই রমণীয়তা কাব্যের ভাবের ন্যায় আমাদের কথিত অর্থেও স্পষ্টরূপে লক্ষ্য হইবে। এই রমণীয়তার অপর নাম বলা যাইতে পারে চমৎকার, চমৎকৃতি অথবা সৌন্দর্য। চমৎকার শব্দের মধ্যে চিত্তবিস্তাররূপ বিস্ময় আছে, তাহার ফলস্বরূপ দেহের কম্পপুলকাদি ও চিত্তের আহ্লাদ আছে, এবং আরও আছে বস্তু বা অর্থের সাক্ষাৎকার। অভিনবগুপ্ত চমৎকার-সম্বন্ধে সর্বশেষে লিখিতেছেন,—

অপি তু প্রতিভানাপরপর্যায়-সাক্ষাৎকার-স্বাভাবেয়মিতি।

—নাট্যশাস্ত্র, ৬।৩৪, ভাষ্য

—'চমৎকার-সম্বন্ধে আরও বলা যায়, তাহা প্রতিভানের অপর নাম সাক্ষাৎকার-স্বরূপ।'

এই সাক্ষাৎকারকেই বলা হয় vision ; discrimination বা observation নয়। মনস্বী কার্লাইল ইহাকেই বলিয়াছেন,—

"The seeing eye ! It is this that discloses the inner harmony of things." —*The Hero as Poet*

—'সর্বদর্শী চক্ষু! ইহাই বস্তুসমূহের আভ্যন্তরীণ সুষমাকে অভিব্যক্ত করে।'

এই vision দ্বারা অর্থ দীপ্ত হয়, রমণীয়তা প্রাপ্ত হয় এবং কাব্য হয়।

যাহা হউক, কাব্যের দুইটি মূলভাগ স্বীকৃত হইল,—দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য। দ্রুতিকাব্য দীপ্তিশূন্য নহে, আবার দীপ্তিকাব্যেও দ্রুতির সিক্ততা দৃষ্ট হয়।

দীপ্তিকাব্যের প্রথমভেদ গৌরবোক্তি, গৌরব-কাব্য বা অর্থগৌরব-পূর্ণ কাব্য। চিন্তার দীপ্তি এবং চরিত্রের মহত্ত্ব এই কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব। সুপ্রাচীন কালেও যে ইহার বিশেষ আদর ছিল, তাহার প্রমাণ কাব্যের উদ্দেশ্য-বিচারের মধ্যে বা

কাব্যের সংজ্ঞা-নির্দেশের মধ্যে ধরা পড়ে। ভারতবর্ষে কান্তা-সম্মিত উপদেশ দান ছিল কাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য, গৌণ উদ্দেশ্য ; গ্রীস ও ইটালিতে কিন্তু **'pleasurable instruction'** বা **'delightful teaching'** অর্থাৎ প্রীতি-প্রদ শিক্ষাদান ছিল কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্লুটার্ক তো স্পষ্টই বলিলেন,—

"Poetry is the preparatory school of philosophy."

—*de Aud. Poet. Ch. I.*

—'কাব্য দর্শনশিক্ষার এক প্রাথমিক পাঠশালা মাত্র।'

হোরাস্-এর 'Ars Poetica' গ্রন্থেও আনন্দের সহিত শিক্ষাদানই কাব্যের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে মহাকবি গেটে সৌন্দর্যের পরিচ্ছদে ভূষিত শাশ্বত সত্যকে আর্টের অর্থাৎ এই কাব্য বা কলার চরম লক্ষ্য বলিয়াছেন। মনস্বী কার্লাইল কাব্যকে বলিলেন, সঙ্গীতময় চিন্তা,—

—"Poetry, therefore, we will call *musical Thought*...At bottom, it turns still on power of intellect ;......" —*The Hero as Poet*

—'অতএব কাব্যকে আমরা বলিব সঙ্গীতময় চিন্তা···অন্তরে ইহা বুদ্ধিশক্তির আশ্রয়ে আবর্তিত হয়।'

এই সকল আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, উৎকৃষ্ট কাব্যে গৌরবপূর্ণ অর্থ, গভীর চিন্তা বা সত্যের একটি সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ প্রকাশ প্রাচীন কাল হইতেই লক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। অনেকে এই অর্থের মহিমায় এত মুগ্ধ হ'ন যে, তাঁহারা বস্তু লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহার পরম ফল আনন্দকে স্পষ্টরূপে লক্ষ্যও করিতে পারেন না।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ ও উপনিষৎ হইতে তিনটি মন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করা যাক্,—

নাসদাসী ন্নো সদাসীৎ তদানীং
নাসীদ্ রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিম্ আবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম
ন্নংভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্॥ —ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।১

—'তৎকালে অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না! পৃথিবী ছিল না, অন্তরীক্ষ ছিল না ; তাহার পারে যাহা, তাহাও কিছু ছিল না! কি আসিয়া সৃষ্টিকে আবরণ

করিবে, কোন্ প্রদেশে থাকিয়া কাহার সুখের জন্য আবরণ করিবে? গহন গভীর অম্ভোরাশিও ছিল কি?'

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ —কঠোপনিষৎ, ২।২।১৫

—'সেখানে সূর্য দীপ্তি পায় না, চন্দ্র-তারকাও পায় না। এই বিদ্যুৎসকলও দীপ্তি পায় না, অগ্নির আর কথা কি? দীপ্ত রহিয়াছেন তিনি, তাঁহার অনুদীপ্তিতে সকলেই দীপ্ত হয়; তাঁহার দীপ্তিদ্বারা এই সকলই দীপ্যমান।'

অগ্নি মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্র-সূর্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা॥ —মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।১।৪

—'দ্যুলোক তাঁহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য দুই চক্ষু, দিক্‌সমূহ শ্রোত্র এবং বিবৃত বেদরাশি তাঁহার বাক্য, বায়ু প্রাণ, হৃদয় বিশ্ব, তাঁহার পদ-যুগল হইতে জাত হইয়াছে এই পৃথিবী, ইনি সকল ভূতের অন্তরাত্মা।'

এই তিনটি মন্ত্র কেবলমাত্র মন্ত্র নয়, অপূর্ব কাব্যও বটে। ইহাদের ছন্দ ও শব্দের গম্ভীর ধ্বনি-মর্যাদার কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহাদের অর্থগত পরম সত্য চিত্তকে দীপ্ত ও সমুন্নত করিয়া অলৌকিক সংবিৎ ও আনন্দ দান করে। অর্থ এখানে আসিয়াছে ঋষি-কর্তৃক বস্তু-স্বরূপের দর্শন বা সাক্ষাৎকার হইতে। মন্ত্র উচ্চারণ বা শ্রবণ করিয়া আমরাও যেন উহা দর্শন বা সাক্ষাৎ করি। মন্ত্র কয়টি রম্যবোধে দীপ্ত অপূর্ব দীপ্তিকাব্য। এই দীপ্তি কেবল কাব্যের নহে, মন্ত্রেরও দীপ্তি। শ্রীঅরবিন্দ এই মন্ত্রকেই কাব্যের শ্রেষ্ঠ রূপ ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি বলিয়া পুনঃ পুনঃ মন্তব্য করিয়াছেন। এখানে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রথম মন্ত্রটিতে কিছুমাত্র অলঙ্কার নাই, কেবল ছন্দ ও অর্থ-ধর্মেই তাহা দীপ্ত; দ্বিতীয় মন্ত্রটির প্রথমাংশে একটি অলঙ্কার—ব্যতিরেক অলঙ্কার আছে, বলা যাইতে পারে; কিন্তু শেষাংশ কেবলমাত্র অলৌকিক মন্ত্রধর্মেই উজ্জ্বল; তৃতীয় মন্ত্রটির আগাগোড়া একটি রূপক—সাঙ্গরূপক অলঙ্কার রহিয়াছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহা এই বক্রোক্তিকে অতিক্রম করিয়া সুমহান্ অর্থ-গৌরবেই উল্লসিত বলিয়া চিত্তকে অভিভূত করে।

উল্লিখিত উদাহরণ কয়টি শ্রেষ্ঠ গৌরবোক্তির উদাহরণ, সন্দেহ নাই। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কাব্যের উদাহরণ-সমূহ অধ্যায়ের শেষাংশে পাওয়া যাইবে। আধুনিক সাহিত্যে কিন্তু এই গৌরবোক্তির আদর যেন পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বলাকা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিতা অর্থ-গৌরবেই দীপ্ত। একেবারে সাম্প্রতিক কবিতাও কেবল বঙ্গোপসাগরের পারে নহে, অতলান্তিকের উভয় তীরেই এই গৌরবোক্তি বা বক্রোক্তিতেই বিশিষ্ট শ্রী লাভ করিয়াছে। সাম্প্রতিক যুগের শৈলীই হইতেছে কাব্যের চিন্তাময় অর্থ-দ্যোতনার উপর সর্বাধিক মূল্য দান করা। সুপ্রশস্ত, সুস্পষ্ট এবং সূক্ষ্ম অথচ বুদ্ধিগত বাস্তব সত্যই সাম্প্রতিক কবিগণের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, ইহাই যেন তাঁহাদের আরাধিত কাব্য-নীতি। জগতের নানা আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা-ভারে পীড়িত মানবজাতি আজ প্রতিভাবান্ কবিদের কাছেও সঞ্জীবনী সুধা না চাহিয়া, চাহিতেছে বাঁচিবার অন্ন ও জল, কখনও বা ক্ষণিক বিভ্রমকর মদ্য। কবি হইলেই আজ তাঁহাকে বাণী দিতে হইবে, তাঁহার রচনায় তাঁহার নিজস্ব দর্শন পরিস্ফুট করিতে হইবে। 'Message of a Poet', 'Philosophy of a Poet'—এ তো যেন এই যুগের গীতা! কবি আবার হইয়া উঠিতেছেন দার্শনিক, নীতি-শিক্ষক এবং যুগধর্ম-প্রচারক! সুতরাং পূর্বযুগের দৃষ্টি দিয়াই দেখি, আর আধুনিক বা সাম্প্রতিক যুগের দৃষ্টি দিয়াই দেখি, অর্থের আশ্রয়ে দীপ্ত গৌরবোক্তি বা গৌরব-কাব্যকে অস্বীকার করা যায় না।

দীপ্তিকাব্যের দ্বিতীয় ভেদ বক্রোক্তি কাব্য। ইহার জন্য চাই বাগ্‌ভঙ্গী ও মনোহর উক্তি; বাস্তবিক পক্ষে উহা এই জাতীয় কাব্যের প্রাণ। রস-কাব্যেও বাগ্‌ভঙ্গী আছে, কিন্তু তাহার প্রাণ রসধর্মে স্থিত; বক্রোক্তি কাব্যে রস-স্পর্শ থাকিলেও তাহার স্বরূপ-ধর্ম বক্রতায়। স্বভাবোক্তির বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র স্বভাবের সরল স্বচ্ছ প্রকাশে। অর্থ-গৌরব কিন্তু রসোক্তি ও বক্রোক্তি উভয় রীতিতেই প্রকাশিত হইতে পারে।

বলিবার ভঙ্গী-বৈচিত্র্যকে প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহ বলিয়াছেন বক্রোক্তি। বক্র শব্দের অর্থ বাঁকা, অর্থাৎ ভঙ্গীসহকারে বা ইঙ্গিতে ব্যক্ত, অতএব, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও মনোহর। ভামহ মনে করেন, অলঙ্কারের অলঙ্কারত্ব এবং কাব্যের কাব্যত্ব কেবলমাত্র বক্রোক্তিতেই সম্ভবপর। এই বক্রতার জন্যই বাক্যসমূহ লাভ করে এক বৈদগ্ধ্যপূর্ণ বিচিত্র বিন্যাস ও বিলাস, এবং অর্থসমূহও সঙ্গে সঙ্গে নানা সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া নব নব ভঙ্গীতে করে আত্মপ্রকাশ। সাধারণ উক্তিই যদি বক্রতায় মণ্ডিত হয়, তবে

হয় বক্রোক্তি, এবং এই বক্রোক্তিই কাব্য। পরবর্তী আলঙ্কারিক দণ্ডীও বক্রোক্তির এই বিশিষ্ট লক্ষণ স্বীকার করেন। তিনি প্রকৃত পক্ষে সমুদয় কাব্যকেই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন,—বক্রোক্তি ও স্বভাবোক্তি; উপমা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার-সমূহ তাঁহার মতে বক্রোক্তিরই অঙ্গ-বিশেষ। অর্থালঙ্কার আলোচনার শেষভাগে আচার্য দণ্ডী মন্তব্য করিয়াছেন,—

ভিন্নং দ্বিধা স্বভাবোক্তি র্বক্রোক্তি শ্চেতি বাঙ্ময়ম্ ॥ —কাব্যাদর্শ, ২।৩৬৩

—'বাঙ্ময় অর্থাৎ কাব্য দুই ভাগে বিভক্ত, স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি।'

স্বভাব বর্ণন বা বস্তু-স্বরূপ বর্ণন স্বভাবোক্তি এবং সালঙ্কার বর্ণন বক্রোক্তি। ভামহ এবং পরবর্তী পণ্ডিত রাজানক কুন্তক স্বভাবোক্তিকে অলঙ্কার-বিশেষ বলিয়া স্বীকার করেন নাই; তাঁহারা প্রশ্ন করেন, বক্রতা না থাকিলে কেবলমাত্র স্বাভাবিক বর্ণনায় সৌন্দর্য বা রমণীয়তা আসিবে কোথা হইতে? ভামহ এবং দণ্ডী বক্রোক্তি দ্বারা কাব্যকে নূতন রূপে বুঝিবার পথ প্রদর্শন করেন। পরবর্তী কালে কুন্তক পাণ্ডিত্য-পূর্ণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া ইহাকে একটি পরিপূর্ণ মতবাদে প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই মতবাদই বক্রোক্তিবাদ নামে প্রসিদ্ধ। বক্রোক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন কুন্তক,—

বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্য-ভঙ্গী-ভণিতিরুচ্যতে ॥

—বক্রোক্তি-জীবিত, ১।১০

—'বক্রোক্তি হইতেছে বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভঙ্গী-সহকারে ভণিতি বা উক্তি।'

এই সংজ্ঞায় বক্র ভণিতি বা বক্র উক্তির দুইটি লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে, বৈদগ্ধ্যময়ত্ব ও ভঙ্গীময়ত্ব। বৈদগ্ধ্য অর্থ কুন্তক লিখিয়াছেন "বিদগ্ধ-ভাবঃ কবিকর্ম-কৌশলম্", এবং ভঙ্গী অর্থ লিখিয়াছেন "বিচ্ছিত্তিঃ"। বিচ্ছিত্তি বুঝাইতে কুন্তক অন্যত্র বৈচিত্র্য, চারুত্ব, হৃদ্যত্ব, সৌন্দর্য, এমন কি চমৎকার শব্দও প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহা হইলে বক্রোক্তির বা উক্তির বক্রতার দুইটি প্রধান লক্ষণ পাওয়া গেল,— প্রথম, কবিকর্ম-কৌশল বা নিপুণ কবিকর্ম, যাহা দ্বারা কবিপ্রতিভার পরিকল্পনাশক্তি বুঝাইতেছে; দ্বিতীয় লক্ষণ—ভঙ্গী, যাহাদ্বারা উক্তির বৈচিত্র্য বা চমৎকারিত্ব বুঝাইতেছে। বলা বাহুল্য, ভঙ্গী বৈদগ্ধ্যেরই ফল; বৈদগ্ধ্য বা কবিকর্ম-কৌশল অথবা কবি-ব্যাপারই আসল কথা। এখানে উল্লেখ করা উচিত, মধ্যবর্তী কালে বামন বা রুদ্রট বক্রোক্তিতে অতি সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিয়া মাত্র একটি তুচ্ছ শব্দালঙ্কার-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

কুন্তকের মতে "বক্রোক্তিঃ কাব্য-জীবিতম্"—বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ। কুন্তক কাব্যবিচারে রস বা ধ্বনির কোন আলোচনা করেন নাই; রস বা ধ্বনি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাও এই বক্রোক্তিবাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বক্রতার সহিত অন্বিত না হইলে অলঙ্কার অলঙ্কার হয় না এবং রসও রস হয় না। ধ্বনিও কুন্তকের মতে বক্রতারই এক প্রকার ভেদ; ধ্বনির একটি রূপ তাঁহার 'উপচার-বক্রতা'। এই সকল বিষয়েই আমরা তাঁহার সহিত একমত না হইলেও বক্রোক্তি যে এক-জাতীয় কাব্যের প্রাণ, তাহা স্বীকার করি। আমাদের মতে যে সকল কাব্য রস-প্রধান নহে, স্বভাবোক্তিও নহে, গৌরবোক্তিও নহে, কিন্তু শব্দ ও অর্থের বিন্যাস ও প্রকাশ ভঙ্গী-গুণে দীপ্তি-প্রধান, তাহাদিগকে বক্রোক্তি কাব্য বলা চলে। বক্রোক্তিতে তাই অলঙ্কার, রীতি, গুণ সর্বদা ঝল্‌মল্‌ করে। এইজন্য সীমাবদ্ধ অর্থে বক্রোক্তিবাদকে আমরা সমর্থন করি। এই বক্রতা অবশ্য বর্ণ-বিন্যাসে, পদ-বিন্যাসে, বাক্য-বিন্যাসে এবং সমগ্র প্রবন্ধ-বিন্যাসেও লক্ষিত হইবে। প্রাচীন বা আধুনিক কালের অনেক কাব্যই বক্রোক্তি কাব্য। রস-কাব্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের গ্রন্থেরও অনেকাংশ এই বক্রোক্তি কাব্য, সন্দেহ নাই। রস-প্রধান কাব্যকে কোন প্রকারেই বক্রোক্তিকাব্যের শ্রেণীভুক্ত করা উচিত নহে।

আলঙ্কারিকগণ নানাভাবে কাব্যকে বিভাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, দেখা যায়। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আচার্য দণ্ডী সমস্ত বাঙ্ময়কে স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। নবম শতাব্দীতে ভট্ট উদ্ভট অন্য কয়েকটি ভাগের সহিত ভাবকাব্য ও রসবৎকাব্য বলিয়া কাব্যের অপর দুইটি ভাগের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ভাবকাব্যই প্রেয়স্বৎ অলঙ্কার। তিনি বলেন,—

রত্যাদিকানাং ভাবানা মনুভাবাদি-সূচনৈঃ।
যৎ কাব্যং বধ্যতে সদ্ভি স্তৎ প্রেয়স্বদ্ উদাহৃতম্॥

—কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ, ৪।২

—'অনুভাবাদির সূচনা করিয়া রতি প্রভৃতি ভাব দ্বারা যে কাব্য নিবদ্ধ হয়, পণ্ডিতগণ-কর্তৃক তাহা প্রেয়স্বৎ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।'

টীকায় শ্রীপ্রতীহারেন্দুরাজ বলেন,—

এবং চ ভাবকাব্যস্য প্রেয়স্বদিতি লক্ষণয়া ব্যপদেশঃ।

—'এইরূপে ভাবকাব্যকে লক্ষণা দ্বারা প্রেয়স্বৎ বলিয়া নির্দেশ করা হইতেছে।'

যে কাব্যে রতি, ভয়, শোক বা গর্ব, চিন্তা, মোহ প্রভৃতি বিচিত্র ভাবের যে কোন একটি ভাব প্রধান হয়, কিন্তু উহা অতিসম্পন্ন হইয়া রসতা প্রাপ্ত হয় না, তাহাই ভাব-কাব্য। ভাব রসতা প্রাপ্ত হইলে হয় রসবৎকাব্য। ইহার পরেই উদ্ভট শান্ত-সহ নয় রসের উল্লেখ করিয়া রসবৎ কাব্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন।

দুই শতাব্দী পরে ধারাপতি ভোজদেব অতি স্পষ্ট করিয়া কাব্যসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন এবং রস-কাব্যের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা পুনরায় ঘোষণা করিলেন,—

বক্রোক্তিশ্চ রসোক্তিশ্চ স্বভাবোক্তিশ্চ বাঙ্ময়ম্।
সর্বাসু গ্রাহিণীং তাসু রসোক্তিং প্রতিজানতে॥

—সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ৫।৮

—'সমস্ত বাঙ্ময় বক্রোক্তি, রসোক্তি এবং স্বভাবোক্তি এই তিন প্রকার কাব্য লইয়া। এই সকলের মধ্যে রসোক্তিকে সর্বাপেক্ষা হৃদয়-গ্রাহিণী বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন।'

আমাদের আলোচনায় ভামহ-কথিত বক্রোক্তি, দণ্ডীর কথিত স্বভাবোক্তি, উদ্ভটের কথিত ভাবোক্তি এবং উদ্ভট, ধ্বনিকার বা আনন্দবর্ধন ও ভোজ প্রভৃতির কথিত রসোক্তি রহিয়াছে। আরও রহিয়াছে আমাদের কথিত গৌরবোক্তি। পূর্বাচার্যগণের অভিমতগুলি যুগোপযোগী সমুচিত ব্যাখ্যান দ্বারা যথাসম্ভব সমন্বয় করিয়া এবং নূতন মত যোজনা দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করা হইল। এখন উপযুক্ত উদাহরণদ্বারা এই বিভাগগুলি সমর্থিত হইবে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে,—উদাহরণগুলি সমস্তই খণ্ড কবিতার বা ক্ষুদ্র কবিতার এবং বৃহৎকাব্যের খণ্ড বা ক্ষুদ্র অংশের। বৃহৎ-কাব্যকে সমগ্ররূপে ধরিয়া এখানে তাহার স্বরূপ কিংবা শ্রেণীভেদ-সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হইল না। যদিও বৃহৎকাব্য সমগ্ররূপে সাধারণতঃ রসকাব্য, সেখানে একটি রস অঙ্গী হইয়া অঙ্গস্বরূপ অপর রসগুলি হইতে পুষ্টি পাইয়া থাকে, তথাপি তাহাদের স্বরূপ ও রূপের আলোচনায় আরও অনেক বিষয়ের অবতারণা আবশ্যক হইবে। রস, ভাব, ধ্বনি, বস্তু ও শব্দার্থ প্রভৃতির বিশদ আলোচনার পূর্বে এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া যায় না।

আনন্দবর্ধনের মতে গৌরবোক্তি ও এই বক্রোক্তি কাব্য হইতেছে গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য কাব্য, যে কাব্যে ব্যঙ্গ্য অর্থাৎ রস হইতেছে গুণীভূত বা অপ্রধান, এবং অর্থ প্রভৃতি হইতেছে প্রধান। রসকেই যাঁহারা কাব্যের একমাত্র সারবস্তু বলিয়া মনে করেন,

তাঁহাদের মতে এ সংজ্ঞা অসমীচীন নয়। কিন্তু আনন্দবর্ধনের পূর্বে প্রায় নয় শতাব্দী ব্যাপিয়া যে কবি ও আলঙ্কারিকগণের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই গুণ, রীতি, অলঙ্কার, ইহাদের সমবায় অথবা বিচিত্র বাগ্‌ভঙ্গীকেই কাব্যের মুখ্য লক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা অনেকে রসবৎ বা প্রেয়ঃ প্রভৃতি অলঙ্কার স্বীকার করিয়া একজাতীয় কাব্যের রসবত্তা পূর্বেই প্রমাণিত করিয়াছেন। এই আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই আবার সুদক্ষ কবি ছিলেন। দণ্ডী প্রভৃতিও কবি-আলঙ্কারিক; তাঁহাদের অভিমত অশ্রদ্ধা করিয়া সহজে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বাস্তবিকপক্ষে যে রচনার যাহাতে প্রাণ বা প্রাধান্য, তদনুসারেই তাহার নাম নির্বচন ও পরিচয় হওয়া উচিত। যাহা অপ্রধান, তাহার উল্লেখ করিয়া কাব্য-বিশেষের অগৌরব ঘোষণা করার অধিকার কোন পণ্ডিত-সমালোচকেরও নাই। এই জন্যই গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য নামের পরিবর্তে দীপ্তিকাব্য অথবা গৌরবোক্তি বা বক্রোক্তি নাম অনেক সঙ্গত ও সত্য। মানুষ-সাধারণের শাশ্বত ও পরিবর্তমান প্রকৃতি এবং মহাকালের শাশ্বত ও চলমান পরিপ্রেক্ষিত, উভয় স্মরণে রাখিয়া স্থায়ী কাব্যের লক্ষণাবলী নির্দিষ্ট হওয়া বিধেয়। হাজার বৎসরের বিবর্তনেই দেখা যায়, এক যুগের অবহেলিত বক্রোক্তিবাদ আজ আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছে, সে দিনের সমুল্লসিত রসবাদ আজ ম্লান হইয়া আসিতেছে। কালচক্র আবার ঘুরিয়া আসিবে সন্দেহ নাই। ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া ধর্মে thesis ও antithesisএর নিয়মে কাব্যজগতেও নিত্য ভাঙ্গাগড়া চলে। কিন্তু কাব্যরচনার মানসিক উপাদান—তাহা কবিরই হউক, কিংবা সহৃদয় সামাজিকেরই হউক, মাত্র দুইটি,—ভাব ও অর্থ; উভয়ে একত্র অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের বস্তু। কাজেই উপায়-বিচারে কাব্যের দুইটি মুখ্য ভেদ স্বীকার করিলে সকল কালের সমুদয় কাব্যকেই বুঝান যাইতে পারে।

(৫)

উদাহরণ-মালা

রস ও ভাব সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হইবে। এখানে রসোক্তির সহিত অন্যবিধ উক্তির সুস্পষ্ট মিশ্রণ-স্থলগুলি উদাহরণ দিয়া দেখান হইল।

শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় রসোক্তি ও বক্রোক্তি অনেক সময়ে একসঙ্গে থাকে; অবশ্য এইরূপ রচনায় রসধর্মই প্রবল হয়, শব্দালঙ্কার, রীতি প্রভৃতির বক্রতা বা সৌন্দর্য রসের

পুষ্টি করে মাত্র। শকুন্তলা নাটকে শকুন্তলার প্রতি পূর্বরাগ-বশে রাজা দুষ্মন্ত তাহাকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন,—

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয় মলূনং কররুহৈর্
অনাবিদ্ধং রত্নং মধু নব মনাস্বাদিত-রসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিবচ তদ্রূপ মনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ॥—শকুন্তলা, ২য় অঙ্ক

—'অনাঘ্রাত পুষ্প, নখদ্বারা অচ্ছিন্ন কিসলয়, অনাবিদ্ধ রত্ন, অনাস্বাদিত-রস নব মধু, যেন পুণ্যরাশির অখণ্ড ফল, এমনি তাঁহার নির্মল রূপ! জানি না বিধি কাহাকে এখানে ভোক্তা করিয়া উপস্থিত করিবেন।'

রতি স্থায়ী ভাব এবং আবেগ, ঔৎসুক্য, ঈর্ষ্যা প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব দিয়া পূর্বরাগাত্মক শৃঙ্গাররস পুষ্ট হইয়াছে। রচনা রসোক্তি, কিন্তু অলঙ্কারাশ্রয়ে বক্রোক্তির কুশল প্রয়োগ যেন আগে চিত্তহরণ করে। পরস্পর প্রতিস্পর্ধী উপমানগুলিতে একটি সৌন্দর্য-শতদল বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, একটি অখণ্ড অর্থ-সম্পদ উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। ভাবের পর ভাব উঠিতেছে, একটি আকাঙ্ক্ষা জাগিতে না জাগিতে নূতন ভাব উঠিয়া তাহা পূর্ণ করিতেছে, আবার নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে। সে যেন পুষ্প, আজও কেহ তাহার ঘ্রাণ লয় নাই! যেন নব কিসলয়, কেহ নখদ্বারা ছিন্ন করে নাই! কোন বর্ণনায়ই তৃপ্তি হইতেছে না! তাই বাসনা-লোক মথিত করিয়া আবার নূতন উপমান আসিতে লাগিল। সে যেন রত্ন, এখনও কেহ বিদ্ধ করিয়া গলায় পরে নাই! যেন নূতন মধু, কেহ তাহার রস আস্বাদন করে নাই! যেন পুণ্যরাশির অখণ্ড ফল!—এই উপমান দিয়া বক্তা কথঞ্চিৎ তৃপ্তি পাইলেন। কিন্তু তখনই শঙ্কা জাগিল, এ পুণ্যফল হয়তো তাঁহার জন্য নয়! হায়! হায়! বিধি এই পুষ্প, এই রত্ন, এই মধু, এই পুণ্যফল ভোগ করিবার জন্য কাহাকে উপস্থিত করিবেন? বিধি তো নিরঙ্কুশ! তাই চিন্তা এবং ঈর্ষ্যা! অনুরণন চলিতে লাগিল—অখণ্ড পুণ্য-ফল ভোগ করে ভাগ্যবান্ পুণ্যাত্মা; এত ভাগ্য, এত পুণ্য তাহার আছে কি? এখানে শব্দরাশি, ছন্দ, বিন্যাসক্রম, রীতি, অলঙ্কার এবং অর্থ সকলই পরস্পরের অনুরূপ; এই সকলের সাহিত্য বা ঐক্য রসে আত্মহারা হইয়া একটি সমগ্রতার সামঞ্জস্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইহাই আসল আর্ট, এখানে ছন্দ ও সুরে গান উঠিয়াছে, রেখায় ও রঙে রূপ ফুটিয়াছে এবং অর্থ ভাবকে ও ভাব রসকে আকর্ষণ করিয়া লোকোত্তর কাব্যানন্দ প্রকাশ করিয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের পঞ্চম সর্গে মেঘনাদ স্বর্ণমন্দিরে প্রমীলার করপদ্ম ধরিয়া প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ করিতেছেন ; মেঘনাদ বলিতেছেন,—

ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখীকুল ! মিল, প্রিয়ে, কমললোচন !
উঠ, চিরানন্দ মোর ! সূর্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তে ; তুমি রবিচ্ছবি ;
তেজোহীন আমি, তুমি মুদিলে নয়ন ।
ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার ! নয়নতারা ! মহার্হ রতন !
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম !

এ বর্ণনা অপূর্ব রসোক্তি এবং অপূর্ব বক্রোক্তি । অলঙ্কারগুলির কুশল প্রয়োগ এবং রমণীয় বাগ্‌ভঙ্গীই এখানে বক্রোক্তি ; উহা উজ্জ্বল করিয়াছে এবং বিশেষভাবে পুষ্ট করিয়াছে এ কাব্যের আত্মা সম্ভোগ-শৃঙ্গার রসকে, এখানে স্থায়ী ভাবরতির মধ্যে স্থূলতা, মূঢ়তা কিছুমাত্র নাই ।

রসোক্তি ও গৌরবোক্তির মিলন-স্থল কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনায়ই পাওয়া যায় । রবীন্দ্রনাথের মানসী-কাব্য ও শিশু-কাব্য হইতে দুইটি উদাহরণ লওয়া হইতেছে, ইহাতে বক্রোক্তির প্রকাশও আছে ।

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে,
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হ'তে ।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে,
বিরহ-বিধুর নয়ন-সলিলে
মিলন-মধুর লাজে ।
পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে ।

আজি সেই চিরদিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হ'য়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ,
নিখিল প্রাণের প্রীতি,
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি। —মানসী, অনন্ত প্রেম

এ কাব্যের অর্থ-গৌরব স্পষ্ট। যুগল প্রেমের অনাদি প্রবাহ এক প্রবাহ, বহুরূপে তাহাতে লীলায়িত হইয়াছে একই প্রেম-ভাব। অর্থ দার্শনিকতার খোলস ছাড়িয়া কাব্যরসে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। রস এখানে পরিপূর্ণ শৃঙ্গার রস, মিলনে সমুজ্জ্বল রস। এই শৃঙ্গার সংস্কৃত-আলঙ্কারিকদের উদাহৃত স্থূল শৃঙ্গার রস নহে। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে একমাত্র ভবভূতিই উত্তররামচরিত নাটকে কৌস্তুভমণিতুল্য কয়েকটি শ্লোকে ইহার দিব্য প্রভা বিচ্ছুরিত করিয়াছেন। সেখানে কাব্যও রসোক্তি ও গৌরবোক্তির অপূর্ব মিলন-স্থল হইয়াছে। ব্যাখ্যাকার ও দার্শনিকগণের মধ্যে আচার্য অভিনবগুপ্তই শৃঙ্গাররতির শুদ্ধ মহিমা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

এৈকব হ্যসৌ তাবতী রতি যত্র অন্যোন্য-সংবিদা একবিয়োগো ন ভবতি।
— নাট্যসূত্র, ৬।৫১, ভাষ্য

—'মিলনে ও বিরহে একই রতি, পরস্পরের চেতনায় পরস্পরের ঐক্য-জ্ঞান, ইহার আর বিচ্ছেদ নাই।'

এই কাব্যের রচনায় দুই একটি অলঙ্কার বস্তুকে সহজেই রূপায়িত ও রসায়িত করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ হইতে দ্বিতীয় উদাহরণ শিশু-কাব্যের প্রথম কবিতাটি।

যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে,
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে
জড়িয়েছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে।

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী,—
তুই জগতের স্বপ্ন হ'তে
এসেছিস্ আনন্দ-স্রোতে
নূতন হ'য়ে আমার বুকে বিলসি। —শিশু, জন্মকথা

বলা বাহুল্য, এই কবিতাটি পূর্ব কবিতারই অপর পিঠ। এখানেও দেশ ও বস্তুর সীমার মূর্তিতে সেই নিত্যকালের নিত্যপ্রবাহের ক্ষণিক প্রকাশ। বিজ্ঞান ও দর্শন-সম্মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি-দ্যুতি রচনার সর্বত্র ঝল্‌মল্ করিতেছে, নিছক তত্ত্ব রূপে ও রসে বিলসিত হইয়া উঠিয়াছে। রস এখানে শৃঙ্গার নহে, কিন্তু তাহারই এক পরিণাম এবং তাহা হইতেও এক হিসাবে মধুরতর, বাঙ্গালী-জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বাৎসল্য রস। রচনায় ছন্দ, অলঙ্কার ও রীতির দিক দিয়া বক্রোক্তির প্রকাশ পরিস্ফুট।

পূর্ব উদাহরণগুলি হইতে বিশুদ্ধ রসোক্তির পরিচয় মিলিবে মনে করিয়া উদাহরণমালা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ভাবোক্তিরও একটি উদাহরণ দেওয়া হইল। ইহাও রবীন্দ্রনাথের রচনা।

কৃষ্ণকলি আমি তা'রেই বলি,
কালো তা'রে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোম্‌টা মাথায় ছিল না তা'র মোটে,
মুক্ত বেণী পিঠের পরে লোটে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক্,
দেখেছি তা'র কালো হরিণ চোখ॥

* * *

এম্‌নি ক'রে কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এম্‌নি ক'রে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমালবনে।

এম্‌নি ক'রে শ্রাবণ-রজনীতে
হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক্,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ॥ —ক্ষণিকা, কৃষ্ণকলি

ভাবের কবিতা, সে যেন 'নুয়ে যায়, ছুঁয়ে যায় না; যেন বয়ে যায়, কয়ে যায় না'। সৌন্দর্য চিত্তে চমক লাগায়, কিন্তু ঘনতা দ্বারা রসের গাঢ় আনন্দ দেয় না। এখানে ভাব শৃঙ্গার রসের রতিভাব, আস্বাদটুকু মধুর, কিন্তু তাহাতে রসের সর্বব্যাপকতা এবং তন্ময় গভীরতা কোথায়? কবি যেন মুখ্যতঃ দ্রষ্টা, আনন্দ দেখার আনন্দ। কৃষ্ণকলি ময়নাপাড়ার মাঠ দিয়া চলিয়া গেল, কবিকে হয়তো একবার দেখিয়াছিল, কবিও হয়তো একবার তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন, দেখিয়াছিলেন তাহার কালো হরিণ-চোখ। তারপর সেই স্নিগ্ধ কালোর সজীব আভা তিনি দেখিলেন জ্যৈষ্ঠের কাজলমেঘে, আষাঢ়ের তমালবনে। আনন্দ তিনি পাইয়াছিলেন বৈ কি, শ্রাবণরজনীর হঠাৎ খুশি চকিতে চিত্ত স্ফুরিত করিয়া দিয়া আবার চলিয়া গেল। কৃষ্ণকলি রাখিয়া গেল তার কালো হরিণ-চোখের এবং হঠাৎ খুশির স্মৃতি।

স্পষ্টতঃ দেখা যায় কাব্য রসে পরিণত হয় নাই, ভাবলোকে অবশ হইয়া ঘুরিয়াছে। অবশ্য রস অপেক্ষা ইহার যে বিশিষ্ট মাধুর্য, তাহার আস্বাদনটুকু বেশ উপভোগ্য।

ভাব-কাব্য সম্বন্ধে আলঙ্কারিকদের পরিচিত উদাহরণ হইতেছে কুমারসম্ভব কাব্যের "এবং বাদিনি দেবর্ষৌ" শ্লোকটি (কুমারসম্ভব, ৬।৮৪)। এখানে লজ্জারূপ ভাব ব্যঞ্জিত হইয়া প্রধান হইয়াছে, স্থায়ী ভাবরতি স্পষ্ট প্রকাশিত হয় নাই। তৃতীয় অধ্যায়ে সংলক্ষ্য-ক্রমে ধ্বনির উদাহরণস্বরূপ শ্লোকটি আলোচনা করা হইবে।

মূক প্রকৃতি ও প্রাণি-জগৎ লইয়া স্বভাবোক্তির বর্ণনা। রবীন্দ্রনাথ যাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের উষালোকের ভোরের পাখী এবং নিজ কাব্য-গুরু বলিয়া সমাদর করিয়াছেন, সেই কবি বিহারীলালের কাব্যে অনেক স্বভাবোক্তির বর্ণনা আছে। সারদামঙ্গল কাব্যের হিমালয়-বর্ণনা একটি নিখুঁত নিসর্গ-কবিতা। কবিতাটিতেই হিমালয়ের বাহিরের সেই 'উদার রূপরাশি' সমধিক পরিস্ফুট; কবিচিত্তের অধিবাসনে তাহা মুখ্যতঃ অন্তভাব ধারণ করে নাই। যদৃচ্ছাক্রমে দুইটি স্তবক লওয়া যাক।

কিবে ওই মনোহারী
দেবদারু সারি সারি
দেদার চলিয়া গেছে কাতারে কাতার!

দূর দূর আলবালে,
কোলাকুলি ডালে ডালে,
পাতার মন্দির গাঁথা মাথায় সবার।

অথবা, জলধারাগুলি—

শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঠেকে ঠেকে,
লম্ফে লম্ফে ঝেঁকে ঝেঁকে,
জেলের জালের মত হয়ে ছত্রাকার,
ঘুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ;
ফেনার আরশি উড়ে,
উড়িছে মরাল যেন হাজার হাজার।

বর্ণনা বাস্তবতার বৈচিত্র্যময় হইলেও ফটোগ্রাফি নয়, উপমা কয়টি অভিনব সৌন্দর্য আরোপ করিয়াছে। এই বর্ণনা খাঁটি নিসর্গ-জগতের বর্ণনা।

স্বভাবোক্তির কয়েকটি সুন্দর বর্ণনা ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায়। কবিচিত্তের কোন বিশিষ্ট ভাব বর্ণনাকে অনুরঞ্জিত করে নাই। উদাহরণ, যথা—

নিষ্কূজস্তিমিতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ডসত্ত্বস্বনাঃ
স্বেচ্ছাসুপ্ত-গভীরভোগ-ভুজগ-শ্বাসপ্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।
সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসৎ স্বল্পাম্ভসো যাস্বয়ং
তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্যকৈ রজগর-স্বেদদ্রবঃ পীয়তে॥

—উত্তররামচরিত, ২।১৬

—'এই জনস্থান অরণ্যের প্রান্তসীমা, কোন কোন অংশ পক্ষিগণের কূজন-শূন্য এবং স্তব্ধ! কোন অংশ বা শ্বাপদকুলের প্রচণ্ড নিনাদে পূর্ণ! কোথাও বা স্বেচ্ছাক্রমে সুপ্ত রহিয়াছে ভুজঙ্গের দল, গম্ভীর তাহাদের ফণা। তাহাদের নিঃশ্বাস-বায়ুতে দাবানল সমধিক জ্বলিয়া উঠিতেছে! অরণ্যসীমায় গভীর বিবরমধ্যে স্বল্প জল চক্ চক্ করিতেছে! এবং ওখানেই তৃষ্ণাতুর কৃকলাসগুলি অজগরদিগের স্বেদধারা পান করিতেছে।'

এখানে গ্রীষ্মপীড়িত অরণ্যচর পশুকুলের স্বাভাবিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

ইহাও দ্রুতি-কাব্য, স্বভাবোক্তি কাব্য। শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার বর্ণনায় স্বভাবোক্তি কাব্যের চমৎকার উদাহরণ রহিয়াছে।

আধুনিক সাহিত্যে মেঘনাদবধকাব্যের চতুর্থ সর্গে সীতা যেখানে সরমাকে পঞ্চবটীর বর্ণনা করিয়া বিগত সুখস্মৃতির কথা শুনাইতেছেন,—

ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে ;
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে
বাঁধে নীড়, থাকে সুখে ; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুরবন-সম।

সেখানে স্বভাবোক্তির একটি চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয়,—এই রচনাংশের উপমা বা অন্য অলঙ্কারগুলিও এত স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও সরস হইয়াছে যে, তাহারা স্বভাবোক্তি বর্ণনার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। অলঙ্কার হইতেছে সৌন্দর্য ; স্বভাব-বর্ণনায়ও তাহা যতক্ষণ সৌন্দর্য, ততক্ষণ তাহার সার্থকতা থাকিতে পারে। রচনার বিমল প্রসাদগুণ এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের কোমলতা, লালিত্য ও মধুর ঝঙ্কার সকলই এই বর্ণনায় স্বভাবোক্তির অনুকূল হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এ রচনা অতুলনীয়।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রা-কাব্যের 'সুখ' কবিতাটি স্বভাবোক্তির আর একটি সুন্দর উদাহরণ। প্রথমার্ধে নিসর্গ বর্ণনা—মেঘমুক্ত দিন, প্রসন্ন আকাশ, প্রশান্ত পদ্মার বক্ষে তরী ভাসিয়া যাওয়া, উলঙ্গ বালকের পদ্মার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়া প্রভৃতি বর্ণনা ; মাঝে মাঝে এক একটি উপমা, যেন উপমা বলিয়াই মনে হয় না, বস্তুর প্রাণধর্ম যেন তাহাতেই স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। 'প্রসন্ন আকাশ হাসিছে বন্ধুর মত', 'অর্ধমগ্ন বালুচর দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর রৌদ্র পোহাইছে', 'পথখানি দূর গ্রাম হতে···নামিয়াছে স্রোতে তৃষার্ত জিহ্বার মতো',—সমস্ত মিলিয়া বাহিরে ও অন্তরে এক অপূর্ব চিত্র-রস সঞ্চার করিয়াছে, এবং চিত্তের গভীরতর দেশে জীবনানন্দের সহজ স্পর্শ বুলাইয়া দিয়াছে। এইখানে কবিতার দ্বিতীয়ার্ধ আরম্ভ, উহার সমাপ্তি হইয়াছে একটি পরিস্ফুট ভাবধারায়। কবিতাটির সম্বন্ধে আমাদের অবশিষ্ট মন্তব্য ধ্বনিবাদের আলোচনার সময়ে করার ইচ্ছা রহিল।

এই শেষের উদাহরণ দুইটিতে নিসর্গ-জগৎ ও প্রাণি-জগৎ অর্থাৎ প্রকৃত পূর্ণ নিসর্গ জগৎ অনুভূত হয়। পঞ্চবটীবনে প্রকৃতির সহিত একাত্ম হইয়া মিশিয়া রহিয়াছে মানুষ, বিহঙ্গ, হরিণ, করভ-করভী, সমস্ত জীব-জগৎ।

কবিচিত্তের প্রবল ভাবধারা অধিবাসিত হইলে স্বভাবকাব্যেও ভাব বা রসের উল্লাস দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'নববর্ষা' কবিতাটিতে এবং আরও

অনেক কবিতায় স্বভাবোক্তি কবির হৃদয়ভাবের উদ্বোধনে আশ্চর্য সরসতা লাভ করিয়াছে।

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ;
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে॥ —ক্ষণিকা, নববর্ষা

সমগ্র কবিতাটিতে স্বভাব-বর্ণনার মধ্য দিয়া প্রকৃতি-সুন্দরীর হৃদয়-স্পন্দন শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা কবি বিহারীলালের হিমালয়-বর্ণনার মত বস্তুর বহিরঙ্গের বর্ণনা মাত্র নহে। কবিচিত্তে ও সামাজিক-চিত্তে বর্ষা তাহার রসমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া কলাপীর মত 'শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস' প্রকাশ করিতেছে। এই কবিতায় রস আছে কিনা এবং থাকিলে কিরূপ রস, তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইবে।

স্বভাবোক্তির আর এক বিচিত্র উদাহরণ শিশু সাহিত্যের ছড়া কবিতা।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ী যান॥

অথবা,—

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে॥
কাজি-ফুল কুড়তে গিয়ে পেয়ে গেলুম মালা।
হাত-ঝুম্‌ঝুম্ পা-ঝুম্‌ঝুম্ সীতারামের খেলা॥
নাচ ত সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে।
আলোচাল দেব টাপাল ভরিয়ে॥—ইত্যাদি

শিশুদের জন্য রচিত বলিয়াই ছড়া-জাতীয় কবিতার প্রকাশপদ্ধতি স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ স্পষ্ট নহে, ছবিগুলিও প্রায় অসংলগ্ন। তথাপি

বিস্ময় ও কৌতূহলের ভাব সদা জাগ্রত রাখিয়া এক একটি রেখার ও এক একটি কথার ছবিতেই এই কবিতা শিশুচিত্তে ভরা আনন্দের সঞ্চার করে। ইহার সরসতাও তুচ্ছ করিবার নহে।

স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি সাধারণতঃ এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে না। একজন সরল সহজ, আর একজন ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে গর্বিত। উভয়ের মিলন তাই স্বাভাবিক নয়; তথাপি মহাকবিদের রচনায় উভয়ের মিলনচেষ্টা কখন কখন দেখা যায়। কবি কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের কেবল প্রারম্ভেই যে হিমালয়-বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনেকস্থলেই স্বভাবোক্তি নহে, বক্রোক্তি মাত্র। কতিপয় অংশ বাদ দিলে ঐ বর্ণনা পাঠ করিয়া দেবতাত্মা হিমালয়ের স্বরূপ কাহারও গোচর হয় না। কিন্তু নন্দিনী ধেনুর বশিষ্ঠ-আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের বর্ণনায় বক্রোক্তি স্পষ্টরূপে থাকিলেও স্বভাবোক্তিটিও অতিশয় মনোহারী হইয়াছে।

সঞ্চার-পূতানি দিগন্তরাণি
কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুম্।
প্রচক্রমে পল্লবরাগ-তাম্রা
প্রভা পতঙ্গস্য মুনেশ্চ ধেনুঃ॥ —রঘুবংশম্, ২।১৫

—'দিগ্ দিগন্ত সঞ্চার-পূত করিয়া দিনাবসানে পল্লবরাগ-তাম্রা সূর্যের প্রভা এবং মুনির ধেনু আপন আপন নিলয়ে ফিরিয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইল।'

শ্লেষ ও উপমা অলঙ্কার ভেদ করিয়া একবার বস্তুর সাক্ষাৎ পাইলে তাহা স্বভাবোক্তিরূপেই ফুটিয়া উঠে এবং চিত্তে চমৎকারিত্ব আনে। মনে হয়, প্রতিভার বরপুত্র কবিগণের অসুলভ কোন সিদ্ধি নাই।

দীপ্তি-কাব্যের প্রধান ভাগ দুইটি—গৌরবোক্তি ও বক্রোক্তি। উভয়ের স্বরূপ-সম্বন্ধে পূর্বেই বিশদ আলোচনা হইয়াছে এবং বেদ ও উপনিষৎ হইতে গৌরবোক্তির উদাহরণও দেওয়া হইয়াছে। রসোক্তি ও গৌরবোক্তির অভিন্ন উদাহরণ-স্থলেও গৌরবোক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিশুদ্ধ গৌরবোক্তির অপর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল

মাটির আকাশ-'পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার-নীচে কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায় !
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে। —বলাকা

'বলাকা'-কবিতাটি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা ; কিন্তু রস বলিতে সচরাচর যাহা বুঝা যায়, তাহা এই কবিতায় পরিস্ফুট নহে। কবিতাটি দীপ্ত হইয়াছে অর্থগৌরবজাত এক অপূর্ব রম্যবোধে। অর্থগৌরব আসিতেছে ঋষিকবি-কর্তৃক সমগ্র সৃষ্টির অবিরাম গতিবেগময় স্বরূপাংশের সাক্ষাৎ দর্শন বা উপলব্ধি হইতে। রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ 'শাজাহান' কবিতা, অথবা বনবাণীর 'বৃক্ষ' কবিতা এবং আরও অনেক কবিতায় অর্থ-গৌরবই সমধিক দ্যোতিত, এবং তাহারা মুখ্যতঃ রস-কাব্য নয়, গৌরব-কাব্য।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের কাব্য-সমূহেও গৌরবোক্তির অনেক উদাহরণ মিলিবে। কবির প্রথম বয়সের সার্থক রচনা পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে মোহনলাল মূর্ছান্তে অস্তমিত-প্রায় প্রভাকরের দিকে চাহিয়া যে হৃদয়-ভেদী বাক্যরাশি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা দেশ-প্রীতি-পূর্ণ গৌরবোক্তি। সে গৌরবোক্তির সহিত মিশ্রিত রহিয়াছে সুষ্ঠু বক্রোক্তি। মোহনলালের প্রথম উক্তিটি মাত্র নিম্নে দেওয়া যাইতেছে,—

কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ !
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি !
তুমি অস্তাচলে দেব ! করিলে গমন,
আসিবে যবন-ভাগ্যে বিষাদ-রজনী !
এ বিষাদ-অন্ধকারে নির্মম অন্তরে,
ডুবায়ে যবন-রাজ্য যেও না তপন !
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ ক'রে !

কি দশা দেখিয়া আহা! ডুবিছ এখন!
পূর্ণ না হইতে তব অর্ধ আবর্তন,
অর্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন! —পলাশীর যুদ্ধ, ৪র্থ সর্গ

গৌরবোক্তি এখানে প্রকাশ পাইতেছে একটি চমৎকার বক্রোক্তিকে অবলম্বন করিয়া। সম্মুখভাগে প্রত্যক্ষ লুপ্ত হইতেছে বঙ্গের মুসলমান রাজ্য, দূরে আকাশভাগে অস্ত যাইতেছে সহস্রাংশু সূর্য। রাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছে বাঙ্গালীর অন্তরে ও বাহিরে। সেই আসন্ন অমাযামিনীর বিভীষিকা দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়াছেন স্বাধীন বাঙ্গালার শেষ সেনাপতি মোহনলাল।

নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র-কাব্যের দ্বাদশ সর্গ 'সুখতত্ত্ব' প্রায় সর্বাংশেই গৌরবোক্তি।

সাম্প্রতিক কবিদের রচনায় দ্রুতি-কাব্য কম, দীপ্তি-কাব্যেরই উল্লাস, গৌরবোক্তি ও বক্রোক্তি দ্বিবিধ রচনায়ই তাঁহাদের দক্ষতা আছে। খুঁজিলেই উদাহরণ মিলিবে। প্রাচীন কবি ভারবি, শ্রীহর্ষ ও মাঘের রচনায়ও গৌরবোক্তি ও বক্রোক্তিরই প্রাধান্য, খাঁটি রসোক্তি ও স্বভাবোক্তি তাদৃশ প্রচুর নহে। প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগে যে জাতীয় কাব্য রচিত ও সমাদৃত হইয়াছে এবং হইতেছে, কাব্যশাস্ত্রে তাহার যে শাশ্বত মূল্য আছে, কাব্যরসিকদের নিকট তাহা যে অশ্রদ্ধেয় নহে, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

এইবার বক্রোক্তির উদাহরণ দিয়া প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করা যাইতেছে। মহাকবি কালিদাস রসোক্তি রচনায় সুদক্ষ, স্বভাবোক্তি রচনায়ও অপূর্ব নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন; কিন্তু আবশ্যক স্থলে বক্রোক্তি রচনায়ও তিনি তুল্য কবিশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ "কবিঃ কালিদাসঃ"—এই মন্তব্য বিদগ্ধ সুধীজনেরই মন্তব্য।

রঘুবংশ-কাব্যের প্রথম সর্গেই যে শ্লোক-পরম্পরায় দিলীপের আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা রসকাব্য নহে, দীপ্তিকাব্য; যেমন,—

আকার-সদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ।
আগমৈঃ সদৃশারম্ভ আরম্ভ-সদৃশোদয়ঃ॥ রঘুবংশ, ১।১৫

—'আকারের সদৃশ তাঁহার প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার সদৃশ তাঁহার আগম (শাস্ত্রার্থ-পরিজ্ঞান) আগমের সদৃশ তাঁহার আরম্ভ (কর্মানুষ্ঠান), এবং আরম্ভের সদৃশ ছিল তাঁহার উদয় (ফলসিদ্ধি)।'

সহজেই দেখা যায়, কোনও ভাবের অতিশয়িত প্রকাশ নহে, কেবল মনোহর

অর্থ ও বাগ্‌ভঙ্গী দিয়া কবি এখানে শব্দার্থের কাব্যত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার শব্দাবলীর ধ্বনিসম্পদ সর্বদাই লক্ষণীয়। এই কাব্য দীপ্তিকাব্য এবং বক্রোক্তি কাব্য; গৌরবোক্তি অবশ্য কিছু মিশ্রিত আছে।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচনা বক্রোক্তি-কাব্যদ্বারাই সমৃদ্ধ। দুইটি উদাহরণ লওয়া যাইতেছে,—

প্রথম, কবির প্রতিপালক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বর্ণনা—

চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মেলে॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র-হৃদে কালী সর্বদা উজ্জ্বল॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥

—অন্নদামঙ্গল, কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-বর্ণন

এ রচনা নিছক বক্রোক্তি, প্রতি স্তবকে ব্যতিরেক অলঙ্কার আশ্রয় করিয়া কয়েকটি যমক-সংযোগে ইহা সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে। অলঙ্কার কয়টি খসাইয়া লইলে ইহা একেবারে নীরস গদ্য হইয়া যাইবে। ইহা একান্তই অলঙ্কার-প্রধান বক্রোক্তি।

দ্বিতীয় উদাহরণ :—

বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥—ইত্যাদি

—বিদ্যাসুন্দর, বিদ্যার রূপবর্ণনা

এ বর্ণনায় অলঙ্কারের ভার ছাড়া আর কিছু নাই, দীপ্তি ও ব্যঞ্জনা বড় অল্প, স্বাভাবিকতা একান্ত ব্যাহত হওয়ায় বক্রোক্তি এখানে মনোহর হয় নাই।

বিদ্যাপতির রচনায়ও বক্রোক্তির অভাব নাই। রাধিকার বয়ঃসন্ধি বর্ণনার অনেকাংশই এই বক্রোক্তি কাব্য। বিদ্যাপতির

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী পন্থ॥
দিনকর কিরণ ভেল পয়গণ্ড।
কেশর কুসুম ধরল হেম দণ্ড॥
নৃপ-আসন নব পাটল-পাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥

—প্রভৃতি কবিতাটিও দীপ্তিকাব্য ; স্বভাবোক্তি নহে, শুদ্ধ বক্রোক্তি।

কবি গোবিন্দদাসের বৈষ্ণবকবিতায় বক্রোক্তির উদাহরণ খুব বেশি পাওয়া যায়। এই সমস্তই অলঙ্কার-বক্রোক্তি। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের—

এবার আমি বুঝব হরে।
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি— বলবো এবার যারে তারে,
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ হৃদে ধরে কোন্ বিচারে ?

—প্রভৃতি পদটিও দীপ্তিকাব্য, বক্রোক্তি মাত্র ; অবশ্য অন্তরালে ভক্তিরসের স্পর্শ আছে। এই বক্রোক্তি অর্থ-প্রধান, কল্পনাশক্তিতে তাহার প্রাণ, অলঙ্কার এখানে নাই। ইহাকে অর্থবক্রোক্তির উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

পূর্বেই উদাহরণ দেখান হইয়াছে, উত্তম বক্রোক্তি অনেক সময়ে উত্তম রসোক্তির সহিত অভিন্ন হইয়া থাকে। বাক্যের রস অলঙ্কারকে আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট করে, অথবা রস-রূপে পরিণত হওয়ার পথে বীজ হইতে পল্লব-পুষ্প-ফল-সমন্বিত বৃক্ষের ন্যায় বাচ্য-রীতি-অলঙ্কার-যুক্ত কাব্য সৃষ্টি করে। এই জাতীয় রচনায় বক্রোক্তির ভার থাকে না, তাই তাহাকে অনেক সময়ে নিজস্বরূপে ধরাই যায় না, বায়ুর ন্যায় যেন অদৃশ্য থাকিয়া কাব্য-জগৎকে ধারণ করে। বক্রোক্তি নিজেকে জানান দিয়াও রচনাকে সৌন্দর্যশালী ও সরস করিতে পারে ; যেমন কবি কৃত্তিবাস-রচিত সীতা-হরণে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ—

গোদাবরী-নীরে আছে কমল কানন,
তথা কি কমল-মুখী করেন ভ্রমণ ?
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া !

চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস,
চন্দ্রকলা-ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস ?
রাজ্যচ্যুত আমারে দেখিয়া চিন্তান্বিতা,
হরিলেন পৃথিবী কি তাঁহার দুহিতা ?

এখানে অলঙ্কারবক্রোক্তি ও অর্থবক্রোক্তি সমান প্রধান হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রস ও ভাব

রস

(১)

নাট্য ও কাব্য

আদিকবি বাল্মীকিকে নমস্কার! ছন্দের ন্যায় রসেরও আদি স্রষ্টা তিনি। ক্রৌঞ্চ-বিয়োগোত্থ শোকভাবের বশে তিনি প্রথম সৃষ্টি করেন রস,—করুণ রস। এই করুণ রস, শৃঙ্গার রস, বীর-রৌদ্র-ভয়ানক রস অপূর্বভাবে স্ফূর্ত হইয়াছে তাঁহার রামায়ণ কাব্যে। পণ্ডিতগণ রসের বিশ্লেষণ করেন অনেক পরে।

ভারত-ভারতীর মন্দিরে রস-প্রদীপ প্রথম প্রজ্বলিত করেন ভরতমুনি, মুনিকে নমস্কার! ভরতমুনি কেবলমাত্র নাট্যবেদের আদি বক্তা ন'ন, রস-শাস্ত্র ও অলঙ্কার-শাস্ত্র লইয়া যে কাব্য-শাস্ত্র, তাহারও আদি গুরু তিনি।[১] ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে নাট্যরস ও ভাবসমূহ এবং ষোড়শ অধ্যায়ে অলঙ্কার, দোষ, গুণ ও লক্ষণ-সমূহ আলোচিত হইয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ ভরতমুনির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কেহ বলেন উহা খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী, কেহ বা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী। তিনি যে কত সুপ্রাচীন তাহা নিঃসংশয়ে বলিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তাঁহার পূর্বে কেবল নাট্য নহে, কাব্যেরও উৎপত্তি ও প্রচার হইয়াছে, ইহা তাঁহার রচনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। প্রথম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে দেখা যায়,—

মহেন্দ্র-প্রমুখৈ র্দেবৈ রুক্তঃ কিল পিতামহঃ।

ক্রীড়নীয়ক মিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ভবেৎ ॥—নাট্যশাস্ত্র, ১।১১

—'মহেন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণ পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন, "এমন একখানি ক্রীড়ার অর্থাৎ আমোদের বস্তু আমরা পাইতে চাই, যাহা একই সময়ে দৃশ্য ও শ্রব্য হইবে"।

---

(১) রাজশেখরের মতে রসের আদি আচার্য নন্দিকেশ্বর এবং রূপক অর্থাৎ নাট্যের আদি আচার্য ভরত,—

…রূপক-নিরূপণীয়ং ভরতঃ, রসাধিকারিকং নন্দিকেশ্বরঃ,…

—কাব্যমীমাংসা, ১ম অধ্যায়

শ্রব্য শব্দের উল্লেখ হইতে স্পষ্ট অনুমান করা চলে যে, শ্রব্য কাব্য অর্থাৎ মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্য তখন প্রচলিত ছিল। দেবতাদিগের প্রার্থনা হইতে আরও অনুমান হয় যে, আরিস্টটলের ন্যায় ভরতমুনিও মনে করিতেন, কেবল শ্রব্য কাব্য বা মহাকাব্য অপেক্ষা দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্য অর্থাৎ নাটক অনেক উৎকৃষ্ট।

ভরতমুনি তাঁহার গ্রন্থে এই নাটকের বিশদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং নাটক বুঝাইতে গিয়া তাহারই জীবিত-স্বরূপ নাট্যরসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি যে ভাবে নাট্যরসের অধ্যায়েও মাঝে মাঝে 'অত্র আনুবংশ্যৌ শ্লোকৌ ভবতঃ',—এখানে এই দুইটি পরম্পরা-প্রাপ্ত শ্লোক আছে, অথবা 'ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ'—এই বিষয়ে এই শ্লোকগুলি আছে,—এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীতি হয় যে, নাট্যরস-সম্পর্কে তাঁহার পূর্বেও কিছু আলোচনা এবং তত্ত্ব-নির্ধারণ হইয়াছিল। নাট্যরসের আলোচনা-কাল তাই ভরতমুনি অপেক্ষাও প্রাচীন, পাণিনি-ব্যাকরণে নটসূত্র-কর্তার উল্লেখ থাকায় এই মত আরও দৃঢ় হয়।

এই নাট্যরসকেই পরবর্তী আচার্যগণ কাব্যরস স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সর্বপ্রথমে ধ্বনি-কার দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্যের প্রয়োগ-স্থল বুঝাইতে গিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ কারিকায় রসের উল্লেখ করিয়াছেন এবং রস-ধ্বনিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিশেষ কোন ব্যাখ্যান উপস্থিত না করিয়া তিনি নাট্যরসকেই নাট্য ও কাব্যের রস বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন এবং কেবল রস-শব্দ দ্বারা উভয়ের নির্বচন করিয়াছেন।

এই বিষয়ে আনন্দবর্ধন স্পষ্টতঃ ভরতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং রস-সম্পর্কে নাট্য ও কাব্যকে একই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। আনন্দবর্ধন লিখিতেছেন,—

এতচ্চ রসাদি তাৎপর্যেণ কাব্যনিবন্ধনং ভরতাদাবপি সুপ্রসিদ্ধমেব।

—ধ্বন্যালোক, ৩৩।২, বৃত্তি

—'রসাদির তাৎপর্য লইয়া এই কাব্য-রচনা ভরত-প্রভৃতির গ্রন্থেও সুপ্রসিদ্ধ আছে।'

আবার,—

বৃত্তয়ো হি রসাদি তাৎপর্যেণ সংনিবেশিতাঃ কামপি নাট্যস্য কাব্যস্য চ ছায়ামাবহন্তি। রসাদয়ো হি দ্বয়োরপি তয়ো জীবভূতাঃ।—ধ্বন্যালোক, ৩।৩৩, বৃত্তি

—'বৃত্তিসমূহ রসাদির উপযোগিতানুসারে সংনিবেশিত হইয়া নাট্যের ও কাব্যের রমণীয় কান্তি জন্মাইতেছে। রসাদি ঐ দুইয়েরই জীবভূত।'

উল্লিখিত উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, আনন্দবর্ধন কেবলমাত্র ভরতমুনির নাট্য-রসকে যে কাব্যরস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি রস যেমন নাট্যের প্রাণ, তেমনই কাব্যেরও প্রাণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ধ্বনি-কার কিন্তু এরূপ মন্তব্য কখনও করেন নাই। রসতত্ত্বের প্রধান ব্যাখ্যাতা অভিনবগুপ্তের অভিমত আলোচনা করিবার পূর্বে ভামহ প্রভৃতি আদি অলঙ্কারাচার্যগণ কাব্যে নাট্যরসের প্রয়োগ সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর লেখক ভামহ কাব্যে ভরত-ব্যাখ্যাত নাট্যরসের প্রয়োগ-বিষয়ে প্রতিকূল ধারণা পোষণ করিতেন বলিয়া মনে হয়। তিনি কাব্যে এই রসকে অলঙ্কার বলিয়া গণ্য করিয়াছেন এবং প্রেয়ঃ, রসবৎ ও উর্জস্বি এই তিনটি অলঙ্কারে অতি সাধারণ ভাবে উহার আলোচনা শেষ করিয়াছেন।

অষ্টম শতাব্দীতে আচার্য দণ্ডী ভামহের ন্যায় রসকে কাব্যে অলঙ্কাররূপে গণ্য করিলেও রসবৎ অলঙ্কারের ব্যাখ্যায় তিনি চমৎকার শ্লোক রচনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ আটটি রসেরই উদাহরণ দিয়াছেন। স্থায়ী ভাব যে রসতা প্রাপ্ত হয়, এ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা স্পষ্ট ছিল বলিয়াই মনে হয়। এ মনোভাব অনেকখানি অনুকূল।

অষ্টম ও নবম শতাব্দীর লেখক বামনাচার্য রসকে কাব্যের অলঙ্কার নয়, একটি প্রধান গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; গুণটির নাম দিয়াছেন তিনি কান্তি,—

দীপ্তরসত্বং কান্তি —কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি, ৩।২।১৪

—'রসের দীপ্তি বা প্রকাশই কান্তি।'

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বামন নাট্যরসের কথা ভাল ভাবেই জানিতেন, কারণ তিনি সন্দর্ভ-সমূহের মধ্যে দশরূপক[১] অর্থাৎ নাটককে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন।

নবম শতাব্দীর লেখক ভট্ট উদ্ভট ভামহের ন্যায় রসকে কাব্যে অলঙ্কার বলিয়া মনে করিলেও, তাঁহার রচনায় শুধু রস নয়, স্থায়ী ভাব, সঞ্চারী ভাব, বিভাব এবং প্রসিদ্ধ আটটি রস ও শান্তরসের উল্লেখ দেখা যায়।

নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে রুদ্রট কাব্যে নাট্যরসের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়া লিখিলেন,—কাব্যমাত্রেই বিবিধ রস থাকা চাই, নতুবা কাব্য শাস্ত্রবৎ নীরস

---

(১) দশরূপক অর্থ দশবিধ রূপক। রূপকের প্রতিশব্দ ইংরেজী drama বা নাট্য, নাটক নহে। সংস্কৃতে নাটক হইতেছে দশ প্রকার রূপকের এক বিশিষ্ট প্রকার রূপক। বাঙ্গালায় রূপক অর্থে নাট্য শব্দের সঙ্গে ভুলে নাটক শব্দ চলিয়া গিয়াছে।

হইয়া যাইবে এবং লোকে কাব্যপাঠে ভয় পাইবে। এই বলিয়া তিনি আটটি নাট্যরসের সহিত শান্ত ও প্রেয়ঃ নামে আর দুইটি রসের উল্লেখ করিলেন এবং শৃঙ্গার রস ও তাহার নায়কাদি-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিলেন। রুদ্রট শব্দার্থকে কাব্য বলিলেও কাব্যের রসবত্তা স্বীকার করিয়াছিলেন, পূর্ববর্তীদের ন্যায় নাট্যরসকে কাব্যে কেবলমাত্র অলঙ্কার বা গুণ বলেন নাই। অবশ্য রুদ্রটের রচনায়ও রস-সম্বন্ধে কোন গভীর আলোচনা পাওয়া যায় না। পণ্ডিতগণের মতে আনন্দবর্ধন রুদ্রটের সমসাময়িক এবং তিনি ধ্বনিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রসবাদকে সর্ব-প্রাধান্য দান করিলেন।

পরবর্তী কালে একাদশ শতাব্দীতে অভিনবগুপ্ত তাঁহার অভিনব-ভারতী ভাষ্যে ভরতমুনির নাট্যরস বুঝাইতে গিয়া নাট্যরস ও কাব্যরস যে বস্তুতঃ এক, এই মত প্রচার করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

নাট্যাৎ সমুদায়রূপাদ্ রসাঃ যদি বা নাট্যমেব রসাঃ, রসসমুদায়ো হি নাট্যম্। ন নাট্যে এব চ রসাঃ, কাব্যেঽপি, নাট্যায়মান এব রসঃ, কাব্যার্থবিষয়ে হি প্রত্যক্ষকল্পসংবেদনোদয়ে রসোদয় ইত্যুপাধ্যায়াঃ। যদাহুঃ কাব্যকৌতুকে—

প্রয়োগত্বম্ অনাপন্নে কাব্যে নাস্বাদসম্ভবঃ। ইতি
বর্ণনোৎকলিকাভোগ-প্রৌঢ়োক্ত্যা সম্যগর্পিতাঃ।
উদ্যান-কান্তা-চন্দ্রাদ্যা ভাবাঃ প্রত্যক্ষবৎস্ফুটাঃ॥ ইতি

অন্যে তু কাব্যেঽপি গুণালঙ্কার-সৌন্দর্যাতিশয়কৃতং রসচর্বণম্ আহুঃ।

বয়ং তু ব্রূমঃ—কাব্যং তাবন্ মুখ্যতো দশরূপকাত্মকমেব। তত্রহি উচিতৈ-র্ভাষাবৃত্তিকাকুনৈপথ্য-প্রভৃতিভিঃ পূর্যতে চ রসবত্তা। সর্গবন্ধাদৌ হি নায়িকায়া অপি সংস্কৃতা এব উক্তি রিত্যাদি বহুতরম্ অনুচিতং কেবলং শক্তিরহিতত্বাদ্ ব্যাবর্ণ্যতে, তাবতীব হৃদ্যম্ ইতি ন্যায়েন অনৌচিত্যং ন প্রতিভাতি। তত এব উচ্যতে সন্দর্ভেষু দশরূপকমিতি। যে স্বভাবতো নির্মলমুকুরহৃদয়া স্তে এব সংসারোচিত-ক্রোধ-মোহাভিলাষ-পরবশ-মনসো ন ভবন্তি। তেষাং তথাবিধ-দশরূপকাকর্ণন-সময়ে সাধারণরসনাত্মক-চর্বণগ্রাহ্যো রস-সঞ্চয়ো নাট্যলক্ষণস্ফুট এব। যে তু অতথাভূতা স্তেষাং প্রত্যক্ষোচিত-তথাবিধ-চর্বণা-লাভায় নটাদি-প্রক্রিয়া, স্বগত-ক্রোধ-শোকাদি-সঙ্কট-হৃদয়-গ্রন্থি-ভঞ্জনায় গীতাদি-প্রক্রিয়া চ মুনিনা বিরচিতা। সর্বানুগ্রাহকং হি শাস্ত্রমিতি ন্যায়াৎ তেন নাট্যে এব রসা ন লোকে ইত্যর্থঃ। কাব্যং চ নাট্যমেব।

—নাট্যশাস্ত্র, ৬৷৩৬, ভাষ্য, পৃঃ ২৯১-২৯২

—'সমগ্ররূপ নাট্য হইতে রস-সমূহের উৎপত্তি হয়; অথবা নাট্যই রস, রসই নাট্য। রসসমূহ কেবল নট্যে নয়, কাব্যেও বর্তমান। রস নাট্যায়মান হয়, অর্থাৎ নাট্যে যেরূপ, সেইরূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ উপাধ্যায় বলিয়াছেন,—কাব্যবর্ণিত বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষের ন্যায় জ্ঞানোদয় হইলে রসোদয় হইয়া থাকে। কাব্যকৌতুকে বলা হইয়াছে,—

'নাটকের ন্যায় অনুভূত না হইলে কাব্যে আস্বাদ সম্ভব হয় না। উদ্যান, কান্তা, চন্দ্র প্রভৃতি বস্তুর বর্ণনা, বিলাস, পরিপূর্ণতা নিপুণভাষায় প্রযুক্ত হইলে বিষয়গুলি প্রত্যক্ষের ন্যায় পরিস্ফুট হয়।"

'অবশ্য কেহ কেহ বলিয়াছেন, কাব্যেও গুণ, অলঙ্কার ও সৌন্দর্যের আতিশয্য হইতেই রসের চর্বণ হইয়া থাকে।

'আমরা কিন্তু বলিতেছি,—

'কাব্য মুখ্যতঃ নাট্যস্বভাবসম্পন্ন। সেখানে সমুচিত ভাষা, বৃত্তি, কাকু এবং নেপথ্য-বিধান প্রভৃতি দ্বারা রসবত্তা পূর্ণ হইয়া থাকে। মহাকাব্য প্রভৃতিতে নায়িকার উক্তিও সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ হয়। এইরূপ বহুতর অনুচিত বিষয় কেবল উপায় নাই বলিয়া সেখানে বর্ণিত হইয়া থাকে। যাহা পাওয়া গেল, উহাই সুন্দর,—এই ন্যায়ানুসারে অনৌচিত্য প্রতিভাত হয় না। সেই জন্যই বলা হইয়া থাকে,—'সন্দর্ভসমূহের মধ্যে দশরূপক শ্রেষ্ঠ।' যাহাদের হৃদয় স্বভাবতঃ নির্মলদর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, তাহাদের মন সংসারোচিত ক্রোধ মোহ ও অভিলাষের বশ হয় না। তাহাদের নাট্য শ্রবণের সময়ে সাধারণ রসনাত্মক চর্বণের ফলে যে রস-সঞ্চয় হয়, তাহাতে নাট্যলক্ষণ স্ফুট হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা তদ্রূপ নহেন, তাহাদের তাদৃশ প্রত্যক্ষবৎ চর্বণা-লাভের নিমিত্ত নটাদির প্রক্রিয়া এবং আত্ম-গত ক্রোধ-শোক-শঙ্কুল হৃদয়গ্রন্থি ভাঙ্গিবার নিমিত্ত গীতাদির প্রক্রিয়া মুনি-কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে। শাস্ত্র সকলকেই অনুগ্রহ করে,—এই ন্যায়ানুসারে নাট্যেই রস-সমূহের অবস্থান, লোকে নয়;—ইহাই বলা হইতেছে। কাব্য তো নাট্যই।'

আচার্য অভিনবগুপ্তের দীর্ঘ ব্যাখ্যান হইতে জানা গেল নাট্যরস ও কাব্যরস এক কিনা এই বিষয়ে উপাধ্যায়গণ পূর্বেও অনেক আলোচনা করিয়াছেন এবং স্থির করিয়াছেন উভয়ই এক। এই সিদ্ধান্তের কারণ-স্বরূপ তাঁহারা বলিয়াছেন যে, কাব্য শ্রবণ বা পাঠের সময়ে সহৃদয় সামাজিকের মানস-নয়নে কাব্যার্থসমূহ প্রায় প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে; এবং তাহারই ফলে রসোদয় হয়। এই বিষয়ে

তিনি স্বীয় আচার্য ভট্টতৌত-প্রণীত কাব্যকৌতুক গ্রন্থ হইতে স্বীয় অনুকূল মতও তুলিয়া দিয়াছেন। পরবর্তী অংশে অভিনবগুপ্ত বামনের অভিমত তুলিয়া দশরূপকের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বুঝাইয়াছেন। বামন লিখিতেছেন,—

সন্দর্ভেষু দশরূপকং শ্রেয়ঃ।
তদ্ধি চিত্রং চিত্রপটবদ্ বিশেষ-সাকল্যাৎ॥

—কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি, ১।৩।৩০,৩১

—'সন্দর্ভ-সমূহের মধ্যে দশরূপকই শ্রেষ্ঠ। বৈশিষ্ট্য-সমূহ সমগ্ররূপে থাকায় তাহা চিত্রপটের ন্যায় বিচিত্র।'

প্রেক্ষাগৃহে প্রেক্ষকের নয়নে সকল বিষয় চিত্রপটের ন্যায় আবির্ভূত হওয়ায় দশরূপক অর্থাৎ নাটকসমূহের শ্রেষ্ঠতা। অভিনবগুপ্ত বলেন, যাঁহাদের হৃদয় স্বভাবতঃ নির্মল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, চিত্ত ক্রোধ-মোহ-মুক্ত, নাটক শ্রবণেও তাঁহারা অভিনয় দর্শনের ন্যায় পরিস্ফুটরূপে রসাস্বাদ পাইয়া থাকেন। যাঁহারা তদ্রূপ যোগ্যতা-সম্পন্ন নহেন, তাঁহাদের নিমিত্তই অভিনয়ের ব্যবস্থা এবং নৃত্য-গীতের ব্যবস্থা।

অভিনবগুপ্তের উক্ত ব্যাখ্যান হইতে আরও বুঝা গেল, তাঁহার মতে—

কাব্যং তাবন্ মুখ্যতো দশরূপকাত্মকমেব।
কাব্যং চ নাট্যমেব।

—'কাব্য প্রধানতঃ দশরূপক বা নাটকসমূহের স্বভাব-সম্পন্ন। কাব্য বস্তুতঃ নাট্যই।'

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কাব্য বলিতে সেই যুগে কেবলমাত্র মহাকাব্য বা আখ্যান-কাব্য বুঝাইত, যাহাতে নাটকের ন্যায় নর-নারীর প্রেম বা বিদ্বেষ প্রভৃতির বশে বিচিত্র সংস্পর্শ বা সংঘর্ষের জন্য ঘটনা মুখ্য হইয়া রস-নিষ্পত্তি করিত। স্তব বা গীত-সমূহও নাটক নয় বলিয়া এই বিচারে কাব্য-পদ-বাচ্য হইতে পারে না। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক বা কুমারসম্ভব কাব্য অখণ্ডদৃষ্টিতে নাটক বা কাব্য হইলেও খণ্ডদৃষ্টিতে তাহাদের অন্তর্গত নিসর্গকবিতা, স্বভাবোক্তি, কিংবা বক্রোক্তিসমূহ, যাহাদিগকে আমরা দীপ্তি-কাব্য বলিয়াছি, এই বিচারে কাব্যপদবাচ্য হইতে পারে না। অভিনবগুপ্তের আবির্ভাবকাল একাদশ শতাব্দী বলিয়া ধরিয়া লইলেও এই মন্তব্য অ-সাবধান মুহূর্তের মন্তব্য বলিয়াই মনে হয়। নাট্যের প্রাণ রস, তাহাতে সন্দেহ নাই। আখ্যানমূলক নাট্যভাবাশ্রয়ী কাব্যসমূহের প্রাণও রস, তাহাও

আমরা স্বীকার করি। কিন্তু যাবতীয় কাব্যই 'দশরূপকাত্মক' এবং কাব্যমাত্রেরই প্রাণ রস, এই অভিমত অশ্রদ্ধেয়। এই সম্বন্ধে আমাদের মত প্রথম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, পরেও বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

আমরা দেখিলাম ভরতমুনির নাট্যরসের ব্যাখ্যানের পর ধ্বনিকার, আনন্দবর্ধন এবং পরে অভিনবগুপ্ত কাব্যরসকেও সর্বথা উহার সদৃশ মনে করিয়া একই রস-শব্দ দ্বারা উভয়কে বুঝাইয়াছেন। অভিনবগুপ্ত আবার কাব্য বলিতে কেবলমাত্র আখ্যানমূলক কাব্যের কথাই বুঝিয়াছেন, অন্যবিধ কাব্য থাকিতে পারে, এই চিন্তা তাঁহার মনে আসে নাই। অভিনবগুপ্তের প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে আনন্দবর্ধন কিন্তু কেবল মহাকাব্য নয়, আমরা যাহাকে গীতিকাব্য বা নিসর্গকাব্য বলি, তাহার রসবত্তা-বিষয়ও লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন,—

নাস্ত্যেব তদ্‌বস্তু যদ্ অভিমত-রসাঙ্গতাং নীয়মানং ন প্রগুণীভবতি। অচেতনা অপি হি ভাবা যথাযথম্ উচিত-রস-ভাবতয়া চেতনা-বৃত্তান্ত-যোজনয়া বা ন সন্ত্যেব তে যে যান্তি ন রসাঙ্গতাম্। —ধ্বন্যালোক, ৩।৪৩, বৃত্তি

—'এমন বস্তুই নাই যাহাতে অভিলষিত রসের স্পর্শ দিলে প্রকৃষ্ট গুণশালী না হয়। অচেতন বিষয়সমূহও যথাযথরূপে সমুচিত রস-ভাব দ্বারা অথবা চেতনবৃত্তান্ত-যোজনা দ্বারা শোভিত হইলে এমন হইতে পারে না, যাহাতে রসাঙ্গতা না পায়।'

আনন্দবর্ধনের মতে রসের জন্য যে কোন বস্তু, এমন কি অচেতন বস্তুও অবলম্বিত হইতে পারে। তাহা হইলে রস বলিতে কেবল নাট্যরস নয়, মহাকাব্য বা আখ্যান-কাব্যের রসও নয়, বিচিত্র গীতিকাব্যের রসও বুঝাইতে পারে। পরবর্তী আচার্য মম্মটভট্টও রসের সংজ্ঞায় "নাট্য-কাব্যয়োঃ"—নাট্য ও কাব্য এই উভয়ের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আগে নাট্য, পরে কাব্য। ভরতমুনির ব্যাখ্যাত নাট্যরস হইতেই কাব্যরসের উৎপত্তি, অথবা, নাট্যরসের ব্যাখ্যার প্রসারেই কাব্যরসের অন্তর্ভাব।

ভরতমুনির সময় ধরিলেও রস-বাদের উৎপত্তিকাল প্রায় দুই সহস্র বৎসর। তাহার পর শ্রীশঙ্কুক প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিলেও রসবাদ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিতে থাকে। পূর্বে দেখান হইয়াছে, ভামহ, দণ্ডী, বামন প্রভৃতি অলঙ্কারাচার্যগণ রসবাদ-সম্পর্কে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই; কাব্য-রচনায় রসের সার্থকতা বা তাৎপর্য যে তাঁহারা বিশেষ করিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহাও মনে হয় না। প্রায় সহস্র বৎসর পরে নবম শতাব্দীতে রসবাদকে উজ্জ্বল করিয়া তুলেন ধ্বনিবাদিগণ।

আনন্দবর্ধন নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রেষ্ঠ ধ্বনি রস-ধ্বনি এবং উহাই কাব্যের আত্মা এই মত প্রচার করেন। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আচার্য অভিনবগুপ্ত ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের অভিনবভারতী ভাষ্য রচনা করিয়া এবং ধ্বন্যালোকের মূলকারিকা ও আনন্দবর্ধন-কৃত বৃত্তির লোচন নামক টীকা রচনা করিয়া স্বীয় অন্তর্দৃষ্টি, রসজ্ঞতা ও মনীষা-বলে রসবাদকে নিঃসংশয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আরও প্রবলতার সহিত রসকেই কাব্যের আত্মা বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রীমম্মটভট্ট আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তকে অনুসরণ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থে রসকেই অলঙ্কারশাস্ত্রের মুখ্যবস্তু বলিয়া বর্ণনা করেন। এই গ্রন্থের আদর ও প্রচলন ভারতব্যাপী। ইহার পরে প্রায় সকল আলঙ্কারিক পণ্ডিতই মম্মটের মতানুসরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে দুই জন মনীষীর নাম উল্লেখযোগ্য,—ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ শতাব্দীর লেখক সাহিত্যদর্পণ-প্রণেতা কবিরাজ বিশ্বনাথ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর লেখক রসগঙ্গাধর-প্রণেতা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ। এই প্রসঙ্গে কবিকর্ণপূর গোস্বামী ওরফে শ্রীপরমানন্দদাস সেনের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি অলঙ্কারকৌস্তুভ প্রণয়ন করেন, ইহাতে রস-তত্ত্বের স্বরূপ-ব্যাখ্যানে তিনি নির্মল প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইনি বাঙ্গালী ছিলেন। জগন্নাথ তাঁহার পরবর্তী; জগন্নাথের পর রস-সম্বন্ধে বা কাব্য-শাস্ত্র-সম্বন্ধে কেহ কোন উল্লেখযোগ্য চিন্তা করেন নাই। উল্লিখিত পণ্ডিতগণের মধ্যে আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত এবং মম্মটভট্ট এই তিন প্রধান আচার্যই কাশ্মীরের অধিবাসী; তাঁহাদেরই দান ধ্বনিবাদ ও বর্তমান রসবাদ।

২

ভরতমুনি-কথিত নাট্যরস ও রসের বিবিধ ব্যাখ্যা

রস-সম্বন্ধে জটিল আলোচনা অবতারণা করিবার পূর্বে ভরতমুনির সহজ সরল উক্তি কয়টি আগে উল্লেখ করা যাইতেছে।

মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

যে রসা ইতি পঠ্যন্তে নাট্যে নাট্য-বিচক্ষণৈঃ।
রসত্বং কেন বৈ তেষাম্ এতদ্ আখ্যাতুম্ অর্হসি ॥—নাট্যশাস্ত্র, ৬।২

—'নাট্য-বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ নাট্য-শাস্ত্রে যে রস-সমূহের কথা পাঠ করেন, তাহাদের রসত্ব কেন, আমাদিগকে বলুন।'

ভরতমুনি বলিলেন,—

শৃঙ্গার-হাস্য-করুণা রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥ —নাট্যশাস্ত্র, ৬।১৬

—'শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত নামক আটটি রস নাট্যশাস্ত্রে পণ্ডিতগণ স্মরণ করিয়া থাকেন।'

তাহার পর ভরত আটটি রসের আটটি স্থায়ী ভাবের কথা বলিলেন,—

রতি র্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥ —নাট্যশাস্ত্র, ৬।১৮

—'রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময় এই আটটি স্থায়ী ভাব বলিয়া প্রকীর্তিত হইয়া থাকে।

তাহার পর তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব ও আটটি সাত্ত্বিক ভাবের কথা উল্লেখ করিয়া মুনি ক্রমে রসের ব্যাখ্যান করিলেন,—

নহি রসাদ্ ঋতে কশ্চিদ্ অর্থঃ প্রবর্ততে।
তত্র বিভাবানুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগাদ্ রস-নিষ্পত্তিঃ।—নাট্যশাস্ত্র ৬।৩৪

—'রস ভিন্ন কোন বিষয় প্রবর্তিত হয় না। সেই নাট্য-বিষয়ে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।'

এই শেষ বাক্যটির ব্যাখ্যায় ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রের বহু পৃষ্ঠা ব্যয়িত হইয়াছে এবং তাহার প্রতিপৃষ্ঠার প্রতিপংক্তিতে ভারতীয় মনীষার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই একটি সরল ও ক্ষুদ্র বাক্যই রসবাদের মূল ভিত্তি। পণ্ডিত শ্রীভট্ট লোল্লট পূর্বমীমাংসা দর্শনের মতানুসারে, শ্রীশঙ্কুক ন্যায়দর্শনের মতানুসারে এবং শ্রীভট্টনায়ক সাংখ্য-দর্শনের মতানুসারে বাক্যটির দীর্ঘ ও জটিল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশেষে আচার্য অভিনবগুপ্তপাদ প্রজ্ঞা ও রসজ্ঞান-পূর্ণ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই পরবর্তিগণ কর্তৃক অলঙ্কার-মত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। 'রসের নিষ্পত্তি'—এই বাক্যের 'নিষ্পত্তি' শব্দ লইয়াই যত গোল বাধিয়াছে। ঐ শব্দটির অর্থ উক্ত আচার্যগণ যথাক্রমে 'উৎপত্তি', 'অনুমিতি', 'ভুক্তি' এবং 'অভিব্যক্তি' বলিয়া ধরিয়া লইয়া স্বমত-প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছেন। আচার্য অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যা এবং তদনুসারে রচিত কবিরাজ বিশ্বনাথ এবং পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের ব্যাখ্যা

অনেকটা বেদান্ত-অনুযায়ী। আমাদের অভিমত পুনরায় এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হইবে, ইহা সম্পূর্ণ বেদান্ত-মতানুসারেই কল্পিত হইয়াছে। ভট্ট লোল্লট প্রভৃতি আচার্যগণের অভিমত অভিনবগুপ্ত খণ্ডন করিয়াছেন, আমরাও সমর্থন করি না, এই জন্য এখানে আর দেওয়া হইল না। অভিনবগুপ্তের মতের সমালোচনা-সূত্রে আমরা আমাদের মত উপস্থিত করিব।

অভিনবগুপ্তের সরণি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন মম্মটভট্ট। তাঁহার কাব্য-প্রকাশ গ্রন্থে রসের কারিকার ব্যাখ্যায় তিনি শ্রীমদাচার্য অভিনবগুপ্তপাদের অভিমত বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা প্রথমে তাহা তুলিয়া রসের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা পাইব।

মম্মটের মূল কারিকা দুইটি এই :—

কারণান্যথ কার্যাণি সহকারীণি যানি চ।
রত্যাদেঃ স্থায়িনো লোকে তানি চেন্নাট্য-কাব্যয়োঃ ॥
বিভাবা অনুভাবাশ্চ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ।
ব্যক্তঃ স তৈ র্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ ॥

—কাব্যপ্রকাশ, ৪।২৭, ২৮

—'লোকে যাহা রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের কারণ, কার্য বা সহকারী, তাহাই যদি নাট্যে ও কাব্যে বর্তমান থাকে, তবে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব বলিয়া কথিত হয়; সেই বিভাবাদি দ্বারা ব্যক্ত স্থায়ী ভাবই রস বলিয়া স্মৃত।'

কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আগে দেওয়া প্রয়োজন; বিশদ ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হইবে।

রতি, শোক, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি যে সমুদয় ভাব মানবচিত্তে স্বতন্ত্র ও স্থায়ী ভাবে বর্তমান, তাহাদিগকে বলে স্থায়ী ভাব। শকুন্তলানাটকে স্থায়ী ভাব রতি।

স্থায়ী ভাবের যাহা কারণ, কাব্যে তাহাকে বলে বিভাব। শকুন্তলানাটকে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা আলম্বন বিভাব এবং মালিনী-তীর, পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব।

স্থায়ী ভাবের যাহা কার্য, কাব্যে তাহাকে বলে অনুভাব। শকুন্তলানাটকে নায়ক-নায়িকার দীর্ঘনিঃশ্বাস, কটাক্ষ প্রভৃতি অনুভাব।

স্থায়ী ভাবের যাহা সহকারী ভাব, তাহাকে বলে ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব। শকুন্তলানাটকে চিন্তা, দৈন্য, উদ্বেগ, স্মৃতি, ব্রীড়া, হর্ষ, আবেগ প্রভৃতি ভাব, যাহা

চিত্তে একবার উদিত হয় ও আবার বিলীন হয়, কিন্তু সর্বদাই মূল ভাবের পোষকতা করে, তাহারা স্থায়ী ভাবের অভিমুখে বিচরণ বা সঞ্চরণ করে বলিয়া ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব।

মূল সংজ্ঞায় আমরা পাইলাম,—

নাট্যে বা কাব্যে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব দ্বারা ব্যক্ত স্থায়ী ভাবই রস।

পূর্বে ভরতমুনি বলিয়াছেন,—বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রস-নিষ্পত্তি হয়।

ভরতমুনির ব্যবহৃত 'নিষ্পত্তি' শব্দ মম্মটের সংজ্ঞায় 'ব্যক্তি' বা 'ব্যক্ত' হইয়া গিয়াছে; আর বিশেষ পার্থক্য নাই। ব্যক্ত অর্থ প্রকাশিত।

মম্মটভট্ট এখন অভিনবগুপ্তের মত বলিয়া রসের ব্যাখ্যান করিতেছেন,—

লোকে প্রমদাদিভিঃ স্থায্যনুমানে অভ্যাসপাটববতাং কাব্যে নাট্যে চ তৈরেব কারণত্বাদি-পরিহারেণ বিভাবনাদি-ব্যাপারবত্ত্বাদ্ অলৌকিক-বিভাবাদি-শব্দ-ব্যবহার্যৈর্মমৈবৈতে শত্রোরেবৈতে তটস্থস্যৈবৈতে, ন মমৈবৈতে ন শত্রোরেবৈতে ন তটস্থস্যৈবৈতে ইতি সম্বন্ধবিশেষ-স্বীকার-পরিহার-নিয়মানধ্যবসায়াৎ সাধারণ্যেন প্রতীতৈ রভিব্যক্তঃ সামাজিকানাং বাসনাত্মতয়া স্থিতঃ স্থায়ী রত্যাদিকো নিয়তপ্রমাতৃ-গতত্বেন স্থিতোঽপি সাধারণোপায়-বলাৎ তৎকাল-বিগলিত-পরিমিত-প্রমাতৃভাব-বশোন্মিষিত-বেদ্যান্তর-সম্পর্কশূন্যাপরিমিতভাবেন প্রমাত্রা সকল-সহৃদয়-সংবাদভাজা সাধারণ্যেন স্বাকার ইব অভিন্নোঽপি গোচরীকৃতশ্চর্ব্যমাণতৈকপ্রাণো বিভাবাদিজীবিতাবধিঃ পানকরস-ন্যায়েন চর্ব্যমাণঃ পুর ইব পরিস্ফুরন্ হৃদয়মিব প্রবিশন্ সর্বাঙ্গীণমিব আলিঙ্গন্ অন্যৎ সর্বমিব তিরোদধদ্ ব্রহ্মানন্দাস্বাদমিব অনুভাবয়ন্ অলৌকিকচমৎকারকারী শৃঙ্গারাদিকো রসঃ।

স চ ন কার্যঃ, বিভাবাদিবিনাশেঽপি তস্য সম্ভব-প্রসঙ্গাৎ। নাপি জ্ঞাপ্যঃ সিদ্ধস্য তস্য অসম্ভবাৎ, অপিতু বিভাবাদিভির্ব্যঞ্জিতশ্চর্বণীয়ঃ। কারক-জ্ঞাপকাভ্যাম্ অন্যৎ ক্ব দৃষ্টমিতি চেৎ, ন ক্বচিদ্ দৃষ্টম্ ইত্যলৌকিকসিদ্ধের্ভূষণমেতৎ, ন দূষণম্। চর্বণা-নিষ্পত্ত্যা তস্য নিষ্পত্তিরুপচরিতা ইতি কার্যোঽপ্যুচ্যতাম্। লৌকিক-প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-তাটস্থ্যাববোধশালি-পরিমিত-যোগি-জ্ঞান-বেদ্যান্তর-সংস্পর্শরহিত-স্বাত্মমাত্রপর্যবসিত-পরিমিতেতরযোগি-সংবেদন-বিলক্ষণ-লোকোত্তর-স্বসংবেদন-গোচর ইতি প্রত্যয়োঽভিধীয়তাম্। তদ্‌গ্রাহকং চ প্রমাণং ন নির্বিকল্পকম্, বিভাবাদি-পরামর্শ-প্রধানত্বাৎ। নাপি সবিকল্পকম্, চর্ব্যমাণস্য অলৌকিকানন্দময়স্য তস্য স্বসংবেদন-

সিদ্ধতাৎ। উভয়াভাব-স্বরূপস্ত চ উভয়াত্মকত্বমপি পূর্ববৎ লোকোত্তরতামেব গময়তি, নতু বিরোধম্ ইতি

শ্রীমদাচার্যাভিনবগুপ্তপাদাঃ।—কাব্যপ্রকাশ, ৪।২৮ বৃত্তি

বলা বাহুল্য উদ্ধৃত অংশের আক্ষরিক অনুবাদ হয় না। আবশ্যকস্থলে স্বল্প ব্যাখ্যান-সহ ভাগে ভাগে অনুবাদ করিয়া বুঝান হইতেছে।

শ্রীমৎ আচার্য অভিনবগুপ্তপাদ বলেন,—

(১) লোকে প্রমদা প্রভৃতি হইতে স্থায়ী ভাবের অনুমান অভ্যাস করিয়া যাঁহারা পটু হইয়াছেন, এইরূপ সামাজিকগণের চিত্তে বাসনা-রূপে বর্তমান রতিপ্রভৃতি স্থায়ী ভাব সাধারণ ভাবে প্রতীত বিভাবাদি দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া শৃঙ্গারাদি রস হয়।

(২) প্রমদা প্রভৃতি লোকে স্থায়ী ভাবের কারণ, কার্য ও সহকারী রূপে পরিচিত হইলেও, কাব্যে এবং নাট্যে কারণত্ব প্রভৃতি পরিহার করিয়া তাহারা বিভাবনা-প্রভৃতি ব্যাপার-হেতু অলৌকিক বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব শব্দ দ্বারা ব্যবহার্য হয়।

(৩) এই বিভাবাদি 'ইহারা আমার', 'ইহারা শত্রুর', 'ইহারা তটস্থের', অথবা 'ইহারা আমার নহে', 'ইহারা শত্রুর নহে', 'ইহারা তটস্থের নহে'—এইরূপ সম্বন্ধ-বিশেষের স্বীকার অথবা পরিহার-নিয়মের আগ্রহাভাব বা অনাবশ্যকতা-হেতু সাধারণ ভাবে প্রতীত হইয়া থাকে।

সামাজিকগণের বাসনারূপে স্থিত রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব সর্বদা প্রমাতার হইলেও সাধারণোপায়-বলে অর্থাৎ সাধারণীকরণ-রূপ ব্যাপার দ্বারা তৎকালে পরিমিত প্রমাতৃ-ভাবকে বিগলিত করে; তখন তাহার বশে অন্য বেদ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্ক-শূন্য হইয়া উন্মিষিত হয় প্রমাতার অ-পরিমিত ভাব বা সাধারণ ভাব। তিনি তখন সকল সহৃদয় জনের সহিত একরূপতা প্রাপ্ত হন।

(৪) সাধারণীকরণ-হেতু ঐ স্থায়ী ভাব অভিব্যক্ত হইয়া স্বীয় আকারের ন্যায় অভিন্ন হইলেও রসরূপে গোচরীকৃত হয়, চর্ব্যমাণতা বা আস্বাদ্যমানতাই তাহার এক মাত্র প্রাণ; যতক্ষণ বিভাব প্রভৃতি, ততক্ষণ তার জীবন, তাহা পানকরসের ন্যায় চর্ব্যমাণ হইতে থাকে। তখন মনে হয়, উহা যেন পুরোভাগে পরিস্ফুরিত হইতেছে, যেন হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে, যেন সর্ব অঙ্গই আলিঙ্গন করিতেছে, যেন অন্য সকল তিরোহিত করিয়া ব্রহ্মানন্দের আস্বাদের ন্যায় অনুভব দিতেছে, উহাই অলৌকিক চমৎকারকারী শৃঙ্গার প্রভৃতি রস।

(৫) তাহা অর্থাৎ রস কার্য নহে, অর্থাৎ বিভাবাদি দ্বারা উৎপন্ন হয় না; কারণ, বিভাবাদির বিনাশ হইলেও তাহা থাকিতে পারে। তাহা জ্ঞাপ্যও নয় অর্থাৎ বিভাবাদি দ্বারা জ্ঞাপিত হয় না, কারণ তাহা কখনও সিদ্ধ হয় না; বস্তুতঃ বিভাবাদি দ্বারা তাহা ব্যঞ্জিত হয় এবং তাহা চর্বণীয় বা আস্বাদনীয় হয়। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, "কারক ও জ্ঞাপকের বাহিরে অন্য কোথায়ও এইরূপ দেখা যায় কি?" আমাদের উত্তর এই,—"না, কোথাও দেখা যায় না; ইহা রসের অলৌকিকত্ব সিদ্ধ করে, ইহা রসের ভূষণই বটে, দূষণ হইতে পারে না।" আবার চর্বণার উৎপত্তি দ্বারা তাহারও উৎপত্তি হইতেছে বলিয়া তাহাকে কার্য বলা যাইতে পারে এবং লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে, অথবা অপরিপক্ক যোগীর জগদ্‌ভেদবিষয়ক জ্ঞান হইতে, কিংবা পরিপক্ক যোগীর বেদ্যান্তর-সংস্পর্শ-শূন্য আত্মমাত্র-বিষয়ক জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ ও লোকোত্তর স্ব-স্বরূপ জ্ঞানের গোচর বলিয়া জ্ঞাপ্যও বলা যাইতে পারে। বিভাবাদির সংযোগ প্রধান হওয়ায় তদ্বিষয়ক জ্ঞান নির্বিকল্প নয়। চর্ব্যমাণ হইলে তাহার অলৌকিক আনন্দময়ত্ব আত্মজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ হয় বলিয়া, তদ্বিষয়ক জ্ঞান সবিকল্পও নয়। উভয়বিধ জ্ঞানের অভাব থাকা সত্ত্বেও তাহা উভয়বিধ জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া পূর্ববৎ লোকোত্তরতা বা অলৌকিকত্বই বুঝায়, বিরোধ বুঝায় না।

ভরতমুনির একটি ছোট বাক্য-বীজ হইতে ফল-পল্লব-বহুল কি বৃহৎ বৃক্ষ উদ্গত হইয়াছে, এখন বুঝিতে পারা যায়। অভিনবগুপ্তই রসবাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা বলিয়া রসের স্বরূপ আলোচনায় তাঁহারই অভিমত বিশেষভাবে প্রণিধান ও পরীক্ষা করা আবশ্যক। অভিনব-কৃত ব্যাখ্যানকেই ৩১টি পদ্য-কারিকায় বিশ্বনাথ নিজ গ্রন্থ সাহিত্যদর্পণে স্থান দিয়াছেন।

রসের ব্যাখ্যানটি পূর্ব-নির্দিষ্ট ভাগ অনুযায়ী পরীক্ষা করা যাইতেছে :—

(১) যে সকল সামাজিক জগতে প্রমদা প্রভৃতির নানাবিধ কার্য দেখিয়া তাহাদের কারণস্বরূপ চিত্ত-গত ভাব অনুমান করিতে পারেন এবং এইরূপ অনুমান পুনঃপুনঃ অভ্যাস করিয়া পটু হইয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তেই বাসনারূপে বর্তমান রতি প্রভৃতি ভাব সহজে উদ্বুদ্ধ হয় এবং সহজে রসতাপ্রাপ্ত হয়। [বাসনা-লোক সম্বন্ধে আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

(২) এখানে বিভাবনা-ব্যাপারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

যে ব্যাপার দ্বারা পাঠক বা সামাজিকের চিত্তে লৌকিক জগতের রাম-সীতা-গত

রতি প্রভৃতি ভাব উদ্বুদ্ধ হইয়া বিভাবিত অর্থাৎ রসে পরিণত হয়, তাহার নাম বিভাবনা ব্যাপার।

তত্র বিভাবনং রত্যাদের্বিশেষেণ আস্বাদাঙ্কুর-যোগ্যতা-নয়নম্

—সাহিত্যদর্পণ, ৩।৪৬

—'বিভাবন হইতেছে রতি প্রভৃতির ভাবকে বিশেষ করিয়া আস্বাদ-রূপ অঙ্কুরে পরিণত করা।'

বিভাবনা ব্যাপার চলে বিভাব ও অনুভাবকে লইয়া। বিভাব কি? ভরতমুনি বলেন,—

বিভাবঃ কারণং নিমিত্তং হেতুরিতি পর্যায়াঃ। —নাট্যশাস্ত্র, ৭।৫

—'বিভাব, কারণ, নিমিত্ত, হেতু একই পর্যায়ের শব্দ।'

লৌকিক জগতে যাহা রতি প্রভৃতি ভাবের কারণ বা উদ্বোধক, নাট্যে বা কাব্যে নিবেশিত হইলে, তাহাকে বলে বিভাব। বিশ্বনাথ বলেন,—

রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্য-নাট্যয়োঃ। —সাহিত্যদর্পণ, ৩।৬৪

—'লোকে যাহা রতি প্রভৃতি ভাবের উদ্বোধক, কাব্যে ও নাট্যে তাহাই বিভাব নামে পরিচিত।'

ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,—

বিভাব্যন্তে আস্বাদাঙ্কুর-প্রাদুর্ভাবযোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে সামাজিক-রত্যাদিভাবাঃ এভিঃ ইতি বিভাবা উচ্যন্তে।

—'সামাজিক-গত রত্যাদি ভাব বিভাবিত হয় অর্থাৎ আস্বাদ-রূপ অঙ্কুরের উৎপত্তির যোগ্য করা হয় ইহাদের দ্বারা; তাই ইহারা বিভাব বলিয়া কথিত হয়।'

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে রামায়ণে রামসীতা, রাবণ প্রভৃতি বিভাব এবং শকুন্তলা-নাটকে দুষ্মন্তশকুন্তলা, দুর্বাসা প্রভৃতি বিভাব।

এই বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। মুখ্যতঃ যে বস্তু আলম্বন অর্থাৎ অবলম্বন করিয়া রস উৎপন্ন হয়, তাহা আলম্বন বিভাব। উল্লিখিত বিভাবগুলি যাহা নাট্যের বা কাব্যের নায়ক, নায়িকা বা প্রতিনায়ক, তাহা আলম্বন বিভাব। যে সকল অবস্থা বা বস্তু রসকে উদ্দীপিত করে অর্থাৎ রস-সৃষ্টির আনুকূল্য করে, তাহারা উদ্দীপন বিভাব। নায়ক-নায়িকা অর্থাৎ আলম্বন-বিভাব-সমূহের রূপ ও ভূষণ প্রভৃতি এক প্রকার উদ্দীপন বিভাব; এবং তাহাদের দেশ-কালের বিশিষ্ট আবেষ্টনী দ্বিতীয় প্রকার উদ্দীপন বিভাব। নায়ক-নায়িকার রূপ-সৌন্দর্য, অথবা মাল্য, চন্দন, বিচিত্র

বেশ ও ভূষা রতিভাবের উদ্দীপন বিভাব। এইরূপ পুষ্পিত কুঞ্জবন, কোকিল-কূজন, অথবা জ্যোৎস্না-রজনী, বসন্তকাল প্রভৃতিও উদ্দীপন বিভাব। এই উভয়বিধ বস্তুই শৃঙ্গার-মনোবৃত্তি বা রতিকে উদ্দীপিত, উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করে।

অনুভাব কাহাকে বলে ?

জগন্নাথ বলেন,—

যানি চ কার্যতয়া, তানি অনুভাব-শব্দেন। অনু পশ্চাদ্ ভাবঃ
উৎপত্তির্যেষাম্। অনুভাবয়ন্তি ইতি বা ব্যুৎপত্তেঃ। —রসগঙ্গাধর, ১।১৬

'যাহা আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব-রূপ কারণের কার্য বলিয়া খ্যাত, কাব্যে ও নাট্যে সেই সকলই অনুভাব শব্দ দ্বারা কথিত হয়।

—অনু অর্থাৎ কারণসমূহের পশ্চাৎ ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি যাহাদের, তাহারা অনুভাব। বিভাবসমূহের অন্তর্গত ভাবকে অনুভব করায় যাহারা, তাহারা অনুভাব।'

যাহা আলম্বন বিভাব অর্থাৎ নায়ক-নায়িকা প্রভৃতির কার্য, যে কার্য দ্বারা তাহাদের অন্তরের ভাবকে অনুভব করা যাইতে পারে, সেই সকলই অনুভাব। প্রসিদ্ধ অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবকে রতিভাবের অনুভাব বলা যাইতে পারে। ভরতমুনি এই সাত্ত্বিক ভাবের গণনা করিয়াছেন;—

স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥ —নাট্যশাস্ত্র, ৬।২৩

—'স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু বা কম্পন, বিবর্ণতা, অশ্রু ও মূর্ছা এই আটটি ভাব সাত্ত্বিক বা সত্ত্বগুণজ বলিয়া কথিত হয়।'

এইরূপ ক্রন্দন, অশ্রুপাত, ভূমিতে পতন, বক্ষে আঘাত, মূর্ছা প্রভৃতি শোকভাবের অনুভাব। এই সমস্ত অনুভাব দ্বারা অন্তরের রতি বা শোক ভাবকে বুঝা যায়। আবার হঠাৎ শকুন্তলার ছল করিয়া কুরুবক-শাখা হইতে বল্কলমোচন, অথবা পদতল হইতে কুশ-কণ্টক মোচনের চেষ্টাও অনুভাব। বস্তুতঃ নায়ক বা নায়িকার প্রত্যেকটি কার্য বা চেষ্টাই কোন চিত্তবৃত্তি বা ভাবের ফল বলিয়া অনুভাব-রূপে গণ্য হইবে।

স্থায়ী ভাব ও ব্যভিচারী ভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এই অধ্যায়ের পরবর্তী ভাগে দৃষ্ট হইবে।

এই বিভাবাদিকে বলা হইয়াছে অলৌকিক। বিভাবনা-ব্যাপারকেও বলা হয় অলৌকিক। যাহা লৌকিক নয়, তাহাই অলৌকিক। যে লৌকিক জগতে

দুষ্মন্ত-শকুন্তলা বিচরণ করিতেন, তাহা বহুকাল হয় গত হইয়াছে। এখন তাঁহারা কবি-প্রতিভা-বলে শব্দে সমর্পিত হইয়া বাঙ্ময় বপুঃ লইয়া কাব্য-জগতের অধিবাসী। কবিসৃষ্ট কাব্য-জগৎ এক মায়ার জগৎ, অলৌকিক জগৎ। এই নিমিত্ত যাহা ছিল লৌকিক বা ব্যাবহারিক জগতের কারণ বা কার্য, তাহাই অলৌকিক কাব্য-জগতে অলৌকিক বিভাব ও অলৌকিক অনুভাব হইয়া সামাজিক বা পাঠকের চিত্তে অলৌকিক রস সঞ্চার করিতেছে। এই অলৌকিকত্ব না থাকিলে তাহারা আমাদের চিত্তে রস নয়, কেবল ভাব জন্মাইত, যেমন জন্মাইত দুষ্মন্ত-শকুন্তলা তাহাদের জীবিতকালে সখীদের মনে। চিত্তের ভাব প্রায় সকল সময়েই লৌকিক। তাহার আশ্রয়ে জাত রস সর্বদাই অলৌকিক এবং কাব্যজগতের বিভাবাদিও অলৌকিক।* এ বিষয়ে বিশ্বনাথের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি দুঃখের কারণসমূহ হইতে সুখোৎপত্তির প্রকার বুঝাইতে গিয়া বলিতেছেন—

হেতুত্বং শোকহর্ষাদে র্গতেভ্যো লোক-সংশ্রয়াৎ।
শোকহর্ষাদয়ো লোকে জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ।
অলৌকিক-বিভাবত্বং প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্য-সংশ্রয়াৎ।
সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ সর্বেভ্যোঽপীতি কা ক্ষতিঃ॥

—সাহিত্যদর্পণ, ৩।৩৯

—'লোক-সম্বন্ধ-হেতু শোকহর্ষাদির কারণ হইতে আগত শোকহর্ষাদি ভাবলোকে লৌকিক নামেই পরিচিত হয়। কাব্যসম্বন্ধ-হেতু অলৌকিক বিভাবরূপে পরিণত সেই সকল হইতেই সুখ সঞ্জাত হয়। ইহাতে ক্ষতি কি?'

এইভাবেই লোকিক শোক-হর্ষাদির পরিণতি হয় অলৌকিক আনন্দে। ইহা কবিচিত্তের মধ্য দিয়া কাব্য বা নাট্যের আশ্রয়ে শব্দার্থের বলেই সম্ভবপর হইয়া থাকে। বিভাবনা-ব্যাপারের অলৌকিকত্ব আরও স্পষ্ট হইবে নিম্নের বর্ণিত সাধারণীকরণ ব্যাপার দ্বারা।

* "What is beautiful artistically is the object of delight apart from any interest."—E. Kant.

"The only beautiful things are things that do not concern us."—Oscar Wilde. 'সাহিত্যের বাহিরে এই সুন্দরের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। সেখানে প্রাণতত্ত্বের অধিকৃত মানুষকে অনিষ্টকর কিছুতে আনন্দ দেয় না।'—রবীন্দ্রনাথ

(৩) এখানে সাধারণোপায়ের বলে পরিমিত প্রমাতৃ-ভাবের বিগলন দ্বারা যাহা বুঝান হইয়াছে, তাহারই নাম সাধারণীকরণ। এই শব্দটিও প্রথম প্রয়োগ করিয়াছেন অভিনবগুপ্ত ভরত-প্রণীত রস-সূত্রের প্রসিদ্ধ ভাষ্যে। সাধারণীকরণের সাক্ষাৎ ফল হইতেছে চিদ্-গত আবরণ-ভঙ্গ। এই সাধারণীকরণ চিদ্-গত আবরণ-ভঙ্গ-নামক ব্যাপার দুইটি না বুঝিলে রসোৎপত্তি বুঝা সম্ভবপর নয়।

এই রস মূলতঃ নাট্যরস। নাট্যরস কি অবস্থায় উৎপন্ন হয়, তাহার একখানি সাধারণ চিত্র লওয়া যাক্।

সুসজ্জিত রঙ্গশালা, উহা পত্র-পুষ্পে শোভিত এবং আলোকমালায় উজ্জ্বল; নানা বাদ্যের মধুর ঐকতান বাজিতেছে। বিশাল প্রেক্ষাগারে সকলেই উদ্‌গ্রীব, কখন যবনিকা উত্তোলিত হইবে। প্রেক্ষাগারে নানাশ্রেণীতে বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত নানাজাতীয় লোক উপবিষ্ট রহিয়াছেন। নাট্যাভিনয় আস্বাদের আগ্রহ প্রায় তুল্যরূপ হইলেও, তাহারা অনেকে জাতিতে, ব্যবসায়ে, নিজেদের প্রকৃতিতে ও পরিবেষ্টনাতে ভিন্ন। ইহাদের অনেকেই অনেককে চেনেন না। ধনী, জমিদার, ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, দেশ-নেতা, উকিল, কেরাণী, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত সকলেই দর্শক-শ্রেণীভুক্ত, একই স্থানে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষমাণ। লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে, সকলেই নিজেকে সাময়িকভাবে এক আনন্দলোকের অধিবাসী বলিয়া মনে করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গালয়ে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্তও নিজ নিজ সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনের নানা সমস্যা লইয়া তাঁহাদের যে অভ্যস্ত ভাবনা-স্রোত চলিতেছিল, তাহা ক্রমে স্তব্ধ হইয়া আসিতেছে; নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব-জড়িত তাঁহাদের যে অ-সাধারণত্ব, তাহা ক্রমশঃ ঘুচিয়া গিয়া তাঁহারা যেন প্রেক্ষাগারের দর্শক-সাধারণের সহিত এক হইয়া যাইতেছেন। সকলের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যময় যে অসাধারণ রূপ ছিল, তাহা খসিয়া যাওয়ায় তাঁহারা ব্যাপকতর ও উর্ধ্বতর সাধারণ সত্তা-চৈতন্যে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছেন। অসাধারণ ব্যক্তিসমূহ যে এইরূপ স্থান-কাল ও অবস্থাবিশেষের মাহাত্ম্যে সাধারণ হ'ন, তাহাই তাঁহাদের সাধারণীকরণ।

সকলের উদ্বুদ্ধ বিস্ময়কে ঘনীভূত করিয়া এমন সময়ে যবনিকা উঠিল। সম্মুখে রঙ্গাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সিদ্ধরস-বিগ্রহ রামচন্দ্র ও সীতা, যাঁহাদের বিষয় এতকাল কাব্যে ও নাট্যে পড়িয়াছি বা লোকমুখে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছি। বলা বাহুল্য, অভিনয়-দক্ষ নটগণ উপযুক্ত বেশভূষা ও উপকরণাদিসহ রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ বা রাবণের ভূমিকায় নিপুণ অভিনয় করিয়া দর্শকগণকে অভিভূত করিয়াছেন।

দর্শকগণই হইলেন সহৃদয় সামাজিক, তাঁহাদের মনের অবস্থাই আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। দর্শকগণের চিত্তের দুইটি অবস্থা লক্ষণীয়। প্রথম, যে সাধারণীকরণ পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল, অভিনয় জমিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা ক্রমশঃ পূর্ণ হইতে লাগিল, তাঁহাদের অ-সাধারণ অর্থাৎ পৃথক্ বা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অভিমান ক্রমশঃ খসিয়া গেল। এখন তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা চলে,—আমি অমুকের পিতা, অমুকের পতি, অমুকের মিত্র বা শত্রু, অথবা অমুক আমার পতি বা পত্নী, অমুকের এই কাজ করিতে হইবে বা হইবে না প্রভৃতি সাংসারিক সম্বন্ধের সমুদয় ব্যবহারই তাঁহারা তৎকালের নিমিত্ত বিস্মৃত হইয়া যান। এমন কি যাঁহারা অভিনয় করিতেছেন, সেই নটগণ অথবা নাটকের রাম-সীতারূপ বিভাবাদি, আমা হইতে পৃথক্ বা পৃথক্ নয়, অথবা আমি তাঁহাদের হইতে পৃথক্ বা পৃথক্ নই, তাঁহারা আমার কেহ, বা কেহ ন'ন, আমি তাঁহাদের কেহ বা কেহ নই—এইরূপ কোন জ্ঞান থাকে না। অথচ আমি আছি, আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি—এ জ্ঞান বর্তমান। এ এক আশ্চর্য অবস্থা; ইহাই সাধারণীকরণের এক দিকের অবস্থা। এই অবস্থাই হইতেছে পরিমিত ব্যক্তিত্ব-বোধের বিলোপ।

অপর দিকে একই কালে বোধ হইতে থাকে, যত সহৃদয় দর্শক, সকলের সহিত আমি এক হইয়া যাইতেছি। অ-সাধারণত্ব ত্যাগ করিয়া সকল দর্শকই এক সাধারণ সত্তা-চৈতন্যের ভূমিতে আরোহণ করায়, তাঁহাদের ভিতরে মূলগত সাদৃশ্যের উপলব্ধি সহজ হইয়া যায়। তখন মনে হয় প্রেক্ষাগারের সকল হৃদয়, সকল মন, সকল কর্ণ, সকল নয়ন যেন এক হইয়া গিয়াছে। ইহাই অভিনবগুপ্ত-কথিত 'সর্বসামাজিকানাম্ এক ঘনতা'—সকল সামাজিকের একঘনতা, ইহারই অন্য নাম সকল-সহৃদয়-সংবাদশালিতা। লক্ষ্য করিবার এই,—এখানে দর্শকগণের পরস্পরের ভেদজ্ঞান যেমন নাই, অভেদজ্ঞানও নাই, ঠিক সাদৃশ্যজ্ঞানও নাই; অথচ ইহা সহৃদয় দর্শক-মাত্রেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার, উহার অপলাপ করা সম্ভবপর নয়। এই ব্যাপার তাই অলৌকিক, রসের ব্যাখ্যানে ইহা দূষণ নয়, আশ্চর্য ভূষণই বটে।

নাট্যশালার দর্শকদের তৎকালীন চিত্তাবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া সাধারণীকরণের দুইটি প্রক্রিয়াই উদাহরণ-সহ প্রদর্শন করা হইল।

স্বল্পকথায় বলা যাইতে পারে,—আমাদের অ-সাধারণত্বময় ব্যক্তিত্বের বিসর্জন-পূর্বক নাট্য বা কাব্য-চিত্রিত চরিত্র ও ভাবের সহিত একটি সাধারণ সম্বন্ধ স্থাপনের নাম সাধারণী-করণ। কাব্য-বর্ণিত চরিত্র, দৃশ্য বা ভাবাদির আলোচনে পাঠক

তন্ময় হইয়া স্বকীয় দেশ, কাল, অবস্থা-বিশেষের সম্বন্ধ এবং ব্যক্তি-স্বরূপের বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হইতে থাকেন। নাট্য বা কাব্য আস্বাদনের কালে সহৃদয় সামাজিক স্বকীয় মর্ত্যলোক বিস্মৃত হইয়া যত বেশী নাট্য বা কাব্যলোকে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন এবং লৌকিক নানা অবস্থার সংঘাতে সঙ্কুচিত চিত্তকে বাধাহীন করিয়া নাট্য বা কাব্যলোকে মুক্তি দিতে পারিবেন, সেই পরিমাণেই তিনি বিশুদ্ধ নাট্য বা কাব্য-রস-সম্ভোগের অধিকারী হইবেন। এই অবস্থায় বিভাবাদির সহিত তন্ময়ীভবনের অর্থাৎ একরূপকতার ফলে বিভাবাদি-গত রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব সামাজিকের চিত্তে সূক্ষ্ম বাসনারূপে স্থিত রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের উদ্রেক করে।

এই সম্পর্কে একটি বিষয় লক্ষণীয়। মম্মটভট্টের মতানুসারে আচার্য অভিনবগুপ্ত বিভাবাদির সহিত সামাজিকের একরূপতার কথা বলেন নাই। পূর্ব ব্যাখ্যায় আমরা কিন্তু উহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। কবিরাজ বিশ্বনাথ সাহিত্য-দর্পণ গ্রন্থে সাধারণীকরণ প্রসঙ্গে এই অভেদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা,—

ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণীকৃতিঃ।
প্রমাতা তদভেদেন স্বাত্মানং প্রতিপদ্যতে॥

—সাহিত্যদর্পণ, ৩৷৪২, ৪৩

—'বিভাবাদির সাধারণীকরণ নামে একটি ব্যাপার আছে, তাহারই প্রভাবে প্রমাতা বা সামাজিক নিজেকে বিভাবাদির সহিত অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করেন।'

ইহার পরেই বিশ্বনাথ বলিয়াছেন,—

পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥

—সাহিত্য-দর্পণ, ৩৷৪৫

—'বিভাবাদির আস্বাদের সময়ে উহা পরের অথবা পরের নহে, আমার অথবা আমার নহে—এই প্রকার কোন পরিচ্ছেদ বা বন্ধন থাকে না।'

বিভাবাদির অলৌকিকত্বের এই লক্ষণ কিন্তু মম্মটকৃত সূত্রে 'মমৈবৈতে শত্রোরেবৈতে' প্রভৃতি অংশে আরও বিশদরূপে ব্যাখ্যাত আছে ; কিন্তু বিভাবাদির সহিত একরূপতা বা অভেদের কথা কোথাও লিখিত নাই।

পণ্ডিতবর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে একবার স্বগতত্ব ও পরগতত্ব এই উভয়বিলক্ষণরূপে প্রতীতি, আবার অভেদদ্বারা কেবল স্বগতত্বরূপে প্রতীতি,

বিশ্বনাথ-কৃত এই উভয়বর্ণনার মধ্যে সুস্পষ্ট বিরোধ রহিয়াছে।[১] অবশ্য তিনি মনে করেন, এই প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ বিভাবাদির অলৌকিকত্বরূপ কারণ বিশ্বনাথ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহার অল্প পূর্বেই মন্তব্য করিয়াছেন;—অভিনবগুপ্তের মতে বিভাবাদিবর্ণিত ব্যাপারের যে সাধারণ ভাবে চিত্তে প্রতিবিম্বন, তাহারই নাম সাধারণীকৃতি; বিশ্বনাথ যে অভেদের কথা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব অভিমত।[২]

এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, পাঠকের প্রথম যোগ্যতাই যে বর্ণনীয় বস্তুর সহিত 'তন্ময়ীভবন-যোগ্যতা' ইহা সহৃদয়ের লক্ষণ-বর্ণনায় লোচনটীকায় অভিনবগুপ্ত অতি স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই অংশেই তিনি 'হৃদয়সংবাদভাজঃ' শব্দ প্রয়োগ করিয়া পাঠক-হৃদয়ের সহিত নায়কাদির হৃদয়ের একরূপতার কথাও ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং পূর্বমতকে দৃঢ় করিয়াছেন। এই বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

অভিনবগুপ্ত সহৃদয়ের লক্ষণ নির্দেশে উহা ধরিয়া লইয়াছেন বলিয়া সাধারণীকরণের ব্যাখ্যায় উহার পুনরুল্লেখ হয়তো আবশ্যক মনে করেন নাই। সেখানে দেখাইয়াছেন আসল সাধারণীকরণ, যাহার ফলে প্রমাতার পরিমিত ভাব লুপ্ত হয়, সকল সামাজিকের 'একঘনতা' প্রতিপন্ন হয় এবং 'অবিঘ্না সংবিৎ' প্রকাশিত হয়[৩]।

বাস্তবিক পক্ষে সাহিত্যদর্পণ-কার বিশ্বনাথ এইস্থলেও কোন নূতন কথা বলেন নাই।

অভিনয়-দর্শন বা কাব্য-শ্রবণে সর্বপ্রথমেই বিভাবাদির সহিত সামাজিক হৃদয়ের 'তন্ময়ীভবন' বা একরূপতা হয় এবং ফলে উহারা প্রথমে স্বগতত্ব রূপেই প্রতীত হয়। অভিনবগুপ্ত-কথিত এই 'তন্ময়ীভবন' অথবা বিশ্বনাথ-কথিত 'অভেদে'র ফলে সামাজিকের চিত্তে বাসনা-রূপে স্থিত অনুরূপ স্থায়ী ভাব উদ্‌বুদ্ধ হয় এবং তাহা ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে। স্থায়ী ভাব একবার উদ্রিক্ত হইয়া প্রবল হইলে বিভাবাদি অপ্রধান হইতে থাকে; তখন বিভাবাদি স্বগতত্ব ও পরগতত্ব এই উভয়বিলক্ষণরূপে প্রতীত হয় এবং ভাব-তন্ময়চিত্তে সংবিদানন্দের প্রকাশে রসের উপলব্ধি হয়।

(১) কাব্য-বিচার, রস ও কাব্য, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৫০।

(২) উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৪৯।

(৩) দ্রষ্টব্য—নাট্যসূত্র, ৬।৩৫, ভাষ্য, বরোদা সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮১।

বিভাবাদি প্রবল থাকিলে ভাব স্ব-মাহাত্ম্যে প্রকাশ পাইতে পারে না এবং রসের উপলব্ধিও সম্ভব হয় না। এই দুইটি প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিলে আর বিরোধ থাকে না। এই বিষয়ে বিঘ্নবর্ণনা-প্রসঙ্গে পরবর্তী অংশে উদ্ধৃত অভিনবগুপ্তের নিম্নের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য,—

তত্র বিঘ্নাপসারকা বিভাবপ্রভৃতয়ঃ।

—'বিভাব প্রভৃতি চিত্তের বিঘ্ন অপসারণ করিয়া থাকে।'

বিভাবাদি কি ভাবে বিঘ্ন অপসারণ করে? তন্ময়ীভবন দ্বারা সামাজিকের অন্তরে আসিয়া ভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া রজস্তমোগুণের অপলাপ এবং সত্ত্বগুণের প্রকাশ ঘটাইয়া নিজেরা যেমন যেমন অপ্রধান হয়, রস তেমন তেমন প্রকাশ পাইয়া প্রধান হইতে থাকে। অতএব প্রথম অবস্থায় বিভাবাদির সহিত সামাজিক-হৃদয়ের অভেদ বা একরূপতা হইয়া থাকে। সাধারণীকরণের ইহা প্রাথমিক স্তর; পাশ্চাত্ত্য সমালোচক ও কবিগণের সাক্ষ্যেও ইহার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। এই বিষয়ে পরবর্তী অংশে তুলনামূলক আলোচনায় আরিস্টটল্ ও বুচারের অভিমত এবং পরে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি কবিগণের অভিমত দ্রষ্টব্য।

সাধারণীকরণের আলোচনা এইখানে সমাপ্ত হইল। কাব্য শুনিয়া পরিমিত ভাব বিগলিত হইলে কিরূপে শ্রোতার চিত্তে অপরূপের প্রকাশ হয়, রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার কয়েকটি চরণ হইতে তাহা সুন্দররূপে বুঝা যাইবে,—

শুনতে শুনতে স'রে গেল সংসারের ব্যবহারিক আচ্ছাদনটা,
যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হয়ে ফুটে বেরোল
অগোচরের অপরূপ প্রকাশ;
তার লঘু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে;—পত্রপুট, পাঁচ

(৪) রসের স্বরূপ-নির্ণয়ে আসল আলোচনা ও শেষ আলোচনা এখানে। অভিনবগুপ্তের অভিমত বলিয়া মম্মট-কর্তৃক ব্যাখ্যাত রসতত্ত্বের বিশদীকরণে মূল বাক্যটি হইতেছে,—

সামাজিকানাং বাসনাত্মতয়া স্থিতঃ স্থায়ী রত্যাদিকো গোচরীকৃতঃ
অলৌকিক চমৎকারকারী শৃঙ্গারাদিকো রসঃ।

—'সামাজিকগণের বাসনারূপে স্থিত রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব গোচরীকৃত হইয়া আলৌকিক চমৎকার-কারী শৃঙ্গার প্রভৃতি রস হয়।'

মূল কারিকার ভাষা আরও স্পষ্ট, —"বিভাবাদি দ্বারা ব্যক্ত হইয়া স্থায়ী ভাব রস বলিয়া স্মৃত হয়।"

লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব কিরূপে রস হয়, তাহার শেষ ও প্রকৃত তত্ত্বটি একেবারে অনুল্লিখিত রহিয়াছে। লেখা পড়িয়া মনে হয় লৌকিক স্থায়ী ভাব সহসা অলৌকিক রস হইয়া যায়। সাধারণীকরণ ছাড়া যেন আর কোন প্রক্রিয়া বুঝিবার অপেক্ষা নাই। প্রশ্ন এই—ইহা সত্য কি? স্থায়ী ভাব আর রস এক কি?

আশ্চর্যের বিষয় এই, আচার্য অভিনবগুপ্ত-কৃত নাট্যশাস্ত্রের অভিনব-ভারতী ভাষ্যে এবং ধ্বন্যালোকের লোচনটীকায় গূঢ় ও সূক্ষ্ম তত্ত্বটি পরিস্ফুটরূপে ব্যাখ্যাত থাকিলেও মম্মটের ব্যাখ্যানে তাহা কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। মম্মট অভিনবগুপ্তের গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কোথাও নাই, এবং তাঁহার ব্যাখ্যানের বাহ্য আড়ম্বর যতই থাক্, তাহা সুধীজনকে পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না।

মম্মটের ব্যাখ্যানও অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যানের প্রতিধ্বনি মাত্র, কেবল মূল কথাটি সেখানে অনুচ্চারিত। অভিনব-ভারতী ভাষ্যের যে অংশ মম্মটের অবলম্বন সেই অংশটি হইতেছে এই,—

তত্র লোক-ব্যবহারে কার্য-কারণ-সহচারাত্মকলিঙ্গদর্শনে স্থায্যাত্মপরচিত্তবৃত্ত্যনু-মানাভ্যাসে এব পাটবাদ্ অধুনা তৈরেব উদ্যানকটাক্ষবৃক্ষাদিভি র্লৌকিকীং কারণত্বাদি-ভুবম্ অতিক্রান্তৈ র্বিভাবনানুভাবনা-সমুপরঞ্জকত্ব-মাত্র-প্রাণৈঃ, অতএব অলৌকিক-বিভাবাদিব্যপদেশভাগ্‌ভিঃ প্রাচ্যকারণাদিরূপ-সংস্কারোপজীবনাখ্যাপনায় বিভাবাদি-নামধেয়-ব্যপদেশ্যৈ র্ভাবাধ্যায়ে ঽপি বক্ষ্যমাণ-স্বরূপভেদৈ র্গুণপ্রধানতাপর্যায়েণ।

সামাজিকধিয়ি সম্যগ্‌যোগং সম্বন্ধম্ ঐকাগ্র্যং বা আসাদিতবদ্ভিরলৌকিক-নির্বিঘ্ন-সংবেদনাত্মক-চর্বণা-গোচরতাং নীতোঽর্থশ্চর্বমাণতৈক-সারো ন তু সিদ্ধস্বভাব স্তাৎকালিক এব ন তু চর্বণাতিরিক্তকালাবলম্বী স্থায়িবিলক্ষণ এব রসঃ।

—নাট্যশাস্ত্র, ৬।৩৪, ভাষ্য, পৃঃ ২৮৫

উল্লিখিত বাক্য পাঠ করিলেই অনায়াসে বুঝা যাইবে, মম্মট একই অর্থ একই শব্দ ও বাক্যাংশ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের চিহ্নিত অংশ দুইটি তিনি লক্ষ্য করেন নাই, অথচ এই অংশ দুইটির মধ্যেই ভাবের রসতা সম্পাদনের মূল কথাটি রহিয়াছে। চিহ্নিত অংশ দুইটির অনুবাদ হইতেছে,—

(১) রস অলৌকিক এবং বিঘ্ন-বিহীন সংবেদন-স্বভাব;

(২) রস স্থায়ী ভাব হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন।

বিঘ্নবিহীন সংবেদন বলিতে কি বুঝায়, অভিনবগুপ্ত অল্প পূর্বেই তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; নিম্নে ঐ অংশ উদ্ধার করা হইল,—

সর্বথা রসনাত্মক-বীতবিঘ্ন-প্রতীতিগ্রাহ্যো ভাব এব রসঃ। তত্র বিঘ্নাপসারকা বিভাবপ্রভৃতয়ঃ। তথাহি—লোকে সকলবিঘ্ন-বিনির্মুক্তা সংবিত্তিরেব চমৎকারনির্বেশ-রসনাস্বাদন-ভোগসমাপত্তি-লয়-বিশ্রান্ত্যাদিশব্দৈ রভিধীয়তে। বিঘ্নাশ্চাস্যাং (সপ্ত)। প্রতিপত্তৌ অযোগ্যতা সংভাবনা-বিরহো নাম (১), স্বগতত্ব-পরগতত্ব-নিয়মেন দেশ-কালবিশেষাবেশো (২), নিজসুখাদিবিবশীভাবঃ (৩), প্রতীত্যুপায়-বৈকল্যম্ (৪), স্ফুটত্বাভাবো (৫), অপ্রধানতা (৬), সংশয়যোগশ্চ (৭)।[১] —নাট্যশাস্ত্র, ৬।৩৪, ভাষ্য

ভাব যখন সর্বপ্রকারে রসনাত্মক অর্থাৎ আস্বাদনাত্মক এবং বিঘ্ন-মুক্ত প্রতীতি দ্বারা গ্রাহ্য হয়, তখন হয় রস। এই বিষয়ে বিভাব প্রভৃতি বিঘ্নসমূহ অপসারণ করে। লোকে সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে বিনির্মুক্ত সংবিৎই চমৎকার-বিনিবেশ, রসন, আস্বাদন, ভোগ-সম্পাদন, লয়, বিশ্রান্তি প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। উহার বিঘ্নসমূহ সাত প্রকার,—(১) উপলব্ধি বিষয়ে অযোগ্যতা, ইহারই অপর নাম প্রতীতির সম্ভাবনার অভাব ; (২) স্বগতত্ব এবং পরগতত্ব নিয়মে দেশ-বিশেষের ও কাল-বিশেষের অবস্থান, (৩) নিজ সুখ প্রভৃতি দ্বারা বিবশভাব, (৪) প্রতীতির উপায়-বিষয়ে বৈকল্য, (৫) স্ফুটত্বের অভাব, (৬) অপ্রধানতা, (৭) সংশয়-যোগ।

সারার্থ হইতেছে এই,—ভাবাশ্রিত চিত্ত রজস্তমোগুণের বিবিধ বিঘ্ন হইতে মুক্ত হইলে তাহাতে আস্বাদনাত্মক সংবিৎ বা জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন উহারই নাম হয় রস। ভাব রস নয়। ভাব-তন্ময় চিত্তে সংবিদানন্দের প্রকাশই রস। এই কথাটি আচার্য অভিনবগুপ্ত আরও স্পষ্ট করিয়া নিঃসংশয়রূপে উল্লেখ করিয়াছেন ধ্বন্যালোকের লোচন-টীকায়, যথা,—

শব্দসমর্প্যমাণ-হৃদয়সংবাদসুন্দর- বিভাবানুভাবসমুদিত-প্রাঙ্‌নিবিষ্টরত্যাদিবাসনানু-রাগ-সুকুমার-স্বসংবিদানন্দ-চর্বণব্যাপার-রসনীয়রূপো রসঃ। —ধ্বন্যালোক, ১।৪ টীকা

—'শব্দে সমর্পিত হইলে এবং হৃদয়ের সংবাদ অর্থাৎ একরূপতা দ্বারা সুন্দর হইলে সামাজিকের চিত্তে বিভাব ও অনুভাব হইতে সমুদিত হয় পূর্বে নিবিষ্ট রতি প্রভৃতি বাসনা। সেই বাসনার অনুরাগ দ্বারা সুকুমার হইলে স্ব-সংবিদানন্দের চর্বণ-ব্যাপারের যে রসনীয় বা আস্বাদনীয় রূপ, তাহাই হইতেছে রস।'

(১) বিভিন্ন পাঠ মিলাইয়া এই পাঠ ঠিক করা হইল।

আসল কথাটি পাইলাম ভাবপূর্ণ চিত্তে নিজ সংবিৎ ও আনন্দের যে চর্বণা, অর্থাৎ আস্বাদন বা প্রকাশ, তাহারই নাম রস।

এই আসল কথাটিই মম্মট তাঁহার ব্যাখ্যানে অনুক্ত রাখিয়াছেন।

এখন অবশিষ্ট অংশ সহজেই আলোচনা করা যায়।

'স্বাকারের ন্যায় অভিন্ন হইলেও' দ্বারা 'আনন্দাত্মক আস্বাদের সহিত অভিন্ন হইলেও' বুঝায়। বাস্তবিক পক্ষে নিজের উপলব্ধি ছাড়া ইহার পৃথক্ কোন অস্তিত্ব নাই। এই অংশই অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন সাহিত্যদর্পণ-কার তাঁহার রস-কারিকায়, যথা—

স্বাকারবদ্ অভিন্নত্বেনায়ম্ আস্বাদ্যতে রসঃ॥ —সাহিত্যদর্পণ, ৩।৩৫

"চর্ব্যমাণতা বা আস্বাদ্যমানতাই তাহার একমাত্র প্রাণ; যতক্ষণ বিভাব প্রভৃতি ততক্ষণ তাহার জীবন"—এত কথা বোধ হয় বলা হইতেছে ব্রহ্মানন্দের সহিত ইহার প্রভেদ বুঝাইবার জন্য। ব্রহ্মানন্দ নির্বিষয়, নিরালম্ব, অনপেক্ষ। কাব্যানন্দ বা রস বিভাবাদি অবলম্বন করিয়া বর্তমান; যতক্ষণ চর্ব্যমাণতা, ততক্ষণ মাত্র তাহার স্থিতি।

"তাহা পানকরসের ন্যায় চর্ব্যমাণ হইতে থাকে।"—এই বর্ণনা স্থূল, ইহা নিঃসন্দেহে একধাপ বা দুইধাপ নীচে নামিয়া করা হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ কথা নহে এবং শেষ কথাও নহে, ইহাতে তাই তৃপ্তি হয় না। আমাদের মনে হয় সত্য সত্য পানকরস-ন্যায়ে কিছু ঘটে না। বাক্যটির দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে, যথা—

(১) "স্বাদু, সুস্নিগ্ধ, সুগন্ধ পানকরসে যেমন তদুপাদানীভূত সামগ্রী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিলক্ষণ একটি নূতন স্বাদ প্রতীত হয়, তেমনি বিভাবাদির স্বাদ হইতে সম্পূর্ণ একটি নূতন স্বাদ রসে প্রতীত হয়।"

—ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত-কৃত কাব্যবিচার, রস ও কাব্য

(২) "যথা পানকরসে কর্পূরাদীনাং প্রত্যেকাস্বাদ-বিলক্ষণঃ কশ্চন মিলিতরসাস্বাদঃ।"

—নাগেশভট্ট-কৃত উদ্দ্যোত

—'যে প্রকার পানকরসে কর্পূর প্রভৃতির প্রত্যেকটি উপাদানের আস্বাদ হইতে বিলক্ষণ সকল উপাদানের মিলিত রসাস্বাদ থাকে।'

আমাদের মনে হয় পানকরসের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই সমীচীন ও স্বাভাবিক ব্যাখ্যা। প্রথম ব্যাখ্যা স্বাভাবিক নহে। যাহা হোক, প্রথম ব্যাখ্যায় পানকরস হইতেছে **chemical combination** এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় **physical combination**।

কিন্তু ইহার কোন ব্যাখ্যাই রসের চর্বণা বা প্রকাশ বুঝাইতে পারে না। রস হইতেছে বিভাবাদিজনিত-ভাবময় চিত্তে স্বরূপসংবিদানন্দের প্রকাশ, বিভাবাদি বা তজ্জনিত ভাবকে অবলম্বন করিয়া এমন একটি সত্তার প্রকাশ, যাহা বিভাবাদি হইতে পৃথক্ এবং তাহাদের আশ্রয়-স্থল চিত্ত হইতে ঊর্ধ্বে বর্তমান। দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে বিভাবাদির আস্বাদই একমাত্র কথা। প্রথম ব্যাখ্যায় আস্বাদের স্বাতন্ত্র্য বা নূতনত্ব থাকিলেও তাহা কেবলমাত্র বিভাবাদির সংমিশ্রণেই বর্তমান, অন্য কোন সত্তার অপেক্ষা রাখে না। এই জন্য এই উপমা সঙ্গতউপমা নহে। যিনি স্থায়ী ভাবকে রস বলিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে এই উপমা খাটিতে পারে; কিন্তু ইহা রসের স্বরূপকে প্রকাশ করে না।

এখানে অবশ্য বিরুদ্ধবাদীরা ভরতমুনির প্রদত্ত উদাহরণ উল্লেখ করিতে পারেন, যথা,—

যথা হি গুড়াদিভি র্দ্রব্যৈ র্ব্যঞ্জনৌষধিভিশ্চ ষাড়বাদয়ো রসা নির্বর্তন্তে, তথা নানাভাবোপগতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্বম্ আপ্নুবন্তীতি।

—নাট্যশাস্ত্র, ৬।৩৫

—'যে প্রকার গুড় প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা এবং ব্যঞ্জনৌষধি দ্বারা ষাড়বাদি রস নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ নানা ভাব দ্বারা মিলিত হইয়া স্থায়ী ভাবসমূহ রসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'

আমাদের উত্তর এই,—ভরতমুনি সর্বত্র সূক্ষ্ম বিচার ও স্বরূপ বিচার করেন নাই, ভাবের মহিমা ও প্রাধান্য বুঝাইবার জন্য অনেক সময়ে অর্থবাদ-পূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন।

সূক্ষ্ম ও স্বরূপ বিচার করিয়াই আমরা পূর্বোক্ত সমালোচনা করিয়াছি।

কেবল বিভাবাদি হইতে রস জন্মিলে বিভাবাদির ভিন্নতাহেতু রস সর্বদাই ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপলব্ধি হইত। কিন্তু তাহা হয় না। যাহারা শ্রেষ্ঠ সহৃদয় সামাজিক, তাহাদের উপলব্ধির প্রমাণে স্পষ্ট বোঝা যায়, সকল প্রকার রসেই এক ঘন আনন্দ-স্বরূপ চেতনা থাকে। রস তাই নামতঃ আট প্রকার হইলেও মূলতঃ এক, অখণ্ড ও বিজাতীয়তাশূন্য। এই মূল আনন্দ হইল আমাদের সংবিদানন্দের প্রকাশ বা প্রতিবিম্বন। স্থায়ী ভাব বিভিন্ন বলিয়া রসেরও বিভিন্নতা পরিকল্পিত হয়; কারণ, ইহা নির্বিকল্প আনন্দ নয় বলিয়া চিত্ত-বৃত্তিতে রসাস্বাদনের প্রবাহের মধ্যেও থাকিয়া থাকিয়া ভাবের আস্বাদন চলে। কাব্যামোদী সামাজিকের চিত্তে রসাস্বাদনের সময়ে

ধ্যানস্থ যোগিচিত্তের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন একতান প্রবাহ চলে না, মধ্যে মধ্যে ভাব-প্রবল বৃত্তিও উঠে। তাই ভরতমুনি লিখিয়াছেন,—

ন ভাবহীনোঽস্তি রসো, ন ভাবো রসবর্জিতঃ। —নাট্যশাস্ত্র, ৬।৪০

—'ভাবহীন রস নাই এবং রস-হীন ভাবও নাই।'

ভাবের আস্বাদ চঞ্চল, আবিল, সুখ-দুঃখ-মোহময়; রসের আস্বাদ স্থির, বিমল, এবং আনন্দ ও প্রকাশময়।

বিশ্বনাথ যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন,—

করুণাদৌ অপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্ ॥
কিঞ্চ তেষু যদা দুঃখং ন কোঽপি স্যাৎ তদুন্মুখঃ ॥
তথা রামায়ণাদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা ॥

—সাহিত্যদর্পণ, ৩।৩৬, ৩৭, ৩৮

—'করুণ প্রভৃতি রসে যে পরম সুখ বা আনন্দ জন্মে, সহৃদয়গণের অনুভবই সেই বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ। তাহাতে দুঃখ থাকিলে কেহ তাহা পাইবার জন্য উন্মুখ হইত না, সেই প্রকার রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ দুঃখের কারণই হইত।'

তথাপি করুণ-রসে নেত্রে অশ্রুর সঞ্চার হয় কেন? হৃদয় বিগলিত হওয়ায় কখন অশ্রু আসে, এরূপ অশ্রু প্রেম-ভাব বা শৃঙ্গার রস হইতেও আসিয়া থাকে। আবার কখন কখন লৌকিক শোকভাবের বশেও অশ্রুপাত হয়; এইরূপ ক্ষেত্রেই ভাবের প্রভাব বা ক্রিয়া অনুভব করা যায়। এইরূপে বলা চলে, শৃঙ্গাররসে বা রৌদ্ররসে যদি দেহ বা মনের বিকার আসে, তবে তাহা রতি বা ক্রোধভাবের ফল; যদি প্রশান্ত বিমল আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাই শুদ্ধ রস।

মম্মটভট্ট শেষাংশে 'পুরোভাগে পরিস্ফুরিত হইতেছে' প্রভৃতি বলিয়া রসের সর্বব্যাপকত্ব, আনন্দময়ত্ব এবং অলৌকিকত্ব বুঝাইয়াছেন।

(৫) বর্তমান প্রবন্ধে এই অংশের আলোচনায় আবশ্যকতা নাই।

এতক্ষণে রসের ব্যাখ্যান শেষ হইল। পরবর্তী আলঙ্কারিকগণের মধ্যে কেবল মাত্র কবিরাজ বিশ্বনাথ ও পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের ব্যাখ্যান উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বনাথ মুখ্যতঃ অভিনবগুপ্তের বিবরণকে সংক্ষিপ্ত ও ঘন করিয়া পদ্যকারিকায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, মম্মটের রচনা হইতেও সাহায্য লইয়াছেন। রসের স্বরূপ-কথনের শ্লোক কয়টি সুন্দর; যথা:—

সত্ত্বোদ্রেকাদ্ অখণ্ড-স্বপ্রকাশানন্দ-চিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তর-স্পর্শ-শূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ ॥
লোকোত্তর-চমৎকার-প্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদ্ অভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ ॥
রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বমিহোচ্যতে ॥ —সাহিত্যদর্পণ, ৩।৩৫

—'সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে কোন কোন প্রমাতা বা সহৃদয় সামাজিক-কর্তৃক রস নিজস্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া আস্বাদিত হয়। এই রস অখণ্ড, স্ব-প্রকাশ, আনন্দময় ও চিন্ময়, অন্য বেদ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্কহীন, এবং ব্রহ্মাস্বাদের সদৃশ; লোকোত্তর চমৎকারই ইহার প্রাণস্বরূপ। রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা অস্পৃষ্ট মনকেই এখানে সত্ত্ব বলা হইয়াছে।'

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এইস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন,—

"বিশ্বনাথের ব্যাখ্যার সহিত তাঁহার পূর্ববর্তীদের ব্যাখ্যার একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে, অভিনবগুপ্ত, মম্মট প্রভৃতি তাঁহার পূর্ববর্তীরা রসের psychological ব্যাখ্যা দিতেই চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কোনওরূপ metaphysical ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন নাই।" —কাব্যবিচার, রস ও কাব্য

এই মন্তব্য মম্মট-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য হইলেও অভিনবগুপ্ত-সম্বন্ধে সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, অভিনবগুপ্ত রস-সম্পর্কে অভিনব-ভারতী ভাষ্যে এবং লোচনটীকায় metaphysical ব্যাখ্যার প্রায় সকল কথাই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বরং মনে হয়, বিশ্বনাথ এমন কথা অল্পই বলিয়াছেন, যাহা অভিনবগুপ্ত-কর্তৃক পূর্বে উচ্চারিত হয় নাই।

সাহিত্য-দর্পণে রসের স্বরূপ-কথনে পূর্বে উল্লিখিত 'বেদ্যান্তর-স্পর্শ-শূন্য', 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ', 'স্বাকারবদ্ অভিন্নত্বেন' প্রভৃতি বাক্যাংশ অভিনবগুপ্ত হইতে প্রায় একরূপেই গৃহীত হইয়াছে। অভিনবগুপ্তের 'সকলবিঘ্নবিনির্মুক্তা সংবিত্তি' অথবা 'স্ব-সংবিদানন্দ' এখানে 'অখণ্ড-প্রকাশানন্দ-চিন্ময়' হইয়াছে। বলা বাহুল্য, অভিনব-কথিত সপ্তবিঘ্নই সংক্ষেপে 'রজস্তমোগুণে' দাঁড়াইয়াছে। সাধারণী-করণের ফলে 'বিগলিত-পরিমিত-প্রমাতৃভাব' এবং 'সত্ত্বোদ্রেক' একই। রসের লক্ষণে চমৎকার শব্দও অভিনবগুপ্ত প্রয়োগ করিয়া তাহার মনোহর তাৎপর্য বুঝাইয়াছেন। তবে এই চমৎকার শব্দের কিঞ্চিৎ নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন বিশ্বনাথ। তিনি ঐ শব্দ দ্বারা বুঝাইয়াছেন,—"চিত্তবিস্তাররূপো বিস্ময়াপরপর্যায়ঃ",—চিত্তের বিস্তার, যাহার

অপর নাম বিস্ময়; এবং ধর্মদত্তের গ্রন্থ হইতে একটি সুষ্ঠু বচন উদ্ধার করিয়া নিজ বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন; যথা,—

রসে সার শ্চমৎকারঃ সর্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকার-সারত্বে সর্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ॥

—'রসের সার হইতেছে চমৎকার, তাহা রসে সর্বত্রই অনুভূত হয়। সেই চমৎকারের সার হইতেছে অদ্ভুত রস।'

সকল রসের মধ্যেই যে অদ্ভুত রস, অথবা আধুনিকদের 'wonder-spirit' বর্তমান, সকল রসেরই প্রাণ-ভূত যে একটি বিস্ময়-ভাব রহিয়াছে,—বিশ্বনাথের এই উক্তি মূল্যবান্, ইহা বিদগ্ধ রসিক জনেরই উক্তি।

বাস্তবিক পক্ষে রসের ব্যাখ্যানে তিনি বিশ্বস্ত অনুচররূপে অভিনবগুপ্তের সরণি অনুসরণ করিলেও রসের স্বরূপকথনে তাঁহার সুস্পষ্ট, সুসংক্ষিপ্ত ও সৌষ্ঠবময় কারিকা কয়টিতে প্রতিভার দ্যুতি বিদ্যমান। এই দ্যুতি মম্মটের ব্যাখ্যানে সুলভ নহে।

জগন্নাথের রসগঙ্গাধরেও রস-সম্বন্ধে অভিনবগুপ্ত বলেন নাই, এমন কথা পাওয়া যায় না; তবে যুগোপযোগী বিন্যাস ও সরল অথচ দার্শনিক-সম্মত ব্যাখ্যান-ভঙ্গীটি লক্ষ্য করিবার মত।

জগন্নাথ-কৃত দীর্ঘ রস-কারিকার শেষাংশ ও আসল অংশ হইতেছে,—

প্রমুষ্ট-পরিমিতপ্রমাতৃত্বাদি-নিজধর্মেণ প্রমাত্রা স্ব-প্রকাশতয়া বাস্তবেন নিজ-স্বরূপানন্দেন সহ গোচরীক্রিয়মাণঃ প্রাগ্-বিনিবিষ্ট-বাসনারূপো রত্যাদিরেব রসঃ॥

—রসগঙ্গাধর, ১।৬

—'সামজিকের চিত্তে পূর্বেই বাসনারূপে অবস্থিত রতিপ্রভৃতি ভাব প্রমাতার পরিমিত নিজধর্ম অর্থাৎ স্বভাব বিনষ্ট হইলে স্বপ্রকাশ ও বাস্তব নিজ স্বরূপানন্দের সহিত গোচরীক্রিয়মাণ হইয়া রস হয়।'

জগন্নাথ-কর্তৃক লিখিত এই অংশের বৃত্তি আরও বিশদ এবং মনোহর, সমস্ত সূক্ষ্ম কথাও সুস্পষ্ট করিয়া বুঝান হইয়াছে; এবং এই প্রকৃত ব্যাখ্যানটি আচার্যপাদ অভিনবগুপ্তের মতানুসারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বৃত্তির আবশ্যক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—

তথা চাহুঃ—'ব্যক্তঃ স তৈ র্বিভাবদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ' ইতি। ব্যক্তো ব্যক্তিবিষয়ীকৃতঃ। ব্যক্তিশ্চ ভগ্নবরণা চিৎ। যথাহি শরাবাদিনা পিহিতো দীপ স্তন্নিবৃত্তৌ সংনিহিতান্ পদার্থান্ প্রকাশয়তি, স্বয়ং চ প্রকাশতে, এবম্ আত্মচৈতন্যং

বিভাবাদি সংবলিতান্‌ রত্যাদীন্‌।···ব্যঞ্জক-বিভাবাদি-চর্বণায়া আবরণ-ভঙ্গস্য বা উৎপত্তি-বিনাশাভ্যাম্‌ উৎপত্তিবিনাশৌ রসে উপচর্যেতে।···

আনন্দো হ্যয়ং ন লৌকিক-সুখান্তর-সাধারণঃ। অনন্তঃকরণবৃত্তিরূপত্বাৎ। ইত্থং চাভিনবগুপ্ত-মম্মটভট্টাদি-গ্রন্থ-স্বারস্যেন ভগ্নাবরণ-চিদ্বিশিষ্টো রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবো রস ইতি স্থিতম্‌। বস্তুতস্তু বক্ষ্যমাণ-শ্রুতি-স্বারস্যেন রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ।···চর্বণা চ অস্য চিদ্‌গতাবরণ-ভঙ্গ এব প্রাগুক্তা।···

—'মম্মটভট্ট প্রভৃতি বলিয়াছেন, সেই বিভাবাদি দ্বারা ব্যক্ত হইলে স্থায়ী ভাব রস বলিয়া স্মৃত হয়। 'ব্যক্ত' অর্থ ব্যক্তির বিষয়ীকৃত। 'ব্যক্তি' হইতেছে এমন চিৎ বা চৈতন্য, যাহার আবরণ ভগ্ন করা হইয়াছে। যে প্রকার শরা প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত দীপ, শরা প্রভৃতি আবরণ দূর করিয়া দিলে সংনিহিত পদার্থসমূহকে প্রকাশ করে এবং নিজেও প্রকাশিত হয়, আত্মচৈতন্যও সেই প্রকার বিভাবাদি-সংবলিত রতিপ্রভৃতি স্থায়ী ভাবকে প্রকাশ করে এবং স্বয়ংও প্রকাশিত হয়।···ব্যঞ্জক বিভাবাদির চর্বণার অথবা আবরণ-ভঙ্গের উৎপত্তি ও বিনাশ দ্বারা রসে উৎপত্তি ও বিনাশ উপচরিত হইয়া থাকে।···

'এই আনন্দ অন্য লৌকিক সুখের মত নয়; কেন না, ইহা অন্তঃকরণবৃত্তি রূপে প্রকাশ পায়। এইরূপ অভিনবগুপ্ত ও মম্মটভট্ট প্রভৃতির গ্রন্থানুসারে ভগ্নাবরণ এবং চিদ্‌-বিশিষ্ট রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবই রস বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ কিন্তু বক্ষ্যমাণ শ্রুতির অভিপ্রায়ানুযায়ী রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইলে এবং আবরণ ভাঙ্গিয়া গেলে চিৎ-স্বরূপই রসরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।···

'চর্বণা হইতেছে উহার পূর্ব-কথিত চিদ্‌গত আবরণ-ভঙ্গ।···'

বলা বাহুল্য এই ব্যাখ্যাও metaphysical। 'ভগ্নাবরণা চিৎ', 'চিদ্‌গত আবরণ-ভঙ্গ' প্রভৃতি উক্তি রসের বর্ণনায় নূতন উক্তি, এবং উদ্দিষ্ট বিষয়কে অনেকখানি পরিষ্কার করিয়াছে।

আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। জগন্নাথ মনে করেন, নিজ স্বরূপানন্দের সহিত গোচরীক্রিয়মাণ স্থায়ী ভাবই রস; অথবা, আরও শুদ্ধ করিয়া বলিতে গেলে,— স্থায়ী ভাব দ্বারা অবিচ্ছিন্ন চিদানন্দই রস। উভয়ক্ষেত্রেই রসে স্বরূপানন্দের আস্বাদন এবং ভাবের আস্বাদন মিশ্রিত আছে।

স্বরূপ-লক্ষণে রসের বিচার শেষ হইল। স্বরূপধর্মে রস এক, অবিভিন্ন, অবিমিশ্র, তাহাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই বিষয়ে ভরতমুনির অন্য প্রসিদ্ধ সূত্র 'নহি

রসাদ্ ঋতে কশ্চিদ্ অর্থঃ প্রবর্ততে'—ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আচার্য অভিনবগুপ্ত স্পষ্টাক্ষরে মন্তব্য করিয়াছেন,—

পূর্বত্র বহুবচনম্, অত্রচ একবচনং প্রযুঞ্জানস্য অয়ম্ আশয়ঃ—এক এব তাবৎ পরমার্থতো রসঃ সূত্র-স্থানীয়ত্বেন রূপকে প্রতিভাতি। তস্যৈব পুন র্ভাগদৃশা বিভাগঃ।

—'রস শব্দে পূর্বে বহুবচন এখানে একবচন প্রয়োগ করিবার অভিপ্রায় এই,—রস পরমার্থতঃ মাত্র একপ্রকার, রূপকে অর্থাৎ নাট্যে সূত্র-স্থানীয় হইয়া প্রকাশ পায়। ভাগের দৃষ্টি দ্বারা তাহারই পুনরায় বিভাগ হইয়া থাকে।'

এই বিষয়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিয়াছেন বাঙ্গালী আলঙ্কারিক কবি কর্ণপূর গোস্বামী, অপর নাম শ্রীপরমানন্দদাস সেন। তিনি বলেন, রস এক অবিভিন্ন সন্দেহ নাই, স্থায়ী ভাবও স্বরূপতঃ মাত্র একটি, তাহা রজস্তমোমুক্ত সত্ত্বগুণময় চিত্তের আনন্দ-স্বভাব অবস্থাবিশেষ। তিনি এই স্থায়ী ভাবের নাম দিয়াছেন আস্বাদাঙ্কুরকন্দ বা আনন্দ।

আস্বাদ অর্থাৎ রসাস্বাদরূপ অঙ্কুরের যাহা কন্দ বা বীজ, তাহা আস্বাদাঙ্কুর-কন্দ, তাহাই স্থায়ী ভাব, তাহাই রস হইয়া থাকে। বিভিন্ন বিভাবানুযায়ী তাহার বিভিন্ন নাম হয়। কর্ণপূর বলেন,—

আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽস্তি ধর্মঃ কশ্চন চেতসঃ।
রজস্তমোভ্যাং হীনস্য শুদ্ধসত্ত্বতয়া সতঃ॥
স স্থায়ী কথ্যতে বিজ্ঞৈ র্বিভাবস্য পৃথক্তয়া।
পৃথগ্‌বিধত্বং যাত্যেষ সামাজিকতয়া সতাম্॥—অলঙ্কারকৌস্তুভ, ৫।৬৩

—'রজস্তমো-রহিত শুদ্ধসত্ত্বগুণ-পূর্ণ চিত্তের একটি বিশিষ্ট ধর্ম আছে, তাহা আস্বাদাঙ্কুরকন্দ।

'তাহাই বিজ্ঞজন-কর্তৃক স্থায়ী ভাব বলিয়া কথিত হয়। বিভাবের পার্থক্য-অনুযায়ী সামাজিকগণের চিত্তে তাহাই পৃথক্ পৃথক্ রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'

কর্ণপূর গোস্বামী নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন,—

যথা এক এব স্ফটিকো জবাকুসুমাদি-নানাপদার্থানাং সঙ্গাৎ কদাচিদ্ রক্তঃ, কদাচিৎ পীতঃ, কদাচিৎ শ্যামঃ ইত্যাদি-বিবিধাকারো ভবতি, তথৈব এক এব স্থায়িরূপো ধর্মো বীররসাদি-পোষকাণাং নানাবিধ-বিভাবানাং সঙ্গাৎ কদাচিদ্ উৎসাহ-রূপঃ, কদাচিদ্ বিস্ময়রূপঃ, কদাচিৎ শোকরূপ ইত্যাদি-বিবিধাকারো ভবতি।

—'যে প্রকার এক স্ফটিকই জবাকুসুম প্রভৃতি নানাপদার্থের সঙ্গ-হেতু কখন রক্ত, কখন পীত, কখনও বা শ্যাম প্রভৃতি বিবিধ বর্ণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ একই স্থায়িরূপ ধর্ম অর্থাৎ স্থায়ী ভাব বীররসাদির পোষক নানাবিধ বিভাবের সঙ্গ-হেতু কখন উৎসাহ, কখন বিস্ময়, কখনও বা শোকরূপ বিবিধ আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'

ইহার পূর্বে তিনি টীকায় এই স্থায়ী ভাবকে বলিয়াছেন,—

হ্লাদিনীশক্তেঃ আনন্দাত্মক-বৃত্তিরূপ এব।

—'হ্লাদিনী-শক্তির আনন্দাত্মক বৃত্তিস্বরূপ।'

ভাবের ব্যাখ্যা করিয়া রসের ব্যাখ্যানে কবি কর্ণপূর বলেন,—

বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তর-রোধকম্।
স্বকারণাদি-সংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ॥
রসস্যানন্দধর্মত্বাদ্ ঐকধ্যং ভাব এব হি।
উপাধি-ভেদান্নানাত্বং রত্যাদয় উপাধয়ঃ॥

—অলঙ্কারকৌস্তভ, ৫।৭০,৭১

—'বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারসমূহকে নিরুদ্ধ করিয়া, স্ব-কারণ বিভাবাদির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া চমৎকারজনক যে সুখ প্রকাশ পায়, তাহাই রস।

'রসের আনন্দধর্ম-হেতু তাহা একপ্রকার মাত্র; ভাবই উপাধিভেদে নানাপ্রকার হয়, রতি প্রভৃতি ভাবই ভিন্ন ভিন্ন উপাধি।'

কবি কর্ণপূরের দৃষ্টি তিনি নিজেই বিশদ করিয়া বুঝাইলেন। আচার্য অভিনবগুপ্ত এবং তাঁহার বিবরণের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। কর্ণপূর একমাত্র রসের একমাত্র স্থায়ী ভাব কল্পনা করিয়াছেন, বিভাবাদি-ভেদে মূলস্থায়ী ভাবের নানা ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। কবি কর্ণপূরের বিচারে প্রত্যেক স্থায়ী ভাবের মধ্যে যে অবিশেষ স্বাদনাত্মক ধর্ম, যে রসানুকূল স্বভাব অনুস্যূত আছে, যাহাকে তিনি 'আনন্দাত্মক বৃত্তি' বলিয়াছেন, তাহাই সর্বরসাস্বাদের মূল-ভূত অদ্বিতীয় একমাত্র স্থায়ী ভাব; তাহাই বিভাবাদির সংযোগে অন্যধর্ম-বিশিষ্ট হইয়া রতি, উৎসাহ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে। কবি কর্ণপূরের উপলব্ধিতে রস মাত্র এক হইলেও তাহা বিভাবাদি-পরিশূন্য হইয়া কদাচ আস্বাদিত হয় না। তিনি বলেন,—

বিভাবাদি-সহিতস্য এব রসস্য সাক্ষাৎকারো জায়তে।

—অলঙ্কারকৌস্তভ, ৫।৭০, টীকা

—'বিভাবাদির সহিতই রসের সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধি হইয়া থাকে।'

ইহা সেই 'পানক-রস-ন্যায়েন' কথাটির অন্য ভাষায় উল্লেখমাত্র। এই বিষয়ে আমাদের সমালোচনা পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

রস একটি মাত্র এবং স্থায়ী ভাবও একটি মাত্র; প্রকৃতি-বিকৃতি ন্যায়ে অন্য সমুদয় রস ও ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে,—এইরূপ মতবাদও কোন কোন কবি এবং কোন কোন আলঙ্কারিক প্রচার করিয়াছেন। কবি কর্ণপূর গোস্বামীও একমাত্র প্রেমরসে সকল রসই বিদ্যমান বলিয়া পরে মন্তব্য করিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে আমরা ভাবাধ্যায়ে আলোচনা করিব।

৩

আমাদের প্রদত্ত রসের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

রস বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা এইসকল ব্যাখ্যান ও আলোচনার অবসরে অনেকাংশে প্রকাশ করা হইয়াছে। এখন আমাদের অভিমত মূল তথ্য কয়টি একসঙ্গে উল্লিখিত হইবে। রসের দুইটি সংজ্ঞা নিম্নে দেওয়া হইতেছে, একটি সংক্ষিপ্ত, অপরটি বিশদ। সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা,—

শব্দার্থজাত ভাব-তন্ময় চিত্তে আনন্দ-স্বরূপের প্রকাশই রস।

প্রশ্ন জাগে এই,—শব্দার্থ হইতে ভাব কি করিয়া জন্মে? ভাব কাহার? ভাব দ্বারা চিত্ত কি প্রকারে তন্ময় হয়? আনন্দ-স্বরূপের প্রকাশ কি ভাবে ঘটে?—ইত্যাদি। এই প্রশ্নসমূহের উত্তর-স্বরূপ বিশদ সংজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে,—

লৌকিক জগতের বস্তু কবিপ্রতিভা-বলে শব্দার্থে সমর্পিত হইয়া অলৌকিক কাব্যজগতে বিভাব ও অনুভাব নামে পরিচিত হয় এবং সহৃদয় সামাজিক চিত্তের সহিত তাহাদের তন্ময়ী-ভবনের ফলে সামাজিক-চিত্তের বাসনালোক হইতে অনুরূপ স্থায়ী ভাব ও সঞ্চারী ভাব উদ্বুদ্ধ করে, এবং সাধারণীকরণের ফলে পরিমিত প্রমাতৃভাব বিগলিত হইলে সামাজিকের চিত্ত রজস্তমোমুক্ত ও সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়; তখন স্থায়ী ভাবের একতান প্রবাহ-হেতু তন্ময় ও স্থির চিত্তে স্বস্বরূপ চিদানন্দের যে প্রকাশ, অথবা স্মৃতি-সহযোগে ভাবাবলম্বনে যে চর্বণা ঘটে, তাহাই রস।

বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত আমাদের উল্লিখিত রসোপলব্ধির কয়েকটি প্রক্রিয়া এখানে ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

(১) তিনটি জগৎ,—বাহ্য জগৎ, কাব্য-জগৎ ও অন্তর্জগৎ। এক, বাহ্য জগৎ বা বস্তু-জগৎ বা লৌকিক জগৎ। বাহ্য জগতের বস্তু শব্দার্থে সমর্পিত হইয়া কাব্য হইলে এই কাব্যের জগৎকে বলা হয় দ্বিতীয় জগৎ; ইহাই অলৌকিক মায়ার জগৎ। বাহ্য জগতের বস্তু কবিচিত্তের মধ্য দিয়া কবিচিত্তের অধিবাসনে শব্দে সমর্পিত হয়; সেই জন্যই তাহার লৌকিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হয় অনেকাংশে অলৌকিক। লৌকিক জগতের কারণ ও কার্যকে অলৌকিক কাব্যজগতে বলা হয় বিভাব ও অনুভাব। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, লৌকিক জগতের ঘটনা বা বস্তু দেখিয়া চিত্তে ভাবের উদয় হইতে পারে, কিন্তু সে ভাব হইতে কদাচ রস হয় না। সে ভাব আমাদের ব্যক্তি-বোধের সহিত গাঢ় সম্বন্ধ বলিয়া এবং তাহাতে কোন অলৌকিকতা থাকিতে পারে না বলিয়া তাহা কেবল লৌকিক সুখ, দুঃখ বা মোহ বিস্তার করে। কবি-প্রতিভার বলে সৃষ্ট অলৌকিক কাব্যজগতের বিভাবাদি হৃদয়-সংবাদ দ্বারা অর্থাৎ নায়ক-নায়িকা-চিত্তের সহিত সহৃদয় সামাজিক-চিত্তের একরূপতা সম্পাদন দ্বারা সামাজিকের বাসনা-লোকের স্ফুরণ ঘটাইয়া অনুরূপ স্থায়ী ভাব বা সঞ্চারী ভাব জাগায়। কেবলমাত্র এইরূপে স্ফুরিত স্থায়ী ভাব হইতেই রস উৎপন্ন হইতে পারে। রস উৎপন্ন হয় সামাজিকের চিত্তে; সুতরাং সামাজিকের চিত্ত-জগৎ বা তাহার অন্তর্জগৎই হইতেছে তৃতীয় জগৎ। রসের প্রকাশের জন্য লাগে শেষোক্ত দুইটি জগৎ—অলৌকিক কাব্য-জগৎ এবং সামাজিকের চিত্ত-জগৎ। রস-সৃষ্টির দুইটি উপাদান ধরিলে কাব্য-জগৎ হইতেছে বাহ্য উপাদান এবং সামাজিকের অন্তর্জগৎ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি বা ভাব হইতেছে আন্তর উপাদান। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে,—

রস কেবলমাত্র শব্দার্থের আশ্রয়ে নাট্য বা কাব্য প্রভৃতিতে থাকিতে পারে। সঙ্গীত, চিত্র, নৃত্য বা অন্যবিধ সুকুমার কলায় রস-শব্দের প্রয়োগ লাক্ষণিক মাত্র।

(২) সাধারণীকরণ—ইহা পূর্বেই বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(৩) রসের প্রকাশের পূর্বে আসল ব্যাপারটি হইতেছে এই :—

সামাজিকের চিত্তে প্রথম তন্ময়ীভবনের ফলে ভাব জাগে; ভাব প্রবল হইলে বিভাবাদি ক্রমশঃ অগোচর হইতে থাকে এবং চিত্তে ভাবময় একাকার বৃত্তি উঠিতে থাকে। চিত্তের বৃত্তি-নিরোধ হয় না, বৃত্তিগুলি প্রায় তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন হইয়া একটি ভাবময় প্রবাহের আকারে চলে। এই তন্ময়তাই চিত্তের স্থিরতা। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই তন্ময়তা আসে রজস্তমোমুক্ত সত্ত্বগুণময় চিত্তে। তখনই চিদানন্দ-

স্বরূপের আবরণ ভাঙ্গিয়া যায়। অতএব নির্মল কাচে অথবা স্থির সলিলে সূর্য-প্রতিবিম্বের ন্যায় সত্ত্বগুণময় স্থির চিত্তে চিদানন্দস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে। ভাবময় স্থির চিত্তে এই আনন্দস্বরূপের প্রকাশই রস।

(৪) 'স্মৃতি-সহযোগে ভাবাবলম্বনে চর্বণা'—এই কথাটি নূতন যোগ করা হইয়াছে। মম্মট বলিয়াছেন, ভাবই রস হয় (স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ)। অভিনব-গুপ্ত বলিয়াছেন, স্থায়ী ভাব হইতে বিলক্ষণ এই রস (স্থায়িবিলক্ষণ এব রসঃ)। জগন্নাথ বলিলেন, রত্যাদি স্থায়ী ভাব নিজ স্বরূপানন্দের সহিত গোচরীক্রিয়মাণ হইয়া হয় রস (নিজস্বরূপানন্দেন সহ গোচরীক্রিয়মাণঃ রত্যাদি রেব রসঃ)। আমরা বলিলাম, ভাব-তন্ময় চিত্তে স্ব-স্বরূপ চিদানন্দের প্রকাশ অথবা স্মৃতি-সহযোগে ভাবাবলম্বনে যে চর্বণা, তাহাই রস। এখানে প্রকৃতপক্ষে দুইটি নয়, একটি কথা বা প্রক্রিয়াই বলা হইয়াছে।

মূল ব্যাপারটিই ভাঙ্গিয়া বলা যাক্। যোগিগণ জানেন প্রত্যেক রেচক ও পূরকের মধ্যে এবং প্রত্যেক পূরক ও রেচকের মধ্যে বহিঃকুম্ভক ও অন্তঃকুম্ভক আছে। এইরূপ আমাদের প্রত্যেক দুইটি চিত্তবৃত্তির মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কালব্যাপী চিত্তের বৃত্তি-নিরোধও আছে। এই নিরোধের মুহূর্ত হইল শুদ্ধ আনন্দ উপলব্ধির মুহূর্ত। সেই মুহূর্তে জীবাত্মা নিজ বিশিষ্টরূপে থাকে না, আনন্দময় পরমাত্মার সহিত যেন এক হইয়া যায়, যেমন সমুদ্রে সমুদ্রতরঙ্গ শান্ত হইয়া মিলাইয়া যায়। পরমুহূর্তেই স্পন্দন উঠে, যেমন সমুদ্র হইতে সমুদ্রতরঙ্গ উঠে। সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত-স্থিত কাব্যাগত ভাবাবলম্বনে পূর্বোপলব্ধ চিদানন্দ-স্বরূপের কিঞ্চিৎ প্রকাশ বা প্রতিফলন চলিতে থাকে। বিষয়ালম্বনে জাত এই জ্ঞান সবিকল্প জ্ঞান। ইহা আসে স্মৃতিশক্তির সহযোগিতায়। প্রকৃত আনন্দবোধের মুহূর্ত বচনাতীত। পরমুহূর্তে বিভাবাদির আলম্বনে স্মৃতিসহযোগে উহার চর্বণা অর্থাৎ আস্বাদন বা প্রকাশ হয়। তাহাই রস।

সুতরাং স্থায়ী ভাব রসে পরিণত হয় না। স্থায়ী ভাব হইতে রস বিলক্ষণ হইলেও স্থায়ী ভাবের আস্বাদ তাহাতে কিছু মিশ্রিত থাকে। স্থায়ী ভাব নিজ স্বরূপানন্দের সহিত গোচরীক্রিয়মাণ হয় না, স্থায়ী ভাবের আশ্রয়ে নিজস্বরূপানন্দ গোচরীক্রিয়মাণ হয়। আমরা তাই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা করিয়াছি,—শব্দার্থজাত ভাব-তন্ময় চিত্তে আনন্দ-স্বরূপের প্রকাশই রস।

আমি কেবল আমাকেই জানিতে পারি; অপরকে জানিতে পারি ততখানি, যতখানি সেই ব্যক্তি বা বস্তু আমার স্বরূপে আকার প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়। সেই

ক্ষেত্রেও আমাকেই আমি জানি মাত্র। রসের বেলায়ও তাই বলা যায়, তাহা শুদ্ধ আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আমার আত্মভূত ভাবের পরিজ্ঞান। এই ভাব বাহিরের নহে, বাহিরের নায়কাদি-গত ভাব অন্তরে বাসনারূপে স্থিত ভাবকে উদ্বুদ্ধ করে; ভাব তখন আত্মস্বরূপ হইয়া যায়। পূর্বেই অভিনবগুপ্তের প্রসিদ্ধ বাক্য উদ্ধার করা হইয়াছে,—"রসনা চ বোধরূপা এব।" এখানে তাই আস্বাদন ও জ্ঞান এক করিয়া দেখান হইল। রসই জ্ঞান এবং জ্ঞানই রস।।

বহু পরিশ্রমে সুদীর্ঘ জটিল দার্শনিক আলোচনা করিয়া আমরা যে কাব্য-গত বিভাবাদি ও রসের পরিচয় লইলাম, তাহাকে কেমন সহজ ও সুন্দর ভাবে অবলীলাক্রমে পরিস্ফুট করিয়াছেন কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি ক্ষুদ্র কবিতা—'চিত্রা' কবিতায়। দৃশ্যমান জগৎ বস্তুময়, সে বস্তু রূপে রসে গন্ধে, ঘটনায় কত বিচিত্র। কবি এই বহু-বিচিত্রকে 'বিচিত্ররূপিণী' সুন্দরী রূপে কল্পনা করিয়াছেন কবিতার প্রথমার্ধে,—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
 তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুলকাননে,
দ্যুলোকভূলোক বিলসিছ চল চরণে,
 তুমি চঞ্চলগামিনী।
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলক গন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
 কত মঞ্জুল রাগিণী।

* * * *

এই বিচিত্র বস্তুরাশিই কাব্যজগতে শব্দে সমর্পিত হইয়া, হইয়া যায় অলৌকিক বিভাব, এবং ক্রমে তাহারা চিত্তে জাগায় ভাব ও রস। 'আস্বাদাঙ্কুরকন্দ' এই ভাব স্থায়ী হইয়া পরিণত হয় শুদ্ধ রসে; তাহা শান্ত, স্ববিশ্রান্ত, প্রসন্নপ্রকাশময়, দেশকালহীন এক অখণ্ড আনন্দ-দ্যুতি। কবিতার দ্বিতীয়ার্ধে কবি বাহির হইতে অন্তরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সেখানে আর বহুবিচিত্র নাই, অন্তর ব্যাপিয়া প্রকাশ পাইতেছে রসের একটি অখণ্ড উপলব্ধি,—

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তর-ব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্ত শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে,
চারিদিকে চিরযামিনী।
অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কালদেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।
ধীর গম্ভীর গভীর মৌন মহিমা
স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ননীলিমা
স্থির হাসিখানি উষালোকসম অসীমা,
অয়ি প্রশান্তহাসিনী।

—বহুবিচিত্রমূর্তি এক শুদ্ধ রস-মূর্তিতে পরিণত হইয়াছে! উহা যেন 'পুরোভাগে পরিস্ফুরিত হইতেছে, হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে, সর্ব অঙ্গ আলিঙ্গন করিতেছে, অন্য সকলই তিরোহিত করিতেছে, যেন ব্রহ্মানন্দের ন্যায় আস্বাদ অনুভব করাইতেছে।" উহাই "অলৌকিক-চমৎকার-কারী রস"।

৪

রস-তত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ

পাশ্চাত্ত্য দেশে কাব্য-শাস্ত্র বা অলঙ্কার-শাস্ত্রের আদিগুরু গ্রীক্ মনীষী আচার্য আরিস্টটল্। তাঁহার আবির্ভাব-কাল খ্রীস্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দী। তাঁহার প্রণীত *The Poetics* নামক কাব্য-সূত্র গ্রন্থখানিকে অবলম্বন করিয়া ইউরোপ-খণ্ডে বিভিন্ন অলঙ্কার-শাস্ত্র কালক্রমে রচিত ও প্রচারিত হয়। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে মনস্বী এস্. এইচ্. বুচার উক্ত গ্রন্থের গ্রীক্‌মূল ও ইংরেজী অনুবাদ সহ এক বিশদ ভাষ্য প্রণয়ন করেন; আমরা প্রথমে উহাকেই অবলম্বন করিয়া বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয়ে তুলনা-মূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আরিস্টটলের অভিপ্রায় বুচার-কর্তৃক সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই, আরিস্টটলের নামে নিজের কথাই বেশী বলা হইয়াছে,—এরূপ অভিযোগ পরবর্তী পণ্ডিতগণ কেহ কেহ করিয়াছেন, আমরা জানি। আরিস্টটলের রচনা আমরা গভীর মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়াছি, তাহা হইতে আমাদের প্রদর্শিত সমুদয় তথ্য নির্গলিত করা যায় না, ইহাও আমরা স্বীকার করি; এবং এই জন্যই আমরা প্রতিপদে বুচারের নাম উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের দেশে ভাষ্য মূলকে মণ্ডন করিয়া এবং কালোপযোগী নূতন প্রশ্ন-সমূহের আলোচনা ও নূতন ব্যাখ্যান করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া থাকে। এখানেও সেইরূপ হইয়াছে বলিলে কিছুই দোষের হয় না। অবশ্য ব্যাখ্যা ঠিক কি না, এই বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে। আমরা যখন সুপ্রাচীন ভারতীয় সিদ্ধান্তের সহিত আলোচ্য সিদ্ধান্ত-সমূহের অনেক স্থলে সুগভীর ঐক্য উপলব্ধি করি, তখন লেখা বুচারের হইলেও তাহা সমুচিত শ্রদ্ধার ও আলোচনার যোগ্য সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষেও যে খ্রীস্ট-পূর্ব যুগেই আদি নাট্যবেদ, রস-সূত্র, কাব্য ও অলঙ্কার-সূত্রের পত্তন ও প্রচার হয়, তাহা ভরত মুনির প্রণীত নাট্য-শাস্ত্র হইতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ভরতমুনি-কৃত নাট্যশাস্ত্রের অনেক ভাষ্য ও ব্যাখ্যান ছিল। উহার বিশদ ভাষ্য করেন কাশ্মীরীয় পণ্ডিত আচার্য অভিনবগুপ্ত। অভিনবগুপ্তের কাল দশম বা একাদশ শতাব্দী বলিয়া গণ্য করিলেও নাট্য-শাস্ত্রের অন্তর্গত রস-সূত্রের সর্ব-স্বীকৃত ব্যাখ্যা বুচারের অন্ততঃ আট শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছে, বলা যায়।

আচার্য আরিস্টটল্‌ ও অভিনবগুপ্ত উভয়েই মুখ্যতঃ নৈয়ায়িক ও দার্শনিক; প্রগাঢ় দার্শনিক প্রতিভা লইয়া উভয়েই কাব্যশাস্ত্র আলোচনা সম্পন্ন করেন এবং নাটককে শ্রেষ্ঠকাব্য গণ্য করিয়া নিজ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি-অনুযায়ী তাহারই বিশ্লেষণে ব্রতী হ'ন। প্রাচীন গ্রীস ও ভারতবর্ষ উভয় দেশেরই সাহিত্যে সরস বস্তু-বাদ প্রশংসিত হইলেও গ্রীক্‌-দৃষ্টিতে বস্তু এবং ভারতীয় দৃষ্টিতে রস ছিল প্রধান। কলা ও বিদ্যার অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় গ্রীক্‌ ও ভারতীয় মনীষা এই ক্ষেত্রেও নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, আরিস্টটল্‌ ভাব ও রসকে মোটামুটি বুঝিলেও বস্তুবিচারে অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়াছেন এবং '*Mimesis*' বা '*Imitation*' অর্থাৎ 'অনুকরণ'কে কেন্দ্র করিয়াই সমুদয় বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে কিন্তু নাট্যকে 'লোকবৃত্তানুকরণ' বা 'অবস্থানুকৃতি' বলিয়া বুঝিলেও[১] বস্তু অপেক্ষা ভাব ও রসের আলোচনা নাটকেও প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। অভিনবগুপ্ত স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

নাট্যাৎ সমুদায়রূপাদ্ রসাঃ যদি বা নাট্যমেব রসাঃ, রস-সমুদায়ো হি নাট্যম্।

—নাট্যশাস্ত্র, ৬।৩৬, ভাষ্য

—'সমগ্ররূপ নাট্য হইতেই রসসমূহের উৎপত্তি, অথবা নাট্যই রস, রস-সমুদায়ই নাট্য।'

তথাপি ভারতীয় গ্রন্থেও যেমন বস্তু-বিচার দেখা যায়, গ্রীক্ গ্রন্থেও সেই প্রকার আমরা যাহাকে ভাব ও রস বলিয়া বুঝি, তাহার অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। সেই আলোচনা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইব, আচার্য অভিনবগুপ্ত নাট্যরস বা কাব্যরস বুঝাইতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে যে বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রায় সকল অংশই আরিস্টটলের কাব্য-সূত্রে অথবা বুচার-কৃত তাহার ব্যাখ্যানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে বর্তমান। কেবলমাত্র ভাবের রস-নিষ্পত্তি ব্যাপারটির যথার্থ স্বরূপ তাঁহারা অংশতঃ মাত্র উপলব্ধি করিয়াছেন, দেখা যায়। সত্যদর্শী মনীষিগণ দেশ ও কাল নির্বিচারে সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, ইহাই আর একবার এই ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইল। তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা জটিল বিষয়টি অনেক সহজ হইবে, এবং একের সিদ্ধান্ত দ্বারা অপরের ভ্রম বা সন্দেহ নিরসন অথবা সিদ্ধান্তের দৃঢ় সমর্থন হইবে মনে করিয়া আমরা একটু দীর্ঘ হইলেও আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যাত পদ্ধতি-অনুযায়ী আমরা বিষয়গুলি ক্রমান্বয়ে উপস্থিত করিয়া পরীক্ষা করিব।

অভিনবগুপ্ত রস-নিষ্পত্তি বুঝাইতে গিয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখাইয়াছেন,—

(১) নাট্য ও কাব্যের উদ্দেশ্য আনন্দ বা রস ;

(২) রস সহৃদয় সামাজিকের ;

(৩) মুখ্য বিষয় মানবজীবন, প্রকৃতি উদ্দীপন-বিভাব মাত্র ;

(৪) রসের বা আনন্দের উৎপত্তি ভাব হইতে ;

(১) লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্।—নাট্যশাস্ত্র, ১।১১৩

—'লোকবৃত্তের অনুকরণ-রূপ এই নাট্য আমাকর্তৃক রচিত হইয়াছে।'

অবস্থানুকৃতি র্নাট্যম্।—দশরূপক, ১।৭

—'অবস্থার অনুকরণই নাটক।'

(৫) স্থায়ী ভাব ও সঞ্চারী ভাব;
(৬) আলম্বন-বিভাব, উদ্দীপন-বিভাব ও অনুভাব;
(৭) বাসনা-লোক;
(৮) সাধারণী-করণ;
(৯) ভাবের রসতা-প্রাপ্তি।

যথাক্রমে উল্লিখিত নয়টি বিষয় তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) নাট্য ও কাব্যের উদ্দেশ্য:—

এই বিষয়ে আরিস্টটলের অভিমত যে ভারতীয় মতের অনুরূপ, তাহা পূর্বেই প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে আরও স্পষ্ট করিয়া বিষয়টি উপস্থিত করা হইতেছে। বুচার বলেন,—

"The other theory, tacitly no doubt held by many, but put into definite shape first by Aristotle, was that poetry is an emotional delight, its end is to give pleasure."

—*Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art*, p. 215

—'কিন্তু অপর মতবাদটি, যাহা নিঃসন্দেহে অনেকেই মনে মনে সমর্থন করিতেন, কিন্তু আরিস্টটল্ সর্বপ্রথমে সুনির্দিষ্ট আকারে পরিণত করেন, তাহা হইতেছে এই যে,—কাব্য রসাত্মক এবং উহার উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা।'

'Emotional delight' হইতেছে emotion অর্থাৎ ভাব হইতে জাত আনন্দ, তাহাকেই আমরা রস বলিয়া থাকি। ভাবেরও একটি স্বাভাবিক আনন্দ আছে, তাহা কিন্তু রস নয়। ভাবের আনন্দ চঞ্চল, ক্রিয়াশীল, রজোগুণাত্মক; তাহা নিম্নস্তরের। রস ঊর্ধ্বস্তরের, তাহা এক শান্ত প্রসন্ন প্রকাশ। 'Emotional delight' বলিতে যে এই ভাবের আনন্দ বুঝান হয় নাই, উচ্চতর শুদ্ধ স্বতন্ত্র আনন্দ বুঝান হইয়াছে, তাহার প্রমাণ আনন্দ-সম্পর্কে বিভিন্ন স্থলে প্রযুক্ত অর্থপূর্ণ বিশেষণগুলি। অল্প পরেই পুনরায় উল্লেখ করা হইয়াছে,—

"The object of poetry, as of all the fine arts, is to produce an emotional delight, a pure and elevated pleasure." —*Ibid*, p. 221

—'সকল সুকুমার কলার ন্যায় কাব্যেরও উদ্দেশ্য হইতেছে রস অর্থাৎ এক বিশুদ্ধ ঊর্ধ্বভূমির আনন্দ সৃষ্টি করা।'

পরবর্তী অংশে (*Ibid*, p. 226) বলা হইয়াছে 'sane and wholesome

pleasure'—ধীর ও হিতকর আনন্দ। ইহারও পরে (*Ibid*, p. 238) বলা হইয়াছে 'refined pleasure'—সুমার্জিত আনন্দ। তারপর (*Ibid*, p. 267 এবং p. 271) পুনরায় উহারই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 'noble emotional satisfaction'—ভাব-সমুখ মহতী তৃপ্তি এবং 'pleasurable calm'—আনন্দময় প্রশান্তি।

যে আনন্দ বিশুদ্ধ ও উর্ধ্বভূমির, এবং ধীর ও হিতকর, যাহা আবার সুমার্জিত এবং ভাব-সমুখ মহতীতৃপ্তি ও আনন্দময় প্রশান্তি, তাহা যে ভাবের আনন্দ নয়, তাহা সুস্পষ্ট। আমরা তাহাকেই সাধারণ ভাবে রস বলিব। এই রসের মূলীভূত ভাবকে অন্যত্র (*Ibid*, p. 128) 'æsthetic emotion' বলা হইয়াছে। সাধারণ ভাব যে চঞ্চল, অশান্ত, তাহা এই মনীষীর দৃষ্টি এড়ায় নাই; উক্ত স্থলেই কিঞ্চিৎ পূর্বে বলা হইয়াছে,—

"The real emotions, the positive needs of life, have always in them some element of disquiet."—*Ibid*, p. 123

—'জীবনে আসল ভাবগুলির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সর্বদাই এক অশান্ত উপাদান বর্তমান।'

নাট্য বা কাব্যের প্রয়োজন-বিষয়ে এবং সাধারণ ভাবে রসের বিষয়েও উভয় দেশে এক মত লক্ষ্য করা গেল।

(২) রস সহৃদয় সামাজিকের :—

এই বিষয়ে পূর্বেই অষ্টম পৃষ্ঠায় প্লেটো ও আরিস্টটলের অনুরূপ অভিমত সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বুচার অতি স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছেন,—

"Aristotle's theory has regard to the pleasure not of the maker but of the 'spectator' who contemplates the finished product. Thus while the pleasures of Philosophy are for him who philosophises—for the intellectual act is an end in itself—the pleasures of art are not for the artist but for those who enjoy what he creates; or if the artist shares at all in the distinctive pleasure which belongs to his art, he does so not as an artist but as one of the public."—*Ibid*, pp. 206-207

—'রস-সম্পর্কে আরিস্টটলের মতবাদ হইতেছে এই যে, উহা স্রষ্টার বা কবির নয়, কিন্তু যে দর্শক সম্পূর্ণ রচনা উপলব্ধি করেন, উহা তাঁহার। এইরূপে যদিও দর্শনের

আনন্দ কেবলমাত্র তাঁহারই জন্য যিনি দার্শনিক চিন্তা করেন—কেননা বুদ্ধির ব্যাপারটিই উঁহার একমাত্র লক্ষ্য—শিল্পকলার আনন্দ শিল্পীর জন্য নয়, কিন্তু যাঁহারা শিল্পীর সৃষ্টিকে ভোগ করেন, একমাত্র তাঁহাদেরই জন্য ; অথবা শিল্পী যদি একান্তই শিল্পের বিশিষ্ট আনন্দকে লাভ করেন, তিনি তাহা শিল্পি-স্বরূপে নয়, একজন সামাজিকস্বরূপেই করিয়া থাকেন।'

এই মতবাদ-সম্পর্কে আরিস্টটলের চিন্তায় অসঙ্গতি আছে কি না পরীক্ষা করিয়া বুচার শেষে মন্তব্য করেন,—

"Thus the productive activity of the artist is not unnaturally subordinated to the receptive activity of the person for whom he produces."—*Ibid*, p. 210

—'যাহার জন্য শিল্প-সৃষ্টি, তাহার ধারণা-শক্তি অনুযায়ী যে শিল্পীর শিল্পকর্ম নিয়মিত হইয়া থাকে, তাহা অস্বাভাবিক নহে।'

Ethics অর্থাৎ নীতিশাস্ত্রেও আরিস্টটল নীতি-গত জটিল প্রশ্ন সমাধানের জন্য নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন সজ্জনের বিচারকে মান্য করিতে বলেন, এবং শেষ উপায়রূপে তাঁহাকেই ন্যায়ের 'the Standard and the Law' অর্থাৎ আদর্শ ও বিধি বলিয়া গিয়াছেন (*Ethics, Nic. iii*, 4. 1113 *a* 33) [১]।

আরিস্টটলের মতে সুকুমার শিল্পেও ঐ প্রকার—

"...a man of sound aesthetic instincts is assumed, who is the standard of taste, and to him the final appeal is made."

—*Ibid*, p. 211

'সৌন্দর্যের সুগভীর বাসনাময় এক ব্যক্তিকে ধরা হয়, যিনি রস-সংবেদন শক্তির আদর্শ স্বরূপে বর্তমান থাকেন এবং যাঁহার নিকট শেষ আবেদন জানান হয়।'

(১) আমাদের শাস্ত্রেও অনুরূপ অভিমত দেখা যায়। মনু ধর্মের লক্ষণ বলিয়াছেন,—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভি র্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ। —মনুসংহিতা, ২।১

—'রাগ-দ্বেষ-হীন বিদ্বান্ অর্থাৎ বেদবিদ্ এবং সজ্জনগণ কর্তৃক যাহা নিত্য সেবিত তাহাই ধর্ম।'

পরবর্তী ষষ্ঠ শ্লোকে ধর্মের অন্যতম মূল বলা হইয়াছে সাধুগণের আচার—'আচারশ্চৈব সাধূনাম্'।

ইহাকে কখন 'subjective impression' (p. 209)—আত্মগত সংস্কার, কখনও বা 'subjective emotion' (p. 210)—আত্মগত ভাব বলা হইয়াছে।

এই বিষয়ে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(৩) মানবজীবন ও প্রকৃতি :—

আরিস্টটলের মতে মানব-জীবনই নাট্য, কাব্য বা শিল্পের প্রকৃত বিষয়বস্তু; নিসর্গ বা ইতর প্রাণিসমূহ কখনও 'Imitation' বা অনুকরণের প্রকৃত বস্তু হইতে পারে না। বুচার বলেন,—

"Aristotle's theory is in agreement with the practice of the Greek poets and artists of the classical period, who introduce the external world only so far as it forms a background of action, and enters as an emotional element into man's life and heightens the human interest."—*Ibid*, p. 124

—ক্লাসিক্যাল যুগের গ্রীক কবি ও শিল্পিকুলের প্রথার সহিত আরিস্টটলের মতবাদের ঐক্য বর্তমান। তাঁহারা বহির্জগৎকে কাব্যে বর্ণিত করিতেন বটে, কিন্তু যতখানি ইহা ঘটনার পটভূমি নির্মাণ করে এবং মানবজীবনে ভাবময় উপাদান যোগায় ও মানবীয় আগ্রহ বৃদ্ধি করে, ততখানি মাত্র।

সেই যুগে, অথবা সাধারণ ভাবে বলা চলে প্রাক্-গীতিকাব্য যুগে আমাদের দেশেও মানবীয় ব্যাপারই ছিল নাটক ও কাব্যের একমাত্র বিষয়বস্তু; প্রকৃতি বা মানবেতর প্রাণী ছিল ভাবের উদ্দীপন-বিভাব মাত্র।

(৪) রসের বা আনন্দের উৎপত্তি ভাব হইতে :—

বুচার বলেন,—

"...he (Aristotle) makes it plain that aesthetic enjoyment proper proceeds from an emotional rather than from an intellectual source. The main appeal is not to the reason but to the feelings."
—*Ibid*, p. 202

—'তিনি (আরিস্টটল্) ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, সৌন্দর্য বা রসের সমুচিত সম্ভোগ বুদ্ধির উৎস অপেক্ষা বরং ভাবের উৎস হইতেই আসিয়া থাকে। প্রধান আবেদন বুদ্ধির নিকটে নয়, অনুভূতির নিকটে।'

(৫) স্থায়ী ভাব ও সঞ্চারী ভাব :—

ভাব বা Emotion-এর কথা আরিস্টটল্ সর্বস্থলেই বলিয়াছেন। বুচারের আলোচনা হইতে মনে হয়, 'primary emotion' ও 'more transient emotion' নাম দিয়া আমরা স্থায়ী ভাব ও সঞ্চারী ভাব বলিতে যাহা বুঝি, তাহাই বুঝান হইয়াছে। ভাবের মধ্যে যে 'element of disquiet' বা অশান্ত উপাদান আছে, এ বিষয়ে তাঁহাদের মত পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বুচার বলেন, আরিস্টটলের মতে 'aesthetic imitation' বা রসানুকূল অনুকৃতি তিন প্রকার,—character, emotion এবং action,[১] অর্থাৎ চরিত্র, ভাব এবং কর্ম। ইহারা মুখ্যতঃ আমাদের কথিত স্থায়ী ভাব, সঞ্চারী ভাব ও অনুভাব। বুচার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, 'character' বলিতে বুঝায়,—

"...the characteristic moral qualities, the permanent dispositions of the mind, which reveal a certain condition of the will."

—*Ibid*, p. 123

'স্বভাব-সিদ্ধ নৈতিক গুণগুলি, মনের স্থায়ী ধর্মগুলি যাহারা ইচ্ছাশক্তির একটি বিশেষ অবস্থা জ্ঞাপন করে।'

বলা বাহুল্য, ইহারা হইতেছে প্রধানতঃ নায়ক-নায়িকা প্রভৃতির চিত্ত-গত স্থায়ী ভাব। পরবর্তী আলোচনায় ইহা আরও স্পষ্ট হইবে।

'Emotion' বলিতে বুঝায়,—

"...the more transient emotions, the passing moods of feeling."

—*Ibid*, p. 123

—'অধিকতর অস্থায়ী ভাবগুলি, ভাবের সঞ্চারী অবস্থা-সমূহ।'

বলা বাহুল্য, ইহারাই স্থায়ী ভাবের সঞ্চারী ভাব। উদাহরণস্বরূপ বুচারের উক্তিই উদ্ধার করা যাইতে পারে; যথা—

"Thus in psychological analysis fear is the primary emotion from which pity derives its meaning."—*Ibid*, p. 257

---

(১) "...for even dancing imitates character, emotion and action by rhythmical movement."—*Aristotle's Poetics*, i. 5.

—কারণ, এমন কি নৃত্যও ছন্দোময় গতিদ্বারা চরিত্র, ভাব এবং কর্ম অর্থাৎ ঘটনাকে অনুকরণ করিয়া থাকে।

—'এইরূপে মনস্তত্ত্ব-সম্মত বিশ্লেষণে ভয় হইতেছে প্রধান ভাব, ইহা হইতেই অনুকম্পা তাহার অর্থ লাভ করিয়া থাকে।'

আমাদের ভাষায় বলিব, ভয় স্থায়ী ভাব এবং অনুকম্পা সঞ্চারী ভাব।

(৬) আলম্বন-বিভাব, উদ্দীপন-বিভাব ও অনুভাব :—

মানবজীবন ও প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় আলোচনাই মুখ্যতঃ আলম্বন-বিভাব ও উদ্দীপন-বিভাবের আলোচনা ; ইহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বুচারের আরও একটি বাক্য এই বিষয়ে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে ; যথা—

"...for all the arts imitate human life in some of its manifestations, and imitate material objects only so far as these serve to interpret spiritual and mental processes."—*Ibid*, p. 144

—'কেন না, সমুদয় শিল্পকলাই মনুষ্য-জীবনকে তাহার কতিপয় অভিব্যক্তির দিক হইতে অনুকরণ করিয়া থাকে, এবং জড় বা স্থূল বস্তুসমূহকেও যতখানি তাহারা আধ্যাত্মিক বা মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করিতে সাহায্য করে, ততখানি অনুকরণ করিয়া থাকে।'

এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, গ্রীকগণের মতে নানাবিধ মনুষ্য-জীবনই আলম্বন-বিভাব এবং পারিপার্শ্বিক স্থূল জগৎ কেবলমাত্র উদ্দীপন-বিভাব।

অনুভাব-সম্বন্ধে বুচারের ব্যাখ্যান আরও অনেক স্পষ্ট,—

"Everything that expresses the mental life, that reveals a rational personality, will fall within this larger sense of action."

—*Ibid*, p. 123

—'যাহা কিছু মানসিক জীবনকে প্রকাশ করে, বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিপুরুষকে অভিব্যক্ত করে, তাহাই কর্মের বৃহত্তর অর্থের অন্তর্গত হইবে।'

যে সমুদয় কর্ম দ্বারা চিত্তগত ভাবকে বুঝা যায়, তাহারাই সেই সেই ভাবের অনুভাব। অতএব, পূর্বে বা এখানে 'action' শব্দের অভিপ্রেত অর্থই আমাদের কথিত অনুভাব।

(৭) বাসনা-লোক :—

ঠিক বাসনা-লোক বলিয়া বা বাসনার উদ্বোধ বলিয়া কোন কিছু আরিস্টটল্ বা বুচার আলোচনা করেন নাই। তবে 'phantasy' সম্পর্কে যে আলোচনা, তাহা হইতে এই বিষয়ে খানিকটা আলোক পাওয়া যায়। বুচার বলেন,—

"...more simply we may define it as the after-effect of a sensation, the continued presence of an impression after the object which first excited it has been withdrawn from actual experience."—*Ibid*, p. 125

—'আরও সহজ করিয়া আমরা ইহাকে ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের পরবর্তী ফল বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি ; ইহা সংস্কারের ধারাবাহিক সত্তা যাহা তাহার প্রথম উদ্বোধক বস্তুটিকে বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইলেও বর্তমান থাকে।'

ইহারই সাহায্যে স্বপ্ন বা অন্যবিধ মায়া-দর্শন ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। ইহারই সাহায্যে মানস-লোকে নানাবিধ রূপের সৃষ্টি হয় এবং মনের পূর্ব-অভিজ্ঞাত চিত্রসমূহ পুনরায় স্মরণ বা দর্শন করিতে পারি। বুচার বলেন,—

"It represents subjectively all the particular concrete objects perceived by the external senses."—*Ibid*, p. 126

—'ইহা বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা পরিগৃহীত স্থূল বিষয়সমূহকে বিষয়ীর আত্মগতভাবে প্রদর্শন করিয়া থাকে।'

বুচার আরও বলেন,—

"It is treated as an image-forming faculty, by which we can recall at will pictures previously presented to the mind."

—*Ibid*, 126

—'ইহাকে এমন একটি মনোবৃত্তি বলিয়া মনে করা হয়, যাহা দ্বারা মানসলোকে নানাবিধ রূপের সৃষ্টি হয় এবং আমরা ইচ্ছামত মনের নিকট পূর্ব-আনীত চিত্রসমূহ দর্শন বা স্মরণ করিতে পারি।'

বলা বাহুল্য, এই বর্ণনাদ্বারা বাসনা-লোকের অনেক কথাই বলা হইল।

(৮) সাধারণীকরণ :—

এই পদ্ধতিটি মোটামুটি ভাবে ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক অনেক পণ্ডিত সমালোচকই লক্ষ্য করিয়াছেন। আর্টের অনুশীলনে আমরা যে উচ্চতর ভূমিতে উন্নীত হই, পরিমিত ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া বিশ্বজনের সহিত এক দুর্লভ সাধারণত্বে দীক্ষিত হই, ইহা না বুঝিলে আর্ট অথবা কাব্যশিল্পের মর্ম-কথাই অজ্ঞাত থাকিয়া যায়।

বুচারের মতে এই প্রক্রিয়ার দুইটি দিক,—প্রথম, কাব্যগত নায়কের সহিত একাত্মভাব; দ্বিতীয় বিশ্বজনের সহিত একাত্মভাব।

প্রথমেই বলা হইল, নায়কের চরিত্রে এইরূপ সমুন্নত মানবিকতা থাকা চাই, যাহাতে—

"......we are able in some sense to identify ourselves with him, to make his misfortunes our own."—*Ibid*, p. 261

—'আমরা কতক পরিমাণে তাহার সহিত আমাদের অভিন্নতা বোধ করিতে পারি, তাহার দুর্ভাগ্যকে আমাদের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।'

বুচার পরেই আবার বলিতেছেন—

"......the hero in whose existence we have for the time merged our own."—*Ibid*, p. 262.

—'নায়ক যাহার সত্তায় আমরা তৎকালের জন্য আমাদের সত্তা মিশাইয়া দিয়াছি।'

এই প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ব্যাপারটির ফলে—

"The spectator is lifted out of himself. He becomes one with the tragic sufferer and through him with humanity at large."

—*Ibid*, p. 266

—'প্রেক্ষক তাহার স্বাভাবিক সত্তার উর্ধ্বে উন্নীত হন। তিনি দুঃখভোগকারীর সহিত এবং তাহারই মধ্য দিয়া বিশ্বমানবের সহিত এক হইয়া যান।'

যাহার বলে ইহা সম্ভবপর হয়, তাহা হইতেছে,—

"the enlarging power of sympathy."—*Ibid*, p. 266.

—'সহানুভূতির সম্প্রসারিকা শক্তি।'

সাধারণীকরণের শেষ পরিণাম-স্বরূপ—

"He forgets his own petty sufferings. He quits the narrow sphere of the individual."—*Ibid*, p. 266.

—'তিনি নিজের ক্ষুদ্র দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিয়া যান। তিনি ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি পরিত্যাগ করেন।'

সাধারণীকরণের ফলে ভাবের শুদ্ধীকরণ সর্বাগ্রে লক্ষণীয়। ভাব শুদ্ধ ও শান্ত হইলে ক্রমে রসতা প্রাপ্ত হয়, এই বিষয়ে বুচার বলিতেছেন,—

"The true tragic fear becomes an almost impersonal emotion, attaching itself not so much to this or that particular incident,

as to the general course of the action which is for us an image of human destiny."—*Ibid*, p. 263

—'প্রকৃত শোকাবহ ভয় প্রায় একটি নৈর্ব্যক্তিক ভাবে পরিণত হয়; তাহা বিশিষ্ট-রূপ এই ঘটনা বা ঐ ঘটনার সহিত তত যোগ রাখে না, যত রাখে ঘটনার সাধারণ গতির সহিত, এবং তাহাই আমাদের নিকট মানব-নিয়তির এক প্রতিমূর্তি।'

ভাবের রসতাপ্রাপ্তি বুঝাইতে সাধারণীকরণ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

(৯) ভাবের রসতা-প্রাপ্তি :—

আমাদের কাব্যশাস্ত্র-বিচারেও এই চরম প্রক্রিয়াটি দার্শনিক এবং খানিকটা দুর্বোধ। এই প্রক্রিয়াকে বুচার কোথাও 'purification of the passions' (*Ibid*, p. 243) —ভাবসমূহের শুদ্ধীকরণ, কোথাও 'clarifying process' (*Ibid*, p. 255) —শুদ্ধি-প্রক্রিয়া, কোথাও বা 'refining process' (*Ibid*, p. 267)—সংক্রিয়া বলিয়াছেন। আরিস্টটল্ এই প্রক্রিয়ার নাম উল্লেখ করিয়াছেন '*Katharsis*'; কিন্তু উহা যে কি তাহা তাঁহার লেখা বলিয়া প্রাপ্ত অসম্বদ্ধ সূত্র-সমূহ হইতে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। বুচার নিজেই বলিতেছেন,—

"But what is the nature of this clarifying process? Here we have no direct reply from Aristotle."—*Ibid*, p. 255.

—'কিন্তু এই শুদ্ধি-প্রক্রিয়ার স্বরূপ কি? এই বিষয়ে আমরা আরিস্টটলের কাছ লইতে সাক্ষাৎভাবে কোন উত্তর পাই না।'

আরিস্টটল্ হইতে প্রাপ্ত কয়েকটি অস্ফুট ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করিয়া বুচার যে ব্যাখ্যান দিয়াছেন, তাহা 'modern conception' বা আধুনিক ধারণা বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বুচার লিখিতেছেন,—

"...if this is not what Aristotle meant, it is at least the natural outcome of his doctrine; to this conclusion his general theory of poetry points."—*Ibid*, pp. 268-269

—'আরিস্টটল্ যাহা বুঝিয়াছিলেন, ইহা যদি তাহা নাও হয়, তবে ইহা অন্ততঃ তাঁহার অভিমতের স্বাভাবিক পরিণাম, তাঁহার কাব্য-বিষয়ক সাধারণ মতবাদ এই সিদ্ধান্তই নির্দেশ করিতেছে।'

বুচারের পূর্বেও বেনাইন, লিসিং ও গেটে-প্রমুখ ইউরোপের অনেক মনীষী '*Katharsis*'-এর নানাপ্রকার বিচিত্র ব্যাখ্যা দিয়াছেন; সে সমুদয় ব্যাখ্যা বুচারই

অশ্রদ্ধেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। বুচার যে ব্যাখ্যান দিয়াছেন, তাহাতে ভাবের রসতা-প্রাপ্তির অথবা রসের পরিস্ফূর্তির ল দুইটি ব্যাপারের একটি ব্যাপার অন্ততঃ কতিপয় স্থলে পরিষ্কার করা হইয়াছে। অভিনবগুপ্ত স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, রসের প্রকাশের জন্য পরিমিত ব্যক্তিত্বের বিস্মরণের ফলে ভাব-স্থির চিত্তে স্বসংবিদ্ আনন্দের প্রকাশ হয়; তাহাই রস। দ্বিতীয় ব্যাপারটি আমরা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে স্পষ্টরূপে পাইতে আশা করিতে পারি না। কিন্তু সুখের বিষয়, দ্বিতীয় ব্যাপারটির অপর পিঠ যে প্রথম ব্যাপারটি তাহা বুচারের আলোচনায় কোথাও কোথাও স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে ; যথা,—

"The sting of the pain, the disquiet and unrest arise from the selfish element which in the world of reality clings to these emotions. The pain is expelled when the taint of egoism is removed."—*Ibid*, p. 268

—'এই বাস্তব জগতে ভাবগুলির সহিত যে স্বার্থাংশ জড়িত থাকে, তাহা হইতেই অস্থিরতা, অশান্তি ও বেদনার দংশন জন্মিয়া থাকে। স্বার্থবাদের বা অহমিকার দোষ-মুক্ত হইলেই বেদনা দূরীভূত হয়।'

ভয়-ভাব বেদনাময়, তাহা চিত্তের তমঃ ও রজোগুণ আশ্রয় করিয়া থাকে। অহমিকা-মুক্ত হওয়াই রজস্তমোগুণ হইতে তৎকালের জন্য মুক্ত হওয়া, অর্থাৎ চিত্তের বিক্ষেপ ও আবরণ দূরীভূত হওয়া, তাহারই ফলে চিদানন্দ-স্বরূপের অবাধিত প্রকাশ হয়। চিত্ত অহমিকার দোষ-মুক্ত হয় পূর্ব ব্যাখ্যাত সাধারণীকরণের ফলে।

বুচার দ্বিতীয় ব্যাপারটি উপলব্ধি করিতে না পারায় প্রথম ব্যাপারটিকেই নানা ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সুস্পষ্টতার অভাবে শব্দারণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রান হইয়াছেন ; যেমন,—

"As the tragic action progresses, when the tumult of the mind, first roused, has afterwards subsided, the lower forms of emotion are found to have been transmuted into higher and more refined forms. The painful element in the pity and fear of reality is purged away ; the emotions themselves are purged. The curative and tranquillising influence that tragedy exercises follows as an immediate accompaniment of the transformation of feeling."

—*Ibid*, p. 254

—'বিষাদাত্মক ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে প্রথমে সঞ্জাত মানসিক বিক্ষোভ পরে প্রশমিত হইয়া যায়, তখন ভাবের নিকৃষ্টতর রূপগুলি উচ্চতর এবং সূক্ষ্মতর রূপে পরিণত হইতে দেখা যায়। বাস্তবজগতের অনুকম্পা ও ভয়ের দুঃখাবহ উপাদান শুদ্ধীকৃত হয়; সেই সেই ভাবগুলি নিজেরাই যেন সংস্কৃত হইয়া যায়। ভাবের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই ট্র্যাজেডি যে হিতকর এবং প্রশান্তিকর প্রভাব বিস্তার করে, তাহা প্রকাশ পাইতে থাকে।'

বুচার পূর্বেও বলিয়াছেন,—

"In the pleasurable calm which follows when the passion is spent, an emotional cure has been wrought."—*Ibid*, p. 246

—'ভাবাবেগ বিনষ্ট হইয়া গেলে যে আনন্দময় প্রশান্তি আসে, তাহাতে ভাবের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে।'

আমরা জিজ্ঞাসা করি,—মনের অগোচর দেশ হইতে স্থির আনন্দের প্রকাশ না হইলে মনোরাজ্যের বিক্ষোভ প্রশমিত হয় কি করিয়া? ঊর্ধ্বভূমি হইতে নবীন চেতনার স্পর্শ না পাইলে ভাব তাহার স্থূলতা পরিহার করিয়া সূক্ষ্মরূপ লাভ করে কি করিয়া? অথবা, নূতন অপর কোন কারণের অপেক্ষা না রাখিয়া ভাবগুলি আপনা-আপনি সংস্কৃত হয় কি করিয়া? আমরা জিজ্ঞাসা করি, ভাবাবেগ কি অমনি বিনষ্ট হয় এবং pleasurable calm অর্থাৎ আনন্দময় প্রশান্তি কি অমনি আসিয়া থাকে? সকল প্রশ্নেরই এক উত্তর, 'taint of egoism' বা অহমিকার দোষ একেবারে দূরীভূত হইলে মনোরাজ্যের অতীত দেশে আমাদের বোধানন্দময় সত্তার প্রকাশ উপলব্ধ হয় এবং তখন সমস্ত অলৌকিক ব্যাপারই সহজে বোধ-গম্য হয়।

কেবলমাত্র *Katharsis* বলিলে, অথবা তাহাকে "the expulsion of a painful and disquieting element" *(Ibid, p.* 255)—অর্থাৎ দুঃখাবহ অশান্তিকর উপাদানের অপসারণ বলিয়া বুঝাইলে, বিশেষ কিছুই বলা হয় না। স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার সাক্ষাৎ স্পর্শ না পাওয়া পর্যন্ত প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠিতে থাকিবে।

মুস্কিল এই, গ্রীক্‌গণ সাধারণতঃ Ethics অর্থাৎ নীতির জগতে বিহার করিতেন, আধ্যাত্মিক জগৎ তাঁহাদের দুরধিগম্য ছিল; ভারতীয়গণ সকল প্রশ্নের শেষ সমাধানের জন্য সহজেই আধ্যাত্মিক সত্তায় দৃঢ়-ভূমি হইয়া দাঁড়াইতেন। গ্রীক্ ও

ভারতীয় অথবা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রকৃতির এই বৈলক্ষণ্য সার্ জন মার্শাল সুন্দর করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"The vision of the Indian was bounded by the immortal rather than the mortal, by the infinite rather than the finite. Where Greek thought was ethical, his was spiritual; where Greek was rational, his was emotional."

—*The Monuments of Ancient India,*
Cambridge History of India, Vol. I., p. 649

—'ভারতবাসীর দৃষ্টি সান্ত অপেক্ষা অনন্ত এবং নশ্বর অপেক্ষা অবিনশ্বর ভাব দ্বারাই আবদ্ধ ছিল। যেখানে গ্রীকের চিন্তা ছিল নৈতিক, তাহার ছিল আধ্যাত্মিক; যেখানে গ্রীকের ছিল যুক্তি-নিষ্ঠা, তাহার ছিল ভাব-নিষ্ঠা।'

আরিস্টটল ও বুচার সম্পর্কে আমাদের আর একটি মন্তব্য আছে,—ট্র্যাজেডির মোহে তাঁহারা এত আবিষ্ট ছিলেন যে, ভয় ভাব ছাড়া আর কোন ভাবের এই অলৌকিক রূপান্তরীকরণ এবং তাহার ফলে আনন্দময় প্রশান্তির প্রকাশ সুষ্ঠুভাবে লক্ষ্য করিতে অথবা স্বীকার করিতে পারেন নাই। বুচার রতিভাব বা ভালবাসা সম্পর্কে প্রশ্নটি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু সম্যক্ আলোচনা না করিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন অহমিকাময় এবং আত্মকেন্দ্রিক বলিয়া রতিভাবের অবলম্বনে সাধারণীকরণ হইতে পারে না[১]। ট্র্যাজেডির আশ্রয়ে একটি বিশেষ ভাবের পরিস্ফুটনে তাহাদের দৃষ্টি একান্ত গণ্ডিবদ্ধ হইয়া রহিল।

ট্র্যাজেডির রস যে নাট্যে বা কাব্যে শ্রেষ্ঠ রস, তাহা প্রতীচ্যখণ্ডে প্রাচীন যুগের আরিস্টটল বা আধুনিক যুগের কবি শেলির ন্যায় ভারতবর্ষে আচার্য অভিনবগুপ্তও স্বীকার করিতেন। কবি শেলি ছন্দোবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন,—

"Our sweetest songs are those
That tell of saddest thoughts."

—'আমাদের মধুরতম সঙ্গীতগুলি গভীরতম দুঃখের কথাই ব্যক্ত করে।'

অভিনবগুপ্ত স্পষ্টাক্ষরে মন্তব্য করিয়াছেন,—

'সম্ভোগ-শৃঙ্গারাৎ মধুরতরো বিপ্রলম্ভঃ, ততোঽপি মধুরতমঃ করুণ ইতি।'

—ধ্বন্যালোক, ২.৯, টীকা

---

(১) *Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art*, p. 272

—'সম্ভোগ-শৃঙ্গার হইতে মধুরতর বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার বা বিরহ, তাহা হইতেও মধুরতম করুণ-রস।'

শৃঙ্গাররসকে আলঙ্কারিকগণ সৃষ্টি-নিয়মে আদিরস বলিলেও ভারতীয় কাব্যেতিহাসের ঐতিহ্য-অনুযায়ী করুণ রসই আদিরস। ক্রৌঞ্চ-বিয়োগ-দুঃখে বাল্মীকি মুনির শোকভাব করুণরসে পরিণত হইয়া শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই নাকি ভারতের সাহিত্যাকাশে প্রথম কবিতা-উষার আবির্ভাব। তথাপি ভারতীয় আচার্যের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় নাই। একটি বিশেষ ভাবে যাহার প্রকাশ, তাহার মনস্তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতত্ত্বের প্রক্রিয়া-ক্রম উপলব্ধি করিয়া ভারতীয় মনীষা কেবল করুণ রসের নয়, সাধারণ ভাবে সমগ্র রসতত্ত্বের ধারণা ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

এই সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেও হইয়াছে, পরেও হইবে।

সুখের বিষয়, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্‌ ও শেলি-প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য কবিগণ এবং বার্গসোঁ ও ক্রোচে-প্রমুখ দার্শনিকগণ কেবলমাত্র একটি বিশেষ ভাবের উদ্দীপনে শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ স্বীকার করেন নাই; তাঁহারা ভাবের নিবিড়তা ও ব্যাপ্তিমাত্র লক্ষ্য করিয়া সাধারণ ভাবেই কাব্যবিচার সম্পন্ন করিয়াছেন। উল্লিখিত কবি ও দার্শনিকগণ অসম্পূর্ণ ভাবে হইলেও রসোপলব্ধির পূর্বাবস্থা সাধারণীকরণ-সম্পর্কে যে বিভিন্ন আলোচনা করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার মত।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রদত্ত কাব্য-সংজ্ঞা মুখ্যতঃ সহৃদয় পাঠকের দিক হইতে নয়, কাব্য-স্রষ্টা কবির দিক হইতে; অবশ্য অবসানে তিনিও পাঠককে স্মরণ করিয়া তাহারই অতিশয়িত আনন্দে লক্ষণ নির্ণয় শেষ করিয়াছেন। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ প্রথম বলিলেন,—

"I have said that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings ; it takes its origin from emotion recollected in tranquillity."—*Poetry and Poetic Diction*

—'আমি বলিয়াছি, কাব্য হইতেছে প্রবল অনুভূতি-নিচয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস; প্রশান্ত অবস্থায় স্মৃত ভাব হইতে ইহার উৎপত্তি।'

উক্ত সংজ্ঞার শেষাংশ আমাদের রসাত্মক বাক্য যে কাব্য, তাহারই এক অস্ফুট ধারণা জন্মায়। কাব্য ভাব নয়, ভাব হইতে তাহার উৎপত্তি, এবং স্মৃতি-সহযোগে চিত্তের অচঞ্চল শান্ত অবস্থায় যে ভাব-চর্বণা, তাহা হইতেই কাব্যের উৎপত্তি। ভাবের রসে পরিণতির অনতিস্পষ্ট ইঙ্গিত যে এখানে রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রস চিত্তের চঞ্চল অবস্থায় পরিস্ফুট হয় না, ভাব-স্থির অবস্থায় প্রকাশিত হয়। ইহাকে তাই ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌-এর প্রসিদ্ধ 'I wandered lonely as a cloud' কবিতার শেষ ভাগে (যাহা তাঁহার পত্নীর রচনা বলিয়া খ্যাত) 'bliss of solitude' বা নির্জনতার আনন্দ বলা হইয়াছে। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ নিজেই উক্ত কাব্য-লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং শান্ত অবস্থার তিরোভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে বাসনা-লোকের স্ফুরণের ফলে ভাবের উদ্বোধের কথা অস্পষ্ট ভাবে স্বীকার করিয়াছেন; যথা—

"...the tranquillity gradually disappears, and an emotion, kindred to that which was before the subject of contemplation, is gradually produced." —*Ibid*

—'...শান্ত অবস্থা ক্রমশঃ কাটিয়া যায়, এবং বিষয়বস্তু ধারণার পূর্বে যে ভাব ছিল, সেই জাতীয় ভাব ক্রমে ক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়।'

এই আলোচনার শেষেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্‌ বলিয়াছেন, পাঠকের চিত্ত যদি সতেজ ও সবল থাকে, তবে সেখানে ভাবের সহিত 'overbalance of pleasure' অর্থাৎ আনন্দাতিরেক আসিবেই।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সাধারণীকরণের বর্ণনাও কবিপুরুষের দিক হইতে। কবি বর্ণনীয় বিষয়ের সামীপ্য বোধ করিতে করিতে শেষে কামনা করেন,—

"...for short spaces of time, perhaps, to let himself slip into an entire delusion, and even confound and identify his own feelings with theirs." —*Ibid*

—'স্বল্প কালের জন্যও হয়তো অখণ্ড মায়াশক্তির হাতে নিজেকে সমর্পণ করিতে, এমন কি স্বীয় অনুভূতি সকলকে তাহাদের সকল অনুভূতির সহিত মিশাইয়া এক করিয়া দিতে।'

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ কেবল কবি নয়, সহৃদয় পাঠকের দিক হইতেও দৃষ্টিপাত করিয়াছেন এবং সাক্ষাৎভাবে কাব্যের লক্ষ্য-ভূত আনন্দের কথা উল্লেখ করিয়া তাহা যে সাধারণীকরণদ্বারা পাঠকের সাধারণ ও শুদ্ধচিত্তে প্রকাশ পায়, তাহাও এক প্রকারে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—

"The Poet writes under one restriction only, namely, the necessity of giving immediate pleasure to a human being possessed of that information which may be expected from him, not as a

lawyer, a physician, a mariner, an astronomer, or a natural philosopher, but as a Man." —*Poetry and Poetic Diction*

—'কবি কেবল মাত্র একটি সর্তাধীন হইয়া রচনা করেন, যথা—যে মানুষ কেবলমাত্র মনুষ্যোচিত জ্ঞানবিশিষ্ট, আইনজ্ঞ নয়, চিকিৎসক, নাবিক, জ্যোতির্বিদ্, অথবা বৈজ্ঞানিক নয়, কেবল মানুষ মাত্র—তাহাকে সদ্যঃ আনন্দ দান করার প্রয়োজনীয়তা।'

কবি শেলির সাধারণীকরণের বর্ণনা আমাদের বিচারেও প্রায় যথার্থ বর্ণনা। তিনি পাঠকদের দিক হইতেই আলোচনা করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন,—

..."the sentiments of the auditors must have been refined and enlarged by a sympathy with such great and lovely impersonations, until from admiring they imitated, and from imitation they identified themselves with the objects of their admiration."

—*A Defence of Poetry*

—'শ্রোতৃমণ্ডলীর ভাবসকল এরূপ মহান্ ও মনোহর ব্যক্তিপুরুষসমূহের প্রতি সহানুভূতিবশে মার্জিত ও প্রসারিত হয় যে, প্রশংসা করিতে করিতে তাহারা অনুকরণ করে এবং অনুকরণ করিতে করিতে প্রশংসাভাজন বস্তু-সমূহের সহিত তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়।'

এই বিষয়ে বার্গসোঁর মন্তব্য প্রথম অধ্যায়ে (১০ পৃঃ) উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইউরোপের বিখ্যাত মনীষী বেনেডেটো ক্রোচে তাঁহার European Literature in the Nineteenth Century নামক গ্রন্থে Henry of Kleist সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া প্রারম্ভে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে পাঠক ও কবি উভয় দিক হইতে রস-সৃষ্টির ব্যাপারটি অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—

"For poetic idealization is not a frivolous embellishment, but a profound penetration, in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation."

—'কাব্য-গত ভাবাবিস্ফুরণ কোন তুচ্ছ অলঙ্করণ নয়, তাহা এক সুগভীর আত্ম-বিদারণ, যাহার ফলে আমরা ক্লেশাবহ ভাবাবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রশান্ত ধ্যানের অবস্থায় উপনীত হই।'

এখানে 'আমরা' অর্থ পাঠকেরা, এই মন্তব্য পাঠকের বিষয়ে প্রযোজ্য। এই ক্রিয়াই বস্তুতঃ ভাবের রসতা-প্রাপ্তি।

ইহার পরেই ক্রোচে মন্তব্য করিয়াছেন,—

"He who fails to accomplish this passage, but remains immersed in passionate agitation, never succeeds in bestowing pure poetic joy either upon others or upon himself, whatever may be his efforts."

—'যিনি এই রূপান্তর সাধনে অসমর্থ হ'ন, প্রত্যুত ভাবাবেগের বিক্ষোভে ডুবিয়া থাকেন, তিনি যত চেষ্টাই করুন না কেন, অপরের নিকটে অথবা নিজের নিকটে কখনও বিশুদ্ধ কাব্যানন্দ পরিবেশনে সফলকাম হ'ন না।'

এখানে 'যিনি' অর্থ যে কবি, এই বাক্য কবির বিষয়ে প্রযোজ্য। এই ক্রিয়াই কবি-কর্তৃক ভাব হইতে রস-সৃষ্টি। 'Pure poetic joy' হইতেছে আমাদের ব্যাখ্যাত 'রস' বা কাব্যরস।

এই সম্পর্কে 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধান-যোগ্য। উল্লিখিত বাক্য দুইটি উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যাচ্ছলে তিনি লিখিতেছেন,—

"ক্রোচের 'Poetic idealization' আলঙ্কারিকদের 'ভাব' ও তার কারণ কার্যের 'সকল-হৃদয়-সংবাদী' 'বিভাব', 'অনুভাব'-এ পরিণতি। ক্রোচের 'passage from troublous emotion to the serenity of contemplation' আলঙ্কারিকদের লৌকিক 'ভাব'কে আস্বাদ্যমান 'রস'-এ রূপান্তর। 'Serenity of contemplation' হচ্ছে দার্শনিক-সুলভ 'মনন'-বৃত্তির উপর ঝোঁক দিয়ে কথা বলা। আলঙ্কারিকদের 'রসচর্বণ' কথাটি মূল সত্যকে অনেক বেশি ফুটিয়ে তুলেছে।"

—কাব্য-জিজ্ঞাসা, রস

প্রবন্ধ ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতেছে দেখিয়া পাশ্চাত্ত্য-সুধীগণের অভিমতের আলোচনা এখানে শেষ করা হইল।

(৫)

'রস' ও 'Beauty' বা 'সৌন্দর্য'

আমাদের দেশে রস-তত্ত্ব লইয়া যেরূপ আলোচনা, পাশ্চাত্ত্য দেশে 'Beauty' বা সৌন্দর্যের তত্ত্ব লইয়া সেইরূপ গভীর, ব্যাপক ও বিচিত্র আলোচনা দেখা যায়। বস্তুতঃ প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ দার্শনিকই এই বিষয়ে নানারূপ মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। এইজন্য প্রাচ্যের রসতত্ত্ব ও প্রতীচ্যের সৌন্দর্যতত্ত্ব লইয়া তুলনা-মূলক আলোচনার প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করিবার অবকাশ না থাকিলেও সৌন্দর্যতত্ত্ব-বিষয়ক যে যে মন্তব্য ভারতীয় রসতত্ত্বের অনুকূল, তাহাদের দুই-একটি এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমেই বক্তব্য প্রাচ্যের রস বা পাশ্চাত্ত্যের সৌন্দর্য উভয়ই বস্তু বা বিভাবকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে বলা চলে,—রস-বাদে বস্তুর ভাব-অংশের প্রাধান্য এবং সৌন্দর্য-বাদে অর্থ বা রূপ-অংশের প্রাধান্য। প্রাধান্য যাহারই হউক, কোন কোন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের মতে সৌন্দর্যও রসের ন্যায় বিষয়ী বা প্রমাতার আত্মগত বোধরূপে প্রকাশ পায় এবং আনন্দ-স্বরূপে পরম সার্থকতা বরণ করে। কাণ্ট্ সৌন্দর্য-সম্বন্ধে তাঁহার Critique of Judgement গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন,—

"Beauty is a state of the mind, a satisfaction, which is purely subjective."

—'সৌন্দর্য একটি চিত্তাবস্থা মাত্র, একটি চিত্ত-পরিতোষ, উহা কেবলমাত্র প্রমাতার আত্ম-গত ধর্ম।'

হিউম বলেন,—

"Beauty is no quality in things themselves; but it exists merely in the mind which contemplates them."

—*Hume's Essays XXII*

—'সৌন্দর্য বস্তু-সমূহের স্বভাব-ভূত কোন গুণ নহে; যে চিত্ত তাহাদের চিন্তন করে, কেবলমাত্র তাহাতেই ইহার অবস্থান।'

বাস্তবিকই কাণ্ট্ চিত্তের বাহিরে স্বরূপধর্মে সৌন্দর্যের কোন বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি আরও বলেন, এই সৌন্দর্যের আনন্দ সম্পূর্ণরূপে স্বার্থপরিশূন্য শুদ্ধ আনন্দ। এখন এই চিত্তাবস্থা যদি ভাবাত্মক বা emotional হয়, তবে কাণ্টের

সৌন্দর্য এবং ভরতমুনির রস অভিন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। হেগেল অন্বয়বাদ অবলম্বন করিয়া সৌন্দর্যের মূলে 'Shining of the Idea through matter' বা বস্তুর আশ্রয়ে প্রজ্ঞার ঔজ্জ্বল্য দেখিতে পাইলেন। কাণ্ট্ ও হেগেলের চরম বুদ্ধি-বাদ পরিহার করিয়া কেহ কেহ সৌন্দর্যের মূলে emotion বা passionকে অর্থাৎ ভাবাবেগকে উপলব্ধি করিলেন।

এই বিষয়ে মনস্বী ই. এফ. কেরিটের বিশদ আলোচনা আমাদের মতবাদের সর্বাধিক অনুকূল। তিনি তাঁহার *The Theory of Beauty* নামক সুলিখিত গ্রন্থে প্লেটো, আরিস্টট্ল্, টল্স্টয়, রাস্কিন, কাণ্ট্, হেগেল, কোল্রিজ, শোপেনহর, নিট্‌শে এবং অবশেষে ইতালীয় পণ্ডিত ক্রোচের সৌন্দর্য-বিষয়ক বহু-প্রশংসিত মতবাদ পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করিয়া শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন,—

"If any point can be thought to have emerged from the foregoing considerations it is this; that in the history of æsthetic we may discover a growing consensus of emphasis upon the doctrine that all *beauty is the expression of what may be generally called emotion*, and that all such expression is beautiful."

(ইটালিক্স্ আমাদের দেওয়া)

—*The Theory of Beauty*, p. 296

—'পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে যদি কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়া থাকে বলিয়া মনে করা যায়, তবে তাহা এই—সৌন্দর্য-বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা একটি তত্ত্ব-বিষয়ে ক্রম-বর্ধমান অথচ সর্ব-সম্মত গুরুত্ব যেন বুঝিতে পারিতেছি। তত্ত্বটি হইতেছে এই—সকল সৌন্দর্যই যাহা সাধারণতঃ *emot on* বা ভাব বলিয়া কথিত হয়, তাহারই প্রকাশ, এবং এইরূপ সকল প্রকাশই সুন্দর।'

আমাদের ব্যাখ্যান এই,—সামাজিকের চিত্তে ভাব জন্মে অলৌকিক বিভাব হইতে। ভাবের এই জন্ম অর্থাৎ বাসনালোক হইতে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং ভাবের প্রকাশ, ঠিক এক কথা নয়। এখানে emotion-এর প্রকাশ অর্থ emotion-এর চূড়ান্ত পরিণাম বা ফল। ভাবের চরম প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হইতেছে রসে। অতএব এই মতানুযায়ী প্রাচ্যের রস এবং প্রতীচ্যের শুদ্ধ সৌন্দর্য একই। বস্তু বা বিভাবাদির সৌন্দর্য আসে ভাবের অভিব্যক্তি হইতে অর্থাৎ ভাবের রসরূপে অভিব্যক্তি লাভ করায়।

কেরিট সুস্পষ্ট মন্তব্য করিলেন,—

"My reading of Croce has convinced me that the *expression of any* feeling is beautiful. The joy which I took to be the presupposition of art is really its result."

—*The Theory of Beauty*, p. 287, *Footnote*

—'ক্রোচে' পাঠ করিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, যে কোন অনুভূতির প্রকাশই সুন্দর। যে আনন্দকে আর্ট বা কলার পূর্ব-স্বীকৃতি বলিয়া মনে করিতাম, তাহা বাস্তবিক পক্ষে তাহার পরিণাম বা ফল।'

আমরা দেখিলাম পাশ্চাত্ত্য কোন কোন দার্শনিক Beauty দ্বারা যাহা উপলব্ধি করেন, তাহা আমাদের ব্যাখ্যাত রস ব্যতীত আর কিছু নয়। বাস্তবিক পক্ষে আরও সরলভাবে বিষয়টি বুঝান যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের রস বলিয়া কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নাই; আমরা ভাব ও রস বলিতে যাহা বুঝি, উভয়ই তাঁহারা সাধারণতঃ emotion শব্দ দ্বারা বুঝাইয়া থাকেন। অর্থবাদ বা প্রশংসার জন্য ভরত প্রভৃতিও অনেক সময়ে স্থায়ী ভাবকেই রস বলিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে সাধারণভাবেও emotion বা ভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হইবে রস। কেরিট-প্রমুখ মনস্বিগণের ধারণা-অনুযায়ী রস আর সৌন্দর্য তাই এক।

কবি রবীন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণা দ্বারা সাহিত্যের সৌন্দর্যকে বুঝিতে না পারিয়া মন্তব্য করিলেন,—

"বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্যে কী দিয়ে এই সৌন্দর্যের বোধকে জাগায় সে কথা গৌণ, নিবিড় বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের।"

—শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত একখানি চিঠি,
শান্তিনিকেতন, ৮ই আশ্বিন, ১৩৪৩।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব বয়সের একটি মন্তব্যও এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হইতেছে,—

"এক হিসাবে সৌন্দর্য মাত্রই আবস্‌ট্র্যাক্‌ট্; সে তো বস্তু নয়, সে একটা প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রস সঞ্চার করে।"

—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত একখানি
চিঠি, শিলাইদহ, কুমারখালি, ৬ই চৈত্র, ১৩০২।

রবীন্দ্রনাথের মতে যা আনন্দ দেয়, বা অন্তরে রস সঞ্চার করে, তাকেই মন সুন্দর বলে, অর্থাৎ বস্তুর আনন্দ দিবার শক্তি বা রস সঞ্চার করার শক্তিরই নাম

বস্তুর সৌন্দর্য। আমরা প্রথম অধ্যায়ে ইহারই নাম দিয়াছি রমণীয়ত্ব বা রম্যত্ব। কুন্তক ও জগন্নাথও রমণীয়ত্ব-দ্বারা ঐ একই প্রকার সৌন্দর্য বুঝাইয়াছেন। আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রে সুন্দর বা সৌন্দর্য শব্দের প্রয়োগ অল্প, আমরা বলিয়া থাকি রমণীয় বা রমণীয়ত্ব। রবীন্দ্রনাথ সহজ করিয়া বলিলেন,—

'সেটাই (সুন্দরই) সাহিত্যের সামগ্রী।'১

আর জগন্নাথ বলিলেন,—

রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্। —রসগঙ্গাধর, ১।১

—'রমণীয় অর্থ যে শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহাই কাব্য।'

বস্তুতঃ এই দুই উক্তির মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই।

বৃত্তিতে 'রমণীয়তা'র ব্যাখ্যা দিয়াছেন জগন্নাথ,—

রমণীয়তা চ লোকোত্তরাহ্লাদজ্ঞানগোচরতা

—'অলৌকিক আনন্দের জ্ঞান-গোচরতাই রমণীয়তা।'

আর রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,—

"যা আনন্দ দেয়, তাকেই মন সুন্দর বলে।"

এই দুই উক্তির মধ্যেও প্রভেদ কিছু নাই, বরং জগন্নাথ লোকোত্তর শব্দটি প্রয়োগ করিয়া সৌন্দর্যের স্বরূপকে অনেক বেশি পরিস্ফুট করিয়াছেন। প্রাচীনদের রমণীয়তার ন্যায় রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যও কেবল ভাবের ধর্ম নয়, অর্থের ধর্মও বটে, অর্থাৎ রস ও রম্যবোধ উভয়ই রমণীয় বা সুন্দর। কিন্তু উপরে পণ্ডিত কেরিট যে মন্তব্য করিলেন, তাহাতে 'Beauty' মুখ্যতঃ ভাবাশ্রয়ে জাত, অতএব মুখ্যতঃ তাহা রস।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পরে যে মন্তব্য করিলেন, তাহা কাব্যের বিচারে যুক্তি-সহ নয়। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,—

"দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেন না সেটা নিবিড় অস্মিতা-সূচক, কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়, সে আশঙ্কা না থাকলে বলতুম সুন্দর।"

—শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত চিঠি।

(১) অনেক কাঠ-খড় পোড়াইয়া পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দরও ঐ একই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"যেখানে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাই সুন্দর।"—সৌন্দর্যতত্ত্ব (জিজ্ঞাসা), পৃ. ৫০

কাব্যের দুঃখ কিন্তু বাস্তবিকই সুন্দর। দুঃখ অর্থ—দুঃখ-জনিত ভাব এবং সেই ভাব-জনিত রসবোধ, সে রসের নাম করুণ রস। কাব্যের রস বা সৌন্দর্য সহৃদয় সামাজিকের জন্য ; নায়ক-নায়িকার দুঃখ বা কবির দুঃখ কাব্যের বস্তুমাত্র, পাঠকের নিজের বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ কদাচ কাব্যের বস্তু নয়। অতএব রসবোদ্ধা বা সৌন্দর্যের আস্বাদন-কর্তা যে পাঠক, তাহার অনিষ্টের আশঙ্কা আসিবে কোথা হইতে ?

এখন আমরা কবি কীট্‌স্‌-এর—

"A thing of beauty is a joy forever."

—'সৌন্দর্যময় বস্তুই শাশ্বত আনন্দ।'

—এই বাক্যের মর্ম উপলব্ধি করিতে পারি। সৌন্দর্যময় বস্তু চিত্তে সৌন্দর্য-বোধ জন্মায়, সৌন্দর্য-বোধ এবং রসবোধ বা রম্যবোধ একই, উভয়ের সার্থকতা আমাদের আনন্দ-স্বরূপের প্রকাশে।

এই অপূর্ব প্রকাশের চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায় ভাবুক কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যে,—

"........his spirit drank
The spectacle ; sensation, soul, and form,
All melted into him ; they swallowed up
His animal being ; in them did he live,
And by them did he live ; they were his life.
In such access of mind, in such high hour
Of visitation from the living God,
Thought was not ; in enjoyment it expired."

—*The Excursion*, Book I 206-213

—'তাহার আত্মা পান করিতে লাগিল দৃশ্যটি ;
তাহার সংবেদন, চিত্ত এবং তনু, সকল গলিয়া গেল তাহাতে ;
তাহারা গ্রাস করিল তাহার জৈবিক সত্তা ;
তাহাদের মধ্যেই ছিল সে বাঁচিয়া এবং তাহাদের বলেই ছিল সে বাঁচিয়া,
তাহারা ছিল তার প্রাণ।
চিত্তের এই মুক্ত অবস্থায়, এইরূপ উন্নত মুহূর্তে

জীবন্ত ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার-কালে
ছিল না কোন চিন্তা, আনন্দে তাহা লীন হইয়া গেল।'

সৌন্দর্য-সম্বন্ধে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দার্শনিক মত যাহাই থাকুক, আলোচ্য অংশে আমরা পাই রসোপলব্ধির দিব্য মুহূর্তের এক অপূর্ব বর্ণনা! এ যেন বিগলিত-বেদ্যান্তর অবস্থা! জীবন্ত ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারই সংবিদানন্দের প্রকাশ!

রচনা অপূর্ব, কারণ, সৌন্দর্যধর্মে অথবা রসধর্মে তাহা সমুজ্জ্বল!

ভাব

(১)

ভাবের স্বরূপলক্ষণ

কাব্যরসের স্বরূপ-লক্ষণ নির্ণয়ের পর কাব্যের ভাবের স্বরূপলক্ষণ নির্ণয় করা আবশ্যক। তাহার পর রস ও ভাবের বিভিন্ন ভেদ ও সম্পর্ক আলোচিত হইতে পারে। ভাব শব্দ সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়। ভূ ধাতু অথবা উহার প্রেরণার্থক ক্রিয়া ভাবি ধাতুর উত্তর নানা প্রত্যয় যোগ করিয়া শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। ধাতুটির মূল অর্থ 'হওয়া' বলিয়া নানাবিধ লাক্ষণিক অর্থ সহজেই পাওয়া গিয়াছে। শ্রীমৎ অমরসিংহ তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ অমরকোশে মাত্র প্রচলিত অর্থ কয়টির উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা,—সত্তা, স্বভাব, অভিপ্রায়, চেষ্টা, আত্মা, জন্ম, মানস, বিকার এবং বিদ্বান্। শেষ অর্থটি কেবলমাত্র নাটকের প্রয়োগেই পাওয়া যায়। এই সমুদয় অর্থ ছাড়াও বিভূতি, সৃষ্টি, পদার্থ, অবস্থা, ক্রিয়া, মর্ম, তাৎপর্য, স্থিতি, সম্ভাবনা, আবেশ, চিত্ত, জীব, প্রকার, কাম, অনুরাগ, প্রণয়, সৌহার্দ, ভক্তি, অনুভূতি, অঙ্গভঙ্গী, বিলাস, চিন্তা প্রভৃতি অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অলঙ্কারশাস্ত্রে শব্দটি তিনটি অর্থে প্রচলিত ; যথা,—

(১) রতি, শোক প্রভৃতি ভাব, যাহাদের স্থায়ী ও ব্যভিচারী রূপে দুই ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে ;

(২) দেবাদিবিষয়া রতি, প্রধান-ভূত সঞ্চারী এবং উদ্‌বুদ্ধমাত্র স্থায়ী ;

(৩) নির্বিকার চিত্তে প্রণয়জনিত প্রথম বিক্রিয়া, নারীগণের হাবের পূর্বাবস্থা।

আমরা এখানে শব্দটি উল্লিখিত প্রথম অর্থে গ্রহণ করিয়া সম্যক্‌রূপে বুঝিবার চেষ্টা পাইব।

ডাঃ সুশীলকুমার দে তাঁহার প্রসিদ্ধ 'History of Sanskrit Poetics' গ্রন্থে ভাব শব্দটির অনুবাদ করিয়াছেন 'emotion' শব্দ দিয়া এবং সর্বত্রই 'emotion' অর্থে উহাকে গ্রহণ করিয়াছেন।

মনস্বী অতুলচন্দ্র গুপ্তও কাব্যজিজ্ঞাসা-গ্রন্থে 'ইমোশন' শব্দ দ্বারাই ভাবকে বুঝাইয়াছেন, তবে একটু সাবধান হইয়া লিখিয়াছেন,—

"...'ইমোশন' সুদ্ধ feeling বা সুখদুঃখানুভূতি নয়। আধুনিক মনোবিদ্যা-বিদ্‌দের ভাষায় 'ইমোশন' হচ্ছে একটি complete psychosis, সর্বাবয়ব মানসিক অবস্থা। অর্থাৎ 'ইমোশন' বা 'ভাব'-এর সুখদুঃখানুভূতি কতকগুলি 'idea' বা 'বিজ্ঞান'কে অবলম্বন ক'রে বিদ্যমান থাকে।" —কাব্যজিজ্ঞাসা, ২য় সং, পৃঃ ৩৫

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সম্ভবতঃ অভিনবগুপ্তের 'সংবিৎ-স্বভাবে নিমজ্জনাদ্ অত এব উন্মজ্জনাচ্চ তেঽপি সংবিদাত্মকাঃ।'—এই বাক্যটি অবলম্বন করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া বলেন, "এই ভাবকে একদিকে যেমন emotion বলা যায়, অপর দিকে তেমনি সংবিদ্ বা জ্ঞানও বলা যায়। কারণ, জ্ঞানস্বরূপেই ইহার আবির্ভাব এবং জ্ঞানস্বরূপেই ইহার লয়। জ্ঞানমাত্রের মধ্যেই ভাব বা emotion আছে, এবং emotion মাত্রের মধ্যেই জ্ঞান আছে।"

—কাব্যবিচার, ১ম সং, পৃঃ ১২৯

কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে যে ভাবে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলি দ্বারাও সম্যক্ অর্থ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ স্থায়ী ভাব ও ব্যভিচারী ভাব লইয়া অনেক আলোচনা থাকিলেও ভাব শব্দ লইয়া অলঙ্কারশাস্ত্রেও আলোচনা বিরল। ভরতমুনি ব্যতীত অন্য সকল আচার্য শব্দটির অর্থ যেন স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য অভিনবগুপ্ত-কৃত নাট্য-ভাষ্যের ভাবাধ্যায় পাওয়া যাইতেছে না, তাহাতে হয়তো অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল। এখানে তাই অভিনবগুপ্ত-কৃত ভাষ্য-সহ ভরতমুনির ব্যাখ্যানই আগে পরীক্ষা করা যাইতেছে। ভরতমুনি বলেন,—

"বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তি ইতি ভাবাঃ।১

"বিভাবৈ রাহৃতো যোঽর্থো হ্যনুভাবৈস্তু গম্যতে।
বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়ৈঃ স ভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥২
বাগঙ্গমুখরাগেণ সত্ত্বেনাভিনয়েন চ।
কবে রন্তর্গতং ভাবং ভাবয়ন্ ভাব উচ্যতে ॥৩

নানাভিনয়সংবদ্ধান্ ভাবয়ন্তি রসান্ ইমান্।
যস্মাৎ তস্মাদ্ অমী ভাবা বিজ্ঞেয়া নাট্যযোক্তৃভিঃ ॥"৪

—নাট্যশাস্ত্র, ৭।১-৪

—'বাক্য, অঙ্গ ও সত্ত্ব অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা সংযুক্ত কাব্যার্থসমূহকে ভাবিত করে বলিয়া ভাব।১

'যে অর্থ বিভাবসমূহ দ্বারা আহৃত হয়, অনুভাবসমূহদ্বারা প্রতীত হয়, বাক্য, অঙ্গ, সত্ত্ব, এবং অভিনয় দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়, তাহাকেই ভাব বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে।২

'বাক্য, অঙ্গ ও মুখরাগ দ্বারা, সত্ত্ব দ্বারা এবং অভিনয় দ্বারা কবির অন্তর্গত ভাবকে ভাবিত করে, এই জন্য ভাব বলিয়া কথিত হয়।৩

'যেহেতু নানা অভিনয় দ্বারা সংবদ্ধ এই রসসমূহকে ভাবিত করে, সেই হেতু ইহারা নাট্যপ্রযোক্তাগণ কর্তৃক ভাব বলিয়া বিজ্ঞাত হইয়া থাকে।'৪

স্পষ্টই লক্ষ্য করা যাইতেছে, ভরতমুনি পূর্বাধ্যায়ে যেমন সাধারণ রসের ব্যাখ্যা না করিয়া কেবল নাট্যরসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এখানেও সেইরূপ সাধারণ ভাবের ব্যাখ্যা না করিয়া কেবলমাত্র নাট্যভাবেরই ব্যাখ্যা করিতেছেন; এবং এই হেতু পুনঃ পুনঃ অভিনয়ের কথা ও নাট্য-প্রযোক্তাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নাট্য-রসের অতিরিক্ত কোন কোন স্থলে কাব্য-রস থাকিলে নাট্য-ভাবের অতিরিক্তও কাব্য-ভাব থাকিবে। স্বরূপলক্ষণে নাট্য-ভাব ও কাব্য-ভাব অর্থাৎ ভাব একই হইবে। এই স্বরূপলক্ষণই আমরা আগে খুঁজিতেছি।

অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যায় প্রথম ও চতুর্থ কারিকার প্রায় সমান অর্থ প্রতীত হইতেছে। প্রথম কারিকার ভাষ্যে তিনি লিখিতেছেন,—

কাব্যস্য অর্থাঃ রসাঃ। অর্থ্যন্তে প্রাধান্যেন ইত্যর্থাঃ।

নতু অর্থশব্দোঽভিধেয়বাচী।

—'কাব্যের অর্থই রস। প্রধানভাবে যাহার প্রার্থনা বা সন্ধান করা হয়, তাহাই অর্থ। অর্থশব্দ কিন্তু এখানে অভিধেয় বুঝায় না।'

তিনি চতুর্থ কারিকার 'রসান্' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—

রসন-যোগ্যান্ চিত্তবৃত্তিবিশেষান্—'আস্বাদন-যোগ্য যাবতীয় চিত্তবৃত্তি-বিশেষ'।

প্রথম কারিকায় ভাব শব্দের অর্থ তিনিই লিখিয়াছেন,—

ভাবশব্দেন তাবৎ চিত্তবৃত্তিবিশেষা এব বিবক্ষিতাঃ

—'ভাবশব্দের দ্বারা চিত্তবৃত্তিবিশেষ বুঝান হইতেছে।'

তৃতীয় কারিকার ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত 'সত্ত্ব' অর্থ 'চিত্তৈকাগ্র্য' লিখিয়াছেন এবং 'ভাবয়ন্' অর্থ লিখিতেছেন,—

ভাবয়ন্ আস্বাদযোগ্যীকুর্বন্। ভাবঃ চিত্তবৃত্তিলক্ষণ এব উচ্যতে।—'ভাবিত করে, আস্বাদের যোগ্য করে। ভাব চিত্তবৃত্তিলক্ষণ বলিয়াই কথিত হয়।'

অভিনবগুপ্তের ভাষ্যে ভাব ক্রিয়াপদের 'বুদ্ধিবিষয় করা' বা 'ব্যাপ্ত করা' বা শুধু 'করা' অর্থ থাকিলেও আমাদের মনে হইতেছে 'আস্বাদযোগ্য করা'ই এখানে মুখ্য অর্থ; তাহা হইলে ভাব শব্দের অর্থ হইবে স্বাদনাত্মক চিত্তবৃত্তি, অর্থাৎ এমন চিত্তবৃত্তি যাহা নিজে আস্বাদন করে, অথবা বিভাবাদিকে আস্বাদযোগ্য করে।

কিন্তু আরও দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। এই ভাব বাহ্য জগতের বস্তুর দর্শন-জাত ভাব বা লৌকিক emotion নহে। ভরতমুনির কারিকা এবং অভিনবগুপ্তের ভাষ্য হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, এই ভাব রসেরই ন্যায় অলৌকিক; ইহা কাব্যজগতের বিভাবাদি হইতে সামাজিকের বাসনালোকের স্ফুরণে জাত রত্যাদি ভাব। ভরতমুনি বার বার উল্লেখ করিয়া বুঝাইতেছেন,—ভাব বাক্যদ্বারা আনীত, বিভাবসমূহ দ্বারা আহৃত, অনুভাবসমূহের দ্বারা বুদ্ধির বিষয়ীকৃত এবং নানা অভিনয়-দ্বারা স্পষ্টীকৃত হয়। তিনি কখনও লৌকিক জগতের কারণ ও কার্য বা সামাজিকের প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা উল্লেখ করেন নাই। এই বিষয়টি তৃতীয় কারিকার ভাষ্যে কবি-গত ভাবের ব্যাখ্যানে অভিনবগুপ্ত স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছেন,—

…যঃ অন্তর্গতঃ অনাদিপ্রাক্তন-সংস্কার-প্রতিভান-ময়ো, নতু লৌকিকবিষয়জঃ,…

—'…যাহা কবির অন্তর্গত অনাদিকাল হইতে আগত প্রাক্তন সংস্কারের প্রকাশ-স্বরূপ, কখনও লৌকিক-বিষয় হইতে জাত নহে,…'

কবির পক্ষে যাহা, সহৃদয় সামাজিকের পক্ষেও এই ক্ষেত্রে তাহাই খাটিবে।

অতএব কাব্যশাস্ত্রের ভাব হইতেছে সামাজিকের চিত্তবৃত্তিবিশেষ, যাহা অলৌকিক বিভাবাদির বলে বাসনালোক হইতে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিভাবাদিকে আস্বাদনযোগ্য করে। পূর্বে কথিত হইয়াছে, ইহারই প্রধান গুণ হৃদয়ের দ্রুতি অর্থাৎ হৃদয়ের বিগলন।

এইবার অপর বিষয়টি লক্ষ্য করা হইতেছে এবং এইজন্য বিভিন্ন ভাবগুলি পরীক্ষা করা যাইতেছে। নাট্যান্তর্গত স্থায়ী ভাবগুলির কথাই আগে ধরা যাক্; তাহারা

রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা এবং বিস্ময়।

ইহাদের মধ্যে 'হাস' ও 'উৎসাহ'কে খাঁটি ভাব বা emotion বলা যায় কি? ইহারা চিত্তবৃত্তি, তাহাতে সন্দেহ নেই; কেন না মানসিক অবস্থা মাত্রই চিত্তবৃত্তি। কিন্তু ইহারা দ্রুতিগুণাত্মক নয়, বরং দীপ্তিগুণাত্মক; কাজেই ইহারা হয়তো ঠিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রের emotion নয়।

হাসি সম্বন্ধে বার্গসোঁ-প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, ইহা একান্তভাবেই বুদ্ধির ব্যাপার; হৃদয়বৃত্তির সম্পর্ক হইলেই হাসির বিনাশ ঘটে। বার্গসোঁ লিখিতেছেন,—

"Indifference is its natural environment, for laughter has no greater foe than emotion,..." —*Laughter* (*1st ed*), Ch. 1, p. 4.

—"নিরপেক্ষতা ইহার স্বাভাবিক পরিমণ্ডল, কেননা 'ইমোশন' বা ভাব অপেক্ষা হাসির বড় শত্রু আর কিছু নাই।"

"Its appeal is to intelligence, pure and simple."—*Ibid.* p. 5.

—'ইহার আবেদন শুদ্ধ ও সহজ বুদ্ধির দ্বারে।'

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের এই অভিমত যে বৃথা নয়, তাহা প্রাচ্য পণ্ডিতগণের আচরণ হইতেও বুঝা যায়। তাঁহারা শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক প্রভৃতি রসে রতি, শোক, ক্রোধ বা ভয় নামক চিত্তবৃত্তি স্থায়ী ভাব বলিয়া উল্লেখ করিলেও হাস্যরসের কোন স্বতন্ত্র চিত্তবৃত্তি খুঁজিয়া পান নাই, তাহার স্থায়ী ভাবকে কেবল 'হাস' বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

ভরত বলেন,—

অথ হাস্যো নাম হাসস্থায়িভাবাত্মকঃ। —নাট্যশাস্ত্র, ৬।৫৬

—'হাস্যরস নাম, স্থায়ী ভাব হইতেছে হাস।'

এই হাস-ভাবকে বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ বলিয়াছেন 'বিকাসাখ্য' চিত্তবৃত্তিবিশেষ; কিন্তু ইহাতেও নূতন কিছু প্রাপ্তি হইল না। আমাদের দেশে হাস্যরসের কোন নিপুণ বিশ্লেষণ হয় নাই; কিন্তু যে মামুলি আলোচনা হইয়াছে, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, বিকৃত বেশ, বিকৃত অঙ্গ, বিরুদ্ধ প্রলাপ বা লৌল্য হইতে যে হাসি, তাহার উপলব্ধি হৃদয় দিয়া নহে, নিছক বুদ্ধি দিয়া; অতএব 'হাস'কে চিত্তবৃত্তি বলিলেও emotion বা স্বাদনাত্মক ভাব বলা সঙ্গত হয় কি? মনে হয়, তাহা হ্লাদ-জনক বৃত্তি হইলেও প্রধানতঃ রম্যবোধ।

এইরূপে উৎসাহকেও প্রধানতঃ emotion বা স্বাদনাত্মক ভাব বলা চলে কি? Complete psychosis হিসাবে উৎসাহের ভিতরে feeling, knowing—অনুভব ও জ্ঞান থাকিলেও, ইহা মুখ্যতঃ উহাদের একটিও নহে, ইহা willing বা ইচ্ছাবৃত্তি। ইহা সত্ত্বগুণাত্মক নহে, ইহা রজোগুণাত্মক volition। পণ্ডিতগণের আলোচনায় এই সূক্ষ্ম তথ্যটি ধরা না পড়িলেও, তাহাদের বিশ্লেষণ-ক্রম ও উদাহরণসমূহ হইতে উহা বুঝিতে পারা যায়। প্রদীপ-টীকায় গোবিন্দ ঠক্কর এবং সাহিত্যদর্পণে বিশ্বনাথ উৎসাহ-অর্থ বলিয়াছেন,—

কার্যারম্ভেষু সংরম্ভঃ স্থেয়ান্ উৎসাহ উচ্যতে।

—কাব্যপ্রকাশ, ৪।২৯, টীকা ; সাহিত্যদর্পণ, ৩।২০৬

—'কার্য আরম্ভ করিবার সময়ে চিত্তে যে স্থিরতর সংরম্ভ বা বেগ জন্মে, তাহারই নাম উৎসাহ।'

জগন্নাথ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া উৎসাহকে বলিয়াছেন,—

'ঔন্নত্যাখ্য'-চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ। —রসগঙ্গাধর, পৃঃ ৩২

—'উন্নতিধর্মময় চিত্তবৃত্তি-বিশেষ।'

ইহার কোন ব্যাখ্যায়ই উৎসাহকে সাধারণভাবে emotion বা স্বাদনাত্মক ভাব বলা যাইতে পারে না।

আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, ভরতমুনির উল্লিখিত স্থায়ী ভাব অথবা ব্যভিচারী ভাবগুলিও সর্বথা emotion বা স্বাদনাত্মক চিত্তবৃত্তি নহে। হাসভাব মুখ্যতঃ দীপ্তি-স্বভাব, তাহা হইতে জাত হাস্যকে রস না বলিয়া রম্যবোধ বলিলেও অধিক সঙ্গত হয়। কেবল রস নয়, রম্যবোধও আনন্দ-স্বরূপ এবং চিত্তবৃত্তি স্বাদনাত্মক না হইয়াও দীপ্তিগুণ বা রম্যার্থ-আশ্রয়ে হ্লাদ-জনক হইতে পারে। উৎসাহে দ্রুতি থাকিলেও দীপ্তিও আছে, সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাবৃত্তির সমধিক প্রবলতা আছে। ইচ্ছাবৃত্তি অনুভব বা জ্ঞান উভয়বিধ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইতে পারে। তাই উৎসাহ হইতে যাহা জাগে অর্থাৎ বীররস প্রকৃতপক্ষে রসবিমিশ্র রম্যবোধ।

এইরূপে অদ্ভুতরসের যাহা স্থায়ী ভাব, বিস্ময় যাহার নাম, তাহাতে আমাদের মতে স্বাদবৃত্তি ও জ্ঞানবৃত্তি উভয়েই প্রায় সমান প্রধান ; এবং অদ্ভুত রসও তাই রস-বিমিশ্র রম্যবোধ।

এই প্রসঙ্গে এখন ব্যভিচারী ভাবগুলিকে সংক্ষেপে পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

ভরতমুনি তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—

নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার বা মূর্ছা, সুপ্তি বা স্বপ্ন, বিবোধ বা জাগরণ, অমর্ষ, অবহিত্থা বা ভাবগুপ্তি, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ বা প্রাণত্যাগের অনুরূপ অবস্থা, ত্রাস, বিতর্ক।

আমরা জিজ্ঞাসা করি,—ইহাদের মধ্যে শ্রম, নিদ্রা, স্বপ্ন, জাগরণ, অপস্মার, ব্যাধি বা মরণ এইগুলি প্রকৃত পক্ষে ভাব হয় কি প্রকারে? ইহাদের দ্রুতি বা দীপ্তি কোনপ্রকার গুণই নাই; ইহারা দৈহিক অবস্থাবিশেষমাত্র। ভাবশব্দের অর্থ মনের বা দেহের অবস্থাবিশেষ ধরিলে ইহাদিগকেও গোলে হরিবোল দিয়া ভাব বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলিবেন, ইহারা কখন কখন রতি বা ক্রোধ প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের সহচারী বলিয়া ব্যভিচারী ভাব বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এই অভিমতও যুক্তি-সহ নহে। মূলে যদি তাহারা স্বাদনাত্মক অথবা জ্ঞানাত্মক চিত্তবৃত্তি না হয়, তবে অলঙ্কারশাস্ত্রের রসাধ্যায়ে বা ভাবাধ্যায়ে ভাব শব্দের অর্থপ্রসারণ ব্যতীত তাহাদিগকে ভাব বলা যাইতে পারে না।

এই সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন,—চিন্তা, স্মৃতি, মতি, বিতর্ক—এইগুলি চিত্তবৃত্তিবিশেষ হইলেও আলঙ্কারিক ভাব কি? ইহারা রতি প্রভৃতি ভাবের সহচারী রূপে থাকিলেও স্বাদনাত্মক চিত্তবৃত্তি নহে, জ্ঞানাত্মক চিত্তবৃত্তি মাত্র। এখানে ইহারা কেবলমাত্র ব্যাপক অর্থেই ভাব বলিয়া পরিচিত হইতে পারে।

রসতরঙ্গিণী গ্রন্থে ভানুদত্ত ভাবকে ঠিক চিত্তবৃত্তি বলিয়া নির্দেশ করেন নাই; তিনি বলেন,—

রসানুকূলো বিকারো ভাব ইতি হি তল্লক্ষণম্।—রসতরঙ্গিণী, পৃঃ ৬৯

—'চিত্তের রসানুকূল বিকারই ভাব, ইহাই তাহার লক্ষণ।'

তাঁহার মতে এই রসানুকূল বিকার দুই প্রকার—আভ্যন্তর ও বাহ্য। আভ্যন্তর বিকার হইতেছে স্থায়ী ও ব্যভিচারী ভাব, এবং বাহ্যবিকার হইতেছে অশ্রু, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব।

ভোজরাজ ব্যভিচারী ভাবসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—

তত্র আভ্যন্তরা ব্যভিচারিষু চিন্তৌৎসুক্যাবেগবিতর্কাদয়ঃ, বাহ্যাঃ স্বেদরোমাঞ্চাশ্রু-বৈবর্ণ্যাদয়ঃ।—শৃঙ্গারপ্রকাশ, ১১শ প্রকাশ

—'ব্যভিচারী ভাবসমূহের মধ্যে আভ্যন্তর ভাব হইতেছে চিন্তা, ঔৎসুক্য, আবেগ, বিতর্ক প্রভৃতি, এবং বাহ্য ভাব হইতেছে স্বেদ, রোমাঞ্চ, অশ্রু, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি।'

এই আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে আমাদের প্রশ্ন লইয়া পূর্বেও কিছু আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু তাহা অস্পষ্ট এবং কোন সুসিদ্ধান্ত প্রকাশ করে না। বস্তুতঃ আলঙ্কারিক ভাবগুলি ভরতমুনি-কর্তৃক আত্মকালে উল্লিখিত হইবার পর কেহই তাহাদিগকে সর্বদিক্ হইতে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেন নাই; এবং ব্যভিচারী ভাবগুলি সম্পর্কে অভিনবগুপ্ত হইতে জগন্নাথ পর্যন্ত প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ আচার্য যথাদৃষ্ট ভাবে স্ব স্ব গ্রন্থে বিবৃত করিয়া কর্তব্য শেষ করিয়াছেন।

এই সকল কারণেই সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রস-শাস্ত্র সম্বন্ধে একান্ত বিরূপ ধারণা পোষণ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন,—

"এ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি একালে পরিহার্য; ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে; আমরা সাধ্যানুসারে তাহা বর্জন করিয়াছি, এই রস শব্দটি ব্যবহার করিয়া বিপদ ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুষ্যচিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ স্থায়িভাব; কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া, ইহাদের কোথাও স্থান নাই—না স্থায়ী, না ব্যভিচারী—কিন্তু একটি কাব্যানুপযোগী কদর্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকাশস্বরূপ স্থায়িভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। স্নেহ, প্রণয়, দয়াদি পরিবিজ্ঞাপক রস নাই, কিন্তু শান্তি একটি রস, সুতরাং এবংবিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য সম্পূর্ণ হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি; আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।" —বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম ভাগ, উত্তরচরিত

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুচিত অশ্রদ্ধা আমাদের চিত্তে পীড়া দিলেও তাঁহার একটি মন্তব্য সমর্থনযোগ্য,—

"স্নেহ, প্রণয়, দয়া, ইহাদের কোথাও স্থান নাই—না স্থায়ী, না ব্যভিচারী—··· স্নেহ, প্রণয়, দয়াদি পরিবিজ্ঞাপক রস নাই,···"

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পর্কেও আমাদের দুইটি মন্তব্য করিতে হইতেছে,—তিনি স্থায়ী ভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সত্যকার স্বরূপ ও পার্থক্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, এবং শৃঙ্গাররসের স্থায়ী ভাব রতিকে প্রেমাখ্য মধুর চিত্তবৃত্তি-বিশেষ না বুঝিয়া বুঝিয়াছিলেন এক কদর্য মানসিক বৃত্তি বলিয়া। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের উদাহৃত শৃঙ্গাররসের শ্লোকগুলি এই জন্য কতকাংশে দায়ী হইলেও বাঙ্গালা উপন্যাস-সাহিত্যের আদিগুরু এবং উত্তররামচরিতের সমালোচকের নিকট হইতে ইহা অপেক্ষা অধিক মনস্বিতাপূর্ণ প্রৌঢ় দৃষ্টিই আমরা আশা করিয়াছিলাম।

আমাদের দ্বিতীয় মন্তব্য এই,—বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তা-মন্ত্রের অগ্র্য পুরোহিত হইলেও আত্মবিস্মৃতিবশে কাব্যশাস্ত্রের অতীতের গৌরবময় সিদ্ধি অস্বীকার করিয়া যথাসম্ভব পাশ্চাত্ত্যের পদ্ধতি অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন। যিনি বাঙ্গালার ও ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস লিখিতে চাহিয়াছিলেন, তিনিও সম্যক্ অধ্যয়ন এবং আলোচনা বিনাই প্রাচীন আলঙ্কারিকদের প্রণাম করিয়া দূরে বিদায় করিলেন। অথচ দেখা যাইতেছে ব্রাড্‌লে ও রিচার্ড্‌স্-প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ কাব্যশাস্ত্র-সম্বন্ধে এখন যে সকল তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে ধ্বনি, ব্যঞ্জনা বা শব্দার্থ-মূলক অনেক বিষয়ই অন্ততঃ সহস্র-বৎসর পূর্বে আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে পণ্ডিতগণ-কর্তৃক প্রায় সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হইয়াছে। তাই প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এইরূপ মন্তব্য এক অসতর্ক ক্ষণের মন্তব্য বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিলাম।

এই বিষয়ে আচার্য অভিনবগুপ্ত রসতত্ত্ব ব্যাখ্যানের অবসরে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষ সার-গর্ভ এবং জাতির পক্ষে সর্বকালেই অনুসরণ-যোগ্য। মন্তব্যটি এই,—

> তস্মাৎ সতামত্র ন দূষিতানি
>
> মতানি তান্যেব তু শোধিতানি।
>
> পূর্বপ্রতিষ্ঠাপিত-যোজনাসু
>
> মূলপ্রতিষ্ঠাফলম্ আমনন্তি।—নাট্যশাস্ত্র, ৬।৩৪, ভাষ্য

'—অতএব সজ্জনগণের মতসকল কেবল দোষ প্রদর্শন করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে না, সেই সকল মতই শোধিত করিয়া নির্দোষ করিয়া লইতে হইবে। পূর্বে যাহা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাহাতে পরবর্তী কালে আবশ্যকীয় যোজনা করিলে মূলের সমগ্ররূপ প্রতিষ্ঠার ফল পাওয়া যায়।'

এই নীতি লইয়াই আমরা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং এই নীতি আরও সাহসের সহিত প্রয়োগ করিতে চাই।

আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল ভাব। কয়েকটি স্থায়ী ভাব ও ব্যভিচারী ভাব পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল ভাব শব্দ সাধারণতঃ স্বাদনাত্মক চিত্তবৃত্তি অর্থে, কখন সাধারণ চিত্তবৃত্তি অর্থে, এবং কখনও বা মানসিক বা দৈহিক যে কোন প্রকার অবস্থাবিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মনস্বী সমালোচক রিচার্ড্‌স্ সাহেব তাঁহার 'Principles of Literary Criticism' গ্রন্থে emotion-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া প্রায়

অনুরূপ মন্তব্যই করিয়াছেন; এই মন্তব্যানুসারে ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগের ব্যবহৃত ভাব শব্দ এবং ইউরোপখণ্ডে আধুনিক যুগের ব্যবহৃত emotion শব্দ সর্বাংশে প্রায় তুল্যার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রিচার্ড্স্ সাহেব প্রথম বলেন,—

"Pleasure, however, and emotion have, on our view, also a cognitive aspect."

—*Principles of Literary Criticism*, Ch. XIII., p. 98.

—'যাহা হউক, আমাদের মতে রস এবং ভাবের একটি জ্ঞানাত্মক বৃত্তিও আছে।'

'রসনা চ বোধরূপা এব'—এই উক্তি দ্বারা অভিনবগুপ্ত নয় শতাব্দী আগেই এ কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন।

তাহার পরে রিচার্ড্স্ মন্তব্য করিলেন,—

"In popular parlance the term 'emotion' stands for those happenings in minds which accompany such exhibitions of unusual excitement as weeping, shouting, blushing, trembling, and so on. But in the usage of most critics it has taken an extended sense, thereby suffering quite needlessly in its usefulness. For them it stands for any noteworthy 'goings on' in the mind almost regardless of their nature." —*Ibid*, Ch. XIII., p 101.

—'চলিত কথাবার্তায় 'emotion' শব্দটি চিত্তের সেই সকল ঘটনা বুঝায়, যাহা রোদন, চীৎকার, লজ্জা, কম্প প্রভৃতি অস্বাভাবিক উত্তেজনায় অভিব্যক্তি লাভ করে। কিন্তু অধিকাংশ সমালোচকের প্রয়োগেই ইহা ব্যাপক অর্থ লাভ করিয়াছে এবং ফলে একান্ত অনাবশ্যক ভাবেই ইহার উপযোগিতা বা কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাঁহাদিগের নিকটে ইহা প্রায় স্বীয় বৃত্তি-নিরপেক্ষ ভাবে চিত্তের যে কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য গতি বা অবস্থা বুঝায়।'

'Emotion' শব্দের এই অর্থ-ব্যাপ্তি রিচার্ড্স্ সমর্থন করেন না; কিন্তু ইহা ঘটিয়াছে প্রাকৃত জনগণের নয়, বিশেষজ্ঞ সমালোচকগণের অসাবধান প্রয়োগের ফলে; তাই ইহার সংশোধনও সহজ নয়। যাহাই হউক, আমরা দেখিতেছি 'ভাব' ও 'emotion' শব্দ সর্বপ্রকারে একার্থক হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে হয়তো পণ্ডিতগণের শিথিল প্রয়োগের ফলেই ভাব শব্দের এইরূপ ব্যাপক অর্থ-প্রসার ঘটিয়া থাকিবে।

(২)

স্থায়ী ভাব ও ব্যভিচারী ভাব

ভাব-সম্বন্ধে অন্য আলোচনার পূর্বে প্রাচীনদের কথিত স্থায়ী ভাব ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব—এই দুইটি ভেদকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। ভাবের স্থায়ী ও ব্যভিচারী এই দুইটি ভেদ এবং তাহাদের স্বল্প ব্যাখ্যান ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রেই পাওয়া যায়। ভাবগুলির নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভরতমুনি স্থায়ী ভাবের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন,—

যথাহি সমান-লক্ষণা স্তুল্যপাণিপাদোদরশরীরাঃ সমানাঙ্গ-প্রত্যঙ্গা অপি পুরুষাঃ কুলশীলবিদ্যাকর্মশিল্প-বিচক্ষণত্বাদ্ রাজত্বম্ আপ্নুবন্তি, তত্রৈব চান্যে হল্পবুদ্ধয় স্তেষামেব অনুচরা ভবন্তি, তথা বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিণঃ স্থায়িভাবান্ উপাশ্রিতা ভবন্তি।

—নাট্যশাস্ত্র, ৭।১১

—'যে প্রকার পুরুষগণের লক্ষণ সমান হইলেও হস্ত, পদ, উদর ও শরীর তুল্য হইলেও এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমান হইলেও কুল, শীল, বিদ্যা, কর্ম ও শিল্পে বিচক্ষণতা-হেতু কেহ কেহ রাজত্ব প্রাপ্ত হ'ন, এবং অন্য সকলে অল্পবুদ্ধি বলিয়া তাঁহাদেরই অনুচর হইয়া থাকে, সেইরূপ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব স্থায়ী ভাবসমূহকে আশ্রয় করিয়া থাকে।'

ইহার অল্প পরেই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—

যথা নরেন্দ্রো বহুজনপরিবারোঽপি সন্ স এব নাম লভতে নান্যঃ, সুমহানপি পুরুষঃ, তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারি-পরিবৃতঃ স্থায়ী ভাবো রসো নাম লভতে।

—'বহুজন দ্বারা পরিবৃত হইলেও নরেন্দ্র যে প্রকার একাই সেই নাম লাভ করেন, কারণ তিনি সুমহান্ পুরুষ, সেইরূপ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব দ্বারা পরিবৃত হইয়া স্থায়ী ভাব রস নাম লাভ করে।'

এই উপমা দ্বারা স্থায়ী ভাবের সর্ব-প্রাধান্য বুঝা গেলেও স্থায়িত্বের কারণ স্পষ্টরূপে বুঝা গেল না।

সঞ্চারী শব্দ ভরত কোথাও প্রয়োগ করেন নাই, তিনি উল্লেখ করিয়াছেন কেবল ব্যভিচারী শব্দ। ঐ শব্দটির ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,—

বি অভি ইত্যেতৌ উপসর্গৌ, চর্ ইতি গত্যর্থো ধাতুঃ বিবিধম্ আভিমুখ্যেন রসেষু চরন্তি ইতি ব্যভিচারিণঃ।

—নাট্যশাস্ত্র, ৭।৪৩

—'বি ও অভি এই দুইটি উপসর্গ, চর্ এই গত্যর্থক ধাতু, রসসমূহের আভিমুখ্যে বিবিধভাবে চলে বলিয়া ব্যভিচারী।'

এই ব্যাখ্যান দ্বারাও ব্যভিচারী ভাবের স্বরূপ সম্পূর্ণ বুঝা গেল না।

পরবর্তী আচার্যগণ স্থায়ী ও ব্যভিচারী এই দুই প্রকার ভাবের সূক্ষ্মভেদ দক্ষতার সহিত নির্ণয় করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিশ্বনাথ বলেন,—

অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুর-কন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ॥—সাহিত্যদর্পণ, ৩।২০৪

—'অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ ভাবসমূহ যাহাকে তিরোহিত করিতে পারে না, যাহা আস্বাদরূপ অঙ্কুরের কন্দ বা মূলস্বরূপ, তাহা স্থায়ী ভাব বলিয়া জ্ঞাত হয়।'

স্থায়ী ভাবের নিপুণ সংজ্ঞা দিয়াছেন ভোজরাজ,—

চিরং চিত্তেঽবতিষ্ঠন্তে সংবধ্যন্তে ঽনুবন্ধিভিঃ।
রসত্বং প্রতিপদ্যন্তে প্রবুদ্ধাঃ স্থায়িনোঽত্র তে॥—সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ৫।১৯

—'সেই স্থায়ী ভাবসমূহ বাসনালোক হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া দীর্ঘকাল চিত্তে অবস্থান করে, অনুবন্ধী বা অনুগত ব্যভিচারী ভাবসমূহ দ্বারা সম্বদ্ধ হয় এবং রসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'

ব্যভিচারী ভাবগুলি সম্বন্ধে বিশ্বনাথ বলেন,—তাহারা

স্থায়িন্যুন্মগ্ননির্মগ্নাঃ— —সাহিত্যদর্পণ, ৩।১৬৭

—'স্থায়ী ভাবে একবার ডুবিতেছে, আবার উঠিতেছে।'

তিনি বৃত্তিতে বলেন,—

স্থিরতয়া বর্তমানে হি রত্যাদৌ নির্বেদাদয়ঃ প্রাদুর্ভাব-তিরোভাবাভ্যাম্ আভিমুখ্যেন চরণাদ্ ব্যভিচারিণঃ কথ্যন্তে।

—'রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব স্থিররূপে বর্তমান থাকে; নির্বেদ প্রভৃতি ভাব একবার প্রাদুর্ভূত, আবার তিরোভূত হইয়া তাহাদের আভিমুখ্যে চলে; তাই ব্যভিচারী বলিয়া কথিত হয়।'

বিষয়টি অনেকখানি স্পষ্ট করিয়াছেন জগন্নাথ, তিনি বলেন,—

তত্র আপ্রবন্ধং স্থিরত্বাদ্ অমীষাং ভাবানাং স্থায়িত্বম্। ন চ চিত্তবৃত্তিরূপাণাম্ এষাম্ আশুবিনাশিত্বেন স্থিরত্বং দুর্লভম্, বাসনারূপতয়া স্থিরত্বং তু ব্যভিচারিষু অতিপ্রসক্তম্ ইতি বাচ্যম্, বাসনারূপাণাম্ অমীষাং মুহুর্মুহুঃ অভিব্যক্তিঃ এব স্থিরপদার্থত্বাৎ। ব্যভিচারিণাং তু নৈব, তদভিব্যক্তেঃ বিদ্যুদ্দ্যোতপ্রায়ত্বাৎ।—রসগঙ্গাধর, বৃত্তি, পৃ ৩০-৩১

—'সমগ্র প্রবন্ধে স্থির থাকে বলিয়া ঐ সকল ভাবের স্থায়িত্ব। চিত্তবৃত্তিস্বরূপ এই সকল ভাব আশু বিনাশ পায় বলিয়া তাহাদের স্থিরত্ব দুর্লভ বলা উচিত নয়: বাসনারূপে যে স্থিরত্ব তাহা কিন্তু ব্যভিচারী ভাবগুলিতেও বর্তমান, ইহা বলা যায়। বাসনা-রূপ ঐ সকল ভাবের স্থিরপদার্থতা আছে বলিয়াই মুহুর্মুহুঃ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ব্যভিচারী ভাবগুলির বেলায় এরূপ হয় না; তাহাদের অভিব্যক্তি বিদ্যুতের প্রকাশের ন্যায় ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে।'

ভাবপ্রকাশন গ্রন্থে শারদাতনয় ব্যভিচারী ভাবগুলির কিছু বিশদ ব্যাখ্যান করিয়াছেন,—

উন্মজ্জন্তো নিমজ্জন্তঃ কল্লোলাশ্চ যথার্ণবে।
তস্যোৎকর্ষং বিতন্বন্তি যান্তি তদ্রূপতামপি॥
স্থায়িন্যুন্মগ্ননিমগ্না স্তথৈব ব্যভিচারিণঃ।
পুষ্ণন্তি স্থায়িনং স্বাংশ্চ তত্র যান্তি রসাত্মতাম্॥

—ভাবপ্রকাশন, ১ম অধিকার

—'কল্লোলগুলি যে প্রকার সমুদ্রে একবার উত্থিত হয়, আবার বিলীন হয় এবং এইরূপে তাহারা উৎকর্ষ বিস্তার করিয়া তাহার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়, ব্যভিচারী ভাবগুলিও সেই প্রকার স্থায়ী ভাবে উন্মগ্ন নিমগ্ন হইয়া নিজ নিজ স্থায়ী ভাবকে পোষণ করে এবং রস-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।'

আমরা এবার আমাদের অভিমত ব্যাখ্যা করিতে পারি। ভাবগুলির স্থায়ী ও ব্যভিচারী রূপে দুই ভেদ প্রাচীন আচার্যগণের বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। বাসনালোক সহ এই দ্বিবিধ ভাবই রসবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে একটু আত্মবিশ্লেষণ বা কাব্যবিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কয়েকটি ভাব সাধারণতঃ স্বতন্ত্ররূপে মানব-চিত্তের গূঢ় অন্তর্দেশ দিয়া সর্বদা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এই স্বতন্ত্র ভাবগুলির কয়েকটি মানবের ন্যায় অনেক প্রাণীর চিত্ত-ভূমিতেও সহজাত দৃঢ় সংস্কাররূপে প্রবাহিত; যেমন বলা চলে,—রতি, ক্রোধ, ভয়, শোক—এই ভাবগুলি সর্বজীব-সাধারণ; আবার হাসি, উৎসাহ, জুগুপ্সা, বিস্ময়—এই ভাবগুলি প্রধানতঃ সর্বমানব-সাধারণ। ইহারা আমাদের বাসনালোকে সর্বদাই গূঢ়রূপে বর্তমান থাকে; উদ্বোধক বস্তু অর্থাৎ আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাবের সান্নিধ্যে চিত্তবৃত্তিরূপে উদ্বুদ্ধ হয়। যখন উদিত হয়, তখন ইহারা যেন সম্রাট্; বিভাব, অনুভাব বা অন্যবিধ ভাব ইহাদের আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া ইহাদের অনুবর্তন

করে। এই ভাবগুলি ভাবান্তরের অধীন না হইয়া মানবচিত্তে স্বতন্ত্রভাবে কার্য করে। ইহারাই স্থায়ী ভাব। ইহারা প্রধান বলিয়া এত প্রবল হয় যে, বিরুদ্ধ ভাব উদিত হইয়াও ইহাদিগকে তিরোহিত করিতে পারে না। স্থায়িত্বের উহাই প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ, ইহারা বাসনালোক হইতে মুহুর্মুহুঃ অভিব্যক্ত হইয়া প্রায় একটি প্রবাহের ন্যায় প্রকাশ পায় এবং তৎকালে প্রত্যক্ষতঃও স্থায়ী হইয়া থাকে। অন্য ভাবগুলিকে তরঙ্গ বলিলে ইহাদিগকে সমুদ্র বলা যায়। ইহারা তৎকালে কাব্যে মহিমময় হইয়া সর্বদাই দৃশ্যমান থাকে, এবং অন্য ভাবগুলি যেন তরঙ্গের ন্যায় উদিত হইয়া ইহাদের আশ্রয়ে নিজ লীলা সম্পন্ন করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া, ইহাদের স্বরূপেই পুনরায় বিলীন হইতে থাকে।

তৃতীয় কারণ, কাব্যনিবন্ধে সমগ্ররূপে এই ভাব-সমূহেরই একটি প্রবল হইয়া স্থায়ী হইতে পারে। অন্য জাতীয় ভাব মানবচিত্তকে স্থায়ী ভাবে দীর্ঘকাল আবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। স্মরণাতীতকালেও এই সমুদয় ভাব মানবচিত্তে প্রবল ছিল; বর্তমান সভ্য মানবের ধারণায়ও বলা চলে,—এই সমুদয় ভাব দূর, অতিদূর ভবিষ্যৎকালেও মানবচিত্তে সমানভাবে প্রবল থাকিবে। তাই এই স্থায়ী ভাবগুলির আশ্রয়ে রচিত নাট্য বা কাব্যই মানবজগতের স্থায়ী সাহিত্য। অন্য ভাবাবলম্বনে রচিত কবিতা যুগবিশেষের যতই আদরণীয় হউক, তাহা যে স্থায়ী সাহিত্য হইবে, কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। আজি হইতে শতবর্ষ পরে বাঙ্গালার বর্তমান যুগের অনেক গীতিকবিতা যে গবেষণাকারী পণ্ডিতেরাও পড়িবেন না, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু বাল্মীকি, বেদব্যাস, বা হোমর, ভার্জিল, কালিদাস, শেক্‌স্‌পীয়র নিত্যকালের। তাই স্থায়ী ভাব হইতেই সাধারণতঃ স্থায়ী সাহিত্যের উদ্ভব হইয়া থাকে।

স্থায়ী ভাবগুলির গণনা এখন করিব না। তাহার আগে ব্যভিচারী ভাবগুলিকে বুঝিতে হইবে এবং উভয়বিধ ভাবের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইবে।

পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বিশেষ ভাবে স্থায়ী ভাব-সমূহের আভিমুখ্যে চলিয়া তাহাদিগকে পুষ্ট করে বলিয়া ইহাদের নাম ব্যভিচারী। ইহাদের অপর একটি নাম সঞ্চারী। স্থায়ী ভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করিয়া ভাবের গতিকে সঞ্চারিত করে বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে।[১] ইহারাও উদ্বোধক বস্তুর সান্নিধ্যে

(১) সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে।

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ২।৩।১ ; রসার্ণবসুধাকর, ২।২

বাসনালোক হইতে চিত্তবৃত্তিরূপে উদ্বুদ্ধ হয়। ইহাদের উদ্বোধক বস্তু বিভাবানুগত বিচিত্র অনুভাব। ইহাদের সম্বন্ধে প্রথম কথাই এই, ইহারা মানবচিত্তে সাধারণতঃ স্বতন্ত্র বা প্রধান হইয়া থাকিতে পারে না, সর্বদাই কোন-না-কোন স্থায়ী ভাবের অধীন হইয়া কাব্যে প্রকাশ পায় এবং রসের পোষকতা করে। মানবচিত্তে ইহাদের স্ফুরণ বিদ্যুতের ন্যায় অল্পকালের নিমিত্ত। ব্যভিচারী ভাব রাজানুচরের ন্যায় অথবা সমুদ্রের বক্ষোবিহারী তরঙ্গের ন্যায়, ইহা পূর্বেই বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখন একটি উদাহরণ দিলেই সকল বিষয় স্পষ্ট হইতে পারে।

বৈষ্ণব কাব্যের রাধাকৃষ্ণের প্রেম বা মধুররতিভাবের বিশ্লেষণ করা যাক্। শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া বা চিত্র দেখিয়া, অথবা কদম্বতলে তাঁহার রূপ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে রাধিকার চিত্তে রতিভাবের উদয় হইয়াছে। এখন সে কেবলই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করে, সে চিন্তা করিতে করিতে মেঘের পানে চাহিয়া থাকে, একদৃষ্টি দিয়া ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ দেখিতে থাকে। কৃষ্ণকে রাধিকা পাইতেছে না, তাহার চিত্ত বিষাদে ভরিয়া যায়, সে চঞ্চল হইয়া একবার ঘরে আরবার বাহিরে যাতায়াত করিতে থাকে। একদিন রাধা শ্রাবণরজনীতে স্বপ্নের ঘোরে শ্রীকৃষ্ণের সাদর স্পর্শ পাইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করে এবং তাহার চিত্ত হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তারপর রাধিকা চলিল অভিসারে, লজ্জায় তাহার পা সরে না, শেষে সখীর স্কন্ধে ভর রাখিয়া চলিতে লাগিল, কৃষ্ণ কিভাবে তাহাকে গ্রহণ করিবেন ভাবিয়া শঙ্কায় বুক দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। এই সময় রাধিকা শুনিল চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কৃষ্ণ খেলা করে। চন্দ্রাবলীর সৌভাগ্য দেখিয়া তাহার ঈর্ষ্যা ও অসূয়া জন্মিল, চন্দ্রাবলীর উপর দোষারোপ করিতে করিতে রাধিকা মোহগ্রস্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল।—ইত্যাদি।

এখানে রাধিকার রতিভাব বা অনুরাগের সাগরে কেবলই ঢেউ উঠিতেছে, আর পড়িতেছে। একবার চিন্তা, আবার বিষাদ, পরক্ষণে স্বপ্নাবস্থা, আবার হর্ষ, লজ্জা, শঙ্কা, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, মোহ, আরও কত ভাবের উদয়-বিলয় চলিল; কিন্তু মূল রতিভাব বা ভালবাসাকে তাহারা ক্রমশঃ নব নব রূপে পুষ্ট করিতে লাগিল। এই ভাবগুলিকেই বলা হয় ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব। ইহাদের অন্তরালবর্তী যে ভাবটি সূত্রে যেমন

—'ভাবের গতিকে সঞ্চারিত করে বলিয়া ব্যভিচারী ভাবকে সঞ্চারী ভাবও বলা হয়।'

পুষ্পগুলিকে গাঁথিয়া লইয়া মাল্য রচনা করে, সেইভাবে ইহাদিগকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে এবং এই কাব্যে পাত্রমিত্র-পরিবেষ্টিত রাজার ন্যায় প্রধান ও স্বতন্ত্র হইয়া রহিয়াছে, তাহাই শৃঙ্গার বা মধুররসের রতিনামক স্থায়ী ভাব।

(৩)

ব্যভিচারী ভাবের ব্যাপার (function) ও মহিমা

রসের অভিব্যক্তিতে ব্যভিচারী ভাবসমূহের উপযোগিতা কতখানি, পূর্বোক্ত উদাহরণ হইতেই স্পষ্ট হইবে।

'রাধা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসে'—এই বাক্য রসাত্মক বাক্য নয় কেন? বিভাব ও স্থায়ী ভাব থাকা সত্ত্বেও দুইটি কারণে উক্ত বাক্য কাব্য হইতে পারে নাই। প্রথম কারণ—বাক্যটিতে স্থায়ী ভাবের উল্লেখমাত্র আছে, উহার বহুলরূপে উপলব্ধি বা প্রকাশ হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ—বাক্যটিতে ব্যভিচারী ভাবের কিছুমাত্র প্রকাশ হয় নাই। হেমাদ্রির নামে প্রচলিত বোপদেব-কৃত মুক্তাফলের কৈবল্যদীপিকা টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে,—

ভাবাৎ এবাতিসম্পন্নাঃ প্রয়ান্তি রসতাম্ অমী।—মুক্তাফল, ১১।১, টীকা, পৃঃ ১৬৪

—'স্থায়ী ভাবসমূহ অতিসম্পন্ন হইলে রসতা প্রাপ্ত হয়।'

স্থায়ী ভাবকে অতিসম্পন্ন হইতে হইলেই উদ্দীপন বিভাবাদিসহ বিবিধ ব্যভিচারী ভাবের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। পূর্বোদাহরণে চিন্তা, বিষাদ, শঙ্কা বা মূর্ছা ভাবগুলির মধ্য দিয়া উহাদের কারণ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রাধিকার রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যভিচারী ভাবগুলি আসিয়া রতি স্থায়ী ভাবকে ক্রমশঃ নব নব রূপে আস্বাদন করাইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে ব্যভিচারী ভাব পরিস্ফুট না হইলে স্থায়ী ভাবের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। স্থায়ী ভাবের স্থিরত্ব, ব্যাপিত্ব, চমৎকারিত্ব ও আস্বাদন-যোগ্যত্ব, অতএব রচনার কাব্যত্ব, অনেক পরিমাণে নির্ভর করে ব্যভিচারী ভাব-সমূহের উপর। এই জন্যই স্তুতিবাদ-স্বরূপ কেহ কেহ ব্যভিচারী ভাবকে এবং রসকে এক বলিয়া থাকেন,—

তাদাত্ম্যং ভাব-রসয়ো র্ভারবিঃ স্পষ্ট মূচিবান্॥

—ভাবপ্রকাশন, ১০ম অধিকার

—'ভারবি ভাব ও রসের তাদাত্ম্যের কথা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।'

এই ভাব যে স্থায়ী ভাব নয়, ব্যভিচারী ভাব, তাহা ভারবির এই মতের পোষক একটি উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যানে শারদাতনয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন,—

…স্তম্ভ-সম্ভ্রমাঙ্গাবসাদাদিভাবৈঃ সম্ভোগশৃঙ্গারঃ প্রকাশ্যতে ইতি তাদাত্ম্যম্।

—'স্তম্ভ, সম্ভ্রম, অঙ্গের অবসাদ প্রভৃতি ভাবদ্বারা সম্ভোগশৃঙ্গার প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব তাদাত্ম্য হইল।'

এখানে যে ভাবগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা সকলই ব্যভিচারী ভাব। শারদাতনয় অন্যত্র বলিয়াছেন,—

ইতি বাসুকিনাপ্যুক্তো ভাবেভ্যো রসসম্ভবঃ।—ভাবপ্রকাশন, ২য় অধিকার

—'ভাবসমূহ হইতে রসোৎপত্তি, ইহা বাসুকি-কর্তৃকও কথিত হইয়াছে।'

এখানেও ভাব অর্থ ব্যভিচারী ভাব বলিয়াই মনে হয়; কারণ স্থায়ী ভাব অর্থ হইলে বাসুকির দোহাই দিয়া বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার প্রশ্ন উঠে না। এই ক্ষেত্রেও ব্যভিচারী ভাবের প্রশংসা মাত্র করা হইয়াছে; আসল কথা হইতেছে,—

—পরিপুষ্টি না হইলে রসত্ব হইবে কি প্রকারে?

এই পরিপুষ্টি উদ্দীপনবিভাবাদি দ্বারা হইলেও বিশেষভাবে হয় ব্যভিচারী ভাবসমূহ দ্বারা।

ব্যভিচারী ভাবের সংখ্যা ভরত গণনা করিয়াছেন তেত্রিশ। কেহ বলিয়াছেন,—

ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ইতি ন্যূনসংখ্যায়া ব্যবচ্ছেদকং, নতু অধিকসংখ্যায়াঃ।

—'তেত্রিশটি ইহা ন্যূনসংখ্যার সীমা, ইহা কিন্তু অধিকসংখ্যার সীমা নহে।'

এই বিষয়ে শারদাতনয় তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব ব্যাখ্যা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন,—

'অন্যেঽপি যদি ভাবাঃ স্যু শ্চিত্তবৃত্তিবিশেষতঃ।
অন্তর্ভাবস্তু সর্বেষাং দ্রষ্টব্যো ব্যভিচারিষু॥—ভাবপ্রকাশন, ১ম অধিকার

—'চিত্তবৃত্তিবিশেষ-স্বরূপ যদি অন্যান্য ভাব থাকে, তাহা হইলে ব্যভিচারী ভাবসমূহের মধ্যেই সেই সকলের অবস্থিতি বুঝিতে হইবে।'

শারদাতনয় ব্যভিচারী ভাবের সংখ্যা আবশ্যকমত বাড়াইতে প্রস্তুত; কিন্তু স্থায়ী ভাবের সংখ্যা আটটির বেশি বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহেন, এমন কি শমকেও নবম স্থায়ী ভাবরূপে গ্রহণ করায় তাঁহার আপত্তি আছে। অবশ্য স্থায়ী ভাব বলিতে তিনি কেবলমাত্র নাট্য-গত স্থায়ী ভাবই বুঝিতেছেন। এই বিষয়ে পরে যথাস্থানে আলোচনা করা হইবে।

আমাদের মতে স্থায়ী ভাব ব্যতীত সকল চিত্তবৃত্তিই ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব হইতে পারে। এমন কি একটি স্থায়ী ভাব সম্পর্কে অপর স্থায়ী ভাবগুলিও ব্যভিচারী ভাবের ন্যায় কার্য করিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে ব্যভিচারী ভাবসমূহের উদাহরণ-স্বরূপ কতকগুলির নাম উল্লেখ করা চলে মাত্র। যুগে যুগে জটিল সমাজ-স্থিতি ও জীবন-গতির নব নব পরিবর্তনের সঙ্গে নব নব ভাব মানবচিত্তে অভ্যুদিত হইবেই। মানব-মনকে যেমন বাঁধা চলে না, তাহার বৃত্তিনিচয়কেও নিঃশেষে কেহ হিসাব করিয়া প্রকাশ করিতে পারে না।

ব্যভিচারী ভাবের সংখ্যা-গণনা যে নির্দোষ হয় নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোদ্ধৃত সমালোচনা হইতেও তাহা বুঝা গিয়াছে। পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ কেহ কেহ শৌচ, ছল, স্নেহ, ঈর্ষ্যা প্রভৃতিকে ব্যভিচারী ভাব বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ভানুদত্ত 'ছল' ভাবের কথা বলিয়াছেন।[১] একাদশ শতাব্দীতে লিখিত সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে ভোজরাজ অপস্মার ও মরণ এই দুইটিকে বাদ দিয়া স্নেহ ও ঈর্ষ্যা এই দুইটিকে গ্রহণ করিয়াছেন,[২] এবং এই ভাবে ব্যভিচারীর মোট সংখ্যা তেত্রিশ রাখিয়াছেন। রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে কৃষ্ণরতি নামক স্থায়ী ভাবের তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবের গণনা করিয়া পরে আরও তেরোটি নূতন ব্যভিচারী ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন[৩]; অবশ্য তিনি এই তেরোটিকে পূর্ববর্তী তেত্রিশটির কোন-না-কোনটির অন্তর্গত বলিয়া দেখাইয়াছেন।

বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য বিচার করিয়া এইখানে আরও তেত্রিশটি ভাবের গণনা করা গেল, যথা,—

করুণা বা দয়া, উপেক্ষা, ক্ষমা, শৌচ বা পবিত্রতা, প্রীতি, প্রমাদ, প্রসন্নতা, ঈর্ষ্যা, দম্ভ, লোভ, নিন্দা, মান, অপমান, অভিমান, অনুতাপ, দম, ত্যাগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সন্তোষ, ভ্রান্তি, ছলনা, খলতা, সহিষ্ণুতা, কোমলতা, কঠিনতা, স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা, প্রগতি, বিদ্রূপ, বিদ্রোহ, সাম্য, সেবা, সমুন্নতি প্রভৃতি।

উপরোক্ত ভাব-সমূহের প্রত্যেকটিই বাঙ্গালা কাব্য বা নাট্যের বিশ্লেষণে লাগিবে। প্রাচীনদের ভাবের নামকরণ ও স্বরূপ লক্ষ্য করিলে উহাদের কোনটির বিষয়েই

(১) রসতরঙ্গিনী, ৫ম তরঙ্গ

(২) সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ৫।১৬-১৮

(৩) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পৃঃ ৫২৭

কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কবিকর্ণপূর বাৎসল্য রসের স্থায়ী ভাবের নাম দিয়াছেন 'মমকার' এবং প্রেমরসের স্থায়ী ভাবের নাম দিয়াছেন 'চিত্তদ্রব'[১]; শান্তরসের স্থায়ী ভাবের নাম আনন্দবর্ধন দিয়াছেন 'তৃষ্ণাক্ষয় সুখ'[২] এবং রুদ্রট দিয়াছেন 'সম্যগ্-জ্ঞান'[৩]। সূক্ষ্ম ভেদ না ধরিয়া একটি ভাবের মধ্যে আরও দুই-একটিকে গ্রহণ করা চলে কি না, এই প্রশ্নও খুব সঙ্গত নয়; কেননা ভরত নিজেই ক্রোধ, ভয় এবং শোক স্থায়ী ভাব থাকা সত্ত্বেও যথাক্রমে অমর্ষ, ত্রাস ও শঙ্কা, এবং বিষাদকে তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে গণনা করিয়াছেন; আবার ত্রাস, শ্রম ও নিদ্রা ব্যভিচারী ভাব থাকা সত্ত্বেও শঙ্কা, গ্লানি ও সুপ্তিকে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া গণনা করিয়াছেন। আমাদের উল্লিখিত নূতন তেত্রিশটি ভাবের মধ্যে প্রীতি, ভক্তি, স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা ও সমুন্নতি ভাব আমাদের মতে স্থায়ী ভাব, অবশিষ্টগুলি ব্যভিচারী।

আমরা যে নূতন তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের বাহিরেও অনেক ব্যভিচারী ভাব রহিয়া গেল, বিভিন্ন নাট্য বা কাব্য-বিশ্লেষণে সেইগুলি পাওয়া যাইবে।

উপরে যাহা ব্যাখ্যাত হইল, তাহা হইতে মনে হইতে পারে ভাবসমূহের স্থায়ী ও ব্যভিচারী রূপে বিভাগ আপেক্ষিক নহে, নিত্য। উভয়বিধ ভাবের সম্পর্ক তাই নিপুণতর ভাবে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

(৪)

ব্যভিচারী রূপে স্থায়ী ভাব

রতি, শোক প্রভৃতি ভাব অতিসম্পন্ন হইয়া রসের প্রকাশ করিলে তাহারা শুধু নামে নয়, কার্যতঃও স্থায়ী ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ ভাবগুলি অতিসম্পন্ন না হইলে অর্থাৎ বিভাবাদিদ্বারা উপযুক্তরূপে পুষ্ট না হইলে সাধারণ ভাব বলিয়াই

(১) অলঙ্কার-কৌস্তুভ, ৫।৭৪, বৃত্তি, পৃঃ ১৪৮

(২) ধ্বন্যালোক, ৩।২৬, বৃত্তি, পৃঃ ১৭৬

(৩) কাব্যালঙ্কার, ১৫।১৫

পরিগণিত হয় এবং কাব্যান্তর্বর্তী অন্য স্থায়ী ভাবের পুষ্টি করিয়া তাহার ব্যভিচারী ভাবের ন্যায় কার্য করিয়া থাকে। এই বিষয়ে স্বয়ং অভিনবগুপ্ত বলেন,—

স্থায়িনো হি ব্যভিচারিতা ভবতি, ন তু ব্যভিচারিণাং স্থায়িতা। এবং সতি তদাস্বাদে রসান্তরমপি স্যাৎ। —নাট্যশাস্ত্র, ৭।২, ভাষ্য, পৃ. ৩৪৬

—'স্থায়ী ভাবের ব্যভিচারিতা হয়, কিন্তু ব্যভিচারী ভাব-সমূহের স্থায়িতা হয় না। এইরূপ হইলে তাহাদের আস্বাদে অন্য রসও হইতে পারে।'

অভিনবগুপ্ত পূর্বেই মন্তব্য করিয়াছেন,—জুগুপ্সা নামক স্থায়ী ভাবকে শৃঙ্গাররসে নিষেধ করিয়া ভরতমুনি সকল স্থায়ী ভাবেরই স্থায়িতা ও সঞ্চারিতা হয় এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন।[১]

এই বিষয়ে সঙ্গীতরত্নাকর-প্রণেতা শার্ঙ্গদেব এবং রসতরঙ্গিণী-প্রণেতা ভানুদত্তের অনুকূল মত অতি স্পষ্ট। সঙ্গীতরত্নাকরের মত পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ তুলিয়া দেখাইয়াছেন[২]; যথা,—

রত্যাদয়ঃ স্থায়িভাবাঃ স্যু র্ভূয়িষ্ঠবিভাবজাঃ।
স্তোকৈ র্বিভাবৈ রুৎপন্না স্ত এব ব্যভিচারিণঃ॥

—'ভূয়িষ্ঠ বিভাবাদি হইতে জাত হইলে রত্যাদি ভাব স্থায়ী ভাব হইয়া থাকে; অল্প বিভাবাদি হইতে উৎপন্ন হইলে তাহারাই হয় ব্যভিচারী।'

ভানুদত্ত বলেন,—

স্থায়িনোঽপি ব্যভিচরন্তি। হাসঃ শৃঙ্গারে। রতিঃ শান্ত-করুণ-হাস্যেষু, ভয়শোকৌ করুণ-শৃঙ্গারয়োঃ। ক্রোধো বীরে। জুগুপ্সা ভয়ানকে। উৎসাহ-বিস্ময়ৌ সর্বরসেষু ব্যভিচারিণৌ॥ —রসতরঙ্গিণী, ৫ম তরঙ্গ

—'স্থায়ী ভাবগুলিও ব্যভিচারী হয়। হাস শৃঙ্গারে, রতি শান্ত, করুণ ও হাস্যরসে, ভয় ও শোক করুণ ও শৃঙ্গাররসে, ক্রোধ বীররসে, জুগুপ্সা ভয়ানকরসে এবং উৎসাহ ও বিস্ময় সকল রসে ব্যভিচারী হইয়া থাকে।'

অভিনবগুপ্ত বুঝাইতে চাহেন ব্যভিচারী ভাবের আবার ব্যভিচারী থাকিতে পারে না। যদি কখনও শঙ্কা হয় যে থাকিতে পারে, তবে বুঝিতে হইবে তাহা মূল স্থায়ী ভাবের।

(১) দ্রষ্টব্য—নাট্যশাস্ত্র, ৬।১০৪, ভাষ্য, পৃ. ৩৩৪।

(২) রসগঙ্গাধর, বৃত্তি, পৃ. ৩১।

যত্রাপি ব্যভিচারিণি ব্যভিচার্যন্তরং সম্ভাব্যতে, তদ্ যথা—পুরূরবসঃ উন্মাদেঽপি তর্কচিন্তাদি, তত্রাপি রতিস্থায়িভাবস্য এব ব্যভিচার্যন্তর-যোগঃ।

—নাট্যশাস্ত্র, ৭।২, ভাষ্য, পৃ. ৩৪৬

—'যেখানে ব্যভিচারী ভাবে অন্য ব্যভিচারী ভাবের সম্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, যেমন—পুরূরবার উন্মাদ-অবস্থায় তর্ক-চিন্তা প্রভৃতি, সেখানেও রতি স্থায়ী ভাবেই অন্য ব্যভিচারী ভাবের যোগ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।'

কিন্তু অভিনবের সরণি অনুসরণ করিয়া নাট্যশাস্ত্র সন্ধান করিলে মনে হয়, ভরতের মতে ব্যভিচারীর ব্যভিচারী ভাব থাকিতে পারে। দৈন্যের সংজ্ঞায় ভরত লিখিয়াছেন,—

চিন্তৌৎসুক্য-সমুত্থা দুঃখাখ্যা ভবতি দীনতা পুংসাম্।—নাট্যশাস্ত্র, ৭।৭৪, পৃ. ৩৬২

—'পুরুষদের দীনতা হইতেছে চিন্তা ও ঔৎসুক্য হইতে সমুত্থিত দুঃখবিশেষ।'

এখানে চিন্তা ও ঔৎসুক্য নামক দুইটি ব্যভিচারী ভাব হইতে দীনতা বা দৈন্য নামক ব্যভিচারীর উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। এইরূপে নাট্যশাস্ত্রে ব্যভিচারী ভাবের ব্যাখ্যায় আরও উদাহরণ পাওয়া যায়।

রস

(১)

স্থায়ী রস ও সঞ্চারী রস

রসেরও স্থায়ী ও সঞ্চারী রূপে দুইটি ভেদ আছে কি না—এই প্রশ্ন কোন কোন আলঙ্কারিক আলোচনা করিয়াছেন।

যে কাব্যে বা প্রবন্ধে বিবিধ রস সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে ধ্বনিকার বলেন,—

প্রসিদ্ধেঽপি প্রবন্ধানাং নানারসনিবন্ধনে।
একো রসোঽঙ্গীকর্তব্য স্তেষাম্ উৎকর্ষম্ ইচ্ছতা॥—ধ্বন্যালোক, ৩।২১

—'নাট্য বা কাব্যরূপ প্রসিদ্ধ প্রবন্ধসমূহের মধ্যে নানা রস নিবদ্ধ হইলে তাহাদের উৎকর্ষের নিমিত্ত একটিমাত্র রসকে **অঙ্গী** বা মুখ্য করিবে।'

কাব্য-গত ঐক্য রক্ষার জন্যই একটি হইবে **অঙ্গী রস** বা প্রধান রস, অপর রস-সমূহ হইবে **অঙ্গ-স্থানীয়**। সকল রসই স্বরূপ-লক্ষণে একপ্রকার হইলেও এবং

আবির্ভাবকালে চিত্তকে প্রায় সমানভাবে তন্ময় করিলেও সমগ্র কাব্যের দৃষ্টি হইতে একটি রস হইবে অঙ্গী, ইহা তাহার প্রাণভূত, সমগ্র কাব্যেই তাহার স্থায়িত্ব, কোথাও বা প্রবলভাবে অন্তরে ও বাহিরে, কোথাও বা সূক্ষ্মভাবে কেবল অন্তরালে। অবশিষ্ট সকল রস সমগ্র কাব্যের বিচারে উদয়-বিলয়-শীল, কিন্তু তাহারা মূলরসাশ্রয়ী ঘটনার সূত্রে বিধৃত হইয়া যখন প্রকাশ পায়, তখন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে অঙ্গী রসের পোষকতা করিয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতপক্ষে অঙ্গাঙ্গি-ভাব।

এখন প্রশ্ন এই,—যেখানে সমগ্র কাব্য বা নাট্য-প্রবন্ধে বিভিন্নরসসমূহের অঙ্গাঙ্গি-ভাব রহিয়াছে, সেখানে কাব্যগত স্থায়ী ভাব ও তাহার সঞ্চারী ভাবের ন্যায় কাব্যগত অঙ্গী রসকে স্থায়ী রস এবং অবশিষ্ট অঙ্গ-ভূত রস-সমূহকে তাহার সঞ্চারী রস বলিতে পারা যায় কি ?

অঙ্গী রসের আপেক্ষিক স্বরূপ বুঝাইতে যাইয়া ধ্বনিকার যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহাতে মনে হয় অঙ্গী রসকে তিনি কার্যতঃ স্থায়ী রস বলিয়াই মনে করেন। আনন্দ-বর্ধন উহার বৃত্তিতে স্পষ্টভাবে স্থায়ী রস শব্দ প্রয়োগ করিয়া উহার যথার্থ স্বরূপও প্রকাশ করিয়াছেন। একই প্রবন্ধে বহুরস পরিপোষ প্রাপ্ত হইলে একটি রস যথার্থই অঙ্গী হয় কি না—এই প্রশ্নের উত্তরে ধ্বনিকার বলিতেছেন,—

রসান্তর-সমাবেশঃ প্রস্তুতস্য রসস্য যঃ।
নোপহন্ত্যাঙ্গিতাং সোঽস্য স্থায়িত্বেনাবভাসিনঃ॥—ধ্বন্যালোক, ৩৷২২

—'প্রস্তুত বা বর্ণনীয় রসের অন্যরসের সহিত যে সমাবেশ, তাহা স্থায়িরূপে প্রকাশমান উক্ত রসের অঙ্গিতা ক্ষুণ্ণ করে না।'

আমরা এই মন্তব্য হইতে দুইটি তথ্য পাইতেছি। প্রথম, একটি প্রবন্ধে একটি মাত্র রসই প্রস্তুত বা মুখ্য বর্ণনীয়; উহাই কবির গভীর অন্তরে প্রথম প্রেরণা সঞ্চার করে, উহাই বীজস্থানীয় হইয়া ফল-পুষ্প-সমন্বিত কাব্য-তরুর প্রকাশ ঘটায়।

দ্বিতীয় তথ্য প্রথমটি হইতেই আসিয়া থাকে। বীজের শক্তি যেমন বৃক্ষের সর্বত্র সঞ্চরমাণ, কাব্যের মূলরসও তাহার অন্তর্গত অন্য সকল রসে তেমনই বর্তমান ও বহমান। ইহাকেই বলা হইয়াছে,—'স্থায়ী রূপে অবভাসমান'। মূল রসটি অন্য সকল রসেই অবভাসমান বা প্রকাশমান বলিয়া তাহা স্থায়ী রস এবং এই জন্যই তাহা অঙ্গী রস, আধিকারিক রস।

আনন্দবর্ধন এখানে বৃত্তিতে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়াছেন,—

প্রবন্ধেষু প্রথমতরং প্রস্তুতঃ সন্ পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধীয়মানত্বেন স্থায়ী যো রসঃ, তস্য সকলরস-ব্যাপিনো রসান্তরৈঃ অন্তরালবর্তিভিঃ সমাবেশো যঃ স ন অঙ্গিতামুপহন্তি।

—ধ্বন্যালোক, ৩।২২, বৃত্তি

—'নাট্য বা কাব্য প্রবন্ধ-সমূহে প্রথম হইতেই প্রস্তুত বা মুখ্য বর্ণনীয় হইয়া যে রস পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধানের বিষয় বলিয়া স্থায়ী হয়, তাহা প্রবন্ধান্তর্গত সকল রসকেই পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে; এবং অন্তরালবর্তী অন্য রসসমূহের সহিত উক্ত রসের যে সমাবেশ, তাহা উহার অঙ্গিতাকে নাশ অর্থাৎ ক্ষুন্ন করে না।'

লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, স্থায়ী ভাবের স্থায়িত্বের যে যে কারণ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, প্রায় সেই সকলই এখানে অঙ্গী রসের অঙ্গিত্ব বা স্থায়িত্বের কারণ-স্বরূপ বিন্যস্ত হইয়াছে।

আমাদের তাই মনে হয়, ধ্বনিকার এবং আনন্দবর্ধনের মতে যাহা অঙ্গী রস, তাহাকে স্থায়ী রস বলিলে কোনও দোষ হয় না। ইহার অল্প পরেই চতুর্বিংশ কারিকার ব্যাখ্যানের শেষভাগে আনন্দবর্ধন এই বিষয়ে প্রচলিত দুইটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন; এবং সম্ভবতঃ উভয় মতের মধ্যে প্রকৃত বিরোধ অল্পই বলিয়া কোনও মতেরই বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন নাই। আচার্য অভিনবগুপ্তও টীকায় দুইটি মতের বিশদ ব্যাখ্যান মাত্র করিয়াছেন।

অঙ্গী ও অঙ্গ-ভূত রসের বর্ণনা-বিষয়ে ধ্বনিকার বলেন,—

অবিরোধী বিরোধী বা রসোঽঙ্গিনি রসান্তরে।
পরিপোষং ন নেতব্য স্তথা স্যাদ্ অবিরোধিতা ॥—ধ্বন্যালোক, ৩।২৪

—'অন্যরস অঙ্গী হইলে তাহার অঙ্গ-ভূত অবিরোধী বা বিরোধী রসকে তাহার তুল্য পরিপুষ্ট দিবে না; তাহা হইলেই উভয়ের অবিরোধিতা বা মিলন রক্ষিত হইবে।'

উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে,—'মেঘনাদবধ কাব্যে' প্রধান বা অঙ্গী রস হইতেছে করুণরস এবং অঙ্গ-ভূত হইতেছে বীররস ও শৃঙ্গাররস। অঙ্গী করুণরস কাব্যের আরম্ভে বীরবাহুর মৃত্যুতে রাজা রাবণের ও মাতা চিত্রাঙ্গদার বিলাপে, কাব্যের মধ্যভাগে শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের মৃত্যুকল্প মূর্চায় রামচন্দ্রের বিলাপে, এবং অবসানে মেঘনাদের মৃত্যু ও প্রমীলার সহমরণে লঙ্কার রাক্ষসবর্গ এবং রাজা রাবণের বিলাপে পুনঃ পুনঃ স্ফূর্ত হইয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বীররস ও শৃঙ্গাররস যেখানে স্ফূর্ত হইয়াছে, সেখানে প্রবল হইলেও সমগ্র কাব্যে করুণরসের তুল্য পরিপুষ্টি লাভ করে

নাই, ন্যূনতা রহিয়াছে। কাজেই মেঘনাদবধ কাব্যে করুণরস অঙ্গী, বীর ও শৃঙ্গার রস সাধর্ম্যে বা বৈধর্ম্যে তাহাকে পুষ্ট করিয়া অঙ্গ-স্থানীয় হইয়াছে।

এই কারিকার টীকায় বহুরসোজ্জ্বল প্রবন্ধে রসসমূহের অঙ্গাঙ্গিভাব অর্থাৎ একটি রস অঙ্গী, অবশিষ্টগুলি অঙ্গ,—ইহা প্রতিপন্ন করিয়া আনন্দবর্ধন যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতেই স্থায়ী ও সঞ্চারী রসের প্রশ্ন সাক্ষাৎভাবে আলোচিত হইয়াছে। আনন্দবর্ধন বলেন,—

এতচ্চ সর্বং যেষাং 'রসো রসান্তরস্য ব্যভিচারীভবতি' ইতি নিদর্শনং, তন্মতেন উচ্যতে। মতান্তরেঽপি রসানাং স্থায়িনো ভাবা উপচারাদ্ রসশব্দেন উক্তাঃ তেষাম্ অঙ্গিত্বে নির্বিরোধিত্বম্ এব।

—'যাহাদের নিকটে "রস রসান্তরের ব্যভিচারী হয়"—ইহাই নিদর্শন, তাহাদের মতানুসারে এই সকল লিখিত হইল। অন্যমতেও রসসমূহের স্থায়ী ভাবগুলিই উপচার-হেতু রসশব্দ দ্বারা উক্ত হইয়াছে; তাহাদের মতেও তাই রসের অর্থাৎ স্থায়ী ভাবের অঙ্গিত্ব-বিষয়ে কোনও বিরোধ নাই।'

আমরা এই বৃত্তিতে বর্তমান প্রসঙ্গে দুইটি মতবাদের সন্ধান পাইতেছি,—এক, রস রসান্তরের ব্যভিচারী হয়; অর্থাৎ যে প্রবন্ধে বহুরসের সমাবেশ আছে, সেখানে একটি হইবে স্থায়ী রস, অপরগুলি সঞ্চারী রস। এই মতের পরিপোষক একটি শ্লোক অভিনবগুপ্ত লোচন-টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা,—

বহূনাং সমবেতানাং রূপং যস্য ভবেদ্ বহু।
স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী, শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ ॥—ধ্বন্যালোক, পৃ. ১৭৪, টীকা

—'সমবেত অনেক রসের মধ্যে যাহার রূপ বহুল ভাবে উপলব্ধ হইবে, সেইটিকেই স্থায়ী রস বলিয়া জানিবে; অবশিষ্টগুলি সঞ্চারী রস।'

এই মত ও মত-সমর্থক যুক্তি স্পষ্ট। অভিনবগুপ্ত এই বিষয়ে ভাগুরি-নামক এক আলঙ্কারিকের মতও উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

তথা চ ভাগুরি রপি কিং রসানাম্ অপি স্থায়ি-সঞ্চারিতা অস্তি ইত্যাক্ষিপ্য অভ্যুপগমেন এব উত্তরম্ অবোচদ্—বাঢ়ম্ অস্তি ইতি। —ধ্বন্যালোক, ৩।২৪, টীকা

—'সেইরূপ ভাগুরিও বলেন—"রসসমূহেরও কি স্থায়ী সঞ্চারী রূপ আছে?"—এইরূপ প্রশ্ন করিয়া উপলব্ধি করিয়া উত্তর বলিলেন,—"হাঁ আছে"।'

কাব্যজিজ্ঞাসা-গ্রন্থে শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত ভাগুরির মত তুলিয়া উহার সমর্থন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মতবাদ হইতেছে এই, আলোচ্য স্থলসমূহে ভাবগুলিই উপচারধর্মে রসশব্দদ্বারা অভিহিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে স্থায়ী রস ও সঞ্চারী রস নয়, আসল কথা স্থায়ী ভাব ও সঞ্চারী ভাব; এবং এইরূপেই উভয়দিকের বিরোধ ভঞ্জন হয়।

লোচনটীকায় অভিনবগুপ্ত এই মতের এইরূপ ব্যাখ্যান করিয়াছেন,—

বহূনাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং যথোপলভ্যতে স স্থায়ী ভাবঃ। স চ রসো রসীকরণযোগ্যঃ, শেষাস্তু সঞ্চারিণ ইতি ব্যাচক্ষতে। ন তু রসানাং স্থায়িসঞ্চারিভাবেন অঙ্গাঙ্গিতা যুক্তা।—ঐ, ঐ

—'চিত্তবৃত্তি-রূপ বহু ভাবের মধ্যে যাহার রূপ বহুল পরিমাণে উপলব্ধ হয়, তাহাই স্থায়ী ভাব। তাহাই রসীকরণযোগ্য অর্থাৎ আস্বাদনের যোগ্য বলিয়া রস, এবং অবশিষ্টগুলি সঞ্চারী এইরূপ বলা হইয়া থাকে। রস-সমূহের স্থায়ী ও সঞ্চারী রূপে অঙ্গাঙ্গিতা যুক্তিযুক্ত হয় না।'[১]

আদি আচার্য ভরতমুনিও মাহাত্ম্য-খ্যাপনের জন্য স্থায়ী ভাবকেই রস বলিয়াছেন। কনিষ্ঠ আলঙ্কারিক জগন্নাথও প্রকরণ-বিশেষে রসশব্দদ্বারা স্থায়ী ভাব বুঝিয়াছেন।[২] কাজেই এই ব্যাখ্যায়ও আপত্তি করিবার কিছু নাই। বাস্তবিকপক্ষে যেখানে জগন্নাথ বলিয়াছেন,—

এবং চ বীররসে প্রধানে ক্রোধো, রৌদ্রে চ উৎসাহঃ, শৃঙ্গারে হাসো ব্যভিচারী ভবতি, নান্তরীয়কশ্চ। —রসগঙ্গাধর, পৃঃ ৩১

—'এইরূপ বীররস প্রধান হইলে ক্রোধ, রৌদ্রে উৎসাহ এবং শৃঙ্গারে হাস ব্যভিচারী হয়, কখনও অন্তরায় হয় না।'

(১) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এই অংশকে অভিনবগুপ্তের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (কাব্যজিজ্ঞাসা, ২য় সং, পৃঃ ৩৭-৩৮)। আমাদের মনে হয়, এখানেও অভিনবগুপ্ত আনন্দবর্ধনের বৃত্তিতে উল্লিখিত দ্বিতীয় মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। কাব্য-জিজ্ঞাসায় এই প্রসঙ্গেরই শেষাংশে (পৃঃ ৩৯) 'পরিপোষরহিতস্য কথং রসত্বম্' বলিয়া সমাপ্ত করিয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা যথার্থ হইলেও আনন্দবর্ধন-কৃত মূল বৃত্তির প্রসঙ্গের বহির্ভূত।

(২) যথা,—রসপদেনাত্র প্রকরণে তদুপাধিঃ স্থায়িভাবো গৃহ্যতে।

—রসগঙ্গাধর, পৃঃ ৪৭

—'এই প্রকরণে রসপদ দ্বারা তাহার উপাধি স্থায়ী ভাব গৃহীত হইয়াছে।'

—সেখানে স্থায়ী রসের সম্পর্কেই ব্যভিচারী ভাবের কথা উক্ত হইয়াছে ; অতএব রস শব্দ এখানেও স্থায়ী ভাবের বাচক।

এই প্রসঙ্গ আর দীর্ঘ করিয়া লাভ নাই। আচার্য আনন্দবর্ধন প্রথম নিজের বৃত্তিতে প্রকারান্তরে অঙ্গী রসকে স্থায়ী রস বলিয়াছেন, পরবর্তী অংশে যাঁহারা স্থায়ী রস ও তাহার সঞ্চারী রসের কথা বলেন, তাঁহাদের অভিমতই প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন এবং কোনও বিরোধিতা করেন নাই। ধ্বনিকারের কারিকা-সমূহের ইঙ্গিতও এই বিষয়ে স্পষ্টতঃ অনুকূল। বলা বাহুল্য, আমরাও অনুরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করি। বহুরস-যুক্ত প্রবন্ধে কাব্য-গত ঐক্যরক্ষা-কল্পে একটিকে অঙ্গী রস, অপরগুলিকে অঙ্গ-ভূত রস করিতে হইবেই। এতদুভয়ের সম্বন্ধ বিচার করিলে অঙ্গী রসকে স্থায়ী এবং অঙ্গ-ভূত রসকে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী বলায় দোষের কিছুই নাই ; বরং তাহাতে সমগ্রকাব্যের বিশ্লেষণে সুবিধাই হয়।

(২)
আধিকারিক রস ও প্রাসঙ্গিক রস

এখন প্রশ্ন—যে সকল ভাব ব্যভিচারী বা সঞ্চারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, অথবা নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থায়ী ভাব ভিন্ন মানব-চিত্তে আর যে যে ভাবের উদয়-বিলয় হয়, তাহারা কোনও অবস্থায়ই স্বতন্ত্র হইয়া স্থায়ী ভাবের ন্যায় রসোৎপাদনে সমর্থ কি ?

প্রশ্নটি লইয়া পূর্বাচার্যগণ কি আলোচনা করিয়াছেন, তাহাই আগে পরীক্ষা করা যাক্।

রস-বাদের প্রধান আচার্য অভিনবগুপ্তের অভিমত এই বিষয়ে স্পষ্ট। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, অভিনবভারতী ভাষ্যে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,—

"স্থায়ী ভাবেরই ব্যভিচারিতা হয়, কিন্তু ব্যভিচারী ভাবসমূহের স্থায়িতা হয় না। এইরূপ হইলে তাহাদের আস্বাদে অন্য রসও উৎপন্ন হইতে পারে।"

অভিনবভারতী ভাষ্য পাঠে মনে হয়, অভিনবগুপ্তের আবির্ভাবের পূর্বে লোল্লট প্রভৃতি একদল আলঙ্কারিক ব্যভিচারী ভাবেরও স্থায়িতা হয় এবং স্থায়ী ভাবের নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই[১], এইরূপ মনে করিতেন। লোচন টীকায় অভিনবগুপ্তের মন্তব্য

(১) দ্রষ্টব্য—নাট্যশাস্ত্র, অভিনবভারতী ভাষ্য, পৃঃ ২৭০, পৃঃ ২৯৯, পৃঃ ৩৪১।

দেখিয়া মনে হয়, সেই সময়ে রস-সম্বন্ধে একটা ভ্রম-পূর্ণ বিপর্যস্ত ধারণা চলিত। তিনি লিখিতেছেন,—

অন্যে তু শুদ্ধং বিভাবম্, অপরে শুদ্ধম্ অনুভাবম্, কেচিত্তু স্থায়িমাত্রম্, ইতরে ব্যভিচারিণম্, অন্যে তৎ-সংযোগম্, একে অনুকার্যম্, কেচন সকলমেব সমুদায়ং রসম্ আহুঃ, ইত্যলং বহুনা। —ধ্বন্যালোক, ২।৪ টীকা, পৃঃ ৬৯

—'রসকে একদল বলিতেন শুদ্ধ বিভাবমাত্র, অপর দল শুদ্ধ অনুভাবমাত্র, কেহ কেহ স্থায়ী ভাবমাত্র, অন্যেরা ব্যভিচারী ভাবমাত্র, অপরেরা এই সকলের সংযোগ-মাত্র, অন্য দল অনুকার্যমাত্র, কেহ কেহ সমুদায় সকলকেই রস বলিতেন। আর অধিক বলার প্রয়োজন নাই।'

জগন্নাথও রসগঙ্গাধরে[১] সম্ভবতঃ উল্লিখিত অংশেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

কিন্তু অভিনবগুপ্ত যুক্তির যে তীক্ষ্নতা ও সারবত্তা দেখাইয়া শান্তরসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং তাহাকেই শ্রেষ্ঠ রস বলিয়া প্রমাণিত করিয়া রসের সংখ্যা আট স্থলে নয় বলিয়া নির্ধারণ করিলেন, তাঁহার অপূর্ব সন্দর্ভের শেষ ভাগে সংখ্যা নয়ের অধিক হইতে পারে না নির্দেশ করিতে যাইয়া আচার্য তাহারই একান্ত অভাব এবং বিচার-বিমুখ স্থূলতা প্রকট করিয়াছেন।

অনুদারতা প্রবেশ করিলে মহৎ মনও বিভ্রান্ত হয়, সন্দেহ নাই। অভিনবের উক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল, যথাস্থানে তাহার সমালোচনা করা যাইবে।

এবং তে নব রসাঃ।··· আর্দ্রতা-স্থায়িকঃ স্নেহো রস ইতি তু অসৎ। স্নেহো হি অভিষঙ্গঃ। স চ সর্বো রত্যুৎসাহাদৌ এব পর্যবস্যতি। তথাহি বালস্য মাতা-পিত্রাদৌ স্নেহো ভয়ে বিশ্রান্তঃ, যূনোঃ মিত্রজনে রতৌ, লক্ষ্মণাদেঃ ভ্রাতরি স্নেহঃ ধর্মবীর এব। এবং বৃদ্ধস্য পুত্রাদৌ অপি দ্রষ্টব্যম্। এষৈব গর্ধ-স্থায়িকস্য লৌল্যরসস্য প্রত্যাখ্যানে সরণি র্মন্তব্যা, হাসে বা রতৌ বা অন্যত্র বা পর্যবসানাৎ। এবং ভক্তৌ অপি বাচ্যমিতি।[২] —নাট্যশাস্ত্র, ৬।১০৯, ভাষ্য, পৃঃ ৩৪২

—'এইরূপে তাহারা নয়টি রস।·····স্নেহ নামে এক রস আছে, আর্দ্রতা তাহার স্থায়ী ভাব—এই মত ঠিক নয়। স্নেহ হইতেছে আসক্তি। তাহা সকলই রতি বা উৎসাহ প্রভৃতিতে পর্যবসিত হয়। এইরূপে বালকের মাতাপিতা প্রভৃতির প্রতি যে স্নেহ, তাহা ভয়ের অন্তর্ভূত; যুবক যুবতীর মিত্রজনে স্নেহ রতির নামান্তর।

(১) রসগঙ্গাধর, পৃঃ ২৮

(২) হেমচন্দ্রের বৃত্তি আলোচনা করিয়া এই পাঠ স্থির করা হইল।

লক্ষ্মণাদির ভ্রাতার প্রতি যে স্নেহ তাহা ধর্মবীর মাত্র। বৃদ্ধের পুত্রাদির প্রতি স্নেহও এইরূপ বুঝিতে হইবে। গর্ধ বা তৃষ্ণা স্থায়ী ভাব হইয়া যে লৌল্য রস জন্মায় বলিয়া কথিত হয়, তাহারও প্রত্যাখ্যানের এই পথ বুঝা যাইবে; হাস বা রতি বা অন্য ভাবে তাহার পর্যবসান হয়। এইরূপে ভক্তিরসের বেলায়ও বলিতে হইবে।'

অভিনবের এই অংশ হইতেই স্নেহ বা বাৎসল্য রস, লৌল্যরস এবং ভক্তিরসের কথা জানা যায়। এই সন্দর্ভেই পূর্বে তিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি রসের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সকল বিষয়েই কাব্যানুশাসন-প্রণেতা হেমচন্দ্র অভিনবের প্রতিধ্বনি করিয়া চলিয়াছেন।

যে সকল গ্রন্থ এখন মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের পাঠে মনে হয় ভট্ট উদ্ভটই সর্বপ্রথম শান্ত রসকে স্বীকার করিয়া নাট্যে নব রসের কথা[1] বলেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, ভরত-প্রণীত নাট্য-শাস্ত্র ব্যাখ্যানের সময়ে তিনিই সর্বপ্রথম শান্তরসের কথা মূলগ্রন্থে নিবদ্ধ করেন; উহা পূর্বে সেখানে ছিল না।

এই বিষয়ে সর্বপ্রথমে উদার এবং যুক্তি-নিষ্ঠ অভিমত প্রচার করেন শ্রীরুদ্রট। তাঁহার আবির্ভাবকাল নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ আটটি নাট্যরসের সহিত শান্ত ও প্রেয়ঃ রসকে গণনা করিয়া তিনি মন্তব্য করিলেন,—

রসনাদ্ রসত্বম্ এষাং মধুরাদীনামিবোক্তম্ আচার্যৈঃ।
নির্বেদাদিষ্বপি তন্নিকামম্ অস্তীতি তেঽপি রসাঃ॥—কাব্যালঙ্কার, ১২।৪

'আচার্যগণ-কর্তৃক মধুরাদি রসের ন্যায় রসন বা আস্বাদন-হেতু এই স্থায়ী ভাবসমূহের রসত্বের কথা উক্ত হইয়াছে। নির্বেদ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাবসমূহেও তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে বলিয়া তাহারাও রস হইতে পারে।'

টীকাকার নমি সাধু এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—

অয়ম্ আশয়ো গ্রন্থকারস্য—যদুত নাস্তি সা কাপি চিত্তবৃত্তির্যা পরিপোষং গতা ন রসীভবতি।

—'গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে, এমন কোন চিত্তবৃত্তিই নাই যাহা পরিপোষ প্রাপ্ত হইলে রস হয় না।'

রুদ্রটের ব্যবহৃত 'রসনাৎ'—অর্থাৎ আস্বাদন-হেতু শব্দ দেখিয়া মনে হয়, তিনি

(১) উদ্ভট-প্রণীত কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ, ৪।৪

ভরতমুনির "অত্র রস ইতি কঃ পদার্থঃ? উচ্যতে আস্বাদ্যত্বাৎ" (নাট্যশাস্ত্র, ৬।৩৫)—আস্বাদ্যতা-হেতুই রস, মাত্র এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া নিজ মত স্থাপন করিতেছেন।

অভিনবগুপ্ত রুদ্রটের অন্ততঃ এক শতাব্দী পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রুদ্রটের অভিমত দেখিয়া থাকিলেও তিনি তাহা স্বীকার করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে রুদ্রটই সর্বপ্রথম স্নেহ অর্থাৎ সৌহার্দকে স্থায়ী ভাব স্বীকার করিয়া প্রেয়োরসকে গণনা করেন।

একাদশ শতাব্দীতে ভোজরাজও শৃঙ্গারপ্রকাশ গ্রন্থে একাদশ প্রকাশে রুদ্রটের ন্যায় একই প্রকার অভিমত জানাইয়া পূর্বাচার্যগণের ন্যায় রসের সংখ্যা নির্দেশ অনাবশ্যক বলিয়া মন্তব্য করেন। সরস্বতীকণ্ঠাভরণে তিনি প্রেয়ঃ ও শান্ত ছাড়া উদ্ধত ও উদাত্ত নামে দুইটি নূতন রসেরও নামোল্লেখ করেন,—

রতৌ সঞ্চারিণঃ সর্বান্ গর্ব-স্নেহৌ ধৃতিং মতিম্।
স্থায়ি়নেবোদ্ধত-প্রেয়ঃ-শান্তোদাত্তেষু জানতে॥"

—সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ৫।২৩

—'রতিভাব সম্পর্কে গর্ব, স্নেহ, ধৃতি ও মতি সকলই সঞ্চারী ভাব। উহারা স্থায়ী হইলে যথাক্রমে উদ্ধত, প্রেয়ঃ, শান্ত ও উদাত্ত রসরূপে পরিজ্ঞাত হয়।'

পুনরায় সরস্বতীকণ্ঠাভরণের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ১৬৪তম কারিকায় ভোজ একসঙ্গে বারোটি রসেরই গণনা করিয়াছেন; এবং উহার ব্যাখ্যান-সময়ে বৃত্তিতে প্রসঙ্গক্রমে নূতন রস কয়টি যে, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদাত্ত—এই চতুর্বিধ নায়কের জন্য কল্পিত হইয়াছে, তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন।

স্থায়ী ভাব ও ব্যভিচারী ভাব সম্পর্কে ভোজদেব শৃঙ্গারপ্রকাশের মুখবন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা অর্থ-দীপ্তি ও প্রকাশ-ভঙ্গীতে একেবারে আধুনিক হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—

রত্যাদয়ো যদি রসাঃ স্যুঃ অতিপ্রকর্ষে,
হর্ষাদিভিঃ কিম্ অপরাদ্ধম্ অতদ্‌বিভিন্নৈঃ।
অস্থায়িন স্তু ইতি চেদ্ ভয়-হাস-শোক-
ক্রোধাদয়ো বদ কিয়চ্চিরম্ উল্লসন্তি॥১১
স্থায়িত্বম্ অত্র বিষয়াতিশয়াৎ মতং চে-
চ্চিন্তাদয়ঃ কুতঃ; উত প্রকৃতে র্বশেন।

তুল্যৈব স্বাত্মনি ভবেদ্; অথ বাসনায়াঃ
সন্দীপনাৎ? তদুভয়ম্ অত্র সমানমেব ॥১২

—শৃঙ্গারপ্রকাশ, ১ম প্রকাশ, ১১, ১২

—'অতিপ্রকর্ষ প্রাপ্ত হইলে রতিপ্রভৃতি যদি রস হয়, তবে হর্ষপ্রভৃতি ভাব, যাহারা তাহাদের হইতে স্বরূপতঃ বিভিন্ন নহে, কি অপরাধ করিল? যদি বলা হয়, তাহারা স্থায়ী নহে, তাহা হইলে ভয়, হাস, শোক, ক্রোধ প্রভৃতি ভাবই বা কত কাল উল্লসিত থাকে, বলুন।

'যদি মনে করা হয়, বিষয়ের আতিশয্য বা গৌরব-হেতু রতিপ্রভৃতির স্থায়িত্ব, তাহা হইলে চিন্তাপ্রভৃতির বেলায় তাহা হইবে না কেন? প্রকৃতির বশে উভয়বিধ ভাবই আত্মায় অর্থাৎ চিত্তে তুল্য হইবে। যদি বাসনার সন্দীপন বা উদ্বোধ-হেতু রসত্ব আসে, তাহা হইলেও উভয়বিধ ভাবের বেলায়ই তাহা সমান হইবে।'

ভোজদেব শৃঙ্গারপ্রকাশের দ্বিতীয় খণ্ডে গদ্যে আবার একই যুক্তি প্রয়োগ করিয়া একটি সার-গর্ভ মন্তব্য করিয়াছেন এবং বিষয়াতিশয়কে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

ন তে স্থায়িন ইতি চেৎ, স্থায়িত্বম্ এষাম্ উৎপন্ন-তীব্রসংস্কারত্বম্। তীব্রসংস্কারোৎপত্তিশ্চ বিষয়াতিশয়াৎ, নায়ক-প্রকৃতেশ্চ। —শৃঙ্গারপ্রকাশ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৫

—'তাহারা অর্থাৎ গ্লানি প্রভৃতি ভাব স্থায়ী নয় ইহা বলা হইলে, উত্তর এই—ইহাদের স্থায়িত্ব, ইহারা যে তীব্র সংস্কার জন্মায়, তাহার মধ্যেই নিহিত আছে। তীব্র সংস্কারের উৎপত্তি হয় বিষয়াতিশয় বা বিষয়গৌরব হইতে এবং নায়কের বিশিষ্ট প্রকৃতি হইতে।'

ভোজ এখানেই থামেন নাই, কার্যতঃ তিনি ভরত-কথিত আটটি রসের সহিত আরও মুখ্য চারিটি রস যোগ করিয়া বারোটি রস[১] গণনা করিয়াছেন, এবং পরে যেন

(১) দ্রষ্টব্য:—ভোজ-স্বীকৃত রসের সংখ্যা ডাঃ অভয়কুমার গুহ বলিয়াছেন, এগার (The Rasa Cult in Chaitanya Charitamrta. Ashutosh Silver Jubilee Volumes, Vol. III, Orientalia, Part III, p. 753)। কবিকর্ণপূর অলঙ্কার-কৌস্তুভে ঐ সংখ্যা এগার বলিয়াছেন,—

ভোজস্তু বৎসল-প্রেমাভ্যাম্ একাদশ রসান্ আচষ্টে।

—অলঙ্কার-কৌস্তুভ, ৫।৬৪, বৃত্তি, পৃঃ ১২৩

—'ভোজ কিন্তু বৎসল ও প্রেমরস ধরিয়া রসের সংখ্যা একাদশ বলিয়াছেন।'

খেলাচ্ছলে স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি আরও আটটি রসের কথা বলিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার কথিত শান্ত ও প্রেয়োরস পূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে। ডাঃ ভি. রাঘবন্ বলেন, মাদ্রাজ গভর্নমেণ্টের Oriental Mss. Library-তে শৃঙ্গারপ্রকাশের অপ্রকাশিত তৃতীয় খণ্ডে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ প্রকাশে ভোজরাজ ভরত-কথিত উনপঞ্চাশৎ ভাবের প্রত্যেকটির বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। অভিনব-গুপ্তের মতে আট বা নয়টি স্থায়ী ভাব ব্যতীত আর কোন ভাবের ব্যভিচারী ভাব হইতে পারে না; বিভাব ও অনুভাব অবশ্য সকল ভাবেরই থাকিতে পারে।

কর্ণপূর নিজেও শ্রব্য ও দৃশ্য উভয় কাব্যেই এগার প্রকার রস স্বীকার করিয়াছেন,—

একাদশ এব দৃশ্যে শ্রব্যেঽপি চ রসিক-সংসদঃ প্রেষ্ঠাঃ। —ঐ, ঐ

অবশ্য কর্ণপূর ইহার পরও ভক্তিরসকে স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার স্বীকৃত রসসংখ্যা মোট বারো হইয়াছে।

আমার মনে হয় এই বিষয়ে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ কবিকর্ণপূরের উক্তিদ্বারা চালিত হইয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন। শৃঙ্গার-প্রকাশের কেবল আরম্ভে দশটি রসের কথা বলা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভোজের বর্ণিত রসের সংখ্যা বারো। উদ্ধত, প্রেয়ঃ, শান্ত ও উদাত্ত এই চারিটি নূতন রসের কথা সরস্বতীকণ্ঠাভরণে ৫ম পরিচ্ছেদে দুই স্থলেই উক্ত হইয়াছে। কবিকর্ণপূরের ভোজ-সম্বন্ধীয় উক্তির কোন ভিত্তি নাই। কবিকর্ণপূর অন্য ভ্রমও করিয়াছেন, ভোজ বৎসল ও প্রেম বলিয়া দুইটি রসের কথা বলেন নাই।

দুঃখের বিষয়, ডাঃ দাশগুপ্তও সম্ভবতঃ কবিকর্ণপূরকে অনুসরণ করিয়া "ভোজ-স্বীকৃত বৎসলতা ও প্রেমরস" (কাব্যবিচার, পৃঃ ১৫৫) বলিয়া একই ভুল করিয়াছেন। ভোজ প্রকৃত পক্ষে উদ্ধত ও উদাত্ত এই দুইটি নূতন রসের কথা বলিয়াছেন, শান্ত ও প্রেয়োরস পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে আরও দ্রষ্টব্য এই যে, ভোজ-স্বীকৃত প্রেয়োরস নামে 'বৎসল-প্রকৃতি' হইলেও কার্যতঃ রতি-প্রকৃতি শৃঙ্গার রসেরই এক মৃদু ভেদমাত্র। ইহা তাঁহার ব্যাখ্যানে ও উদাহরণে স্পষ্ট হইয়াছে। ভোজ বলেন,—

অত্র বৎসল-প্রকৃতেঃ ধীরতয়া ললিত-নায়কস্য প্রিয়ালম্বন-বিভাবাদ্ উৎপন্নঃ স্নেহ-স্থায়িভাবঃ··· —সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ৫।১৬৪-৬৬, বৃত্তি, পৃঃ ৫৯৮

—'এখানে ধীরতাহেতু বৎসল-প্রকৃতি ললিত-নায়কের প্রিয়ালম্বন বিভাব হইতে উৎপন্ন স্নেহ-স্থায়িভাব'···

ভোজরাজ অবশেষে একেবারে চরমে উঠিয়া স্তম্ভ, অশ্রু, মূর্ছা প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব অর্থাৎ বাহ্য দৈহিক লক্ষণগুলির পর্যন্ত রসত্ব হইতে পারে, এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

ভোজ-পন্থী পরিবর্তনবাদী অনেকে পূর্বে ও পরেও মূল আট বা নয় রস ছাড়া নূতন নূতন রস কল্পিত করিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অভিনবভারতী ভাষ্য হইতেই স্নেহ বা বাৎসল্য রস, লৌল্যরস, শ্রদ্ধারস ও ভক্তিরসের কথা জানা গিয়াছে। ভোজ উদাত্ত ও উদ্ধত রস কল্পনা ও সমর্থন করিয়াছেন; অপর আটটি রস বরং নাই ধরা হইল। ধনঞ্জয়ের লেখা হইতে মনে হয়, মৃগয়ারস ও অক্ষরস নামক দুইটি রসও কেহ কেহ কল্পনা করিয়াছিলেন।[১] রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র তাঁহাদের নাট্যদর্পণে গর্ধ-স্থায়িভাব লৌল্যরসের সহিত আর্দ্রতা-স্থায়িভাব স্নেহরস, আসক্তি-স্থায়িভাব ব্যসনরস, অরতি-স্থায়িভাব দুঃখরস এবং সন্তোষ-স্থায়িভাব সুখরস একপ্রকার সমর্থন করিয়াছেন। এই সকল ব্যতীত বৈষ্ণবগণের দাস্যরস, রস-তরঙ্গিণীতে উল্লিখিত ভানুদত্তের প্রবৃত্তি-স্থায়িভাব মায়ারস ও স্পৃহা-স্থায়িভাব কার্পণ্যরস প্রভৃতিও আছে।[২]

পরবর্তী কালে শারদাতনয়ও ভোজরাজের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

কেচিদ্ অন্যেঽপি ভাবাশ্চেৎ পোষং যান্তি রসাত্মনা।
তেষাং বিশেষো বিজ্ঞেয়ঃ স্থায়িষ্বেব ন চান্যথা॥

—ভাবপ্রকাশন, ১ম অধিকার

—'অন্য কোন কোন ভাব যদি রস-স্বরূপে পুষ্টি পায়, তবে তাহাদিগের বিশেষ সত্তা স্থায়ী ভাবসমূহের মধ্যেই আছে জানিবে, অন্য প্রকারে কিছু হয় নাই।'

এই প্রসঙ্গে ১২০এর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের মত আমরা পুনরায় পাঠ করিতে পারি। রস ও ভাব বিষয়ে ভোজরাজের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলেও কতিপয় স্থলে উভয়ের মত ও যুক্তির ঐক্য বিস্ময়-জনক। এই জন্যই আমরা ভোজরাজের মতকে আধুনিকতা-সম্পন্ন বলিয়াছি।

দেখা যাইতেছে, এই যুক্তিবাদীদের অভিমত সেকালে গৃহীত হয় নাই; ভরত ও অভিনবগুপ্তের নির্দেশই সকলে অনুসরণ করিয়াছেন। হেমাদ্রির নামে প্রচলিত বোপদেব-কৃত মুক্তাফলের টীকায় বোপদেব ভোজরাজের মতের ব্যাখ্যা করিয়া স্পষ্ট বলিলেন,—

(১) দশরূপক, ৪।৮৩।

(২) ডাঃ ভি. রাঘবন্ প্রণীত "The Number of Rasas" (The Adyar Library, Adyar) নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা পাওয়া যাইবে।

ব্যভিচারিণঃ স্থায়িনশ্চেতি তু মম মাতা বন্ধ্যেতিবদ্ বিপ্রতিষিদ্ধে বচসী

—মুক্তাফল, ১১।১, টীকা, পৃঃ ১৬৮

—'ব্যভিচারী ভাব স্থায়ী, ইহা আমার মাতা বন্ধ্যা—এই বাক্যের ন্যায় বিরুদ্ধ বচন।'

সর্বশেষে সপ্তদশ শতাব্দীতেও জগন্নাথ, বিশ্বনাথ বা রূপ গোস্বামী প্রভৃতির আবির্ভাবের পরেও বাৎসল্য বা ভক্তিরস স্বীকার পাইতে চাহিলেন না, যুক্তি দিলেন,—

রসানাং নবত্ব-গণনা চ মুনিবচন-নিয়ন্ত্রিতা ভজ্যেত, ইতি যথাশাস্ত্রমেব জ্যায়ঃ।

—রসগঙ্গাধর, বৃত্তি, পৃঃ ৪৬

—'রসসমূহ যে নয়টি বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা ভরতমুনির বাক্যদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই তাহাই মান্য করা হয়, শাস্ত্রানুসারে ইহাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।'

জগন্নাথ বা তৎপূর্ববর্তী কেহ, এমন কি অভিনবগুপ্ত পর্যন্ত লক্ষ্য করিলেন না, ভরতমুনি কেবল নাট্যরসের কথাই লিখিয়াছেন, কাব্যরসের বিষয় আলোচনা করেন নাই; আর ভারতবর্ষে ভরতমুনির পর নাট্য ও কাব্য সাহিত্যের বিপুল প্রসার হইয়াছে। প্রবহমাণ কাল, গতিশীল জাগ্রত জগৎ এবং নিত্য বিকাশশীল জীবনের মর্ম উপলব্ধি না করিয়া যাঁহারা সাহিত্যকে কেবল প্রাচীনত্বের উপনেত্র দ্বারা দেখিয়া সুপ্রাচীন মুনিবচনের সাহায্যেই নিঃশেষে ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা এই দেশের কেবল দর্শনশাস্ত্র ও কাব্য-শাস্ত্র নহে, অনেক শাস্ত্রেরই পুষ্টি রুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছেন। সুখের বিষয়, কাব্যসাহিত্য এই শাস্ত্রকারদের অগ্রাহ্য করিয়া নিজবেগে বহুধা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে; তাই আমরা সংস্কৃতের পরিবর্তে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষার প্রতিষ্ঠা এবং তাহাকে বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্তপদাবলী হইতে বিচিত্র রবীন্দ্ররচনাবলী দ্বারা নব নব ভাবে ও রসে সমৃদ্ধ দেখিতে পাই।

আমাদের আলোচ্য প্রশ্নটির উত্তরে বর্তমান যুগে সর্বপ্রথম শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত কাব্য-জিজ্ঞাসা গ্রন্থে সবিনয়ে একটি ক্ষুদ্র মন্তব্য করেন,—

"কিন্তু 'স্থায়ী' ও 'সঞ্চারী'র এই প্রভেদ কিছু মূলগত প্রভেদ নয়, এবং 'সঞ্চারী' ভাবের স্বতন্ত্র 'রস'-এ পরিণতি সম্ভব নয়, এও একটু অতিসাহসের কথা।"

—কাব্য-জিজ্ঞাসা, রস

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার 'কাব্যবিচার' গ্রন্থে রস ও কাব্যের অধ্যায়ে সম্ভবতঃ উক্ত মতেরই প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"কিন্তু আমাদের এই সমালোচনা ঠিক বলিয়া মনে হয় না।"

অবশ্য তিনি হয়তো বাঙ্গালাসাহিত্যের কথা মুখ্যতঃ ভাবেন নাই, কেবল সংস্কৃতসাহিত্যের কথাই আলোচনা করিয়াছেন।

ভাবের রসে পরিণতির জন্য একান্ত আবশ্যক ভাবের অতিসম্পন্নতা অর্থাৎ প্রকর্ষ-প্রাপ্তি এবং বিভাবাদির ভূয়িষ্ঠতা ও গৌরব। ভাব অতিসম্পন্ন হইতে পারিলে বাসনার সন্দীপন বা উদ্বোধ হইবেই, এবং সঙ্গে সঙ্গে তীব্র সংস্কারের উৎপত্তিও হইবে। বস্তুতঃ ভাবের রসতা-প্রাপ্তির একটিই মাত্র কারণ—উহার অতিসম্পন্নতা। বিভাবাদির গৌরব ও প্রাচুর্য ভাবের এই অতিসম্পন্নতার জন্যই আবশ্যক। বিভাবাদির গৌরব ও ভূয়িষ্ঠতা মুখ্যতঃ কবি-কর্ম-কৌশলের উপরই নির্ভর করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আলঙ্কারিক ও কবিগণ বলিয়া থাকেন, জগতে হেন বস্তু বা অবস্থা নাই, যাহা কবি-ভাবনা দ্বারা ভাব্যমান হইয়া রসত্ব লাভ না করে।[১]

তাহা হইলে, উপযুক্ত কবি-প্রতিভাবলে যে কোন বস্তু অর্থাৎ যে কোনও ভাব ও অর্থ রসত্ব লাভ করিতে পারে। অতএব বিভাবাদির প্রশ্ন বাদ দিয়া ভাবের অতিসম্পন্নতার জন্য আর যাহা আবশ্যক, তাহারই আলোচনা করিতে হয়। প্রশ্নটি দাঁড়ায় এই,—উপযুক্ত বিভাবাদি ও উপযুক্ত কবিকর্মকৌশল থাকিলে সকল ভাবই অতিসম্পন্ন হয় কি? যে ভাবগুলি মানবমনে স্বতন্ত্র ভাবে বর্তমান ও অন্যমুখাপেক্ষী না হইয়া চলিতে পারে, স্ববিশ্রান্তভাবে থাকিতে পারে, বাসনা-লোক হইতে মুহুর্মুহুঃ যাহাদের অভিব্যক্তি ঘটে, তাহারাই স্থায়ী ভাব বলিয়া পরিচিত এবং তাহারা মন্দ কবির চেষ্টায়ও সহজে রসত্ব পায়। অবশ্য এইরূপ ভাবের সংখ্যাও আমাদের মতে আট বা নয় নহে, তাহার বেশি। স্বাতন্ত্র্য-লক্ষণে অনুচর-পরিবৃত নরেন্দ্র-ধর্মেও নাট্য বা কাব্যের স্থায়ী ভাব গণনা শেষ হয় নাই। নায়ক-নায়িকার প্রীতির ন্যায় মাতা ও সন্তানের প্রীতি, অথবা বন্ধু ও বন্ধুর প্রীতি, এবং মানবসাধারণের জন্মভূমির প্রতি প্রীতি, শুদ্ধ ভক্তের ভগবানের প্রতি প্রীতি এক একটি স্থায়ী ভাব সন্দেহ নাই। যথাস্থানে এই স্থায়ী ভাবের সংখ্যা প্রভৃতি আলোচিত হইবে। এই স্থায়ী ভাব হইতেই রস হয়।

কিন্তু যে সব ভাব উক্ত লক্ষণে সাধারণতঃ স্থায়ী বলিয়া গণ্য নহে, তাহাদের সম্বন্ধেই তাহা হইলে প্রশ্ন। এই বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, উপযুক্ত কবি-কল্পনাদ্বারা সমৃদ্ধ হইলে কাব্যের প্রসঙ্গ-বিশেষে এবং কবির চিত্তাবস্থা ও ভাব-কল্পনার মহিমাবিশেষে তাহারাও তৎকালের জন্য অতিসম্পন্ন হইতে পারে এবং স্বরূপলক্ষণে

(১) এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে দ্রষ্টব্য

স্বতন্ত্ররসে পরিণত হইতে পারে। তথাপি স্থায়ী ভাব ও ব্যভিচারী ভাবের পার্থক্য প্রধানতঃ মূলগত এবং গৌণতঃ অবস্থাগত, স্থায়ী ভাবের আপেক্ষিক নিত্যত্ব নিশ্চয়ই আছে। সেই জন্য স্থায়ী ভাব লইয়া রসকাব্য সকল কবিই লিখিতে পারেন। আমাদের চিত্তে ঐ ভাবের গূঢ় প্রবাহ আছে বলিয়া উহা যেন সিদ্ধ ভাব, অল্প আয়াসেই সামাজিকের বাসনা-লোকের স্ফুরণ হয় এবং রস অভিব্যক্ত হয়। স্থায়ী ভাব হইতে জাত এই রসও যেন তুলনায় অনেকটা 'সিদ্ধরস'; নিম্নবঙ্গের সরস ভূমি খননের ন্যায় সহজেই উহা হইতে রসের প্রকাশ ঘটে। আর এই জাতীয় কাব্য মানবমনের চিরন্তন ভাব-সংস্কারের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া সুদীর্ঘকাল রসাস্বাদন দিতে সমর্থ। পূর্বেই বলা হইয়াছে, জগতে স্থায়ী ভাব হইতে স্থায়ী কাব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অপর ভাবগুলি মানবচিত্তে স্বভাবতঃ মুহুর্মুহুঃ অভিব্যক্ত হয় না, তাহাদের হইতে রসোৎপাদনের প্রয়াস যেন উচ্চ শুষ্কভূমিতে কূপখননের চেষ্টা। সকল কবির পক্ষেই দেশ, কাল ও চিত্তাবস্থার প্রসঙ্গ-ক্রমে এই ভাবগুলি হইতে রসকাব্য রচনা সম্ভবপর নহে। এখানে কবিকর্মের সূক্ষ্ম কৌশল এবং কবিচিত্তের গাঢ় অনুভূতি বিশেষ প্রয়োজন। এই সকল সত্ত্বেও মানবচিত্তের সহিত সহজ ও গভীর যোগের অভাবে এই-জাতীয় কাব্যের স্থায়িত্ব বিষয়ে যুগ-স্বভাব লক্ষ্য না করিয়া কেহ কোন কথা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন না।

নির্দিষ্ট স্থায়ী ভাব লইয়া বিচারে স্থায়ী ও ব্যভিচারী কোন কোন সময়ে জাতিগত-ভেদ নয়, অবস্থা-গত তারতম্য বুঝায় মাত্র; যেমন লক্ষ্য করিলে ভরত-কথিত ভাব-সমূহের মধ্যেই দেখা যায়,—

> শঙ্কা ও ত্রাস ব্যভিচারী, কিন্তু ভয় স্থায়ী;
> উগ্রতা ও অমর্ষ ব্যভিচারী, কিন্তু ক্রোধ স্থায়ী;
> বিষাদ ব্যভিচারী, কিন্তু শোক স্থায়ী;
> হর্ষ ব্যভিচারী, কিন্তু রতি স্থায়ী।

স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে ত্রাস, অমর্ষ, বিষাদ, হর্ষ অতিশয়িত হইয়া যথাক্রমে, ভয়, ক্রোধ, শোক ও রতিতে পরিণত হইয়াছে এবং ক্রমে ভয়ানক, রৌদ্র, করুণ ও শৃঙ্গার রস-রূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

আমাদের মতে বর্তমান প্রয়োজনে অন্যভাবে এই দ্বিবিধ ভাবকে চিহ্নিত করা আবশ্যক। ধনঞ্জয় দশরূপকে বস্তুকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন,—

—বস্তু চ দ্বিধা

তত্রাধিকারিকং মুখ্যম্, অঙ্গং প্রাসঙ্গিকং বিদুঃ ॥—দশরূপক, ১।১১

—'বস্তু দুই প্রকার; মুখ্য বস্তুকে আধিকারিক, এবং অঙ্গ অর্থাৎ অপ্রধান বস্তুকে প্রাসঙ্গিক বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন।'

আমরা আধিকারিক ও প্রাসঙ্গিক এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিয়া ভাব ও তাহা হইতে জাত রসের দুই অবস্থা-গত ভেদকে বুঝাইতে চাই।' যে সকল ভাব সাধারণতঃ স্থায়ী ভাব বলিয়া পরিগণিত ও তাহাদের লক্ষণান্বিত, তাহারা আধিকারিক ভাব এবং তাহাদের হইতে নিষ্পন্ন রসসমূহ আধিকারিক রস। আধিকারিক ভাব ও আধিকারিক রসের সংখ্যা তাই প্রায় সুনির্দিষ্ট।

বিশিষ্ট গৌরব দিবার জন্য আধিকারিক রসের প্রত্যেকটির বিশিষ্ট নামও থাকিবে। অতএব রতি, শোক, ক্রোধ, ভয়, উৎসাহ প্রভৃতি আধিকারিক ভাব এবং তাহাদের হইতে জাত শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীর রস প্রভৃতি আধিকারিক রস। অধিকার শব্দ এখানে কেবলমাত্র ধনঞ্জয়-ব্যাখ্যাত 'ফল-স্বাম্য' অর্থাৎ 'ফলের সহিত স্বস্বামি-সম্বন্ধ' বুঝাইতেছে না; অধিকার এখানে,—

(১) সমগ্র প্রবন্ধের অধিকার বা ব্যাপ্তি, অতএব বিষয়-গত প্রাধান্য,

(২) পাঠক বা সামাজিক চিত্তের অধিকার, অতএব আস্বাদন-গত প্রাধান্য, এবং

(৩) দীর্ঘতর কালের অধিকার, অতএব কাল-গত ব্যাপ্তি বা প্রাধান্য বুঝায়।

স্থায়ী ভাবের আলোচনায় পূর্বেই এই বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

অপর ভাবগুলিকে আমরা বলিতে চাই প্রাসঙ্গিক ভাব, এবং তদুৎপন্ন রসসমূহকে প্রাসঙ্গিক রস। প্রাসঙ্গিক ভাবসমূহের পরিচায়ক নাম থাকিবেই, কিন্তু প্রাসঙ্গিক

(১) আধিকারিক শব্দের প্রয়োগ রস-সম্পর্কে প্রায় একই অর্থে পূর্বে কচিৎ দেখা যায়। লোচন-টীকায় অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করিতেছেন,—

আধিকারিকত্বে ন তু শান্তো রসো নিবদ্ধব্য ইতি চন্দ্রিকাকারঃ।

—ধ্বন্যালোক, ৩।২৭, টীকা, পৃঃ ১৭৮

—'চন্দ্রিকাকার বলিতেছেন, শান্ত রস নাটকে আধিকারিক রূপে নিবদ্ধ করিবে না।'

চন্দ্রিকা ধ্বন্যালোকেরই এক টীকা, অধুনা লুপ্ত; উহা লিখিয়াছেন অভিনবগুপ্তেরই এক পূর্বপুরুষ।

রসসমূহের পৃথক্ নাম রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রাসঙ্গিক শব্দের প্রসঙ্গও এখানে,—

(১) সমগ্র প্রবন্ধের ব্যাপ্তি নয়, উহার অঙ্গবিশেষমাত্র,

(২) পাঠক বা সামাজিক চিত্তের দীর্ঘস্থায়ী সংস্কার নয়, উহার অল্পস্থায়ী অবস্থা, বা mood বিশেষমাত্র, এবং

(৩) কাল-গত সুদীর্ঘ-ব্যাপিত্ব নয়, সাধারণ ব্যাপিত্বমাত্র বুঝাইতেছে।

বলা বাহুল্য, এই সকল বিশেষণই আধিকারিক রূপের ব্যতিক্রম বা বৈপরীত্য-সূত্রে প্রয়োগ করা হইল। অবশ্য এখানে স্বীকার করা কর্তব্য, অপূর্ব কবি-প্রতিভাবলে প্রাসঙ্গিক রসও কখন কখন মানব-চিত্তে গাঢ়ত্ব ও দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়িত্ব পাইতে পারে।

মহাকাব্য, আখ্যান-কাব্য, নাট্যকাব্য বা কথা-সাহিত্যে আধিকারিক ও প্রাসঙ্গিক এই দুই প্রকার ভেদ সহজেই উপলব্ধি হয়। লিরিক বা গীতিকাব্যে যে সকল স্থলে কবির চিত্ত-ভাব বা mood প্রধান অবলম্বন, সেখানেও এই দুই প্রকার ভাগ সার্থক বলিয়া মনে হয়।

আমরা এখন ১৪৭-এর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত অভিনবগুপ্তের অভিমতের আলোচনা করিতেছি। আচার্য অনেক সদ্‌যুক্তি প্রদর্শন করিয়া শান্ত রসকে স্বীকার করিলেন এবং রসের সংখ্যা নয় বলিয়া নিত্যকালের নিমিত্ত নির্ধারণ করিয়া দিলেন। আমরা দুই দিক হইতে দুইটি প্রশ্ন করিতেছি। বীভৎস রস কোন্ জাতীয় আধিকারিক রস? জুগুপ্সা ভাব রতি, ক্রোধ বা শোকের সহিত সমমর্যাদা পাইবার যোগ্য কি? এই ভাবটিতে ব্যভিচারী ভাবের লক্ষণই সমধিক পরিস্ফুট নয় কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন,—আর্দ্রতা বা বৎসলতা কি প্রকারে রতি কিংবা উৎসাহভাবের অন্তর্গত হইতে পারে? অথবা, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃ-প্রেম কি ভাবে ধর্মোৎসাহরূপে পরিগণিত হইতে পারে, এবং গর্বভাব বা ভক্তিভাব কি প্রকারে রতিভাবে পর্যবসিত হইতে পারে?

রসের সংখ্যা অকারণ বাড়াইবার চেষ্টা নিন্দনীয় হইলে, অকারণ কমাইবার চেষ্টাও নিন্দনীয়। এখানে সাহিত্যের ব্যাপকতা ও সূক্ষ্মতার প্রতি বাস্তব দৃষ্টি রাখিয়া এবং মানবচিত্তের বিচিত্র স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মতবাদ নয়, অর্থবাদ নয়, যথার্থবাদ বা সত্যবাদ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইতে হইবে। রসের সংখ্যা কমাইয়া চমক দেখাইতে হইলে আমরা নারায়ণের ন্যায় অদ্ভুত রস, ভবভূতির ন্যায় করুণ রস, কিংবা ভোজ-দেবের ন্যায় শৃঙ্গাররস অথবা কবিকর্ণপূরের ন্যায় প্রেমরসকেই সকল রসের মূল না

বলিয়া অভিনবগুপ্তের ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া বীররসকেই একমাত্র রস বলিতে চাই ; কারণ, সকল ভাবই উৎসাহভাবের মধ্যে নিহিত আছে, অথবা সকল ভাবেই উৎসাহ ভাব অন্তর্ভূত আছে। আমরা বলিব রতিবীর, শোকবীর, ক্রোধবীর, হাস্যবীর, জুগুপ্সাবীর, ভয়বীর এবং বিস্ময়বীর। ইহাতে আপত্তি করিবার কি আছে ? অবশ্য রসের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট রাখার পক্ষে যে সকল প্রবল যুক্তি আছে, তাহা আমরা মান্য করিতে প্রস্তুত। এই দিক দিয়া চিন্তা করিলে অভিনবগুপ্তের চেষ্টা প্রশংসনীয় ; সকল অবস্থাই নির্বিচারে রস হইতে পারে, ভোজের এই মতবাদ নিন্দনীয়। কিন্তু প্রশ্নটিকে প্রত্যক্ষভাবে বিচার না করিয়া অপযুক্তির আশ্রয় লওয়া সমর্থনযোগ্য নহে।

বস্তুতঃ আগে শাস্ত্র নয়, আগে সাহিত্য। সাহিত্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন হয়। যেদিন সাহিত্যোদ্ভূত শাস্ত্র আসিয়া সাহিত্যকে অন্যায় ভাবে শাসন করিয়াছে, সেদিন সাহিত্যের এক দুর্দিন। কবি-প্রতিভার তাহাতে বিশেষ হানি হয় নাই, প্রতিভা সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া প্রাকৃত ভাষায়, এবং পরে আধুনিক দেশভাষায় নূতন মুক্তির আস্বাদ পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছে।

উদাহরণ-মালা

এইবার অল্প কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বিষয়টির আলোচনা শেষ করা যাইতেছে। কবিবর মধুসূদন দত্তের 'আশ্বিন মাস' কবিতাটি পরীক্ষা করা যাক,—

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরি উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দিনী-রূপে ভকতের ঘরে ;

* * *

এক পদ্মে শতদল। শত রূপবতী—
নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্র গগনে—
কি আনন্দ ! পূর্বকথা কেন ক'য়ে স্মৃতি,
আনিছ হে বারিধারা আজি এ নয়নে ?—
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব-ভকতি ?

—চতুর্দশপদী কবিতাবলী

স্পষ্টই এখানে স্মৃতি—গৌড়গৃহের চিরানন্দ-বিজড়িত স্মৃতি স্থায়ী ভাব হইয়া

কাব্যকে রসোত্তীর্ণ করিয়াছে। আনন্দ ও অশ্রু এখানে সঞ্চারী ভাব এবং সাত্ত্বিক ভাব বা অনুভাব। শেষ চরণ লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, এখানে স্মৃতিই স্থায়ী ভাব, ভক্তি নয়। এখানে রস প্রাসঙ্গিক রস। মধুসূদনের প্রসিদ্ধ কবিতা 'কপোতাক্ষ নদ'-এ স্মৃতি ও জন্মভূমি-প্রীতি দুইটি ভাব প্রবল রহিয়াছে। জন্মভূমি-প্রীতি স্থায়ী ভাব; স্মৃতি এবং ভ্রান্তি ও আকাঙ্ক্ষা ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব; কাব্যে চমৎকার রস প্রকাশ পাইয়াছে। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর 'ভূতকাল' কবিতাটিতে কবির অনুতাপ বা অনুশোচনাই স্থায়ী ভাব, তাহাও এক প্রকার প্রাসঙ্গিক রসে পরিণত হইয়াছে।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের অঙ্কিত একটি সরস চিত্র লওয়া হইতেছে,—

একদিন নিরজনে মনোহর পুরোদ্যানে
সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিলা বসি অন্যমন;
শুভ্র মেঘ-খণ্ড মত রাজহংস শত শত
আনন্দলহরী-পূর্ণ করিয়া গগন
যাইছে ভাসিয়া সুখে, হঠাৎ আহত বুকে
একটি কুমার-অঙ্কে হইল পতন।
উদ্ধার করিতে শর লাগিল কোমল করে,
কুমার বেদনা এই বুঝিলা প্রথম,
অধীর হইল প্রাণ, বহিল প্রথম এই
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য প্রস্রবণ।
করুণার অশ্রুজলে, করুণার পরশনে,
হইল বিগত ব্যথা বাঁচিল মরাল;
কুমার লইয়া বুকে, মুগ্ধা জননীর মত
চাহি ক্ষুদ্র মুখপানে রহে কিছুকাল।
কি মহিমা করুণায়! কাননের বিহঙ্গেও
বুঝে তাহা, কি মধুর করে প্রতিদান!
উভয়ে উভয় পানে নীরবে চাহিয়া, কিবা
করুণায় উভয়ের বিমোহিত প্রাণ। —অমিতাভ, ৩য় সর্গ

এ রচনায় স্পষ্টতঃ করুণা বা দয়া স্থায়ী ভাব, পূর্বে শোক বা দুঃখ এবং পরে স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার প্রীতি, মধ্যে অধীরতা ও সমবেদনা সঞ্চারী ভাব। স্তম্ভ বা স্তব্ধতা ও অশ্রু

সাত্ত্বিক ভাব বা অনুভাব। রচনা রসধর্মে সমুজ্জ্বল হইয়া উৎকৃষ্ট কাব্যে পরিণত হইয়াছে।

রস হইয়াছে কি না ইহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ 'সচেতসাম্ অনুভবঃ'—চিত্তবান্ ব্যক্তিগণের অনুভব বা উপলব্ধি। সেই প্রমাণে এখানে রস নয়, ভাব হইয়াছে ইহা কেহ বলিতে সাহসী হইবেন, মনে হয় না। কাব্যশাস্ত্রেও বিজ্ঞানশাস্ত্রের ন্যায় প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, 'স্বয়ং পশ্য, বিচারয়'—নিজেই দেখ, বিচার কর, একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। অথচ ভরতের ও অভিনব-গুপ্তের গণনায় করুণা স্থায়ী অথবা ব্যভিচারী কোনও ভাবের মধ্যেই উল্লিখিত হয় নাই।

এখানে কারুণ্য রস নাম দিয়া এই মহনীয় রসটির পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে, ইহাকে অবশ্য প্রাসঙ্গিক রস বলিতে হইবে। এই করুণা বা দয়া মূলতঃ প্রীতি-ভাবের অন্তর্গত।

এই রূপে নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ কাব্যগ্রন্থের প্রধান রসই দেশপ্রীতি রস; জন্মভূমির সম্পর্কে জাত বলিয়া ইহাকে ভৌম রসও বলা যাইতে পারে। এই রসটি আধিকারিক রস; ইহা বৃহৎকাব্য পলাশীর যুদ্ধ, পদ্মিনী-উপাখ্যান অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' ও রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' প্রভৃতি কবিতায় স্বতন্ত্র ও প্রধান হইয়া দীপ্তি পাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতার মধ্যে প্রাসঙ্গিক রসের অনেক উদাহরণ মিলিবে; কিন্তু সংখ্যা যত বেশি মনে হইতেছে, তত বেশি নয়। লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে, অধিকাংশ কবিতাই কোন-না-কোন আধিকারিক ভাব অর্থাৎ প্রসিদ্ধ স্থায়ী ভাব অবলম্বন করিয়া আধিকারিক রসে উল্লসিত হইয়াছে। প্রাসঙ্গিক রসের একটি মাত্র উদাহরণ এখানে লওয়া হইল, 'দুঃসময়' কবিতা,—

> যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
> সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া
> যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
> যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
> মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন অন্তরে,
> দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
> তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
> এখনি, অন্ধ, বন্ধ ক'রো না পাখা॥

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহ-বন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা ব'সে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-শেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা,
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ ক'রো না পাখা॥ —কল্পনা

চমৎকার কবিতা। ছন্দঃ, বিভাব, ভাব ও অনুভাব, কবির বর্ণনা-কৌশল, ধ্বনি, অলঙ্কার ও রীতি পরস্পর পরস্পরকে উল্লসিত করিয়া সমগ্রতায় রস-মূর্তি লাভ করিয়াছে। কবিতা রসোক্তি সন্দেহ নাই। স্থায়ী ভাব হইতেছে মানব-জীবনের গতিবেগ; তাহাকে পুষ্ট করিতেছে আশঙ্কা, ক্লান্তি, প্রলোভন, উদ্যম প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব।

আর একটি প্রশ্ন আলোচনা করিলেই এই প্রসঙ্গ শেষ হয়। অলঙ্কার শাস্ত্রে 'উদ্বুদ্ধমাত্র স্থায়ী', 'অঞ্জিত ব্যভিচারী' বা প্রধানভূত সঞ্চারী এবং 'দেবাদিবিষয়া রতি'কে 'ভাব' বলা হইয়াছে। এই 'ভাব' অর্থ ঠিক স্থায়ী বা সঞ্চারী ভাব নয়; এই ভাবকে বরং বলা চলে অ-সম্পূর্ণ রস, যে সকল ভাব রসে পরিণত হইবার পথে বাধা পাইয়াছে। এই বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত এই,—স্থায়ী যেখানে উদ্বুদ্ধ মাত্র, সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া রসে পরিণত হয় নাই, সেখানে রচনা ভাবোক্তি মাত্র, রসোক্তি নহে। যেখানে রচনায় সঞ্চারী ভাব প্রধান হইয়াছে, এবং স্থায়ী অপ্রধানভাবে রহিয়াছে, সেখানে ভাবটি যদি উপযুক্ত বিভাবাদি-সম্পন্ন হইয়া অতিসম্পন্ন হয়, তবে রচনা রসোক্তি; রস অবশ্য প্রাসঙ্গিক রস। অন্যথায় কেবল সঞ্চারী ভাবের আপেক্ষিক প্রাধান্য হইলে রচনা ভাবোক্তি বা ভাবকাব্যই থাকিবে। বাকী রহিল দেবাদিবিষয়া রতি। এই বিষয়ে অল্প পরেই বিশদ আলোচনা হইবে। এখানে শুধু বলা যায় যে, দেবাদি-বিষয়ক ভক্তি যদি কেবল বৈধী ভক্তি হয়, তবে তাহা ভাব মাত্র, কাব্য ভাব-কাব্য; আর উহা যদি পরমপ্রেমাত্মক হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহা অপূর্ব রস, ভক্তিরস বা দিব্যরসে পরিণত হইতে পারে।

(৩)

নাট্য-রস ও কাব্য-রস, অভিনেয় রস ও অভিধেয় রস

বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভাংশে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভরত মুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে কেবলমাত্র নাট্যরসেরই আলোচনা করিয়াছেন। পরবর্তী আচার্যগণ নাট্যরসকে কাব্যে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাকেই কাব্যরস বলিয়াছেন, এবং নাট্য বা কাব্যের রসকে একই স্বরূপলক্ষণে বুঝাইয়াছেন। আচার্য অভিনবগুপ্ত অভিনবভারতী ভাষ্যে যুক্তিপূর্ণ বিশেষ ব্যাখ্যান দিয়া কাব্য বস্তুতঃ নাট্যস্বভাব-সম্পন্ন, ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এই সকল কথাই স্বল্প সমালোচনা-সহ এই অধ্যায়ের প্রথম ভাগে আমরা উল্লেখ করিয়াছি; এবং কাব্য বলিতে কেবলমাত্র আখ্যান-মূলক কাব্য বুঝাইলে আচার্যগণের অভিমত সর্বাংশে সত্য, তাহাও মন্তব্য করিয়াছি।

আচার্য অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যান এই অধ্যায়েরই প্রারম্ভভাগে[১] দেখা যাইবে। কাব্য যে নাট্যই এই মত সমর্থনে তিনি স্বীয় উপাধ্যায় ভট্টতৌতের রচিত কাব্য-কৌতুক গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভরতের ন্যায় অভিনবগুপ্তও বিশ্বাস করিতেন বিবিধকাব্যের মধ্যে দৃশ্যকাব্য অর্থাৎ নাটকাদিই শ্রেষ্ঠ, এবং এই বিষয়ে তিনি বামনাচার্যের মতও প্রমাণ-স্বরূপ উপস্থিত করিয়াছেন।[২] এই আচার্যগণের সকলেরই ধারণা কাব্যের কাব্যত্ব নাট্য-স্বভাবের অনুকরণে, এবং যাবতীয় সাহিত্যই দশরূপক বা নাট্যসাহিত্যের বিলাসমাত্র। বামনাচার্য স্পষ্ট বলিয়াছেন,—

দশরূপকস্যৈব হি ইদং সর্বং বিলসিতম্, যচ্চ কথাখ্যায়িকে মহাকাব্যমিতি।

—কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি, ১।৩।৩২, বৃত্তি

—'কথা, আখ্যায়িকা বা মহাকাব্য, এই সকল দশরূপকেরই বিলাস অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।'

প্রাচীনগণের এই নির্ধারণ কতদূর যুক্তি-সহ, তাহা সংক্ষেপে পরীক্ষা করা যাইতেছে। আমরা ইহার বিরুদ্ধে তিনটি যুক্তির অবতারণা করিব এবং তৃতীয় যুক্তিই বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

(১) কাব্যালোক, পৃঃ ৬৫।
(২) ঐ পৃঃ ৬৭।

প্রথম কথা এই, কাব্য যতই নাট্য-স্বভাব-সম্পন্ন হউক, বিদগ্ধ সুধীগণের নিকটে উভয়ের আস্বাদ ও চর্বণা সর্বথা এক নয়। অভিনবগুপ্ত ও তদীয় আচার্য ভট্টতৌত বলেন[১] কাব্য পাঠের সময়ে সামাজিকের চিত্তে অভিনয়ের ন্যায় ঘটনাবলীর প্রায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। কাব্য হইতে রস-গ্রহণ করা তাই সাধারণ পাঠকের পক্ষে একটু কঠিন, নাট্যাভিনয় হইতে রসাস্বাদন সকলের পক্ষেই সহজ। সাধারণের চিত্তে সমধিক রসাবহ করিবার জন্য নাট্যে গীত এবং নৃত্য প্রভৃতিরও যোজনা হইয়া থাকে।[২]

আমাদিগের বক্তব্য এই, দশরূপকে অভিনেতাদিগের আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়-সমূহ প্রেক্ষকদিগের চিত্তে রসের সঞ্চার করিয়া থাকে। কাব্যে থাকে কবির নিজকৃত বিচিত্র বর্ণনা, কবি নাট্যকারের ন্যায় অদৃশ্য না থাকিয়া স্বয়ং অভিনয়ে ব্যক্তব্য

(১) কাব্যালোক, পৃঃ ৬৪-৬৬।

(২) এই বিষয়ে আরিস্টটল্‌ও এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন,—

So we are told that Epic poetry is addressed to a cultivated audience, who do not need gesture; Tragedy to an inferior public. —*Aristotle's Poetics*, XXVI

—অতএব আমাদিগকে বলা হয় যে, 'এপিক্' কাব্যের আবেদন বিদগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট, তাহাদের বুঝিবার জন্য অঙ্গ-ভঙ্গির আবশ্যকতা নাই; 'ট্র্যাজিডি'র আবেদন নিকৃষ্ট সামাজিকগণের নিকট।

আরিস্টটল্ পরে নিজে মন্তব্য করিয়াছেন,—

Tragedy like Epic Poetry produces its effect even without action; it reveals its power by mere reading. —*Ibid*

—'এপিক্ কাব্যের ন্যায় ট্র্যাজিডিও অভিনয় ব্যতীতই ইহার ফল জন্মাইয়া থাকে; কেবলমাত্র পাঠের দ্বারাই ইহার শক্তি আবিষ্কৃত হয়।'

অবশ্য সকলে উক্ত মত সমর্থন করেন না। Lodovico Castelvetro নামক এক ইতালীয় পণ্ডিত ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে আরিস্টটলের *Poetics*-এর অনুবাদ করিয়া তাহার একখানি ভাষ্যও রচনা করেন। উল্লিখিত অভিমত সম্পর্কে বিরুদ্ধ মন্তব্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, ট্র্যাজিডি অভিনীত হইলে পণ্ডিত ও মূর্খ সকলেই সমভাবে উহার অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু কেবলমাত্র পাঠ করিয়া পণ্ডিতগণই উহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

এবং অভিনয়ে অব্যক্তব্য সমুদয় ভাব ও অর্থই প্রয়োজনানুযায়ী পাঠকের গোচর করিয়া থাকেন। নমিসাধু যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন,—

নায়কমুখেন কবিরেব মন্ত্রয়তে, নিশ্চিনোতি ইতি কেচিৎ।

—রুদ্রটের কাব্যালঙ্কার, ১৬।১৩, বৃত্তি

—'নাটকেও নায়কের মুখ দিয়া কবিই মন্ত্রণা করেন, কেহ কেহ বলেন নিশ্চয় করিয়া থাকেন।'

কাব্যে কিন্তু কবি কেবল নায়কমুখে নয়, কবি-স্বরূপে সাক্ষাৎ ভাবেই মন্ত্রণা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য ও নাটকের প্রভেদ বুঝাইতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

"যখন হৃদয় কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না; কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া ও কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেটুকু গীতিকাব্য-প্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে। ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়।" —বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম ভাগ

গীতিকাব্য ও মহাকাব্য উভয়ই কাব্য। তাহা হইলে নাটকের ধর্ম কাব্যে থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে অতিরিক্ত আছে কাব্যের নিজস্ব ধর্ম যাহার বলে ক্রিয়া ও তৎ-সূচক কথা বা সংলাপ দ্বারা যাহা ব্যক্ত হয় না, কবি নিজেই তাহা দেশ ও কালের বর্ণনা এবং পাত্রের চিত্ত-গত ভাবের বর্ণনা দ্বারা পাঠকসাধারণের সংবেদন-গোচর করিয়া তুলেন। সুধী পণ্ডিত শ্লেগেল এবং আরও অনেকে কাব্য ও নাটকের পার্থক্য এইরূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন। আধুনিক কালে পাশ্চাত্ত্য নাট্যকারগণ প্রত্যেক অঙ্কের আরম্ভে মঞ্চ-সজ্জা এবং দেশ ও কালের বিষয়ে যেরূপ সুদীর্ঘ নির্দেশ দিতেছেন, এবং পাত্র-পাত্রীর মনোভাবের ও পরিস্থিতির যেরূপ বিশদ ব্যাখ্যা দিতেছেন, তাহাতে নাট্য ও কাব্যের ব্যবধান কিয়ৎ পরিমাণে লুপ্ত হইয়া উঠিতেছে। কাব্যে কিন্তু কবি যে কোন স্থলে নিজে আসিয়া দেখা দিয়া বিষয়টিকে ইচ্ছামত সরল বা জটিল করিয়া তুলিতে পারেন। বাস্তবিক পক্ষে এই জন্য কবির বিভাবনাশক্তি কাব্যে যেন সমধিক পরিস্ফুট হয়। কাব্য

নাটকের ন্যায় তত স্পষ্ট অবস্থানুকৃতি নয় বলিয়া এবং অনুকৃতি থাকিলেও কবির মানস-প্রকৃতি অবাধে প্রকাশ পায় বলিয়া, তাহাতে ইংরেজীতে যাহাকে বলে lyrical element, তাহার সদ্ভাব অনেক বেশি। আমরা দেখিব নাট্য ও কাব্যের মূলগত পার্থক্য ইহা হইতেই আসিয়াছে। কিন্তু তাহা আলোচনার পূর্বে আর একটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

আমাদের মনে হয়, অভিনয় দর্শন অপেক্ষা কাব্য পাঠে সহৃদয় সুধীজনের রস ও ধ্বনির চর্বণা হয় অনেক বেশি, বস্তু-স্বরূপের উপলব্ধিও হয় অনেক বেশি। পাঠকের চিত্ত কাব্য-পাঠের কালে সমধিক অন্তর্মুখী ও স্বপ্রতিষ্ঠ থাকে, এবং বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বাসনা-লোকের আলোড়ন এবং কল্পনাশক্তির স্পন্দনের জন্য নাট্যরস অপেক্ষা বিচিত্রতর ও গভীরতর কাব্যরসের আস্বাদন করিয়া থাকে। নাট্য সুদক্ষ নটের অভিনয়-নৈপুণ্যে সম্পূর্ণ অবস্থানুকরণ ও প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বলিয়াই নাট্যরসের স্বাদ অতি তীব্র ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে; কিন্তু কাব্যরস মুখ্যতঃ পাঠকের কল্পনা ও ভাবনা-কুশল চিত্তের আশ্রয়ে পুষ্ট বলিয়া তাহাতে সৌন্দর্যময় সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও বস্তুস্বরূপের বিচিত্রতর আস্বাদ থাকিতে পারে। এই বিষয়ে বোপদেব হেমাদ্রির নামে প্রচলিত মুক্তাফল গ্রন্থের টীকায় অনুকূল মন্তব্য করিয়া এক অজ্ঞাতনামা বিদগ্ধ ব্যক্তির উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা,—

অভিনয়ৈঃ উপদর্শ্যমানাদ্ অপি সন্দর্ভৈঃ সমর্প্যমাণো রসঃ অতিস্বদতে। অতএবোক্তম্—

কবিবাগভিনেয়ঞ্চ তদুপায়ো দ্বিধেষ্যতে।

বস্তুশক্তি-মহিম্না তু প্রথমোঽত্র বিশিষ্যতে॥ ইতি।—মুক্তাফল, ১১।১, টীকা

'—অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত হইলেও সন্দর্ভে সমর্পিত রস অধিক আস্বাদ দেয়। অতএব বলা হয়,—

কাব্যাস্বাদনের দুই প্রকার উপায় আছে,—কবিবাক্য পাঠ এবং অভিনয় দর্শন। বস্তুশক্তির মহিমার বলে প্রথম উপায়ই বিশিষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হয়।''

(১) আরিস্টট্‌ল্ কিন্তু সকল দিক্ হইতে, বিশেষ ভাবে বিষয়-গত ঐক্যের দিক্ হইতে বিচার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন,—

"Tragedy is the higher art, as attaining its end more perfectly."
—*Ibid*, XXVI.

—সুষ্ঠুতর রূপে লক্ষ্যের প্রাপক বলিয়া ট্র্যাজিডিই উন্নততর আর্ট।

এই বিষয়ে ভোজদেবও মন্তব্য করিয়াছেন,—

অতঃ অভিনেতৃভ্যঃ কবীন্ এব বহুমন্যামহে, অভিনেয়ভ্যশ্চ কাব্যম্ এব ইতি।

—শৃঙ্গারপ্রকাশ, ১ম প্রকাশ

—'অতএব অভিনেতৃগণ হইতে কবিগণকেই বহু মাননা করি এবং অভিনেয়-সমূহ হইতে কাব্যকে।'

এই উভয় স্থলেই কাব্য এবং পঠিত নাটককে 'কাব্য', আর অভিনীত নাটককে নাটক বলা হইয়াছে।

নাট্য ও কাব্যের পার্থক্য-বিষয়ে আমাদের মুখ্য আলোচনা রস-সম্পর্কে। আমরা বলিতে চাই যে, নাটকে যে সকল রস থাকিতে পারে, মহাকাব্যে বা আখ্যানমূলক কাব্যে তাহা থাকিতে পারেই, গীতি-কাব্যেও থাকিতে পারে। কিন্তু অব্যক্তব্য অংশের প্রকাশ-হেতু কাব্যে এমন কতকগুলি রস থাকিতে পারে ও আছে, যাঁটি নাট্যকাব্যে যাহাদের থাকা সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই মন্তব্য নাট্য ও কাব্যের অন্তর্গত রস ও ভাবের জাতিভেদ-সম্পর্কে নয়; কারণ এক নাটকে যে রস ও ভাব অব্যক্তব্য, অন্য নাটকে তাহা ব্যক্তব্য হইতে পারে।

এই কথা যে প্রাচীনকালে কেহ কেহ একেবারেই বুঝিতেন না, তাহা নয়। শান্তরসের বিচারেই দেখা গিয়াছে, ধনঞ্জয় বা শারদাতনয় এবং আরও কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন,—এই নবম রসটি কাব্যোপযোগী হইলেও নাট্যোপযোগী নয়।

আটটি রস গণনা করিয়া ধনঞ্জয় বলিতেছেন,—

শমমপি কেচিৎ প্রাহুঃ, পুষ্টি র্নাট্যেষু নৈতস্য॥— দশরূপক, ৪।৩৫

'—কেহ কেহ শান্তকেও রস বলিয়া থাকেন, কিন্তু নাট্য-সমূহে ইহার পুষ্টি হয় না।'

টীকাকার ধনিক মন্তব্য করিলেন,—

সর্বথা নাটকাদৌ অভিনয়াত্মনি স্থায়িত্বম্ অস্মাভিঃ শমস্য নিষিধ্যতে।

—'নাটক প্রভৃতি যাহাদের স্বভাবই হইল অভিনয়, তাহাদের মধ্যে শমভাবের স্থায়িত্ব আমাদের দ্বারা সকল প্রকারেই নিষিদ্ধ করা হইতেছে।'

ধনঞ্জয় ও ধনিকের মন্তব্যের তাৎপর্য এই যে, শান্তরস নাটকের উপযোগী নয়; তবে কাব্যে অর্থাৎ শ্রব্যকাব্যে চলিতে পারে।

বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করিয়া অনেক পরিষ্কার করিয়াছেন শারদাতনয়।

তিনি ভাবপ্রকাশনের প্রথম অধিকারে সাধারণভাবে বলিলেন,—অনুভাব নাই

বলিয়া শমভাব নাট্যে অভিনীত হইতে পারে না, তাই নাট্যের উপযোগী স্থায়ী ভাব আটটি মাত্র[১]। ইহার পরে ষষ্ঠ অধিকারে তিনি শান্তরসের বিভাবসমূহের বর্ণনা করিয়া দেখাইলেন শান্তরসের অভিনয়ের জন্য নায়কাদির কার্য-স্বরূপ অনুভাব অতি বিরল; তাঁহার মতে এই রসটি 'বিকলাঙ্গ',[২] নাট্যাভিনয়ে ইহার স্থান নাই; তথাপি ইহা শ্রব্যকাব্যে শ্রেষ্ঠ,—

অতোঽয়ং বিকলপ্রায় স্তথাপি শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥ —ভাবপ্রকাশন, ৬ষ্ঠ অধিকার

—'অতএব এই রস বিকলপ্রায়, তথাপি পণ্ডিতগণ-কর্তৃক শ্রেষ্ঠ বলিয়াই কথিত হয়।'

শান্তরসটি অনুভাবের বিরলতা-হেতু নাট্যে অভিনেয় নয়, কিন্তু কাব্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই আদৃত হয়। এইখানেই নাট্যরস ও কাব্যরসের মূল-গত পার্থক্যের স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। আমরা অন্যভাবে রসকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি,—অভিনেয় রস ও অভিধ্যেয় রস। এই উভয়বিধ রসই কিন্তু অভিজ্ঞেয় অর্থাৎ সমানভাবে জ্ঞানের গোচরীভূত হয়। যে রস অভিনয় করা চলে এবং অভিনয়দর্শনে সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞান-গোচরতা প্রাপ্ত হয়, তাহা অভিনেয় রস, ইহাই নাট্যরস। প্রসিদ্ধ আটটি রস, অথবা দেশপ্রীতিরস বা ভৌম রস নায়কাদির কার্যদ্বারা অভিনীত হইতে পারে বলিয়া মুখ্যতঃ অভিনেয় রস। যে রস অভিধ্যান অর্থাৎ বিশেষ চিন্তন করিয়া আস্বাদন করিতে হয়, স্থায়ী ভাবের বহিঃপ্রকাশক কার্য স্বল্প বলিয়া অভিনীত হইতে পারে না, কাব্য পাঠ বা শ্রবণের দ্বারা অভিধ্যানের সাহায্যে জ্ঞান-গোচরতা প্রাপ্ত হয়, তাহা অভিধ্যেয় রস; ইহাই বিশিষ্ট কাব্যরস। শান্তরস, বাৎসল্য রস, ভক্তিরস বা দিব্যরস এবং নানাবিধ প্রাসঙ্গিক রস মুখ্যতঃ অভিধ্যেয় রস, অভিনয়ে ইহারা পরিস্ফুট হয় না। বিশুদ্ধ গীতিকাব্যের রস মাত্রেই অভিধ্যেয় রস; অর্থাৎ কার্যে বা ঘটনায় অব্যক্তব্য রসমাত্রই অভিধ্যেয় রস।

এখানে রসের দুইটি ভেদের কথা বলা হইতেছে। নাটকের জীবন হইল অন্তর্জগৎ বা বহির্জগতে তীব্র দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, অথবা বিচিত্র ঘটনাশ্রয়ে মিলন ও সংস্পর্শ। আখ্যানবস্তু যদি মূল স্থায়ী ভাব ও সহকারী সঞ্চারী ভাবসমূহকে কার্য ও ঘটনায় অর্থাৎ উপযুক্ত অনুভাব-সমূহের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে না পারে, তাহা হইলে

(১) "অতোঽনুভাব-রাহিত্যান্ন নাট্যেঽভিনয়ো ভবেৎ।"
"ততোঽষ্টৌ স্থায়িনো ভাবা নাট্যস্যৈবোপযোগিনঃ।"
—ভাবপ্রকাশন, ১ম অধিকার

(২) "তস্মাৎ শান্তরসস্যৈবং বিকলাঙ্গত্বম্ উচ্যতে।"— ঐ, ৬ষ্ঠ অধিকার

যতই ভাবোদ্দীপক সংলাপ থাকুক, এবং সাক্ষাৎ ভাবে সংলাপের মধ্য দিয়াই নাট্যাকারে উপনিবদ্ধ হউক, তাহা রঙ্গ-মঞ্চে অভিনয়োপযোগী নয় বলিয়া স্বরূপতঃ নাটক নয়, কাব্যই। কতকগুলি রস স্বভাবতঃ নাটকের অর্থাৎ অভিনয়ের উপযোগী; তাহারা মুখ্যতঃ নাট্যরস বা অভিনেয় রস। আবার কতকগুলি রস অভিনয়ের উপযোগী না হইলেও সামাজিকচিত্তে অভিধ্যান দ্বারা চর্বণা ও আস্বাদনের উপযোগী, তাহারা মুখ্যতঃ কাব্যরস বা অভিধ্যেয় রস।

অভিনেয় রস লইয়া নাট্য রচিত হয়, মহাকাব্য বা খণ্ডকাব্যও রচিত হয়, কথাসাহিত্যও রচিত হয়। এই সকল ক্ষেত্রে কাব্য বা কথাকে অনায়াসে নাট্যে রূপান্তরিত করা চলে। কিন্তু অনেক সময় অভিনেয় বা নাট্যরস বর্ণনা-বৈচিত্র্যে অভিধ্যেয় বা নিছক কাব্যরস হইয়া যায়; অবশ্য অভিধ্যেয় রস কখনও অভিনেয় হইতে পারে না। যেখানে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত নাই, এবং ভাবসমূহ কার্য বা অনুভাবের মধ্য দিয়া প্রকাশ না পাইয়া কেবল কথায় প্রকাশ পাইতেছে; অথবা ভাবের গূঢ়তা, গভীরতা ও ঘনতাই এই প্রকার যে, প্রকাশহীন স্তব্ধতাই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, কবি আসিয়া নানা অলঙ্কারের ও সৌন্দর্যের সাহায্যে সেই অব্যক্তব্য অতলদেশের মণিমালাকে এক এক করিয়া নানা কৌশলে দিব্যপ্রভায় পরিস্ফুট করিতে থাকেন, তখন প্রসিদ্ধ আটটি নাট্যরসও কেবল কাব্যরসে পরিণত হইয়া যায়। পাঠক-চিত্তের চিন্তন-ব্যাপারই প্রত্যক্ষ অবলম্বন বলিয়া কাব্য সমধিক রসাবহ হয়, এবং তাহাতে কবি গূঢ়তম ভাবও অবলীলায় অভিব্যক্ত করিতে পারেন,—একথা পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে বৈষ্ণব কবিতার কথা; তাহাতে শৃঙ্গাররসাশ্রয়ী পূর্বরাগ, অভিসার বা বিরহের পদগুলি পাত্র বা পাত্রী-বিশেষের মুখের উক্তি দ্বারা রচিত হইলেও নাটক নয়, বিশুদ্ধ কাব্য, রসও অনেক সময়ে অভিধ্যেয় রস। শাক্তপদের আগমনী ও বিজয়ার পদগুলি সম্বন্ধেও একই উক্তি প্রযোজ্য; তবে তাহাদের অবলম্বন-ভূত বাৎসল্য রস মুখ্যতঃ অভিধ্যেয় রস। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, উত্তররামচরিত নাটকে সীতানির্বাসনের পূর্বে বিহ্বল-প্রায় রামচন্দ্রের উক্তিকয়টি মুখ্যতঃ নাট্যোচিত হয় নাই, হইয়াছে গীতি-কাব্যোচিত।[১] ঐ স্থলে রসও মুখ্যতঃ অভিনেয় নয়, অভিধ্যেয়।

এই প্রসঙ্গে একটি নূতন প্রশ্ন জাগে। অভিধ্যেয় রসে সঞ্চারী ভাব বা অনুভাবের ঐশ্বর্য অল্প বলিয়া তাহা কি সত্যই 'বিকলাঙ্গ' রস? এ কথা আমরা সহজেই স্বীকার

(১) বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম ভাগ, উত্তরচরিত ও গীতিকাব্য।

করিতে পারি আলম্বন বিভাব, উদ্দীপন বিভাব, ভাব, সঞ্চারী ভাব এবং বিচিত্র অনুভাব লইয়া নাট্যরস বা অভিনেয় রস পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহা পূর্ণাঙ্গ রস; তাহা রঙ্গমঞ্চে নিখুঁত অভিনয় করিয়া দর্শক-সাধারণের সমক্ষে আলেখ্যবৎ পরিস্ফুট করা চলে। নাট্য-স্বভাব-সম্পন্ন কাব্যেও রস মুখ্যতঃ অভিনেয় রস এবং তাহা পূর্ণাঙ্গ রস। গীতিকাব্যের রস বা প্রাসঙ্গিক রসও অনেক সময় পূর্ণাঙ্গ রস। কিন্তু অনেক কবিতা আছে, এমন কি প্রধান আধিকারিক রস—শৃঙ্গাররসের কবিতাও আছে, যেখানে অনুভাব বা সঞ্চারী ভাব বড় নাই, অথচ রচনা রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। এইরূপ স্থলে রস কি সত্যই বিকলাঙ্গ রস? বৈষ্ণব পদাবলী হইতেই উদাহরণ লওয়া যাক্। প্রথম শৃঙ্গাররসাশ্রিত পূর্ণাঙ্গ রসের উদাহরণ লওয়া হইতেছে,—চণ্ডীদাস-রচিত শ্রীরাধার পূর্বরাগের প্রসিদ্ধ পদ—

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দু'হাত তুলি॥
এক দিঠ করি ময়ূর-ময়ূরী-
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া-বঁধুর সনে॥

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে কিশোরী রাধিকা আলম্বন-বিভাব। বিরল দেশ, কালো মেঘ, কালো বেণী, ময়ূর-ময়ূরী-কণ্ঠ উদ্দীপন-বিভাব; ধ্যান-নিশ্চল নেত্রে মেঘের পানে চাহিয়া থাকা, আহারে বিরতি, রাঙ্গাবাস পরিধান করা, বেণী এলাইয়া ফুলের গাঁথনি খসাইয়া কালো চুল দেখা, এবং একদৃষ্টিতে ময়ূর-ময়ূরী-কণ্ঠ নিরীক্ষণ

করা অনুভাব। চিন্তা, আবেগ, স্মৃতি (যথা—সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে), নির্বেদ (যথা—বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে), উন্মাদ (যথা—হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে, কি কহে দুহাত তুলি ;) প্রভৃতি সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব। রতি স্থায়ী ভাব ; ইহা দর্শন-শ্রবণাদি-জাত এবং মিলনের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা-প্রসূত পূর্বরাগ ; রস এখানে তাই বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার। বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের প্রাচুর্যে রস পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে।

কবি জ্ঞানদাসের,—

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দিখিলুঁ যে শ্যামল বরণ
তাহা বিনু আর কারো নই ॥

—প্রভৃতি পদটিতে বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী ভাবের ঐশ্বর্য এবং রসের অভিনেয়ত্ব ধর্ম যেন আরও পূর্ণ ; শৃঙ্গার-সম্পদে পূর্বরাগাত্মক বিপ্রলম্ভ যেন উচ্ছ্বসিত হইতেছে ! ইহা পূর্ণাঙ্গ রস।

এইবার বৈষ্ণবপদাবলী হইতে শৃঙ্গার প্রভৃতি রসের কয়েকটি প্রসিদ্ধ পদ লইয়া দেখান হইবে উপাদানের বিচারে তাহা বিকলাঙ্গ বা অপূর্ণাঙ্গ হইলেও রস-ধর্মে তাহা যেন আরও উৎকৃষ্ট ! বিদ্যাপতির প্রসিদ্ধ বর্ষার বিরহ-পদ,—

(১) এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝাম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

অথবা বাৎসল্যরসের,—

(২) নাচত মোহন নন্দদুলাল।
রঙ্গিম চরণে মঞ্জির ঘন
বাজত কিঙ্কিণী তাঁহি রসাল॥
স্থল পঙ্কজ দল জিনিয়া চরণতল
অরুণ-কিরণ কিয়ে আভা।
তাহার উপরে নখ- চান্দ সুশোভিত
হেরইতে জগ-মন-লোভা॥
মণি-আভরণ কত অঙ্গহি ঝলকত
নাসায় মুকুতা কিবা দোলে
মা মা মা বলি চান্দবদন তুলি
নবীন কোকিল যেন বোলে।

অথবা সখ্যরসের,—

(৩) আওত শ্রীদামচন্দ্র রঙ্গিয়া পাগড়ী মাথে।
স্তোককৃষ্ণ অংশুমান্ দাম বসুদাম সাথে॥
কটি কাছনি, বঙ্কিম ধটি, বেণুবর বাম কাঁখে।
জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর, ভায়্যা ভায়্যা বলি ডাকে॥
গো-ছান্দন ডোরি কান্ধহি শোভে কাণে কুণ্ডলখেলা।
গলে লম্বিত গুঞ্জাহার ভুজে অঙ্গদ বালা॥
স্ফুটচম্পকদল-নিন্দিত উজ্জ্বল তনু শোভা।
পদ-পঙ্কজে নূপুর বাজে শেখর-মনোলোভা॥

অথবা পুনরায় শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রসের,—

(৪) হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥

হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখিক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ দোহাঁ হোয়॥

প্রথম পদটি বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ বিরহ-পদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে স্থায়ী ভাব বিপ্রলম্ভরতির সহিত সাধারণ ভাবে বিষাদ ও ব্যাকুলতার ভাব অনুস্যূত রহিয়াছে। নায়িকা অর্থাৎ আলম্বন-বিভাব শ্রীরাধিকা, কিন্তু অনুভাব নাই একটিও, সঞ্চারী ভাবও তাই নাই বলিলেই চলে, রহিয়াছে প্রবল উদ্দীপন-বিভাব। ধাবমান পবনের আঘাতের পর আঘাত আসিয়া যেমন স্থির সমুদ্রে বিপুল বিক্ষোভ তোলে এবং সমুদ্রের মত্ত স্বরূপকে গোচরীভূত করে, সেইরূপই উদ্দীপন-বিভাবের উপর্যুপরি অভিঘাতে স্থায়ী ভাব উদ্দীপ্ত হইয়া সহস্র তরঙ্গে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং শৃঙ্গাররসকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। বর্ষার সকল মত্ততা, মিলনের তীব্রতা, মেঘ-গর্জন-সহ ভুবন-ভরা অশ্রান্ত বর্ষণ রাধার হৃদয়ে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। এ সেই ভরা বাদর, যাহার সূচনায় আষাঢ়ের প্রথম দিবসে কবি কালিদাস কণ্ঠালিঙ্গন-সুখী প্রেমিক-যুগলের চিত্তেও বিরহের আর্তি-পূর্ণ অন্যথাভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। আজ কিন্তু মাহ ভাদরে ভরা বাদরে রাধিকা শূন্যমন্দিরে শূন্যচিত্ত প্রায়, পুনঃ পুনঃ শরশরে আহত হইতেছে। প্রকৃতির বুকে বজ্রধ্বনির সম্ভাষণে ময়ূর মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, মেঘ-বর্ষণে দাদুরী ডাহুকী সকলেই পাগল। হায়! শূন্য মন্দিরে রাধিকার বুক যে ফাটিয়া যায়! এ তো গেল দিন, হয়তো বা সহ্য হয়। আসিল তিমিরাবরণে ঘোর যামিনী। ঐ যে কালো মেঘের বক্ষে বিদ্যুৎ সুন্দরী অস্থির হইয়া খেলা করিতেছে! আহা! বিদ্যুদ্‌দ্যুতিময়ী রাধিকা, তাহার কৃষ্ণ কোথায়?

এই কবিতায় রস আছে কি না এবং পূর্ণ চন্দ্রে জ্যোৎস্না আছে কি না একই প্রশ্ন। অথচ এখানে অনুভাব একটিও নাই, সঞ্চারী ভাবও তথৈবচ, তাহা হইলে কাব্যে রসবত্তা আসিল কি প্রকারে? কবিতাটি সঙ্গীতধর্মে সমানভাবে পুষ্ট হইলেও আমরা এখানে কেবল ভাবধর্মের দিক্ হইতেই বিচার করিব। রস-নিষ্পত্তির মূল কথা হইল ভাবের অতিসম্পন্নতা। কথাটি পূর্বে উল্লিখিত হইলেও আবার উদ্ধৃত হইতে পারে,—

—ভাবা এবাতিসম্পন্নাঃ প্রয়ান্তি রসতামমী।

ভাব অতিসম্পন্ন হইলেই রসতা প্রাপ্ত হয়, ভাবের অতিসম্পন্নতার জন্যই অনুভাব, সঞ্চারী ভাব এবং উদ্দীপন-বিভাবের আবশ্যকতা। কাব্যের বিচিত্র উদাহরণ বিচার করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, নাট্যরস বা অভিনেয়-রস উপাদান-বিচারেও পূর্ণাঙ্গ, নতুবা তাহাদের অভিনেয়ত্ব হয় না; কাব্যরস বা অভিধ্যেয় রসে দুই একটি উপাদান, যেমন অনুভাব বা সঞ্চারী ভাব, কখনও বা উদ্দীপন ভাবের বিরলতা অথবা একেবারে অভাবও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে রসোপলব্ধির পূর্ণতার হানি হয় না। ইহাদের রসতার কারণ অভিধ্যান, অভি বা আভিমুখ্যে বিশেষভাবে ধ্যান বা চিন্তন। সামাজিক চিত্তের চিন্তন-ব্যাপারে বস্তু রসোত্তীর্ণ হইয়া যায়। এই চিন্তন-ব্যাপারের আনুকূল্য আসে কবিতার অন্য উপাদান হইতে। দেখা যাইবে যে সকল কবিতায় একটি অঙ্গ দুর্বল বা অবিদ্যমান, সেই সকল কবিতায় অপর কোনও অঙ্গ অতিপুষ্ট হইয়া ক্ষতিপূরণ করে, এবং মোটের উপর ভাবের অতিসম্পন্নতা-কার্য তুল্যরূপেই সিদ্ধ করিয়া থাকে। এই অভিধ্যেয় রস তাই বাহ্যতঃ শারদাতনয়ের কথিত রূপে বিকলাঙ্গ হইলেও কার্যতঃ পূর্ণাঙ্গ, এক অঙ্গের অভাব পরিমাণগুণে অন্য অঙ্গদ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে, এবং কাব্য রসবৎ হইয়া যায়। শান্তরস, বা বাৎসল্যরস, বা ভক্তিরস, অথবা কোন কোন প্রাসঙ্গিক রসে সাধারণতঃ অনুভাব বিরল; কিন্তু উদ্দীপন বিভাবের প্রাচুর্য কাব্যকে রসোত্তীর্ণ করে।

আমাদের আলোচ্য উদাহরণটি অন্যতম প্রধান রস শৃঙ্গার-রসাশ্রিত হইলেও সেখানে অনুভাব নাই, কিন্তু উদ্দীপন-বিভাবের কি বিচিত্র ও বিপুল সমাবেশ! ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির, মেঘের গর্জন ও বর্ষণ, কুলিশপাত এবং ময়ূরের নৃত্য, দাদুরী ও ডাহুকীর মত্ততা, তিমির-যামিনী এবং মেঘের বুকে বিদ্যুদ্-বিলাস—সকলই উদ্দীপন বিভাব; পাঠকের চিত্তে যুগপৎ বিরহবোধ ও মিলনের আকাঙ্ক্ষা পুনঃ পুনঃ জাগ্রত করিয়া স্থায়ী ভাবকে অতিপুষ্ট বা অতিসম্পন্ন করে, এবং ফলে চিত্ত একেবারে ভাব-তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে রসের প্রকাশ ঘটে। এই-জাতীয় অভিধ্যেয় রস পাঠক-চিত্তের চিন্তন-কুশলতায় প্রকাশ হয়, তাহা কদাচ অভিনেয় হয় না।

উক্ত কবিতাটির উদ্দীপন বিভাব বাহিরের প্রকৃতি। পরবর্তী বাৎসল্যরসের কবিতাটিতেও ("নাচত মোহন নন্দদুলাল") অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব প্রায় নাই, উদ্দীপনবিভাবের অতিশয়তা আছে এবং তাহা হইতেছে নন্দদুলালের বিচিত্র রূপ ও অলঙ্কার; বহিঃপ্রকৃতি নহে। কেবল শেষে একটি অনুভাব—মা মা মা বলিয়া ডাকা—বাৎসল্যরসকে ঘন করিয়া তুলিয়াছে।

পরবর্তী সখ্যরসের কবিতাটিও একই প্রকারের; গোপাল বালক-গণের বিচিত্র সজ্জা ও অঙ্গের অলঙ্কার-রূপ উদ্দীপন বিভাবের প্রাচুর্য অনুভাবের অভাবের পূরণ করিয়াছে। এখানেও অবশ্য একটি অনুভাব আছে—'ভায়্যা ভায়্যা' বলিয়া ডাকা।

শেষ কবিতাটি আবার শৃঙ্গার বা মধুর রসের কবিতা। এখানেও অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব নাই; আশ্চর্য এই,—সাক্ষাৎভাবে উদ্দীপনবিভাবও নাই; আছে কেবল মালা-রূপক অলঙ্কারের আশ্রয়ে উপমান বা অপ্রস্তুত বিষয়ের প্রাচুর্য। এই বিষয়গুলিই ব্যঞ্জনাধর্মে আলম্বনবিভাব শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্করণ করিতেছে, এবং উদ্দীপন বিভাবের স্থলাভিষিক্ত হইয়া স্থায়ী ভাব রতিকে অতিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। এখানে তাই অলঙ্কারাশ্রয়ে বিকলাঙ্গত্ব ঘুচিয়া রস পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥

—চণ্ডীদাসের এই কবিতাটিতেও বিষম-অলঙ্কারের তরঙ্গ উঠিতেছে। নানা বিষয়কে পার্শ্বে বসাইয়া ব্যঞ্জন-ধর্মে ভাবকে অতিপুষ্ট করা হইয়াছে, এবং কবিতার উপাদানের বিকলাঙ্গতা-সত্ত্বেও রস পূর্ণাঙ্গ হইয়া উল্লসিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা কাব্যের 'নববর্ষা' কবিতাটি সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য করা চলে।

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে
হৃদয় নাচেরে।
শতবরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মত ক'রেছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচেরে।
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে ॥
গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।

ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে ॥

এখানে কবি-হৃদয়ই আলম্বন বিভাব; চেষ্টা করিলে 'হৃদয় নাচে' বা 'আকুল পরাণ আকাশে চাহে'—এই দুইটিকে অনুভাব বলা যায়; কিন্তু কার্যতঃ ইহারা অনুভাব নয়, কেননা হৃদয়ের নাচ এবং পরাণের চাওয়া কিছুই প্রত্যক্ষ-গোচর বা অভিনেয় হয় না। 'শতবরণের ভাব-উচ্ছ্বাস'-এর কথা লিখিত আছে বটে, কিন্তু সহর্ষ উল্লাস ছাড়া আর কোন ভাবেরই প্রকাশ কবিতায় নাই, উহাকেই আস্বাদাঙ্কুরকন্দরূপ মূল স্থায়ী ভাব বলিতে হইবে। কবিতাটির অপূর্বত্ব আসিতেছে বর্ষার বিচিত্ররূপের অবলম্বনে উদ্দীপনবিভাবের বিপুল সম্ভার হইতে। দ্বিতীয় স্তবক হইতে বর্ষার বিচিত্র রঙ্গময় চিত্র কবি-তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে; তাহাই ভাবকে অতিপুষ্ট করিয়া রসায়িত করিয়াছে। মূল রস এখানে প্রাসঙ্গিক রস, কিন্তু ফলের বিচারে তাহাকে বিদ্যাপতির "এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর"—এই কবিতাটির ন্যায় পূর্ণাঙ্গই বলিতে হইবে।

স্থায়ী ভাব অতিসম্পন্ন হইলেই রস হয়। তালমান-যুক্ত অর্থহীন সঙ্গীতের ধ্বনিপরম্পরা চিত্তে অনুরূপ স্পন্দন-পরম্পরা জাগাইয়া কিঞ্চিৎ অস্ফুট হইলেও রসবোধ জন্মায়। চিত্তের অনুকূল স্পন্দন-পরম্পরা হইতেই রসবোধ জন্মে। সে স্পন্দন ধ্বনি হইতেও আসিতে পারে, অর্থ হইতেও আসিতে পারে। যেখানে অর্থপূর্ণ আলম্বন বিভাবের সঙ্গে শুধু উদ্দীপনবিভাবের, অথবা কেবল অনুভাবের বিপুল ঐশ্বর্য রহিয়াছে, এবং মূল-ভূত স্থায়ী ভাবটি নানা আঘাতে চকিত ও সজাগ হইয়া চিত্তে একতান স্পন্দ-প্রবাহ সঞ্চার করিতেছে, সেখানে রস-বোধ পরিস্ফুট না হইবার কোন হেতু নাই।

বিষয়টি সুদীর্ঘ হইয়াছে, আর আলোচনা করিব না। আমরা কেবল বলিতে চাই অভিনবগুপ্ত-কথিত 'কাব্যং চ নাট্যমেব'—এই মন্তব্য কদাচ বিচার-সহ নহে। নাট্যরসের বাহিরে কাব্যরস আছে, তাহার বিশিষ্টধর্ম ও বৈচিত্র্যও আছে, তাহাকেই আমরা বলিলাম অভিধেয় রস। ইহা উপাদান-বিচারে কখনও

বা পূর্ণাঙ্গ, কখনও বা বিকলাঙ্গ, কিন্তু রসের স্বরূপ-বিচারে সর্বদাই সমান ও সম্পূর্ণ।

এই উপলক্ষে গীতি-কাব্যের রস-বিচারের একটি জটিল প্রশ্নের সমাধান করা হইল।

ভরতমুনি যে সূত্র করিয়াছিলেন,—

তত্র বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্ রস-নিষ্পত্তিঃ,

তাহা তিনি স্পষ্টতঃ নাট্যরসের সূত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; নাট্যরস-বিষয়ে এই সূত্র এবং সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। কিন্তু ঐ সূত্রকে যাঁহারা নির্বিচারে কাব্য-রসের সূত্র বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্যগ্‌দর্শিতার এবং দূরদর্শিতার প্রশংসা করা যায় না।

(৪)

স্থায়ী ভাব ও রসের সংখ্যা ও পরিচয়

রসাধ্যায়ের শেষ ভাগে কবি কর্ণপূর গোস্বামীর অভিমত ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে যে, রস মাত্র একটি এবং স্থায়ী ভাবও মাত্র একটি। গোস্বামী মহাশয় ইহার পরেই প্রেমরস নামে একটি নূতন রস স্বীকার করিয়া বলিলেন,—

প্রেমরসে সর্বে রসা অন্তর্ভবন্তি ইত্যত্র মহীয়ানেব প্রপঞ্চঃ। গ্রন্থগৌরবভয়াদ্ দিঙ্‌মাত্রম্ উক্তম্। —অলঙ্কারকৌস্তুভ, ৫।৭৪, বৃত্তি, পৃঃ ১৪৮-১৪৯

'—প্রেমরসে সকল রসই অন্তর্ভূত আছে, এই প্রপঞ্চ অতি মহান্। গ্রন্থ বাড়িয়া যাইবে, এই ভয়ে দিক্ মাত্র কথিত হইল।'

অতঃপর তিনি মন্তব্য করিলেন,—

উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রেম্ন্যখণ্ডরসত্বতঃ।
সর্বে রসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গা ইব বারিধৌ॥

—'সমুদ্রে তরঙ্গ-সমূহের ন্যায় অখণ্ড প্রেমরসে সকল রস ও সকল ভাব একবার উঠিতেছে, আবার বিলীন হইতেছে।'

কর্ণপূর গোস্বামীর অনেক পূর্বে ভোজরাজ তদীয় শৃঙ্গার-প্রকাশ গ্রন্থে বিশদ রূপে এবং সরস্বতীকণ্ঠাভরণে সংক্ষিপ্তরূপে শৃঙ্গাররসকে সর্ব-রসের মূল প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই শৃঙ্গার কিন্তু নবরসের আদি রস নয়, ইহা পুরুষের আদি অভিমান বা অহঙ্কার। ভোজ বলেন,—

তচ্চ আত্মনোঽহঙ্কার-গুণ-বিশেষং ব্রূমঃ। স শৃঙ্গারঃ, সোঽভিমানঃ, স রসঃ। তত এতে রত্যাদয়ো জায়ন্তে। —শৃঙ্গারপ্রকাশ, ১১শ প্রকাশ

—'তাহাকে আত্মার অহঙ্কার-নামক গুণবিশেষ বলিয়া বলিতেছি। তাহাই শৃঙ্গার, তাহাই অভিমান, তাহাই রস। তাহা হইতে এই রতি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।'

সরস্বতীকণ্ঠাভরণে তিনি রস-পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই ভূমিকা করিয়াছেন,—

রসোঽভিমানোঽহঙ্কারঃ শৃঙ্গার ইতি গীয়তে।
যোঽর্থস্তস্যান্বয়াৎ কাব্যং কমনীয়ত্বমশ্নুতে॥—সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ৫।১

—'রস অভিমান, অহঙ্কার, শৃঙ্গার বলিয়া গীত হইয়া থাকে। এই যে রস, তাহার অন্বয়-হেতু কাব্য কমনীয়তা প্রাপ্ত হয়।'

অভিমান বা অহঙ্কারকে কেবল রসের কেন, সৃষ্টির যাবতীয় বিষয়ের মূল কারণ বলা যাইতে পারে। এই ব্যাখ্যায় কিঞ্চিৎ দার্শনিকতা থাকিলেও রস-স্বরূপ বুঝিতে তাহা বিশেষ কিছু সাহায্য করে না।

ভোজদেব কিন্তু সরস্বতীকণ্ঠাভরণে অহঙ্কার-শৃঙ্গারের পরই প্রেমকে সর্বরসের মূল প্রকৃতি বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। এই প্রেম অহঙ্কারের উত্তরা কোটি বা চরম পরিণাম, অর্থাৎ পরিপক্ক অবস্থা। আমরা লোককে রতি-প্রিয়, রণ-প্রিয়, পরিহাস-প্রিয়, অথবা অমর্ষ-প্রিয় বলি বলিয়া ভোজদেবের মতে প্রীতি বা প্রেমেই সকল ভাব পর্যবসিত হইতেছে। কবিকর্ণপূর প্রেমরস সর্বরসের মূলাধার কেন, তাহার কারণ উল্লেখ করেন নাই; তাঁহার পূর্বগামী ও তাঁহার আদর্শ-ভূত ভোজদেব যে কারণ দিলেন, তাহাও প্রৌঢ় চিত্তকে তুষ্ট করে না।

এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় রস-বিশেষের ভক্ত, তাহার আরাধিত রসকেই সর্বরসের মূলপ্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। আচার্য অভিনবগুপ্ত শান্তরসকে বলেন সর্বোত্তম রস, তাহা প্রকৃতি-স্থানীয় হইয়া অন্য সকল রসের জন্ম দিয়া থাকে।[১] সূরি ভবভূতি তমসার মুখ দিয়া যে কথা[২] বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ টীকাকার

(১) নাট্যশাস্ত্র, ৬।১০৯, ভাষ্য, পৃঃ ৩৪০।
এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য—নাট্যশাস্ত্র, ৬।১০৭-১০৮।

(২) একো রসঃ করুণ এব নিমিত্ত-ভেদাদ্
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্।
আবর্ত-বুদ্বুদ-তরঙ্গময়ান্ বিকারান্
অম্ভো যথা সলিলমেব হি তৎসমগ্রম্॥—উত্তররামচরিত, ৩।৪৭।

বীররাঘব হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক পণ্ডিতই ভবভূতির মর্মবাণী উপলব্ধি করিয়াছেন,—করুণরসই রস, অন্যান্য রস উহারই বিকৃতি বা পরিণাম মাত্র।[১] নারায়ণ ও ধর্মদত্তের মতে সকল রসের সার অদ্ভুত রস, এবং অদ্ভুতরসই রস অর্থাৎ মূলরস।[২]

বলা বাহুল্য, ভক্তগণের এই সকল মতবাদের কিছু অর্থ থাকিলেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়া আলোচনা করিবার মত কোন তত্ত্ব তাহাতে নাই। বরং অভিমানাত্মক শৃঙ্গারকে সকল রসের মূল কারণ বলা যায়, এবং এখান হইতে আমরা আমাদের বিশ্লেষণ আরম্ভ করিতে পারি।

অভিমানের দ্বিবিধ প্রকাশ—অনুকূল চিত্তবৃত্তি এবং প্রতিকূল চিত্তবৃত্তি। অনুকূল চিত্তবৃত্তি হ্লাদ বা সুখজনক, আমরা তাহার সাধারণ নাম দিতে পারি প্রীতি; প্রতিকূল চিত্তবৃত্তি দুঃখ বা তাপ-জনক, তাহার সাধারণ নাম দেওয়া যায় অপ্রীতি

'একই করুণরস নিমিত্ত-ভেদ-হেতু ভিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপভেদ প্রাপ্ত হয়, জল যে প্রকার আবর্ত, বুদ্বুদ ও তরঙ্গরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ সমস্তই সলিল থাকে।'

(১) ইদমত্র কবের্মতম্—যদ্যপি শৃঙ্গার এক এব রস ইতি, শৃঙ্গারপ্রকাশকারাদি-মতম্, তথাপি প্রাচুর্যাদ্ রাগি-বিরাগি-সাধারণ্যাৎ করুণ এক এব রসঃ। অন্যে তু তদ্বিকৃতয়ঃ ইতি। —বীররাঘবের টীকা

—'এখানে কবির মত হইতেছে এই,—শৃঙ্গারপ্রকাশকার প্রভৃতির মতে যদিও শৃঙ্গারই একমাত্র রস, তথাপি জীবনে ইহার প্রাচুর্যহেতু এবং সংসারী ও সংন্যাসী সকলের মধ্যেই সাধারণভাবে অবস্থানহেতু করুণই একমাত্র রস, অন্যান্য রস তাহার বিকৃতিমাত্র।'

(২) তদাহ ধর্মদত্তঃ স্বগ্রন্থে—

রসে সার শ্চমৎকারঃ সর্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকার-সারত্বে সর্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ॥
তস্মাদ্ অদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্। ইতি।

—সাহিত্য-দর্পণ, ৩।৩৫, বৃত্তি

—'তাই ধর্মদত্ত স্বগ্রন্থে বলেন,—রসের সার হইতেছে চমৎকার, উহা সর্বত্রই অনুভূত হয়, সেই চমৎকারের সার সর্বত্রই অদ্ভুত রস বলিয়া স্বীকৃত হয়। অতএব পণ্ডিত নারায়ণ অদ্ভুত রসকেই একমাত্র রস বলিয়া মনে করেন।'

অর্থাৎ দ্বেষ। এখন প্রীতি-ভাবকে আলম্বনবিভাবানুযায়ী মুখ্যতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা,—

(১) প্রীতি—চিত্তের বিকাশ-স্বরূপ সুখময় প্রসন্নতা-ভাব; নিম্নের উল্লিখিত বিশেষ প্রীতি ভিন্ন ভ্রাতৃ-প্রীতি, প্রভু-প্রীতি, বা সমাজ-প্রীতি প্রভৃতি যাবতীয় প্রীতি ইহার মধ্যে পড়িবে ;

(২) স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি প্রীতি—শৃঙ্গাররতি ;

(৩) জ্যেষ্ঠের কনিষ্ঠের প্রতি প্রীতি, যথা,—মাতার সন্তানের প্রতি, অথবা তৎসদৃশ সম্পর্কান্বিত প্রীতি—স্নেহ, মমতা বা বাৎসল্যরতি ;

(৪) অনুত্তমের উত্তমের প্রতি প্রীতি, অথবা ভক্তের পরমদেবতার প্রতি প্রীতি—ভক্তি ;

(৫) তুল্যজনের পরস্পরের প্রতি প্রীতি—সৌহার্দ বা সখ্যরতি ;

(৬) জন্মভূমি বা স্বদেশের প্রতি প্রীতি—দেশপ্রীতি ; ইহারই অপর নাম উদ্দীপ্তি বা স্বাধীনতা-বোধ।

আমাদের মতে এই ষড়্‌বিধ প্রীতিই মানবচিত্তের গূঢ় স্থায়ী ভাব, অতিদৃঢ় সংস্কাররূপে তাহারা বাসনা-লোকে বর্তমান। বিভাবাদিদ্বারা পুষ্ট হইয়া অতিসম্পন্ন হইলে তাহাদের হইতে যথাক্রমে প্রেয়োরস, শৃঙ্গাররস, বাৎসল্যরস, ভক্তিরস বা দিব্যরস, সখ্যরস, এবং উদ্দীপ্তিরস বা ভৌমরস বা দেশপ্রীতিরসের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এখানে আমরা মূলরস একটি মাত্র গণনা করিব, তাহার নাম প্রেয়োরস। দাস্যরস, বা সৌভ্রাত্ররস, অথবা কারুণ্যরস হইলে তাহারাও এই প্রেয়োরসের অন্তর্গত হইবে। ভরতমুনি যদি জুগুপ্সাকে একটি স্থায়ী ভাবের মর্যাদা দিয়া থাকিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের কথিত কোন স্থায়ী ভাব সম্বন্ধেই কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। যাহা হউক, আমাদের উল্লিখিত নূতন স্থায়ী ভাব ও রসগুলিকে আমরা পরে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

এইরূপে প্রতিকূল চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ অপ্রীতি বা দ্বেষ-মূলক ভাবকেও মুখ্যতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা,—

(১) শোক ভাব ; (২) ক্রোধ ভাব ; (৩) ভয় ভাব ; (৪) জুগুপ্সা ভাব। ইহাদের হইতে উৎপন্ন রসগুলির নাম যথাক্রমে করুণ রস, রৌদ্র রস, ভয়ানক রস, ও বীভৎস রস।

চিত্তের আরও কয়েকটি বৃত্তি আছে, তাহাদিগকেও স্থায়ী বৃত্তি বলা চলে।

তাহারাও সাধারণ লক্ষণে ভাব, কিন্তু মুখ্যতঃ স্বাদনাত্মক বা দ্রুতি-ধর্মী ভাব নয়। অবশ্য তাহারাও চিত্তের অনুকূলবৃত্তি এবং হ্লাদ-জনক ভাব। এইরূপ স্থায়ী ভাব হইতেছে তিনটি বা চারটি; যথা,—

(১) হাস ভাব; (২) উৎসাহ ভাব[১]; (৩) সমুন্নতি ভাব; এবং (৪) বিস্ময় ভাব। ইহাদের হইতে জাত রসের নাম যথাক্রমে,—হাস্যরস, বীররস, উদাত্তরস এবং অদ্ভুতরস। ইহাদের মধ্যে উদাত্তরসকে বীররসের অন্তর্ভূত করিলে এইরূপ রসের সংখ্যা হইবে তিনটি। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে হাস্যরস মুখ্যতঃ রম্যবোধ, বীররস ও অদ্ভুতরস রসবিমিশ্র রম্যবোধ। যেখানে ভাব ও অর্থ সমান ভাবে প্রবল, সেখানে রস ও রম্যবোধের যুগপৎ সমান প্রকাশ হইতে পারে।

যেখানে চিত্তবৃত্তি সাধারণ বিচারে প্রীতি-মূলক বা অপ্রীতি-মূলক কিছুই নয়, কেবল পরমজ্ঞানাত্মক ও বিশুদ্ধসুখাত্মক, সেখানে ভাবটি সকল সাংসারিক ভাবের উর্ধ্বে অবস্থিত, তাহার নাম হইতেছে নির্বেদ বা শম। ইহারই নাম রুদ্রট রাখিয়াছেন 'সম্যগ্‌জ্ঞান', এবং আনন্দবর্ধন 'তৃষ্ণাক্ষয়সুখ'। এই ভাব হইতে জাত রসের নাম শান্তরস। বৈষ্ণবগণের শান্তরস আমাদের মতে কোনও রসই নয়। যেখানে কেবল নিষ্ঠা, প্রবল প্রীতি বা বিদ্বেষ কিছুই নাই, সেখানে তাহা স্বরূপ-লক্ষণে রস জন্মাইতে পারে না। আমাদের কথিত শান্তরসে রজস্তমোগুণের অতীত বিশুদ্ধ সত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ রহিয়াছে, এবং এই সত্ত্বকে অতিক্রম করিয়াও বিশুদ্ধ আত্মানন্দ বা সংবিদানন্দের প্রকাশ রহিয়াছে। ইহা যুগপৎ জ্ঞানাত্মক ও আনন্দ-স্বাদাত্মক। শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠতা-বুদ্ধির সহিত দাস্যভাবাদি কিছু যুক্ত না থাকিলে তাহা দেব-বিষয়ক রতি-ভাবেই পর্যবসিত হইয়া আলঙ্কারিকগণের কথিত 'ভাব' হইবে মাত্র, রস হইবে

---

(১) আমরা পূর্বে উৎসাহকে volition বা ইচ্ছাবৃত্তি বলিয়াছি, এবং বীররসকে রস-বিমিশ্র রম্যবোধ বলিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে ব্যাপক ভাবে ধরিলে ইচ্ছাবৃত্তিকে ভাব-বৃত্তির অন্তর্ভূত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। রিচার্ড্‌স্‌ এক স্থলে টিপ্পনী করিয়া বলিয়াছেন,—

"Under 'Feeling' I group for convenience the whole conative-affective aspect of life—emotions, emotional attitudes, the will, desire, pleasure-unpleasure, and the rest. 'Feeling' is shorthand for any or all of this."

—*Practical Criticism*, Part III, Ch. I, p. 181

না। বৈষ্ণবগণ সনক, সনন্দ প্রভৃতি পরম যোগিগণকে যে শান্তরসের সাধক বলিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের ব্যাখ্যাত শান্তরস হইলে বলিতে হয়, বৈষ্ণবীয় অতিভক্তি তাহাদের জ্ঞানদৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়াছে। অভিনবগুপ্ত বলেন,—

সর্ব-রসানাং শান্তপ্রায় এবাস্বাদঃ, বিষয়েভ্যো বিপরিবৃত্ত্যা।[1]

—নাট্যসূত্র, ৬।১০৮, ভাষ্য, পৃঃ ৩৪০

—'বিষয় হইতে নিবৃত্তি না হইলে রসের অভিব্যক্তি হয় না বলিয়া সকল রসেরই আস্বাদ শান্তরসের তুল্য।'

বিষয়-জ্ঞান তৎকালের নিমিত্ত লুপ্ত-প্রায় না হইলে কোন রসেরই সম্যক্ অভিব্যক্তি হইতে পারে না। সেই বিষয়-জ্ঞান যে অবস্থায় কিছু কালের নিমিত্ত সম্যক্ রূপে লুপ্ত হয়, তাহাতে যে রসের চূড়ান্ত প্রকাশ হইবে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? বিষয়জ্ঞান লুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মেঘ-বিচ্ছেদে মেঘান্তরিত চন্দ্রমার ন্যায় আত্মানন্দ ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে। নাট্যশাস্ত্রে শান্তরসের বর্ণনা এইরূপ,—

ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন দ্বেষো নাপি মৎসরঃ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু স শান্তঃ প্রথিতো রসঃ॥ —নাট্যশাস্ত্র, ৬।১০৬

—'যেখানে দুঃখ নাই, সুখও নাই, দ্বেষ অথবা মাৎসর্য নাই, সর্বভূতে যাহা সমদৃষ্টি-স্বরূপ, তাহাই শান্ত-রস বলিয়া প্রসিদ্ধ।'

তাহা হইলে আমাদের মতেও মূল রস নয়টি; যথা—

প্রেয়োরস, করুণরস, রৌদ্ররস, ভয়ানক রস, বীভৎস রস, হাস্যরস, বীররস, অদ্ভুত রস ও শান্তরস।

ইহাদের মধ্যে প্রেয়োরসের ছয়টি বিভাগ করা হইয়াছে, যথা,—

প্রেয়োরস, শৃঙ্গাররস, বাৎসল্য রস, ভক্তিরস, বা দিব্য রস, সখ্য রস এবং উদ্দীপ্তি রস বা ভৌমরস বা দেশপ্রীতি-রস।

বীররসেরও দুইটি বিভাগ করা হইয়াছে; যথা,—

বীররস ও উদাত্তরস।

স্থায়ী ভাবও মুখ্যতঃ নয়টি; যথা,—প্রীতি; শোক, ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সা; হাস, উৎসাহ, বিস্ময়; শম। ইহাদের মধ্যে প্রীতি-ভাব আলম্বন-বিভাব-ভেদে পূর্বকথিত রূপে ছয় প্রকার, এবং উৎসাহ ভাবও উৎসাহ ও সমুন্নতি এই দুই প্রকার।

(১) পাঠ-সংস্কার করা হইয়াছে।

এখন আমাদের উল্লিখিত নূতন রস ও স্থায়ী ভাব গণনার যৌক্তিকতা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রেয়:কে রস নয়, অলঙ্কার বা বাক্‌সৌন্দর্যরূপে প্রথম গণনা করেন ভামহ ও দণ্ডী। দণ্ডী বলিয়াছেন,—

প্রেয়: প্রিয়তরাখ্যানম্। —কাব্যাদর্শ, ২।২৭৫

—'প্রেয়: অলঙ্কার হইতেছে প্রিয়তর উক্তি।'

দণ্ডী প্রথমে ভামহের উদাহরণটি তুলিয়া ব্যাখ্যানচ্ছলে যাহা বলিলেন, তাহাতে প্রেয়ের প্রীতি-অর্থ দেবাদিবিষয়া রতি বা ভক্তি। দণ্ডীর প্রদত্ত পরবর্তী উদাহরণে প্রীতি যে ভক্তি, তাহা আরও স্পষ্ট হইয়াছে। দণ্ডীর রসবৎ অলঙ্কারের সংজ্ঞা-নির্দেশক বাক্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দণ্ডী বলিতেছেন,—

প্রাক্ প্রীতি র্দশিতা সেয়ং রতিঃ শৃঙ্গারতাং গতা।
রূপবাহুল্য-যোগেন তদিদং রসবদ্ বচঃ॥ —কাব্যাদর্শ, ২।২৮১

—'পূর্বে প্রীতি দেখান হইয়াছে, সেই রতি রূপবাহুল্য-যোগে শৃঙ্গারতা প্রাপ্ত হইল, ইহাই রসবদ্ বাক্য।'

টীকাকার শ্রীপ্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ 'রূপবাহুল্য-যোগেন'-এর ব্যাখ্যা লিখিতেছেন,—

রূপস্য স্বরূপস্য বাহুল্যং বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিভিঃ পরিপোষঃ, তস্য যোগেন সম্বন্ধেন।

—'রূপ অর্থাৎ স্বরূপের বাহুল্য হইতেছে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব দ্বারা পরিপুষ্টি, তাহার যোগ বা সম্বন্ধ-হেতু।'

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দণ্ডী লক্ষ্য করিয়াছেন প্রীতি বা রতি নানা প্রকার 'রূপবাহুল্য-যোগে' অর্থাৎ বিভাবাদির সংযোগে নানা প্রকার ভাব এবং পরে নানা প্রকার রস হইয়া থাকে। আমরাও এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়া এক প্রীতি হইতেই বিভাবাদির বৈশিষ্ট্যানুযায়ী আরও পাঁচ প্রকার ভাব নির্গলিত করিয়াছি।

উদ্ভটের নিকটেও প্রেয়স্বৎ একটি অলঙ্কার; তাহার অবলম্বন রতি, হাস, শোক প্রভৃতি বিভিন্ন স্থায়ী ও ব্যভিচারী ভাব। অবশ্য এই ভাবগুলি রসতা প্রাপ্ত না হইয়া ভাবে অবস্থান করিলেই প্রেয়স্বৎ হয়।[১] আমাদের বক্তব্য এই,—প্রেয়:-এর প্রীতি দণ্ডী উপলব্ধি করিয়াছেন ভক্তিতে, প্রেয়স্বৎ-এর প্রীতি উদ্ভট অনুভব করিলেন রতি প্রভৃতি সকল ভাবে।

(১) কাব্যালঙ্কারসার-সংগ্রহ, ৪।২

রুদ্রটই প্রথম প্রেয়ঃকে অলঙ্কার নয়, রস-স্বরূপে উপলব্ধি করিলেন। প্রেয়ের স্থায়ী ভাবকে তিনি বলিলেন স্নেহ; স্নেহ অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন সৌহার্দ বা সখ্য।[১] রুদ্রট তাহা হইলে প্রেয়ের প্রীতি দ্বারা সৌহার্দ, মৈত্রী বা সখ্য ভাব বুঝিয়াছেন।

ভোজরাজও প্রেয়োরস গণনা করিয়াছেন, তাহার স্থায়ী ভাবের নাম দিয়াছেন স্নেহ।[২]

ভোজ-প্রদত্ত উদাহরণ হইতে বুঝা যায় উহা কার্যতঃ শৃঙ্গাররতির এক মৃদু ভেদ মাত্র।[৩] যাহা হউক, আমরা দেখিলাম ভোজ প্রেয়োরসের প্রীতি দ্বারা কার্যতঃ শৃঙ্গাররতি বুঝিয়াছেন।

রূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে মুখ্য ভক্তিরসের পঞ্চ বিভাগ বর্ণনায় প্রীতরস দিয়া দাস্য রস, এবং প্রেয়োরস দিয়া সখ্যরস বুঝাইয়াছেন। তাহা হইলে এখানেও প্রেয়ের প্রীতির অর্থ সখ্যভাব বা সখ্যরতি।

এইভাবে দেখা যায় প্রেয়োরসকে স্বীকার করিয়া তাহার স্থায়ী ভাব প্রীতিদ্বারা পূর্বাচার্যগণ ভক্তি, সখ্য, শৃঙ্গাররতি, এবং কেহ কেহ অন্য ভাবও বুঝাইয়াছেন। অতএব আমাদের পক্ষে প্রেয়োরসকে মুখ্য রস ধরিয়া তাহার প্রীতিভাবের মধ্যে সর্বপ্রকার স্বাদনাত্মক অনুকূল চিত্তবৃত্তি গণনা করায় অপযুক্তি বা শাস্ত্রবিরুদ্ধতা হয় নাই।

উপরে উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রীতি ভিন্ন অন্য যাবতীয় প্রীতি, যথা,—ভ্রাতৃ-প্রীতি, প্রভু-প্রীতি প্রভৃতি হইতে কখনও রস নিষ্পন্ন হইলে, তাহা এই প্রেয়োরসের মধ্যেই পড়িবে। রাম-লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র বা পাণ্ডবভ্রাতৃগণের সৌভ্রাত্র রসে পরিণত হইলেও ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ-বোধ সর্বদাই রসে পরিণত হয় না। এই জন্য সৌভ্রাত্র রসকে পৃথক্ ভাবে স্বীকার করা হইল না। দাস্যভাব অর্থাৎ প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধবোধ আমাদের মতে স্থায়ী ভাব হইতে পারে না। বৈষ্ণব সাহিত্যের দাস্যরস প্রকৃতপক্ষে ভক্তিরস; ভক্তিভাব দাস্যভাবাশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া রসে পরিণত হইলে তাহাই হয় দাস্যরস। বৈষ্ণব সাহিত্যের বাহিরে কেবলমাত্র প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক লইয়া রস উৎপন্ন হওয়া সাধারণতঃ

---

(১) স্নেহ-প্রকৃতিঃ প্রেয়ান্ —কাব্যালঙ্কার, ১৫।১৭

—'প্রেয়োরসের প্রকৃতি বা স্থায়ী ভাব হইতেছে স্নেহ।'

অন্যোন্যং প্রতি সুহৃদো র্ব্যবহারোঽয়ং মতস্তত্র॥ —ঐ ১৫।১৮

—'সেখানে অর্থাৎ প্রেয়োরসে পরস্পরের প্রতি সুহৃৎ যুগলের ব্যবহার হয়।'

(২) সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ৫।২৩

(৩) এই গ্রন্থের ১৫১ পৃষ্ঠা, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

সম্ভবপর নয়; সেইজন্য দাস্যরসকেও পৃথক্ ভাবে স্বীকার করা হইল না। উহার আলোচনা-স্থল ভক্তিভাবময় বৈষ্ণবপদসাহিত্য।

নিসর্গপ্রীতি রস হয় কিনা, তাহা পরে পৃথক্ ভাবে বিচার করা হইতেছে।

শৃঙ্গাররসকে আলঙ্কারিকগণ বলেন আদি রস। বৈষ্ণবগণ অলৌকিকত্ব স্থাপন করিয়া ইহাকে আদর করিয়া বলেন মধুররস, কান্তরস, উজ্জলরস। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর মিলনেচ্ছা মানুষের কেন, সকল প্রাণীরই এক অতিগভীর সংস্কার; ইহাকে অবলম্বন করিয়া সংসার ও সৃষ্টিচক্র চলিতেছে। বাৎসল্যরসের মূলে এক হিসাবে এই শৃঙ্গাররস। উহার অবলম্বন শৃঙ্গাররতি যৌন ভাবকে আশ্রয় করিয়া পুষ্ট হইলেও উহা যৌনভাবকে অতিক্রম করিতে পারে, এবং এক বিশুদ্ধ প্রেমময় সত্তায় পরিণত হইতে পারে। শৃঙ্গাররস সম্বন্ধে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের উদাহরণগুলি সাধারণতঃ অতিস্থূল ও বাস্তবতাপূর্ণ, এই জন্য অনেকে উহার স্বরূপ-গত সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। শৃঙ্গাররসের আলোচনায় সংস্কৃতে অনেক বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ভোজদেবের শৃঙ্গার-প্রকাশ, শিঙ্গভূপালের রসার্ণব-সুধাকর এবং আরও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ, এমন কি রূপগোস্বামীর উজ্জলনীলমণি গ্রন্থকেও এক হিসাবে এই শ্রেণীতে রাখা যাইতে পারে। শৃঙ্গাররস-সম্পর্কে আলঙ্কারিকগণ আলোচনা করেন নাই, এরূপ কথা উজ্জলনীলমণিতে খুব বেশি নাই। অবশ্য অপ্রাকৃত ভাবপূর্ণ বৈষ্ণবদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, তজ্জনিত নূতনত্ব এবং রূপ গোস্বামীর বৈদগ্ধ্যময় কবিত্ব উহাতে দৃষ্ট হইবে; এবং তাহাই তাঁহাকে পণ্ডিত সমাজে অমর করিয়াছে।

প্রীতি যে রূপবাহুল্য-যোগে শৃঙ্গার-রতিতে পরিণত হয়, এ কথা আচার্য দণ্ডীর মত উদ্ধৃত করিয়া পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

শৃঙ্গাররসের মুখ্যভাগ দুইটি, সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার; ইহাদের প্রত্যেকটি আবার চার চার ভাগে বিভক্ত। এই আট প্রকার শৃঙ্গার রসের প্রত্যেকটি পুনরায় আট ভাগে বিভক্ত। শৃঙ্গার রসের বিশদ ভাগ তাই চৌষট্টি প্রকার। ইহাদের আলোচনা করিবার স্থান এই গ্রন্থে নাই।

প্রসিদ্ধ রসগুলির সম্যক্ আলোচনা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবেশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রামাণ্য অলঙ্কারগ্রন্থসমূহের মধ্যে চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে কবিরাজ বিশ্বনাথ বাৎসল্যরসকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করিলেন এবং তাহাকে দশম রস বলিয়া বর্ণনা করিলেন; যথা,—

অথ মুনীন্দ্র-সম্মতো বৎসলঃ
বৎসলশ্চ রস ইতি তেন স দশমো রসঃ।
স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলং চ রসং বিদুঃ।
স্থায়ী বৎসলতা-স্নেহঃ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্ ॥ —সাহিত্যদর্পণ, ৩।২৩৯

—'তাহার পর মুনীন্দ্র-সম্মত বাৎসল্য রস। বাৎসল্যও রস, ইহা তাই দশম রস। চমৎকারিত্ব পরিস্ফুট বলিয়া বাৎসল্যও রস বলিয়া বিদিত। বৎসলতারূপ স্নেহ এখানে স্থায়ী ভাব, এবং পুত্রাদিই অবলম্বন।'

বিশ্বনাথ মন্তব্য করিলেন, বাৎসল্যরসও মুনীন্দ্র ভরতকর্তৃক অনুমত। ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? নাট্যশাস্ত্রের কাব্যমালা-সংস্করণে পাঠ্য-গুণের বর্ণ-নির্ণয়ে দৃষ্ট হয়,—

…করুণ-বাৎসল্য[১]-ভয়ানকেষু অনুদাত্ত-স্বরিত-কম্পিতৈ বর্ণৈঃ পাঠ্যম্, উপপাদয়ন্তি।
—নাট্যশাস্ত্র, ১৭শ অধ্যায়, কাব্যমালা সংস্করণ, পৃঃ ১৮৭

—'করুণ, বাৎসল্য ও ভয়ানক রসে অনুদাত্ত, স্বরিত ও কম্পিত বর্ণসমূহ দ্বারা পাঠ্য,—ইহাই উপপন্ন করিতেছেন।'

এই পাঠ প্রামাণ্য হইলে অবশ্য ভরতমুনির ইঙ্গিতের কথা বলা চলে।

বিশ্বনাথের উক্তির ব্যাখ্যানে টীকাকার শ্রীরামচরণ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য 'পুত্রাদ্যালম্বনম্'এর অর্থ করিয়াছেন,—

পুত্রাদীত্যাদিনা ভ্রাত্রাদি-গ্রহণম্।…অত্র শ্রীরামস্য ভ্রাতৃস্নেহঃ। তাদৃশোক্ত্যানুভাবেন আস্বাদ্যমানো রসতামেতি।

—'পুত্রাদি প্রভৃতি দ্বারা ভ্রাতা প্রভৃতিও গ্রহণ করা হইয়াছে।…এখানে শ্রীরামের ভ্রাতৃস্নেহ। তাদৃশ উক্তির অনুভাব দ্বারা আস্বাদ্যমান হইয়া বৎসলভাব রসত্ব প্রাপ্ত হয়।'

তর্কবাগীশ মহাশয়ের মন্তব্যটি অর্থ-পূর্ণ। এই দৃষ্টির বিচারে শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণ-প্রীতিকে বাৎসল্য রস, এবং লক্ষ্মণের শ্রীরাম-প্রীতিকে ভক্তিরস, আর ভ্রাতৃযুগল যদি সখ্যভাবাপন্ন হয়, তবে তাহাদের আশ্রিত প্রীতিকে সখ্যরসও বলা চলে। এই বিচারে পৃথক্ ভাবে সৌভ্রাত্র-রস স্বীকার না করিলে ক্ষতি নাই।

(১) Gaekwad's Oriental Series-এর প্রকাশিত নাট্যশাস্ত্রে পাঠ আছে 'করুণ-বীভৎস-ভয়ানকেষু'; বোধ হয় বীভৎস পাঠই ঠিক, বাৎসল্য পাঠ ভুল।

অভিনবগুপ্তের পূর্বে বা সমকালে বাৎসল্যরস ও সৌভ্রাত্র-রসের প্রশ্ন উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, ১৪৭-এর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত অভিনব গুপ্তের—

'তথাহি বালস্য মাতা-পিত্রাদৌ স্নেহঃ',

এবং পরেই—'লক্ষ্মণাদেঃ ভ্রাতরি স্নেহঃ'

—এই উক্তি হইতেই আমাদের পূর্বোক্তরূপ প্রতীতি হইতেছে। অভিনবগুপ্ত প্রবল ভ্রাতৃস্নেহ-রূপ ভাবের জন্য লক্ষ্মণকে ধর্মবীর বলিয়াছেন।

ভোজদেব শৃঙ্গারপ্রকাশের প্রথম প্রকাশে মুখবন্ধের ষষ্ঠ শ্লোকে 'বৎসল' রস লইয়া দশ রসের গণনা করিয়াছেন। এই 'বৎসল' রস আমাদের বাৎসল্য রস, না তাঁহার প্রেয়োরস—স্পষ্ট কিছু বুঝা গেল না।

ডাঃ ভিঃ রাঘবন্ তাঁহার 'The Number of Rasas' গ্রন্থে বাৎসল্যরসকে রুদ্রটের সময় হইতে স্বীকৃত বলিয়া বলেন।[১] এই ধারণা যে ভুল, আমরা পূর্বেই তাহা দেখাইয়াছি ; রুদ্রটের প্রেয়োরস প্রকৃত পক্ষে সখ্যরস[২], বাৎসল্য রস নহে।

বিশ্বনাথের স্বীকৃত বাৎসল্যরসকে সকলে মানিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। পরবর্তী শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ সপ্তদশ শতাব্দীতে ভরতমুনির দোহাই দিয়া ভক্তিরস ও বাৎসল্যরসকে অস্বীকার করিলেন, তাহাদিগকে ভাবমাত্র বলিলেন। এই বিষয়ে জগন্নাথের মন্তব্য,—

ভরতাদিমুনিবচনানাম্ এব অত্র রস-ভাবত্বাদি-ব্যবস্থাপকত্বেন স্বাতন্ত্র্যযোগাৎ। অন্যথা পুত্রাদি-বিষয়ায়া অপি রতেঃ স্থায়িভাবত্বং কুতো ন স্যাৎ ?—রসগঙ্গাধর, পৃঃ ৪৫

—'রস-ভাব প্রভৃতির ব্যবস্থাপনে ভরতাদি মুনির বাক্য-সমূহই প্রমাণ। তাহা না হইলে পুত্রাদি-বিষয়ক রতি স্থায়ী ভাব হইবে না কেন ?'

এই বিষয়ে কিন্তু এক শতাব্দী পূর্বেই কবি কর্ণপূর তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভ গ্রন্থে বিশ্বনাথকে এবং রূপগোস্বামীকে অনুসরণ করিয়া বাৎসল্যরসকে স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহার স্থায়ী ভাব নির্দেশ করিয়াছেন 'মমকার'[৩] অর্থাৎ আমার আমার এই ভাব।

(১) "Vatsalya (which comes down from Rudrata's time)"

—*The Number of Rasas*, p. 55.

(২) কাব্যালঙ্কার, ১৫।১৭, ১৮, ১৯ ;—এই তিনটি শ্লোকে রুদ্রট প্রেয়োরসের স্থায়ী ভাব যে সৌহার্দ মাত্র, তাহা অতি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন।

(৩) 'অত্র মমকারঃ স্থায়ী।'—অলঙ্কারকৌস্তুভ, ৫ম কিরণ, পৃঃ ১৪৮

জগন্নাথের মতই যদি পণ্ডিতগণের অভিমত হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় বাঙ্গালা দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রভাবে বাৎসল্যরস একটি আধিকারিক রস রূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

সংস্কৃতে স্নেহ অর্থ যে কোন প্রকার প্রীতি, বাঙ্গালায় অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া কেবলমাত্র কনিষ্ঠের প্রতি প্রীতি বুঝায়। তাই বাৎসল্য রসের স্থায়ী ভাবকে স্নেহ বলা হইয়াছে; ইহারই অপর নাম 'মমকার', আমরা বলিব মমতা। মন্দারমরন্দচম্পূ গ্রন্থে বাৎসল্য রসের স্থায়ী ভাব বলা হইয়াছে করুণা বা দয়া।[১]

বাৎসল্য রস কি না, এবং বাৎসল্য-রতি বা মমতা একটি স্থায়ী ভাব কি না—এই প্রশ্ন যে জিজ্ঞাসিত হইতে পারে, ইহাই আমাদের ধারণা হয় না। অবশ্য অভিনয়োপযোগী অনুভাব অল্প বলিয়া ইহা মুখ্যতঃ অভিনেয় রস বা নাট্যরস নয়, ইহা চমৎকার কাব্যরস। সন্তান-বাৎসল্য কেবল মনুষ্য-সমাজে নয়, পশু, পক্ষী ও অনেক ইতর প্রাণিসমাজেও সমানভাবে প্রবল দেখা যায়। তাই ইহা জীব-চিত্তের একটি প্রধান সংস্কার।

আমার মনে হয়, বর্তমান বাঙ্গালী জীবনেও শৃঙ্গাররতি অপেক্ষা বাৎসল্যরতির ব্যাপকতা ও প্রসার বেশি। বাল্য-জীবন এবং প্রৌঢ়-জীবনে ইহা এক মুখ্য অবলম্বন; কিন্তু মধ্যজীবনেও ইহার প্রকাশ তুচ্ছ করিবার নহে। যে দেশের সাহিত্যে পুত্র-বিয়োগে অন্ধমুনির ও রাজা দশরথের প্রাণ-বিয়োগ বর্ণিত হইয়া অপূর্ব অশ্রু-সাগর উদ্বেল করে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র-প্রীতি পরিণামে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের এক কারণ হইয়া অন্তরে ঘোর ভয় ও ব্যথার সঞ্চার করে, যে দেশে নন্দ-যশোদার বাৎসল্য, অথবা মেনকার মমতা—উমার আগমনী ও বিজয়া গান—বৈরাগী ও ভিখারীর কণ্ঠেও গীত হয় এবং বাঙ্গালীর চিত্তকে বিগলিত করিয়া এক অলৌকিক ভাবপ্রবাহের সৃষ্টি করে, যে দেশে পুত্র-কন্যার স্নেহের মধ্য দিয়া জনকজননী সাক্ষাৎ ভগবান্ ও ভগবতীর সাধনা করেন, সে দেশে বাৎসল্যরস রস কি না এ প্রশ্ন নিরর্থক।

বৈষ্ণব ও শাক্ত পদসাহিত্যের বাৎসল্যরসের পদ সকলেরই সুপরিচিত; শাক্তপদ-সাহিত্যের রস-বিচারের সময়ে আমরা দুই-একটি উদাহরণ দিয়া আগমনী ও বিজয়ার ভাবসৌন্দর্য বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

---

(১) অন্যে তু করুণা-স্থায়ী বাৎসল্যং দশমোঽপি চ।

—মন্দারমরন্দচম্পূ (কাব্যমালা সংস্করণ,) পৃঃ ১০০

—'কেহ কেহ বাৎসল্যকে দশম রস বলেন, করুণা উহার স্থায়ী ভাব।'

প্রাচীনগণ ভক্তিরসকে স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে উহা 'ভাব' মাত্র, অর্থাৎ ভক্তিভাব কখনও এত সম্পন্ন হইতে পারে না, যাহাতে রসের বা আনন্দ-স্বরূপের প্রকাশ ঘটাইতে পারে। যে দেশের শ্রুতিতে ব্রহ্মের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদ্, অন্তরতরং যদয়ম্ আত্মা'
—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।৪।৮

—'এই যে অন্তরতর আত্মা, তিনি পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অন্য সকল হইতেই প্রিয়তর,'

—সেই দেশে এই প্রিয়তম পরমাত্মার সম্পর্কিত ভাব রসে পরিণত হয় না, এই উক্তি বড় অদ্ভুত ঠেকে। ভক্তি বলিতে যদি সকাম ভক্তি বা বৈধী ভক্তি বুঝা যায়, তবে আলঙ্কারিকগণের মত যথার্থ বলিয়াই মনে করি। কিন্তু যেখানে ভক্তি নিষ্কাম ভক্তি, অর্থাৎ 'রাগানুগা' অথবা 'পরমপ্রেমরূপা', সেখানে ভক্তি অনুশীলিত হইলে যে-কোন ভাব অপেক্ষা সহজে রস-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। রসাভিব্যক্তির জন্য যে পরিমিত-ব্যক্তিত্ব-বোধের বিগলন, অথবা রজস্তমোগুণের মন্দভাব এবং সত্ত্বগুণের অতিবৃদ্ধি প্রয়োজন, তাহা ভক্তিভাবের বশে সহজেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।[১] বাস্তবিক

(১) এই বিষয়ে পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী এবং জীবগোস্বামীর মত উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন সরস্বতী বলেন,—

রতি র্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথোর্জিতঃ।
ভাবঃ প্রোক্তো রসো নেতি যদুক্তং রসকোবিদৈঃ॥
দেবান্তরেষু জীবত্বাৎ পরানন্দাপ্রকাশনাৎ।
তৎযোজ্যম্ পরমানন্দরূপে ন পরমাত্মনি॥

—ভগবদ্‌ভক্তিরসায়ন, ২।৭৫, ৭৬

—'রসকোবিদগণ যে বলিয়া থাকেন, দেবাদিবিষয়ক রতি এবং প্রধানভূত ব্যভিচারী ভাব বলিয়া কথিত হয়, তাহা রস নয়,—এই উক্তি পরমানন্দ প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি অন্য দেবতা-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়।'

অব্যবহিত পরেই মধুসূদন দ্বিতীয় যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন,—

কান্তাদিবিষয়া বা যে রসাদ্যা স্তত্র নেদৃশম্।
রসত্বং পুষ্যতে পূর্ণসুখাস্পর্শিত্ব-কারণাৎ॥

পক্ষে যে যে কারণে অভিনবগুপ্ত শান্তরসকে সমর্থন করিয়াছেন, সেই সকল কারণে ভক্তিরস বা দিব্যরস সমর্থিত হইবে। অবশ্য অভিনবগুপ্ত মন্তব্য করিয়াছেন, ভক্তিরস বা শ্রদ্ধারস অস্বীকার করার হেতু নাই, তবে তাহারা শান্তরসেরই অন্তর্ভূত। তিনি বলেন,—

অতএব ঈশ্বরপ্রণিধানবিষয়ে ভক্তিশ্রদ্ধে স্মৃতি-মতি-ধৃত্যুৎসাহাদ্যনুপ্রবিষ্টে অন্যথৈব অঙ্গম্ (শান্তস্য) ইতি ন তয়োঃ পৃথগ্‌-রসত্বেন গণনম্।

—নাট্যশাস্ত্র, ৬।১০৯ ভাষ্য, পৃঃ ৩৪০

—'ঈশ্বরপ্রণিধান-বিষয়ক ভক্তি ও শ্রদ্ধা স্মৃতি, মতি, ধৃতি ও উৎসাহ প্রভৃতি দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া শান্তরসের অঙ্গই হইয়া যায়। তাই পৃথক্ রসরূপে তাহাদের গণনা করা হইল না।'

এই মন্তব্য হইতে স্বাভাবিক প্রশ্ন আসিতেছে ভক্তিরস শান্তরসের অন্তর্গত কি ?

আমরা বলি 'না', অন্তর্গত নয়, উভয় রসে সাদৃশ্য বা ঐক্যরূপ থাকিলেও ভিন্নতাও বড় অল্প নয়। শান্তরস প্রকৃত পক্ষে সম্যক্ জ্ঞান-প্রকৃতি, তৃষ্ণাক্ষয়-সুখ হইতে উহার উৎপত্তি, উহাতে যদি ভক্তি থাকে, সে ভক্তি গীতার ভক্তিরই ন্যায়

পরিপূর্ণ-রসা ক্ষুদ্র-রসেভ্যো ভগবদ্‌রতিঃ।
খদ্যোতেভ্য ইবাদিত্য-প্রভেব বলবত্তরা ॥ —ঐ ২।৭৭, ৭৮

—'কান্তাদি-বিষয়ক যে রস-সমূহ, তাহারা ভক্তিরসের তুল্য নয়। পূর্ণসুখ লাভ না হইলেও সেখানে রসের পুষ্টি হয়, বলা হইয়া থাকে। ভগবদ্‌বিষয়ক রতি শৃঙ্গারাদি ক্ষুদ্ররস-সমূহের তুলনায় পরিপূর্ণ-রস, যে প্রকার সূর্য-প্রভা খদ্যোত-সমূহের তুলনায় বলবত্তর।'

প্রীতি-সন্দর্ভ গ্রন্থে জীবগোস্বামীও পূর্বে একই যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন,—

যৎ তু প্রাকৃত-রসিকৈ রসসামগ্রী-বিরহাদ্ ভক্তৌ রসত্বং ন ইষ্টং, তৎ খলু প্রাকৃতদেবাদি-বিষয়মেব সম্ভবেৎ···তথা তত্র কারণাদয়ঃ স্বত এব অলৌকিকাদ্ভুত-রূপত্বেন দর্শিতা দর্শনীয়াশ্চ। —প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৬৭৩-৭৪

—'প্রাকৃত আলঙ্কারিক রসিকগণ যে রস-সামগ্রী নাই বলিয়া ভক্তিতে রস আছে বলিতে চাহেন না, তাহা নিশ্চয়ই প্রাকৃত দেবাদি বিষয়ে হইবে···এইরূপে ভক্তি এবং তাহার কারণাদি অর্থাৎ বিভাব প্রভৃতি স্বভাবতঃই অলৌকিক ও অদ্ভুত বলিয়া পূর্বে দেখান হইয়াছে, এবং পরেও দেখান হইবে।'

অতএব ভক্তিরস আলঙ্কারিকগণের বিচারেও সিদ্ধ হয়।

জ্ঞানেরই নামান্তর[১]; সে ভক্তি মুখ্যতঃ আত্মার পরমজ্ঞান-মূলক। শান্তরসও প্রকৃতপক্ষে রসবিমিশ্র রম্যবোধ। আমরা চাই বৈষ্ণব বা শাক্ত সাধকের ভক্তি, অন্ততঃ বহিরাশ্রয় তাহার দ্বৈতবাদ, এবং পরমদেবতা সেখানে আত্মরূপে নয়, কিন্তু ব্যক্তিরূপে অর্থাৎ স্বামী, প্রেমিক, সখা, অথবা মাতা বা পিতার রূপে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্য দিয়া প্রকাশ পান। তাঁহাকে পূজা করা যায়, ভালবাসা যায়, তাঁহাকে আদর করা যায়, তাঁহার প্রতি অভিমান করা যায়, রাগ করা যায়, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিচিত্র মানবীয় লীলা সম্পন্ন করা যায়। এই ভক্তির পাত্র হইতেছেন গৌরচন্দ্রের হৃদয়-সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণ এবং রামপ্রসাদের 'মা'; শান্তরসে এই লীলা চলে না। অভিনবগুপ্ত শান্তরস বুঝাইতে সংগ্রহকারিকা দিয়াছেন,—

মোক্ষাধ্যাত্মনিমিত্ত স্তত্ত্বজ্ঞানার্থহেতুসংযুক্তঃ।
নিঃশ্রেয়স-ধর্মযুতঃ শান্তরসো নাম বিজ্ঞেয়ঃ॥

—অভিনবভারতী ভাষ্য, পৃঃ ৩৪১

—'শান্তরসকে আধ্যাত্মিক মোক্ষের এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভের হেতু বলিয়া জানিবে; উহা নিঃশ্রেয়সের ধর্ম-যুক্ত।'

নিশ্চয়ই ইহা বৈষ্ণব বা শাক্ত কবিগণের ভক্তি নয়, সে ভক্তি মুখ্যতঃ জ্ঞান নয়, সে ভক্তি হইতেছে প্রীতি। এই প্রীতি যখন শুদ্ধা প্রীতি এবং পরমদেবতা-বিষয়ক, তখনই ভক্তিরসের নাম দিব্যরস। দিব্যশব্দের দ্বারা অলৌকিকত্ব এবং শুদ্ধত্ব বুঝাইতেছে; ইহা যে কামনামূলক বৈধী ভক্তি বা সাংসারিক লোকের পার্থিব ভক্তি নয়, তাহাও বুঝাইতেছে। তন্ত্রে শ্রেষ্ঠ সাধকের নাম দিব্যসাধক, শ্রেষ্ঠ ভাবের নামও দিব্যভাব। আমরাও তাই শ্রেষ্ঠ ভক্তিরসের নাম দিলাম দিব্যরস। যে কোন দেবতা-বিষয়ক সাধারণ ভক্তি বা মানবীয় সমাজের ভক্তি ভক্তিমাত্র, তাহা হইতে কখনও রস জন্মিলে তাহা সাধারণ ভক্তিরস মাত্র। দিব্যরস সর্বদাই নিষ্কামসাধনায় পরম প্রীতি-আশ্রয়ে প্রকাশ পায়। গৌরাঙ্গের অপূর্ব কান্তাভাব বা মহাভাব, এবং রামপ্রসাদের অপূর্ব মাতৃভাব বা দিব্যভাব হইতে অভিব্যক্ত রস দিব্যরস।

(১) শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—

'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।' —গীতা, ১৮।৫৫

—'ভক্তিদ্বারা সম্পূর্ণ রূপে জানা যায় আমি কিরূপ সর্বব্যাপী এবং কি আমার তত্ত্বতঃ স্বরূপ।'

রূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে মূল বৈষ্ণব রসেরই নাম দিয়াছেন ভক্তিরস। উহা তাঁহার মতে দুই প্রকার,—মুখ্য ভক্তিরস ও গৌণ ভক্তিরস। শান্ত, প্রীত (দাস্য), প্রেয়ঃ (সখ্য), বাৎসল্য, মধুর বা উজ্জ্বল (শৃঙ্গার)—এই পঞ্চভেদে মুখ্য ভক্তিরস পাঁচ প্রকার। আর হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক এবং বীভৎস—এই সপ্তভেদে গৌণ ভক্তিরস সাত প্রকার। রূপগোস্বামীর মতে বৈষ্ণব ভক্তিরস এই মোট দ্বাদশ প্রকার।

কবিকর্ণপূর আলঙ্কারিকগণের আট বা নয় রস স্বীকার করিয়া অতিরিক্ত বাৎসল্য রস, প্রেমরস এবং সর্বশেষে ভক্তি রসের কথা বলিয়াছেন।

ভক্তিরসের ব্যাখ্যাতাগণ অনেকেই বাঙ্গালী, সকলেই সাধক ও ভক্ত। শ্রীমধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতবাদের আচার্য হইয়াও ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীরূপগোস্বামী, শ্রীজীবগোস্বামী ও শ্রীপরমানন্দদাস সেন, কবিকর্ণপূর সকলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য বা কবি। ইঁহাদের অনেক পরে জন্ম গ্রহণ করিয়া তৈলঙ্গ দেশবাসী পণ্ডিত-রাজ জগন্নাথ ভক্তিরসকে স্বরূপতঃ উপলব্ধি করিয়াও[1] ভরতমুনির নির্দিষ্ট রস-সংখ্যা মান্য করিতে গিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব ভাব, এমন কি শাক্তভাব অবলম্বন করিয়াও ভক্তিরস জয়ী হইয়াছে।

বৈষ্ণবগণ প্রেয়োরসটিকেও প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। অবশ্য অনেক পূর্বে নবম শতাব্দীতে প্রেয়োরস বলিয়া রুদ্রট যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে এই সখ্যরস; সৌহার্দ বা সখ্যরতি ইহার স্থায়ী ভাব। বৈষ্ণব পদাবলীর বাহিরেও ইহার চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায়।

রস হিসাবে ভৌম বা উদ্দীপ্তি রসের গণনা এবং নামকরণ এই প্রথম। কিন্তু এই রসের অনুভূতি আজ পরাধীন বা স্বাধীন সর্বদেশের সর্বমানব-সাধারণ। দেশপ্রীতি ও দেশাত্মবোধ অর্থাৎ দেশকে আপন বলিয়া বোধ করা একই কথা। স্বাধীনতাবোধও প্রকৃতপক্ষে স্ব-বোধ বা আত্মবোধ, অর্থাৎ আত্মপ্রীতি। আমাদের এই স্ব বা আত্মা দেশকাল-ব্যতিরিক্ত কোন সত্তা নয়, ইহা দেশকালব্যাপী জাগ্রত জগতের এক মহাসত্তা। যে আমি চিন্তা করি, কাজ করি, বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্য দিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করি ও আস্বাদন করি, সেই আমির প্রকাশের জন্য তাহার ভূমিগত এবং কালগত সত্তাই প্রথম ও প্রধান আশ্রয়। দেশ ও কালে প্রকাশিত আমি যে

(১) দ্রষ্টব্য—রসগঙ্গাধর, পৃঃ ৪৫, শেষ ছয় পংক্তি।

জগতের মানুষ, সেই জগতের মধ্য দিয়া আমার আদি পরিচয়। ভৌমরসের ভূমি অর্থাৎ জন্মভূমির ভূমি কেবল মাটি নয়; সে মৃন্ময়ী চিন্ময়ী। কারণ, সেই মাটিকে অবলম্বন করিয়া যে বিপুল ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিবিধ বিদ্যা ও কর্মের সাধনা রহিয়াছে, তাহাও সমান ভাবে ইহার অন্তর্গত। ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক যে সকল বিশিষ্ট উপাদান আমার স্ব বা আত্মা, অর্থাৎ আমার চিত্ত ও দেহ, —আমার বিশিষ্ট মানস ও শারীর প্রকৃতি গঠন করিয়াছে, তাহা সকলই এই ভৌমভাবের অন্তর্গত।

এই বোধ বা ভাব কেবল বর্তমান জগতে নয়, প্রাচীন জগতেও ছিল; জাতিতে জাতিতে বা দেশে দেশে সংঘর্ষের মধ্য দিয়া ইহার উগ্র পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এই গভীর সংস্কার পশু-পক্ষীর মধ্যেও দেখা যায়; আপন দেশ, স্থান, আপন গুহা বা নীড় কেহ সহজে ছাড়িতে চাহে না। হউক না কেন অতি তুচ্ছ, আপন অধিকার রক্ষার জন্য যে লোক জীবন পর্যন্ত পণ না করে, তাহাকে সমাজ কাপুরুষ, ভীরু বলিয়া গালি দিয়া থাকে। আনন্দমঠের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—জীবন তুচ্ছ, সকলেই তাহা ত্যাগ করিতে পারে, চাই ভক্তি। এই দেশ-ভক্তি বা দেশ-প্রীতিই হইল স্বাধীনতা বা স্বাধিকার রক্ষার মুখ্য শক্তি। ইহাই ঋষি বঙ্কিমের কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে রূপ লাভ করিয়াছে।

রামায়ণে আদি কবির কণ্ঠেই প্রথম শোনা যায়,—

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী,

—"জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ মানি।" জননীকে অবলম্বন করিয়া বাৎসল্যরস, জন্মভূমিকে অবলম্বন করিয়া ভৌম রস বা উদ্দীপ্তিরস।

যে যুগে দেশপ্রীতির প্রভাবে জন্মভূমি রক্ষার জন্য এবং জন্মভূমি দ্বারা সূচিত হয় যে ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতি, দেশের বহুমুখী ব্যাপক সংস্কৃতি, সেই সকল রক্ষার জন্য মহাযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ প্রাণ অনায়াসে বলি হইয়া গেল, সেই যুগেও কি প্রশ্ন উঠে, দেশপ্রীতি বা স্বাধীনতাবোধ মানবচিত্তের একটি স্থায়ী ভাব কি না?

বাস্তবিক পক্ষে ইহা মানবমাত্রেরই এক সহজ, সরল ও গভীর চিত্ত-ভাব; আলঙ্কারিকের ভাষায় বলিব,—দেশরতি বা দেশপ্রীতি আমাদের চিত্তের এক স্থায়ী ভাব।

বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত এই দেশপ্রীতি-ভাব অবলম্বনে রচিত প্রসিদ্ধ কবিতা; কবিতার রসসমুজ্জ্বল দীপ্তি এক সময়ে সমগ্র বাঙ্গালীজাতির

মনে আগুন ধরাইয়া দিয়া দেশাত্মবোধকে ভারতময় ব্যাপ্ত করিয়াছিল। তারপর ক্রমে "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী! অয়ি নির্মল সূর্যকরোজ্জল ধরণী, জনকজননী-জননী!" অথবা "বঙ্গ আমার জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ!" প্রভৃতি সঙ্গীত রচিত হয় এবং বাঙ্গালীর দেশপ্রীতিকে গাঢ় ও গভীর করিয়া তুলে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যান ও নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ কাব্য, ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতাপসিংহ নাটক, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাস এই মহৎ ভাব অবলম্বন করিয়াই রচিত।

দেশপ্রীতি দ্বারা আমাদের চিত্তের সমগ্র শক্তি সহসা উদ্দীপ্ত হয় বলিয়া ইহা হইতে উৎপন্ন রসকে উদ্দীপ্তিরস বলা হইল।

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

"স্নেহ, প্রণয়, দয়া, ইহাদের কোথাও স্থান নাই—না স্থায়ী, না ব্যভিচারী—…। স্নেহ, প্রণয়, দয়াদি—পরিবিজ্ঞাপক রস নাই।"

—বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম ভাগ, উত্তরচরিত

স্নেহ, প্রণয়ভাব পূর্বেই স্বীকৃত ছিল এবং তাহা হইতে জাত রসও প্রসিদ্ধ। কিন্তু আর্য অলঙ্কারশাস্ত্রে করুণা ভাব গণনা করা হয় নাই, এ বড় আশ্চর্য কথা। শোক দুঃখ যদি সংসারে স্বাভাবিক হয়, তবে শোক দুঃখ দূর করার প্রবৃত্তিও এক স্বাভাবিক ভাব হইবে। সমাজ-বন্ধনের মূল কথাই যে পরস্পরের সহায়তা সাধন বা পরস্পর প্রীতি। করুণা বা দয়া উহারই অন্তর্গত। করুণার অপর নাম সহানুভূতি বা সমবেদনা, এবং তাহারই অপর নাম বলা যায় প্রীতি,—দুঃখী জন, আর্ত, বা অসহায় জনের প্রতি প্রীতি। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে এই ভাবটির অজস্র প্রশংসা রহিয়াছে, যথা,—

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুনঃ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ —গীতা, ৬।৩২

—'হে অর্জুন! যিনি সর্বজীবে সুখ বা দুঃখ আপনার সুখ-দুঃখের সমান দেখেন, তিনি পরম যোগী,—ইহা আমার অভিমত।'

পরদুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া বোধ করাই সমবেদনা বা সহানুভূতি, ইহা হইতে জাগে দয়াপ্রবৃত্তি।

পাতঞ্জলদর্শনে চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য পরের দুঃখে দুঃখ বোধ করিয়া করুণা-ভাবনার কথা আছে[১]। বৈষ্ণব ধর্মে 'জীবে দয়া' এক উত্তম সাধনা।

কাজেই দয়া বা করুণা মানবচিত্তের এক বিশিষ্ট ভাব। ইহা হইতে জাত রসের নাম দেওয়া হইল কারুণ্য রস। ইহার উদাহরণ পূর্বেই ১৫৯-এর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্য-বিচারে মনে হয় ইহা কদাচিৎ আধিকারিক রস রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কাব্যে ইহা সাধারণতঃ কোন অঙ্গী রসের অঙ্গ-ভূত হইয়াই প্রকাশ পায়। এই জন্য করুণা-ভাবটির মহনীয়তা স্বীকার করিয়াও সাহিত্যে আমরা ইহাকে প্রাসঙ্গিক রস রূপেই গ্রহণ করিলাম। বাৎসল্যরস ও করুণরসের মধ্যেও ইহার অবস্থান সহজেই অনুভব করা যায়।

করুণরস, রৌদ্ররস, ভয়ানকরস, বীভৎসরস, অদ্ভুতরস, শান্তরস এবং হাস্যরস সম্বন্ধে এবং শৃঙ্গাররস সম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। কেবল বীররস-সম্পর্কে দুই একটি মন্তব্য করা প্রয়োজন মনে করি।

আমরা বীররসকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি, বীররস ও উদাত্তরস; ইহাদের স্থায়ী ভাব যথাক্রমে উৎসাহ ও সমুন্নতি। বস্তুতঃ ব্যাখ্যার প্রসার করিলে উভয় রস ও উভয় ভাবই এক বলিয়া প্রতীতি হইবে। পূর্বেই উল্লেখ করা উচিত, ভোজ-ব্যাখ্যাত উদাত্তরস ও আমাদের স্বীকৃত উদাত্তরস সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভোজের উদাত্তরসের স্থায়ী ভাব হইতেছে মতি—'তত্ত্বাভিনিবেশিনী মতিঃ'[২]। কিন্তু আলোচ্য উদাত্তরসের স্থায়ী ভাব সমুন্নতি। এই সমুন্নতি বলিতে একদিকে যেমন sublimity বা মহত্ত্ব বুঝায়, অপর দিকে তেমনি urge of life বা জীবনের উল্লাস বুঝায়। অনেকে বলিবেন sublimityই তো বিস্ময় বা অদ্ভুত রস; আবার নূতন করিয়া উহার অবতারণার আবশ্যকতা কি? অদ্ভুতরস কিন্তু সর্বত্রই পুরাপুরি sublimity নয়; sublimity-এর অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ যে বৃহত্তা বা বিশালতা আছে, অদ্ভুতরসে তা না থাকিলেও ক্ষতি নাই, বিস্ময় জন্মাইলেই তাহা সার্থক। একটি পুষ্পকলি বা মণিখণ্ড অদ্ভুত হইতে পারে, কিন্তু তাহা sublime নয়। আমরা উদাত্তরসে যে সমুন্নতি বুঝাইতে চাই, তাহা কিন্তু প্রায়শঃ গভীর, মহান্ ও বিশাল। জীবনের যে উল্লাসে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়, সে গুহাশ্রয় ত্যাগ করিয়া নদীপ্রবাহে নিঃসীম সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়, শিশু সে বাড়িতে বাড়িতে যৌবন-মহিমা লাভ

---

(১) পাতঞ্জল দর্শন, ১।৩৩

(২) সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, পৃঃ ৫৯৯

করিয়া প্রৌঢ়ত্বে পূর্ণত্ব বরণ করে, মূক সে বাগ্মী হইয়া যায় এবং পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে, তাহার নাম উৎসাহ, স্থিরতর সংরম্ভ, বা সমুন্নতি। ভরত বলিয়াছেন,—

বীরাচ্চৈবাদ্ভুতোৎপত্তিঃ। —নাট্যশাস্ত্র, ৬।৪৪

—'বীররস হইতে অদ্ভুতরসের উৎপত্তি।

বীরস্যাপি চ যৎকর্ম সোঽদ্ভুতঃ পরিকীর্তিতঃ। —নাট্যশাস্ত্র, ৬।৪৬

—'বীরের যে কর্ম, তাহাই অদ্ভুত বলিয়া পরিকীর্তিত হয়।

যে বীররস হইতে অদ্ভুতরসের উৎপত্তি, তাহাই স্বরূপতঃ উদাত্তরস। অন্যকারণেও এই নামকরণের সার্থকতা আছে।

পূর্ববর্তিগণ বীররসে তিন বা চারি প্রকার বীর গণনা করিয়াছেন, যথা—দানবীর, দয়াবীর, যুদ্ধবীর ও ধর্মবীর। জগন্নাথ অনেক প্রকার বীর হইতে পারে এইরূপ মন্তব্য করিয়া উক্ত চারিপ্রকার বীরের সহিত সত্যবীর, পাণ্ডিত্যবীর, ক্ষমাবীর ও বলবীরের উদাহরণ উপস্থিত করিয়াছেন।[১]

বস্তুতঃ এখানে মনে হয় মহাভারতীয় উক্তির অনুকরণে বীর গণনা করা হইতেছে। মহাভারতে অনুশাসনপর্বে পিতামহ ভীষ্ম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে শূরগণের বিষয়ে বলিতেছেন,—

শূরাঃ বহুবিধাঃ প্রোক্তা স্তেষাম্ অর্থাংস্তু মে শৃণু।

* * * *

যজ্ঞশূরা দমে শূরাঃ সত্যশূরা স্তথাপরে।
যুদ্ধশূরা স্তথৈবোক্তা দানশূরাশ্চ মানবাঃ॥
বুদ্ধিশূরা স্তথৈবান্যে ক্ষমাশূরা স্তথাপরে।
আর্জবে চ তথা শূরাঃ শমে বর্তন্তি মানবাঃ। —ইত্যাদি

—মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ৭৫।২২, ২৩, ২৫

—'ঋষিগণ অনেক প্রকার শূরের কথা বলিয়াছেন, তাহাদের বিষয় আমার কাছে শোন। যজ্ঞশূর, দম-শূর, একদল আছেন সত্যশূর। এই প্রকারে মানবগণ যুদ্ধশূর, কেহ কেহ বা দানশূর। অন্যদল বুদ্ধিশূর, অপরেরা ক্ষমাশূর, কেহ কেহ আর্জব বা সরলতায় শূর ; মানবেরা শমবিষয়েও শূর হইয়া থাকেন।'—ইত্যাদি

আমাদের প্রস্তাব এই,—বীররসকে প্রচলিত অর্থে রাখিয়া ত্যাগ, ধর্ম, সত্য

(১) রসগঙ্গাধর, ১ম আনন, পৃঃ ৪১

প্রভৃতি সমুন্নতিভাব-মূলক রস উদাত্তরসের অন্তর্গত করিলে প্রয়োগের সার্থকতা এবং বুঝিবার সুবিধা হয় অনেক বেশি।

সমগ্র প্রবন্ধের সারকথা এই :—রস মুখ্যতঃ নয় প্রকারই রহিল, যথা,—প্রেয়োরস, করুণরস, রৌদ্ররস, ভয়ানকরস, বীভৎসরস, হাস্যরস, বীররস, অদ্ভুতরস এবং শান্তরস।

ইহাদের মধ্যে প্রেয়োরস ছয় প্রকার, যথা,—সাধারণ প্রেয়োরস, শৃঙ্গাররস, বাৎসল্যরস, ভক্তিরস বা দিব্যরস, সখ্যরস, এবং উদ্দীপ্তিরস বা ভৌমরস বা দেশপ্রীতি রস।

বীররসও দুই প্রকার, যথা,—বীররস ও উদাত্তরস।

কারুণ্যরস একটি প্রাসঙ্গিক রস। মোট গণনায় আধিকারিক রস পঞ্চদশ প্রকার দেখা যাইতেছে।

(৫)

গীতিকাব্যের রস ও কবিগত রস

গীতিকাব্যের রস-বিষয়ে মুখ্য আলোচনা পূর্বেই সমাপ্ত হইয়াছে। আধিকারিক রসের সহিত প্রাসঙ্গিক রস স্বীকার করিয়া এবং নাট্যরস-ব্যতিরিক্ত কাব্যরস বা অভিজ্ঞেয় রস স্বীকার করিয়া আমরা গীতিকাব্যের রসের বিশিষ্টতা পূর্বেই দেখাইয়াছি। যে কোন ভাব যদি অতিসম্পন্ন হইয়া রস হইতে পারে, এবং উদ্দীপন বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব একসঙ্গে না থাকিলেও যদি উহাদের কোন একটির অতিপুষ্টি ও প্রাচুর্য-হেতু ভাবের রসতা-প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়, তবে আর গীতিকাব্যের রস-বিষয়ে আলোচনার কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

এতৎসত্ত্বেও আলম্বন-বিভাব বিষয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত এবং পর্যালোচিত হইতে পারে। গীতিকাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণের স্থান এই নয়। তথাপি বলা যায়, গীতি-কাব্যের আলম্বন-বিভাব দুই প্রকারের হইতে পারে। কোথাও বা বহির্বস্তু বা বহির্বিষয় আলম্বন এবং কোথায়ও বা কবিচিত্তই মুখ্য আলম্বন। যেখানে বাহিরের বিষয় আলম্বন সেখানে রসের অভ্যুদয়-ক্রম অতি স্পষ্ট। সামাজিক বা পাঠকের নিকটে বহির্বস্তুর ন্যায় কবি-চিত্তও আলম্বন-ভূত হইলে একই ক্রমে রসোদয় হইবে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ প্রশ্নটি গীতিকাব্যের রস লইয়া নহে, প্রশ্নটি গীতিকাব্যের কবিকে লইয়া। যে কবি-চিত্তই ভাবালম্বন, সেই কবিচিত্তই কি একই সময়ে ঐ ভাব-সমুখ

রসের স্রষ্টা হইতে পারে? আমাদের আলঙ্কারিকগণ বলেন, রসের স্রষ্টা হইতে হইলে আগে বিষয়ের দ্রষ্টা এবং ভোক্তা হওয়া চাই। তাহা হইলে বলিতে হয় গীতিকাব্যে কবিচিত্ত মুখ্য আলম্বন হইলেও উহা ভাবকে অতিক্রম করিয়া রসকে আস্বাদন করিতে পারে, এবং বিশিষ্ট প্রতিভাবলে নিজ চিত্তকেই শব্দে সমর্পিত করিয়া ভাব ও রস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়।

তাহা হইলে প্রথম বিচার্য,—সামাজিক-গত রসের ন্যায় কবি-গত রসও আছে কি না। ভরতমুনির একটি বাক্য অবলম্বন করিয়া রসবাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেন,—আছে। তৎপূর্বে ধ্বনিকার ও আনন্দবর্ধনও বলিয়াছেন,—আছে; এবং সেই স্থলে লোচন-টীকায় অভিনবগুপ্ত বিশদভাবেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভরতমুনির বাক্য আগে পরীক্ষা করা যাক্। ভরত বলেন,—

যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং যথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ॥ —নাট্যশাস্ত্র, ৬।৪২

—'যে প্রকার বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষ হইতে পুষ্প এবং ক্রমে ফল হয়, সেই প্রকার কাব্যবিষয়েও রস-সমূহই মূল, তাহাদের হইতে ভাব-সমূহ ব্যবস্থিত হইয়া থাকে।'

অভিনবগুপ্তের মতে এখানে ভরত রস শব্দ দ্বারা কবি-গত রস বুঝিয়াছেন।

ভাষ্যে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন,—

এবং মূলবীজস্থানীয়াৎ কবিগতো রসঃ। কবি র্হি সামাজিক-তুল্য এব। তত এবোক্তং 'শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ' ইত্যাদি আনন্দবর্ধনাচার্যেণ। ততো বৃক্ষ-স্থানীয়ং কাব্যম্। তত্র পুষ্পাদিস্থানীয়ঃ অভিনয়াদি-নটব্যাপারঃ। তত্র ফলস্থানীয়ঃ সামাজিক-রসাস্বাদঃ। তেন রসময়মেব বিশ্বম্। —ঐ ভাষ্য, পৃঃ ২৯৫

—'এই প্রকারে মূলবীজ-স্থানীয় হইতেছে কবিগত রস। কবিই এখানে সামাজিকের তুল্য। এই জন্যই আনন্দবর্ধনাচার্য কর্তৃক উক্ত হইয়াছে 'কবি যদি শৃঙ্গারী হ'ন'—ইত্যাদি। কবি হইতে উৎপন্ন হয় বৃক্ষস্থানীয় কাব্য। সেখানে পুষ্পাদি-স্থানীয় হইতেছে অভিনয় প্রভৃতি নটব্যাপার, এবং ফলস্থানীয় হইতেছে সামাজিকের রসাস্বাদ। অতএব এই বিশ্বই রসময়।'

আচার্য বোধ হয় বলিতে চান,—আমরা যেমন কাব্যপাঠে বা অভিনয়দর্শনে রস আস্বাদ করি, কবিগণ তাঁহাদের বিশেষ শক্তিবলে অলৌকিক বিভাবাদিরূপে

উপস্থিত না হইলেও এই জগৎ-কাব্য অর্থাৎ বাহ্যবস্তুরাশি হইতে প্রত্যক্ষরূপে কেবল ভাব নয়, রসও উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উপলব্ধিভূত এই রস বীজ হইয়া কাব্য-বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সহজ ভাষায় বলা চলে,— কবির চিত্তে রসোপলব্ধি হইলে কবি তাঁহার অপূর্ব-বস্তু-নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞাবলে বাহিরের কারণাদিকে অলৌকিক বিভাবরূপে গ্রহণ ও বর্ণন করিয়া রসাত্মক কাব্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই কাব্য আবার পাঠ বা অভিনয় প্রভৃতি নট-ব্যাপারের মধ্য দিয়া সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে রসের প্রকাশ ঘটায়। এইভাবে কবি এবং পাঠক বা সামাজিক লইয়া যে জগৎ, তাহা রসময় হইয়া যায়।

এই ব্যাখ্যা হইতে কবির দুইটি শক্তি উপলব্ধি হইতেছে,—প্রথম, সাক্ষাৎভাবে দৃশ্যমান জগৎ হইতে ভাব, এবং কবি-গত সাধারণীকরণের ফলে তাহার পরিমিত ব্যক্তিত্ববোধ বিগলিত হইলে রস লাভ করিয়া থাকেন। যে প্রণালীতে সামাজিকের চিত্তে রসোদ্ভব হয়, সেই প্রণালীতেই কবিচিত্তেও রসোদ্ভব হইয়া থাকে। এই জন্যই অভিনবগুপ্ত মন্তব্য করিয়াছেন,—"কবি সামাজিকেরই তুল্য।" কবির এখানে বিশেষ শক্তি হইতেছে এই যে, যেখানে সাধারণ সামাজিক ভাব আস্বাদন করিয়া সুখদুঃখাদির বশ হয়, কবি সেখানে নির্লিপ্তচিত্তে দৃষ্টিপাত করিয়া রস আস্বাদন করিতে পারেন। কবির রসাস্বাদনের জন্য শব্দে সমর্পিত অলৌকিক বিভাবাদির আবশ্যকতা হয় না। অবশ্য যে কবি ভাবলোকেই বিহার করেন, রসলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারেন না, তাঁহার রচিত কাব্য ভাবকাব্যই থাকিয়া যায়, রসকাব্যে পরিণত হয় না।

কবির দ্বিতীয় শক্তির কথা সকলেই জানেন, তাহা হইতেছে স্বীয় অনুভূত রসকে প্রতিভার শক্তিদ্বারা শব্দে সমর্পিত করিয়া কাব্য নির্মাণ করা। এই কবি-রচিত কাব্য হইতেই সামাজিকগণ রসাস্বাদ করিয়া থাকেন, জগৎকাব্য হইতে রস উপলব্ধি করা তাঁহাদের পক্ষে সাধারণতঃ সম্ভবপর হয় না।

অভিনবগুপ্ত নিজ ভাষ্যে আনন্দবর্ধনাচার্যের যে বাক্য[১] উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেছে অগ্নিপুরাণের। বাক্যটি এই,—

শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।
স এব বীতরাগশ্চেন্ নীরসং সর্বমেব তৎ॥ —অগ্নিপুরাণ, ৩৪৫।১১

—'কবি যদি কাব্যরচনাকালে শৃঙ্গার রসময় হ'ন, কাব্য-জগৎ রসময় হইয়া যাইবে। তিনিই যদি তখন বীতরাগ হ'ন, সেই সকলই নীরস বলিয়া মনে হইবে।'

(১) ধ্বন্যালোক, ৩।৪৩ বৃত্তি, পৃঃ ২২২।

কবি-গত রস দ্বারাই কাব্যের রসবত্তা হয়,—ইহাই বাক্যটির তাৎপর্য।

এই বিষয়ে ধ্বনিকার ও আনন্দবর্ধন প্রথম উদ্দ্যোতের পঞ্চম ও ষষ্ঠ কারিকা ও তাহার বৃত্তিতে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাও আলোচনার যোগ্য। ভারতীয় ঐতিহ্য-অনুযায়ী বাল্মীকির কবিত্ব-লাভের ঘটনাটি পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে কবির ভাবোদয় ও রসোদয় কি প্রকারে হয়। ব্যাধ, ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চবধূর ব্যাপার দেখিয়া কবি বাল্মীকি প্রথমে যেন শোকাভিভূত হইলেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোকাশ্রয়ে করুণরসের আবির্ভাব হইল, তাঁহার চিত্ত রসে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহার রসনা হইতে স্বতঃস্ফূর্ত হইল আদি-কাব্যাত্মক শ্লোকটি,—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদ্ একম্ অবধীঃ কামমোহিতম্ ॥—রামায়ণ, বালকাণ্ড, ২।১৫

এই অংশের ব্যাখ্যানে চমৎকার বিশ্লেষণ-শক্তি দেখাইয়াছেন অভিনবগুপ্ত। তিনি লিখিতেছেন,—

স (শোকঃ স্থায়িভাবঃ) এব তথাভূত-বিভাব-তদুত্থাক্রন্দাদ্যনুভাবচর্বণয়া হৃদয়সংবাদ-তন্ময়ীভবনক্রমাদ্ আস্বাদ্যমানতাং প্রতিপন্নঃ করুণরসরূপতাং লৌকিকশোক-ব্যতিরিক্তাং স্বচিত্তবৃত্তি-সমাস্বাদ্য-সারাং প্রতিপন্নো রসঃ পরিপূর্ণকুম্ভোচ্ছলনবৎ…………সমুচিতচ্ছন্দোবৃত্তাদিনিয়ন্ত্রিত-শ্লোকরূপতাং প্রাপ্তঃ মা নিষাদ ইত্যাদি। ন তু মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম্। এবং হি সতি তদ্দুঃখেন সোঽপি দুঃখিত ইতি কৃত্বা রসস্য আত্মতা ইতি নিরবকাশং ভবেৎ। ন তু দুঃখসন্তপ্তস্য এষা দশা ইতি।

—ধ্বন্যালোক, ১।৫, টীকা, পৃঃ ২৭

—'ক্রৌঞ্চহননের ফলে উদ্ভূত সেই শোক-নামক স্থায়ী ভাব, তাদৃশ বিভাব এবং তাহা হইতে জাত ক্রন্দন প্রভৃতি অনুভাব-হেতু উভয় হৃদয়ের একরূপতা এবং তন্ময়ীভাবের ক্রমানুযায়ী আস্বাদ্যমান হইয়া করুণরসে পরিণত হইল। এই করুণরস লৌকিক শোক হইতে ভিন্ন এবং নিজ চিত্তবৃত্তির আস্বাদনস্বরূপ। পরিপূর্ণ কুম্ভ হইতে জল যেমন উচ্ছলিত হইয়া পড়ে, তেমনই ঐ রস সমুচিত ছন্দ ও বৃত্ত প্রভৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া 'মা নিষাদ' ইত্যাদি শ্লোকরূপে নির্গত হইয়াছে। এই শোক মুনির নিজের শোক নয়—ইহা অবশ্যই বুঝিতে হইবে। এইরূপ হইলে সেই দুঃখে তিনিও দুঃখিত থাকিতেন এবং কাব্যের রসরূপ আত্মা প্রকাশিত হইবার অবকাশ পাইত না। দুঃখসন্তপ্তের এইরূপ দশা অর্থাৎ কাব্য-রচনা দেখা যায় না।'

এই ব্যাখ্যানের শেষভাগে দেখা যাইতেছে অভিনবগুপ্তের মতানুযায়ী ক্রৌঞ্চীর প্রতি সমবেদনাবশে বাল্মীকির যে শোক সঞ্জাত হইয়াছে, তাহা লৌকিক শোকভাব নয়, ইহা এক হিসাবে অলৌকিক শোকভাব, এবং সেই জন্যই তাহা হইতে অলৌকিক করুণরসের উৎপত্তি সম্ভবপর হইয়াছে। লৌকিক বিষয়-জাত ভাবই লৌকিক ভাব, তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে বিষয়ের সম্বন্ধ হইতে জন্মিয়া থাকে, এবং ভোক্তাকে সুখ বা দুঃখ দ্বারা অভিভূত করে। এখানে ক্রৌঞ্চীর নিকটে শোকভাবটি একান্ত লৌকিক, শোকের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ তাহার। এইরূপে যাহারা ব্যক্তি-গত সুখ বা দুঃখে অবশ হয়, তাহাদের পক্ষে ঐ সুখ বা দুঃখভাব দ্বারা কাব্যরচনা সম্ভবপর হয় না। বাল্মীকি শোকের বশ হ'ন নাই, তাঁহার শোকভাব লৌকিক বিষয়জ নহে বলিয়া নিজ অনাদি প্রাক্তন সংস্কার বা বাসনা হইতেই উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, এবং সেই জন্যই তাঁহার রসনায় শ্লোক আবির্ভূত হইতে পারিয়াছে। কবিদের দর্শনের ইংরেজী নাম vision ; ইহা ব্যক্তি-বোধ-বিরহিত নির্লিপ্ত অবস্থায়ই সম্ভবপর হয় ; অবশ্য এই অবস্থায় আসিবার পূর্বকালে সাধারণীকরণ ঘটিয়া থাকে। সহজ ভাষায় বলা চলে, ক্রৌঞ্চী-গত শোকভাব বাল্মীকির চিত্তে সূক্ষ্ম বাসনারূপে স্থিত শোকভাবের উদ্রেক করিয়াছে, অতএব তাহা অলৌকিক।

এই শক্তিই কবির বিশেষ শক্তি, ইহাই তাঁহার vision ; শব্দে সমর্পিত বিভাবাদি না হইলেও বাহ্জগতের বস্তু হইতেই অলৌকিক স্থায়ী ভাবের উদ্বোধ হইয়া থাকে।

কবিগণের দ্বিতীয় শক্তি এবং প্রধান শক্তি হইতেছে কবিকর্ম বা সৃষ্টিপ্রতিভা। এই উভয়বিধ শক্তি লক্ষ্য করিয়া ধ্বনিকার বলিতেছেন,—

সরস্বতী স্বাদু তদর্থবস্তু
নিঃস্যন্দমানা মহতাং কবীনাম্।
অলোক-সামান্যম্ অভিব্যনক্তি
প্রতিস্ফুরন্তং প্রতিভা-বিশেষম্ ॥ —ধ্বন্যালোক, ১।৬

—'মহাকবিগণের বাণী হইতে স্বতঃই যেন সেই স্বাদু বস্তু ও রস নিঃস্যন্দমান হয় ; উহা তাহাদের অলোকসামান্য পরিস্ফুরণশীল প্রতিভা-বিশেষকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে।'

এইখানে প্রতিভার ব্যাখ্যা করিয়াছেন অভিনবগুপ্ত,—

অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা।

কেহ কেহ বলেন,—

প্রজ্ঞাং নবনবোন্মেষশালিনীং প্রতিভাং বিদুঃ

—'নব নব উন্মেষশালিনী প্রজ্ঞাকেই প্রতিভা বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন।'

আমরা এখানে সারদামঙ্গলের কবি বিহারীলালের বর্ণিত বাল্মীকির কবিত্ব-লাভের দৃশ্যটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারি। ক্রৌঞ্চ ব্যাধশরে নিহত হইয়াছে; তখন,—

ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে!
চক্ষে করি দরশন
জড়িমা জড়িত মন,
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায়;
সহসা ললাট ভাগে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নব ঘনে। —সারদামঙ্গল, ১।১০

তারপর সেই জ্যোতির্ময়ী কন্যা—

একবার সে ক্রৌঞ্চীরে
আর বার বাল্মীকিরে
নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী!
কাতরা করুণা ভরে,
গান সকরুণ স্বরে,
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী! —সারদামঙ্গল, ১।১৬

বিহারীলালের বর্ণনায়—ক্রৌঞ্চীর আর্ত চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া প্রথমে কবির চক্ষু দ্বারা দর্শন, কবি-মনে শোক-ভাবের প্রবেশ, সঙ্গে সঙ্গে কবি-ললাট অর্থাৎ কবির চিত্তশক্তি হইতে জ্যোতির্ময়ী কন্যা অথবা প্রজ্ঞাময়ী প্রতিভার স্ফূর্তি। কবি অবাক্ হইয়া গেলেন, কবি-প্রতিভা যেন উন্মাদিনী হইয়া একবার ক্রৌঞ্চীকে আরবার কবিকে অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ীকে নিরীক্ষণ করিল। ইহার ফলে ক্রৌঞ্চীর সহিত কবি-হৃদয়ের তন্ময়ীভবন বা একরূপতা হইয়া গেল। ইহাই এক প্রকার সাধারণীকরণ; উহা পূর্ণ হইতেই প্রতিভার অপূর্ব বস্তুর নির্মাণকার্য আরম্ভ হইল, কন্যার

করে বীণা-গুঞ্জনের সহিত কবির কণ্ঠে করুণরসের গান উঠিল, অর্থাৎ করুণরসাত্মক কাব্যের সৃষ্টি বা প্রকাশ আরম্ভ হইল। উহাই বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ।

এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য কবি ও সুধী সমালোচকদের মত অতি স্পষ্ট। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ পাঠক, এমন কি কবিকৃতি কাব্য অপেক্ষাও সাক্ষাৎ কবির বিশ্লেষণ করেন অনেক বেশি। কবির সূক্ষ্ম পর্যালোচনা ব্যতীত তাঁহাদের কাব্যের সম্যক্ আস্বাদন ও উপলব্ধি হয় না। তাই কবি-গত রস বা সৌন্দর্যোপলব্ধি পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। পূর্বে রসের প্রকাশ-প্রক্রিয়া বুঝাইবার জন্য ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌, শেলি বা ক্রোচের যে উক্তি-সমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইগুলি পর্যালোচনা করিলেও কবি-গত মূল আনন্দ ও রসের স্বীকৃতি পাওয়া যাইবে। ক্রোচে যখন বলিলেন,—"bestowing pure poetic joy either upon others or upon himself"—অন্য সকলকে অথবা নিজকে বিশুদ্ধ কাব্যানন্দ দান, তখনই একসঙ্গে সামাজিক-গত অথবা কবি-গত রসের কথা বলা হইল।

কিন্তু কবি-গত রসের সত্তা-সম্পর্কে আরিস্টটলের বা বুচারের একটি মন্তব্য আপাত-দৃষ্টিতে বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে। তাঁহারা যে বলিয়াছেন, কবি কাব্যানন্দ বা কলাস্বাদ পাইতে পারেন, কিন্তু তাহা কবি বা শিল্পি-স্বরূপে নয়, সাধারণ একজন সামাজিক-স্বরূপে মাত্র,[১] এ কথার অর্থ কি? সঙ্গতি করিলে এই স্থলে বলিতে হয়, সৃষ্টিকালে কবির কাব্যাস্বাদ বা কলাস্বাদ থাকে না; কিন্তু তৎপূর্বে যখন রসোপলব্ধি হয়, তখন কবি একজন সামাজিক মাত্র, "কবি র্হি সামাজিক-তুল্য এব"। আর সৃষ্ট কাব্য ও কলার আস্বাদনে কবি যে ভিন্নভূমিতে অবতরণ করিয়া সামাজিকের সদৃশ আচরণ করিয়া থাকেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

(৬)

রস-সম্বন্ধে নিসর্গ কবিতা

প্রথমেই বলা উচিত নিসর্গ-রস বলিয়া কোন রস স্বীকার করা যাইতে পারে না। রসের পরিচয় ভাব হইতে; আলম্বন বা উদ্দীপন বিভাব, অথবা বিষয়বস্তু হইতে কদাচ রসের সাক্ষাৎ পরিচয় হইতে পারে না। একই বিভাব বা বস্তু হইতে স্থল-

(১) দ্রষ্টব্য—কাব্যালোক, ১০২-এর পৃষ্ঠা

বিশেষে বিভিন্ন ভাব ও রসের উদ্ভব হইতে পারে। একই নারী বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্গাররস, সখ্যরস, করুণরস, অদ্ভুত রস, অথবা ভক্তি বা শান্ত রসের আলম্বন-বিভাব হইতে পারে। সেইরূপ একই নিসর্গ কবি-চিত্তের বিচিত্র অধিবাসনের ফলে উল্লিখিত সমুদয় রসেরই প্রকাশ ঘটাইতে পারে। সেই জন্য নিসর্গ-কবিতা বা নিসর্গ-মূলক স্বভাবোক্তি কবিতা হইতে স্বতন্ত্র কোন রস সৃষ্ট হয় বলিয়া আমরা মনে করি না।

বাস্তবিক পক্ষে এখানে প্রশ্নটি এই,—মনন-শীল ও অনুভূতিশীল মানুষ হইতেই ভাব ও রসের উদ্ভব হয়; পশুজগৎ বা অন্য প্রাণীর জগতে চিত্তশক্তি অনেক অস্ফুট থাকিলেও আমরা তাহাদের মধ্যেও কয়েকটি ভাব ও রসের উদ্ভব উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু Nature বা নিসর্গ-বিষয়ে আমরা সাক্ষাৎভাবে চিত্তশক্তির মনন বা অনুভব—কোন ক্রিয়াই লক্ষ্য করি না; সেখানেও তাই ভাবের সত্তা ও রসোদয়ের প্রশ্ন উঠিবে কেন? প্রশ্নটি নূতন নহে। প্রাচীনেরাও ইহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, ইংরেজী সাহিত্যের Pathetic Fallacy, Personification প্রভৃতি অলঙ্কার-গত সৌন্দর্যের বিশ্লেষণেও প্রশ্নটির আংশিক উত্তর পাওয়া যায়। অবশ্য আলঙ্কারিকগণ সাক্ষাৎভাবেও প্রশ্নটির আলোচনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে আচার্য আনন্দবর্ধনের সুস্পষ্ট অভিমত এই গ্রন্থের ৬৮-এর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার মতানুসারে বলা যায় যে, নদী বা বৃক্ষ প্রভৃতি অচেতন বস্তুও কবির রচনাকৌশলে চেতন-বৃত্তান্ত যোজনাদ্বারা, অথবা কবির চিত্তগত ভাবের আরোপ দ্বারা রস-নিষ্পাদনে সমর্থ হয়। উক্ত অংশেরই কেবল পরে আনন্দবর্ধন নিজ পক্ষ সমর্থনে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট; শ্লোকটি এই—

ভাবান্ অচেতনান্ অপি চেতনবৎ চেতনান্ অচেতনবৎ।

ব্যবহারয়তি যথেষ্টং সুকবিঃ কাব্যে স্বতন্ত্রতয়া॥—ধ্বন্যালোক, ৩।৪৩, বৃত্তি, পৃঃ ২২২

—'সুকবি কাব্যে স্বতন্ত্র হইয়া নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী অচেতন বিষয়সমূহকে চেতনের ন্যায় এবং চেতন বিষয়সমূহকে অচেতনের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।'

এই সমুদয় স্থলে কবি-গত ভাবই মুখ্য কথা; তাহারই যোজনা বা আরোপ করিয়া কবি অচেতনকেও চেতনের ন্যায় বর্ণনা করিয়া থাকেন। ঐ বৃত্তিরই প্রথম ভাগে আরও স্পষ্ট করিয়া আনন্দবর্ধন মন্তব্য করিয়াছেন,—

ন চ তদস্তি বস্তু কিঞ্চিৎ যৎ ন চিত্তবৃত্তিবিশেষম্ উপজনয়তি তদুপাদানে চ কবিবিষয়তা এব তস্য ন স্যাৎ। —ধ্বন্যালোক, ৩।৪৩, বৃত্তি, পৃ ২২০

—'এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা কবির চিত্তবৃত্তিবিশেষ না জন্মায়, এবং তাহার উপাদান সম্বন্ধে কবি-বিষয়তা প্রাপ্ত না হয়।'

নিসর্গের প্রতিটি বস্তুই তাই কবির চিত্তবৃত্তি বা ভাব-বিশেষ জন্মাইয়া থাকে, এবং এই ভাব জন্মাইয়াই তাহা কবি-চিত্তের সহিত তন্ময়ীভূত হইয়া যায়। তন্ময়ীভবনের ফলে কবিচিত্তে হয় রসের আবির্ভাব; কবি-গত রসই পরে কাব্যে পরিণত হইয়া সামাজিক-গত রসের প্রকাশ ঘটায়। তাই নিসর্গ-কবিতার আলোচনায় কবির চিত্তবৃত্তি বা ভাব-অনুযায়ী তাহার ভাব নির্ণয় করিতে হইবে এবং সেই সেই ভাবের সমুচিত রসের গণনা করিতে হইবে। এই জন্য নিসর্গরস বলিয়া পৃথক্ কোনও রস স্বীকারের প্রশ্ন উঠে না। যেখানে নিসর্গের উপলব্ধিতে কবি-মনে বিশেষ কোনও ভাব না উঠিয়া অ-বিশেষ একটি প্রীতি-প্রসন্ন ভাবের সঞ্চার হইবে, সেখানে আমরা নিসর্গের আলম্বনে প্রেয়োরসের সঞ্চার হইয়াছে বলিব। অন্য ক্ষেত্রেও অবশ্য নিসর্গের আলম্বনে শৃঙ্গাররস বা করুণরস—এইরূপ মন্তব্য করা উচিত হইবে।

নিসর্গের স্পর্শে কবিচিত্তে কি ভাব উঠিবে, তাহা মুখ্যতঃ কবির তৎকালীন চিত্তাবস্থা বা mood-এর উপর নির্ভর করে। মনস্তত্ত্ববিৎ মিচেল বলেন,—

"Whether we see the same sunlit sea to be smiling frankly or in treachery is a matter of our mood."

—*Mitchell's Structure and Growth of the Mind*, p. 173.

—আমরা যে সেই একই সূর্যালোকিত সমুদ্রকে সরলভাবে বা কপটভাবে হাসিতে দেখি, তাহা আমাদের মানসিক অবস্থার ব্যাপারবিশেষ মাত্র।

বাস্তবিকও বাতাসের শন্ শন্ শব্দ আমাদের চিত্তে সান্ত্বনা আনে, না ভয়ের সঙ্কেত জানায়, না আনন্দের স্পর্শ সঞ্চার করে; অথবা কুসুমিত বৃক্ষ আনন্দের আতিশয্যে ফুল ঝরাইয়া দেয়, না মনোদুঃখে আভরণ খুলিয়া ফেলে,—ইহা নির্ভর করে কবি বা দ্রষ্টার তৎকালীন ভাব বা mood বা বিশিষ্ট চিত্তাবস্থার উপর।

হেগেল বলেন, মানুষই কাব্য-কলার শ্রেষ্ঠ আলম্বন, কেন না তাহার অন্তরে প্রকৃতই চিত্ত বা মনের অবস্থান।[১] তাহার পর স্থান অন্য প্রাণীদের; তাহাদের চিত্তভাব অপুষ্ট বা অপরিণত হইলেও তাহারা নিসর্গ অপেক্ষা মানুষের নিকটতর এবং তাই নিসর্গ অপেক্ষা সুন্দরতর।[২] নিসর্গের হইতেছে আরোপিত সৌন্দর্য,

(১) Æsthetik, ii, pp. 12, 13.

(২) Ibid, i, p. 167.

তাহা আমাদের ভাবের উদ্বোধ হইতে আসে ; কেবলমাত্র আর্ট বা কাব্যকলার দান স্বরূপেই নিসর্গের একটি চিত্তাভাস পরিলক্ষিত হয়।[১]

ক্রোচে বলেন, নিসর্গ আমাদের একটি চিত্তাবস্থা মাত্র।[২]

এই বিষয়ে কাণ্টের অভিমত খানিকটা স্ববিরোধী হইলেও উল্লেখযোগ্য। নিসর্গ-জাত বর্ণ ও ধ্বনি সম্বন্ধে তিনি বলেন,—উহারা "একপ্রকার ভাষা, নিসর্গ উহাদ্বারা আমাদের সম্বোধন করে,...আমরা বিহঙ্গের গান সুখ ও সন্তোষ প্রকাশ করে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি"।[৩]

এক শ্রেণীর দার্শনিকগণের অভিমত উদ্ধৃত হইল। অপর দিকে কবি ওয়ার্ড্‌স্‌-ওয়ার্থ্‌ বা রাস্‌কিন্‌ প্রভৃতির অভিমত অনেকেরই পরিচিত, বাহুল্য-ভয়ে এই প্রবন্ধে আর বিশেষভাবে আলোচিত হইল না। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ মনে করিতেন এবং অনুভব করিতেন,—নদী-গিরি-বনময় এই বিপুল জগতে এক অখণ্ড আত্মার অধিষ্ঠান, নিসর্গের প্রতিটি স্পন্দন তাহার হৃৎস্পন্দনই যেন সূচিত করে, কবির চিত্ত-ভাব নিসর্গে আরোপিত হয় না, নিসর্গের বিশিষ্ট ভাবই কবি-চিত্তকে স্পন্দিত ও ভাবাপ্লুত করে। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কাব্য হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত হইতেছে,—

> "From Nature and her overflowing soul
> I had received so much, that all my thoughts
> Were steeped in feeling ; I was only then
> Contented, when with bliss ineffable
> I felt the sentiment of Being spread
> O'er all that moves and all that seemeth still ;"
>
> —*The Prelude*, ii, 397-402

> —'প্রকৃতির এবং তাহার উচ্ছ্বসিত আত্মা হ'তে
> আমি এত লাভ পেয়েছি যে,
> আমার সকল চিন্তা অনুভূতি-সিক্ত হয়েছিল ;

(১) Ibid, i, p. 167, p. 194 ; ii, p. 256

(২) "A landscape is a state of mind."
Paraphrased by E. F. Caritt from *Problemi*, p. 24.

(৩) কেরিটের অনুবাদ হইতে গৃহীত।
The Theory of Beauty, p. 294.

আমি কেবল তখনই তুষ্ট হলাম, যখন অবর্ণনীয় দিব্য আনন্দের সহিত
আমি অনুভব করলাম,—এক ভাবময় মহাসত্তা,
তাহা পরিব্যাপ্ত করেছিল যাহা কিছু চলমান এবং যাহা কিছু স্তব্ধকল্প।"

পুনরায়,—

"Where living things, and things inanimate,
Do speak at Heaven's command to eye and ear,
And speak to social reason's inner sense,
With inarticulate languages."

—'যেখানে জীবন্ত বস্তুগুলি, এবং অচেতন বস্তুগুলি
ঈশ্বরের আদেশে কথা বলে নয়ন ও শ্রবণের নিকট,
এবং বলে সামাজিক যুক্তির অন্তর-স্থিত অর্থের নিকট
অস্পষ্টোচ্চারিত ভাষায়।'

প্রাচ্য দেশেও বাল্মীকি-কালিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নিসর্গ-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গী বা সৃষ্টি-ক্রমের কত বৈচিত্র্য রহিয়াছে! কিন্তু আমাদের পক্ষে বর্তমান প্রসঙ্গে এই আলোচনা নিরর্থক; কারণ, মূক প্রকৃতি যে প্রকারেই কবিচিত্তে ভাবপ্লাবন আনুক এবং সামাজিক-চিত্তে যে ভাবই উদ্বুদ্ধ করুক, তাহা হইতে রসের প্রকাশ একই প্রক্রিয়া ও প্রণালীবশে ঘটিয়া থাকে। এই নিমিত্ত নিসর্গ-কবিতা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিবার থাকিলেও নিসর্গ-কবিতা হইতে জাত রস-সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু আলোচ্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

(৭)

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে রস

বৈষ্ণব রস-তত্ত্বে বৈষ্ণবীয় দৃষ্টি-ভঙ্গী ও ব্যাখ্যান-ভঙ্গীই প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। বৈষ্ণব পদগুলি যাঁহাদের রচনা, তাঁহাদিগকে বলে মহাজন, তাঁহারা একাধারে কবি ও সাধক বা সিদ্ধপুরুষ। এই পদগুলি কেবলমাত্র কাব্যরস আস্বাদনের জন্যই রচিত হয় নাই, অখিলরসামৃত-সিন্ধু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিসাধনার অঙ্গ-স্বরূপে উহাদের প্রকাশ,—আচারী বৈষ্ণবগণ এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব সাধনা ভক্তির সাধনা; এই ভক্তির সাধনা হইতেছে ভাবের সাধনা বা রসের সাধনা। বৈদান্তিকের

যেমন বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় বিচার করিয়া ও ধ্যান করিয়া, অথবা তান্ত্রিকের যেমন বিচিত্র ক্রিয়াযোগের সহায়তায় একাগ্রতা অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব হইলে পরম জ্ঞান ও পরম আনন্দ প্রকাশ পায়, ঠিক তেমনই বৈষ্ণবের সাধনায় হৃদয়বৃত্তির চর্চায় ভাব বা রসবিশেষের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে অপূর্ব তন্ময়তা জন্মিলে রসস্বরূপ ভগবানের পরম রস প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাই সংক্ষেপে বৈষ্ণব সাধনার গূঢ় তত্ত্ব। ইহা লইয়া এখানে অধিক আলোচনার অবসর নাই, কেননা আমরা বিষয়টিকে দেখিতেছি মুখ্যতঃ কাব্যরস-পিপাসুর দৃষ্টি হইতে।

কাব্যরসিকের দৃষ্টি হইতেও বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের রস একটি মাত্র, তাহা শুদ্ধ ভক্তিরস। শ্রীচৈতন্যদেব, অথবা তাঁহারই শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীরূপগোস্বামী এবং পরবর্তী কালের শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ সকলেই এই মুখ্য তত্ত্বটি নানা প্রকারে পরিস্ফুট করিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামীর কৃত রস-বিশ্লেষণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামীও একই কথা লিখিয়াছেন,—

ভক্তিভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর॥
বাৎসল্যরতি, মধুররতি পঞ্চবিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ॥
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুররস নাম।
কৃষ্ণভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥
হাস্যাদ্ভুত-বীর-করুণ-রৌদ্র-বীভৎস-ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়॥
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্ত মনে।
সপ্তগৌণ[১] আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৯শ পরিচ্ছেদ

আমরা এখানেও পাইতেছি,—মূল রস ভক্তিরস ; তাহা দুই প্রকার—মুখ্য ভক্তি-রস ও গৌণ ভক্তিরস। মুখ্য ভক্তিরস হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই পাঁচ প্রকার। রূপগোস্বামী দাস্য ও সখ্য রসকে যথাক্রমে প্রীত ও প্রেয়ঃ আখ্যা দিয়াছেন। গৌণ ভক্তি-রস হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক হাস্য,

(১) বর্ণনা হইতে মনে হয় মুখ্য পঞ্চ রস যেন স্থায়ী, গৌণ সপ্তরস যেন উহাদের ব্যভিচারী।

অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস এবং ভয় এই সাত প্রকার। এই রসসমূহের বিশদ আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তাহা আবশ্যকমত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সম্পন্ন করা যাইবে।

একটি মাত্র প্রশ্ন এখানে আলোচ্য, কাব্যরসিকদের দৃষ্টিতে ভারতীয় রস-তত্ত্বে বৈষ্ণব কবিগণের কোনও বিশিষ্ট দান আছে কি না। অপূর্ব ভক্তিময় দৃষ্টিভঙ্গী বাদ দিলে আমাদের মনে হয় দাস্যরস ব্যতীত আর কোনও নূতন রস বৈষ্ণবগণ ধারণা বা প্রকাশ করেন নাই। অবশ্য কাব্যসাহিত্যে দাস্যরস আমরা স্বীকার করি নাই। পূর্ববর্তী রসজ্ঞ আলঙ্কারিকগণ প্রায় সমুদয় স্থায়ী ভাব ও রসেরই লক্ষণ নির্ণয় করিয়া তাহা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এমন কি মুখ্য দুই এবং গৌণ সপ্তরসকেও ভক্তিরসরূপে কল্পনা বা ধারণা শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের অনেক পূর্বেই ভারতীয় বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রচলিত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র-পণ্ডিত শ্রীবোপদেব গোস্বামী মুক্তাফল গ্রন্থে বিষ্ণুভক্তের লক্ষণ ও ভেদ নির্ণয় করিতে গিয়া লিখিতেছেন,—

স নবধা ভক্তঃ। ভক্তিরসস্য এব হাস্য-শৃঙ্গার-করুণ-রৌদ্র-ভয়ানক-বীভৎস-শান্তা-দ্ভুত-বীর-রূপেণ অনুভবাৎ। —মুক্তাফল, ১১।১, বৃত্তি

—'এক ভক্তিরসেরই হাস্য, শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত, অদ্ভুত এবং বীর এই নয় রূপে অনুভব হয় বলিয়া সেই ভক্ত নয় প্রকার।'

হেমাদ্রির নামে প্রচলিত টীকায় বোপদেবই ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন,—

ভক্তিরসানুভবাচ্চ ভক্তঃ। যথা তৃপ্ত্যনুভবাৎ তৃপ্ত ইত্যুচ্যতে। স চ অনুভবো নবধা হাস্যাদিভঙ্গিভেদেন। হাস্যাদয় এব হি ভগবতি প্রযুজ্যমানাঃ 'তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।' (ভাগবত, ৭।১।৩১) ইতি ভক্তিলক্ষণাক্রান্তত্বাদ্ ভক্তিরসপদবীম্ আসাদয়ন্তীতি ভাবঃ।

—মুক্তাফল টীকা, পৃঃ ১৬৪

ভক্তিরসের অনুভব হইলে ভক্ত হয়, যেমন তৃপ্তির অনুভব হইলে তৃপ্ত বলিয়া কথিত হয়। সেই অনুভব হাস্যাদি ভঙ্গিভেদে নয় প্রকার। হাস্যপ্রভৃতি শ্রীভগবানে প্রযুক্ত হইলে ভক্তিলক্ষণাক্রান্ত হয় বলিয়া ভক্তি-রসপদবী প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। ইহাই অর্থ। ভাগবতেও কথিত হইয়াছে,—'অতএব যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মন নিবিষ্ট করিবে।'

বোপদেব অতঃপর ভক্তিরসের সংজ্ঞা দিলেন,—

ব্যাসাদিভির্বর্ণিতস্য বিষ্ণো বিষ্ণুভক্তানাং বা চরিত্রস্য নবরসাত্মকস্য শ্রবণাদিনা জনিত শ্চমৎকারো ভক্তিরসঃ। —মুক্তাফল, ১১শ অঃ, পৃঃ ১৬৭

—'ব্যাসপ্রভৃতি-কর্তৃক বর্ণিত বিষ্ণুর বা বিষ্ণুভক্তগণের নবরসাত্মক চরিত্রের শ্রবণাদি হইতে যে চমৎকার জন্মে তাহাই ভক্তিরস।'

বোপদেব ইহার পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উপযুক্ত উদাহরণমালা লইয়া বিষয়টি একেবারে সহজ করিয়াছেন।

বোপদেবের এই আলোচনা হইতেই পাওয়া গেল, ভক্তিরসে কেবল গৌণ সপ্তরস নয়, মুখ্য পঞ্চরসের প্রথমটি ও শেষটি অর্থাৎ শান্ত ও মধুর বা শৃঙ্গার রসের ভক্তিপূত উদাহরণ-সহ উল্লেখ তিনিই করিয়া গিয়াছেন। ভরতমুনি হইতে আরম্ভ করিয়া মম্মট ও হেমচন্দ্র পর্যন্ত অলঙ্কারাচার্যগণের গ্রন্থ যে বোপদেব পাঠ করিয়াছিলেন এবং এই নয়টি রসও যে উক্ত অলঙ্কারাচার্যগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কৃত কৈবল্য-দীপিকা[১] টীকা হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। বাকী তিনটি মুখ্যরসের প্রেয়ো বা সখ্যরস রুদ্রটের সময় হইতে এবং বাৎসল্যরস অন্ততঃ বিশ্বনাথের সময় হইতে স্বীকৃত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সুতরাং এখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অলৌকিক ভক্তিভাবের আরোপ বা তাহাদের ভক্তিমূলকতা নির্দেশ করা ব্যতীত আর কিছুই করেন নাই। কেবল প্রীত বা দাস্য রস তাঁহাদের সৃষ্টি, কিন্তু ইহা কাব্য-সাহিত্যে গৃহীত হয় নাই, হইবেও না। ইহার কারণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, ভগবদ্ভক্তিভাব অন্তরালে না থাকিলে কেবল লৌকিক দাস্যভাব হইতে রস জন্মিতে পারে না। সুতরাং কাব্য-গত রসতত্ত্বে বৈষ্ণবগণের মৌলিক দান কিছুই নাই; তাঁহারাই বরং আলঙ্কারিকগণের রসতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বকে রসায়িত ও সঞ্জীবিত করিয়াছেন। আলঙ্কারিক রসতত্ত্বের ভক্তীকরণ বা ভক্তীভাবতা আপাদনও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ করেন নাই, করিয়াছেন ভাগবতগ্রন্থ-মন্থনকারী দাক্ষিণাত্যবাসী বোপদেব[২]-প্রমুখ বৈষ্ণব ভক্তপণ্ডিতগণ। শ্রীচৈতন্যদেব রায় রামানন্দের মুখে যেভাবে মুখ্য পঞ্চ ভক্তিরস এবং পরকীয়া-তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিবরণ শুনিয়াছেন, তাহাতে নিঃসংশয়ে প্রতীত হয় যে, রায় রামানন্দের দেশে ইহা বহুকাল হইতেই ভক্ত বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন আলোয়ারগণের ভক্তিগাথাও ইহার সাক্ষ্য দেয়।

(১) দ্রষ্টব্য—মুক্তাফল, টীকা পৃঃ ।

(২) সনাতন গোস্বামী ও জীব গোস্বামীর রচনায়, বিশেষভাবে ভক্তমালগ্রন্থে মুক্তাফল ও বোপদেবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব আলঙ্কারিক কবিকর্ণপূর গোস্বামী অলঙ্কারকৌস্তভ গ্রন্থে প্রসিদ্ধ নয়টি রস ও বাৎসল্য রস এবং তদতিরিক্ত ভক্তিরসের মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যে প্রেমরসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার গণনা করা যায় না, কেন না তাহা পৃথক্ একটি রস হইলে ভক্তিরসেরই ভেদ, অন্যথায় তাহা সর্বরসের মূলীভূত রস; 'চিত্তদ্রব' স্থায়ী ভাব দেখিয়া এবং বৃত্তির মন্তব্য পড়িয়া শেষোক্ত অভিমতই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহাও যে কর্ণপূর ভোজরাজের অনুগত হইয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এমন কি রূপগোস্বামীর রচিত উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে পরকীয়া নায়িকার ব্যাপার এবং শৃঙ্গাররসের বিবিধ ভেদ ও বিলাস-বর্ণনাও তত্ত্বতঃ ভোজরাজ প্রভৃতির গ্রন্থ হইতেই গৃহীত হইয়াছে, তাহাতেও আমরা নিঃসন্দেহ। তাই বলিতে ইচ্ছা হয় বৈষ্ণব আলঙ্কারিক ও বৈষ্ণব কবি-গণের সংস্কৃত বা বাঙ্গালা সাহিত্যের রসতত্ত্বে প্রকৃত মৌলিক দান কিছুই নাই; তাঁহারাই প্রাচীন রসতত্ত্বকে অলৌকিক ভক্তিভাব দ্বারা নবীকৃত ও পরিপুষ্ট করিয়া বৈষ্ণব ভক্তি-সাধনার পথ সরস এবং সুগম করিয়াছেন। আলঙ্কারিক রস-তত্ত্বের পক্ষে ইহাও একটি গৌরবের কথা। কেবল সহৃদয়গণের সমীপে কাব্যামৃত পরিবেশনে নয়, ভক্তি-সাধনায় এবং ভক্তিরসের প্রকাশ ও পরিপুষ্টিতে আলঙ্কারিক রসতত্ত্বের দান স্মরণীয়। রস যদি স্বরূপতঃ রজস্তমোলেশরহিত পরিমিত প্রমাতৃ-বোধের বিগলিত অবস্থায় শুদ্ধ সংবিদানন্দের প্রকাশ হয়, তাহা হইলে ইহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে?

আমরা এখন দেখিব শাক্তসাধকগণের ভক্তি-সাধনায় এবং পদরচনায়ও আলঙ্কারিক রসতত্ত্বের সুষ্ঠু প্রয়োগ রহিয়াছে।

(৮)

শাক্ত পদসাহিত্যে রস

বৈষ্ণব পদাবলীর ন্যায় শাক্ত পদাবলীরও মূল আলম্বন ভক্তিরস। এই ভক্তিরস নানা অবস্থায় নানা ভাবের অধিবাসনে বাৎসল্য, বীর, অদ্ভুত, দিব্য ও শান্ত, এই পঞ্চ মুখ্য রসে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। শাক্ত সাধকগণের ভক্তিভাব হইতেছে দিব্য মাতৃভাব বা মাতৃমহাভাব; ইহাতে জগন্মাতার মাধুর্য এবং মহাশক্তির ঐশ্বর্য

উভয়ই মিশ্রিত রহিয়াছে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে শাক্ত কবির আগমনী ও বিজয়া গান, এমন কি মাতৃমূর্তির আশ্রয়ে স্বতঃস্ফূর্ত অপূর্ব ভক্তি-গীতিও একান্ত ভাবে ঐশ্বর্যভাব-শূন্য নহে। শাক্ত মাতৃভাবকে আশ্রয় করিয়া জগৎকে দিব্য চক্ষে প্রত্যক্ষ করেন, জগৎ তাঁহার কাছে মিথ্যা নয়; সৎ, চিতি ও শক্তি তাঁহার কাছে এক, অবিভিন্ন। তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ঙ্করী ব্রহ্মময়ীকে মমতাময়ী মাতৃরূপে উপলব্ধি করেন, আবার ধ্যানযোগে রূপাতীত ও মায়াতীত হইয়া পরম অদ্বৈতসত্তায় নিলীন হইয়া যান। বৈষ্ণবভক্তি ঐশ্বর্যবুদ্ধি-হীন কেবলমাধুর্য-স্বরূপ হইয়া এবং নাম, রূপ ও গুণে বিভোর হইয়া দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত; কিন্তু শাক্তভক্তি ঐশ্বর্য-মিশ্রা হইয়াও অবসানে নামরূপাতীত অদ্বৈত। অবস্থাবিশেষে কবি রবীন্দ্রনাথও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া ঐশ্বর্য-মিশ্র মাধুর্য ভাব পাইতে চাহিয়াছেন,—

তব প্রেমে ধন্য তুমি করেছ আমারে,
প্রিয়তম, তবু শুধু মাধুর্য-মাঝারে
চাহি না নিমগ্ন করে রাখিতে হৃদয়।

* * *

তোমার মাধুর্য যেন বেঁধে নাহি রাখে,
তব ঐশ্বর্যের পানে টানে সে আমাকে।

—নৈবেদ্য, ৮২ সংখ্যক কবিতা

এই মাতৃভাবের অতি মহনীয় প্রকাশ হইয়াছে সিদ্ধ কবি রামপ্রসাদের কবিতায়। শাক্ত-জগতে তিনি একাই ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ, জয়দেব এবং চণ্ডীদাস। শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় জীবনব্যাপী একাগ্র সাধনাদ্বারা শাক্ত পদসাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তিনি; জয়দেবের ন্যায় শাক্ত পদাবলীর বিশিষ্ট প্রতীক, সুর, ছন্দ, রূপ ও ঢং দিয়াছেন তিনি; এবং চণ্ডীদাসের ন্যায় ভাব সাধনার নব নব বৈচিত্র্য ও পরম গভীরতাও দিয়াছেন তিনি। সকল দিক বিচার করিলে শাক্তপদ-গঙ্গার আদি গঙ্গোত্রী কার্যতঃ রামপ্রসাদকেই বলিতে হয়। তাঁহার মাতৃভাবসাধনা ভারতের ও বাঙ্গালার সাধনায়ও অপূর্ব ও অতুলনীয়। এই দিব্য মাতৃমহাভাব আমরা কোন তন্ত্রে পাই না, কোন পুরাণে বা ধর্মশাস্ত্রে, অথবা সে যুগের কোন কাব্যসাহিত্যেও পাই না। চণ্ডীতে যে মাতৃভাব আছে তাহা ভক্তিরসাশ্রিত হইলেও কামনাময়; রামপ্রসাদের মাতৃভাবের আলোকে তাহা একান্তই ম্লান। 'মা' এই ডাক রামপ্রসাদের কণ্ঠে এক সিদ্ধমন্ত্রের শক্তিতে মহিমময় হইয়া উঠিয়াছে। যে অজ্ঞাতনামা লেখক লিখিয়াছেন,—

বৈষ্ণব আলঙ্কারিক কবিকর্ণপূর গোস্বামী অলঙ্কারকৌস্তভ গ্রন্থে প্রসিদ্ধ নয়টি রস ও বাৎসল্য রস এবং তদতিরিক্ত ভক্তিরসের মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যে প্রেমরসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার গণনা করা যায় না, কেন না তাহা পৃথক্ একটি রস হইলে ভক্তিরসেরই ভেদ, অন্যথায় তাহা সর্বরসের মূলীভূত রস: 'চিত্তদ্রব' স্থায়ী ভাব দেখিয়া এবং বৃত্তির মন্তব্য পড়িয়া শেষোক্ত অভিমতই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহাও যে কর্ণপূর ভোজরাজের অনুগত হইয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এমন কি রূপগোস্বামীর রচিত উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে পরকীয়া নায়িকার ব্যাপার এবং শৃঙ্গাররসের বিবিধ ভেদ ও বিলাস-বর্ণনাও তত্ত্বতঃ ভোজরাজ প্রভৃতির গ্রন্থ হইতেই গৃহীত হইয়াছে, তাহাতেও আমরা নিঃসন্দেহ। তাই বলিতে ইচ্ছা হয় বৈষ্ণব আলঙ্কারিক ও বৈষ্ণব কবি-গণের সংস্কৃত বা বাঙ্গালা সাহিত্যের রসতত্ত্বে প্রকৃত মৌলিক দান কিছুই নাই; তাঁহারাই প্রাচীন রসতত্ত্বকে অলৌকিক ভক্তিভাব দ্বারা নবীকৃত ও পরিপুষ্ট করিয়া বৈষ্ণব ভক্তি-সাধনার পথ সরস এবং সুগম করিয়াছেন। আলঙ্কারিক রস-তত্ত্বের পক্ষে ইহাও একটি গৌরবের কথা। কেবল সহৃদয়গণের সমীপে কাব্যামৃত পরিবেশনে নয়, ভক্তি-সাধনায় এবং ভক্তিরসের প্রকাশ ও পরিপুষ্টিতে আলঙ্কারিক রসতত্ত্বের দান স্মরণীয়। রস যদি স্বরূপতঃ রজস্তমোলেশরহিত পরিমিত প্রমাতৃ-বোধের বিগলিত অবস্থায় শুদ্ধ সংবিদানন্দের প্রকাশ হয়, তাহা হইলে ইহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে?

আমরা এখন দেখিব শাক্তসাধকগণের ভক্তি-সাধনায় এবং পদরচনায়ও আলঙ্কারিক রসতত্ত্বের সুষ্ঠু প্রয়োগ রহিয়াছে।

(৮)

শাক্ত পদসাহিত্যে রস

বৈষ্ণব পদাবলীর ন্যায় শাক্ত পদাবলীরও মূল আলম্বন ভক্তিরস। এই ভক্তিরস নানা অবস্থায় নানা ভাবের অধিবাসনে বাৎসল্য, বীর, অদ্ভুত, দিব্য ও শান্ত, এই পঞ্চ মুখ্য রসে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। শাক্ত সাধকগণের ভক্তিভাব হইতেছে দিব্য মাতৃভাব বা মাতৃমহাভাব; ইহাতে জগন্মাতার মাধুর্য এবং মহাশক্তির ঐশ্বর্য

উভয়ই মিশ্রিত রহিয়াছে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে শাক্ত কবির আগমনী ও বিজয়া গান, এমন কি মাতৃমূর্তির আশ্রয়ে স্বতঃস্ফূর্ত অপূর্ব ভক্তি-গীতিও একান্ত ভাবে ঐশ্বর্যভাব-শূন্য নহে। শাক্ত মাতৃভাবকে আশ্রয় করিয়া জগৎকে দিব্য চক্ষে প্রত্যক্ষ করেন, জগৎ তাঁহার কাছে মিথ্যা নয়; সৎ, চিতি ও শক্তি তাঁহার কাছে এক, অবিভিন্ন। তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ঙ্করী ব্রহ্মময়ীকে মমতাময়ী মাতৃরূপে উপলব্ধি করেন, আবার ধ্যানযোগে রূপাতীত ও মায়াতীত হইয়া পরম অদ্বৈতসত্তায় নিলীন হইয়া যান। বৈষ্ণবভক্তি ঐশ্বর্যবুদ্ধি-হীন কেবলমাধুর্য-স্বরূপ হইয়া এবং নাম, রূপ ও গুণে বিভোর হইয়া দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত; কিন্তু শাক্তভক্তি ঐশ্বর্য-মিশ্রা হইয়াও অবসানে নামরূপাতীত অদ্বৈত। অবস্থাবিশেষে কবি রবীন্দ্রনাথও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া ঐশ্বর্য-মিশ্র মাধুর্য ভাব পাইতে চাহিয়াছেন,—

তব প্রেমে ধন্য তুমি করেছ আমারে,
প্রিয়তম, তবু শুধু মাধুর্য-মাঝারে
চাহি না নিমগ্ন করে রাখিতে হৃদয়।

*   *   *

তোমার মাধুর্য যেন বেঁধে নাহি রাখে,
তব ঐশ্বর্যের পানে টানে সে আমাকে।

—নৈবেদ্য, ৮২ সংখ্যক কবিতা

এই মাতৃভাবের অতি মহনীয় প্রকাশ হইয়াছে সিদ্ধ কবি রামপ্রসাদের কবিতায়। শাক্ত-জগতে তিনি একাই ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ, জয়দেব এবং চণ্ডীদাস। শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় জীবনব্যাপী একাগ্র সাধনাদ্বারা শাক্ত পদসাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তিনি; জয়দেবের ন্যায় শাক্ত পদাবলীর বিশিষ্ট প্রতীক, সুর, ছন্দ, রূপ ও ঢং দিয়াছেন তিনি; এবং চণ্ডীদাসের ন্যায় ভাব-সাধনার নব নব বৈচিত্র্য ও পরম গভীরতাও দিয়াছেন তিনি। সকল দিক বিচার করিলে শাক্তপদ-গঙ্গার আদি গঙ্গোত্রী কার্যতঃ রামপ্রসাদকেই বলিতে হয়। তাঁহার মাতৃভাবসাধনা ভারতের ও বাঙ্গালার সাধনায়ও অপূর্ব ও অতুলনীয়। এই দিব্য মাতৃমহাভাব আমরা কোন তন্ত্রে পাই না, কোন পুরাণে বা ধর্মশাস্ত্রে, অথবা সে যুগের কোন কাব্যসাহিত্যেও পাই না। চণ্ডীতে যে মাতৃভাব আছে তাহা ভক্তিরসাশ্রিত হইলেও কামনাময়; রামপ্রসাদের মাতৃভাবের আলোকে তাহা একান্তই ম্লান। 'মা' এই ডাক রামপ্রসাদের কণ্ঠে এক সিদ্ধমন্ত্রের শক্তিতে মহিমময় হইয়া উঠিয়াছে। যে অজ্ঞাতনামা লেখক লিখিয়াছেন,—

"মা ঐ একটি অক্ষরের শব্দের ভিতরে কি অপার, অগাধ, অতলস্পর্শ স্নেহের প্রকৃত মহাকাব্য অবরুদ্ধ রহিয়াছে!"[১]
—তিনি প্রেমিক ছিলেন সন্দেহ নাই। রামপ্রসাদের ভক্তিভাব ও ভালবাসার ভাব এক হইয়া গিয়াছে; সেই ভালবাসার সমুদ্রে অবিরাম সফেন তরঙ্গভঙ্গ উঠিতেছে; কত তার বৈচিত্র্য! অভিমান, আবদার, অভিযোগ, গালি, সংশয়, বিশ্বাস, ক্রোধ, দুঃখ এবং হর্ষ—নানা ভাবের তরঙ্গ-বিলাস চলিতেছে! রামপ্রসাদ পরম দুঃখেও মর্মের বিশ্বাস আঁকড়িয়া রহিয়াছেন,—

ভূতলে আনিয়ে মা গো,
করলে আমায় লোহাপেটা;
আমি তবু কালী ব'লে ডাকি,
সাবাস্ আমার বুকের পাটা।

—রামপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী, বসুমতী সং, পৃঃ ১১০

শ্রীমতী রাধিকার মহাভাব আর এই মহাভাবে জাতি-গত পার্থক্য কিছু নাই। রাধিকার মহাভাব ভারতবর্ষের প্রায় সকল সাহিত্যেই অল্প-বিস্তর বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু রামপ্রসাদের এই দিব্য মাতৃভাব বাঙ্গালীর সাধনার এক অভিনব বৈশিষ্ট্য, সন্দেহ নাই!

শাক্ত সাধনার মূলে বিচিত্র তন্ত্রাচার ও যোগাচার থাকিলেও শাক্তপদাবলী যেন পঙ্ক ও সলিলের উপরে প্রস্ফুটিত পদ্মের শোভা! যে দেখে, সে-ই মুগ্ধ হয়। পদ্মের তলদেশ কেহ সন্ধান করিতে চাহে না। ডক্টর এড্ওয়ার্ড্ টম্প্সন্ যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন,—

"But the better side of Saktaism is the one which is generally present in Ramprasad."

—*Bengali Religious Lyrics, Sakta, Introduction.*

—'শাক্তধর্মের উৎকৃষ্ট দিক্‌টিই সাধারণতঃ রামপ্রসাদের পদাবলীতে পরিস্ফুট হইয়াছে।'

ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়ের অভিমতও[২] এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি

(১) অজ্ঞাতনামা লেখকের রচিত 'প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি' প্রবন্ধ,—ভারতী, ১২৮৯

(২) Bengali Literature in the 19th Century, Ch. XI, p. 419.

বলেন,—বৈষ্ণব কবিগণের আবেগময়ী প্রেম-গীতি অদীক্ষিত ব্যক্তিগণের চিত্তে সংসার-বৈরাগ্যের পরিবর্তে ইন্দ্রিয়াসক্তি বা সংসারাসক্তি জন্মাইতে পারে। রামপ্রসাদ এবং তাঁহার অনুবর্তিগণের গীতি-সমূহ পাঠে এইরূপ বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই। শাক্তপদের এই সরল ও কোমল মাতৃভাবের আকুতি বৈষ্ণব কবিগণের মধুরভাবের উচ্ছ্বাসের সহিত কাব্যাংশে সর্বথা তুলিত হইতে না পারে, কিন্তু তাহা রসিক বা অরসিক, সাধু বা অসাধু, পণ্ডিত বা মূর্খ, সকলের নিকটে সমানভাবে আস্বাদযোগ্য। মানবশিশুর মাতৃস্নেহের ন্যায় এই পদগুলিও মানব-সকলের সাধারণ সম্পত্তি।

আজ পর্যন্ত শাক্ত পদসাহিত্যের বিশেষ কোন বিশ্লেষণ হয় নাই। তাই সর্বাগ্রে শাক্ত পদকাব্যের প্রথম ও প্রধান কবি বলিয়া পরিচিত কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়া শাক্ত ভক্তির বিশ্লেষণে অগ্রসর হইতেছি।

বৈষ্ণব ভক্তিরসের প্রধান হইতেছে মধুর রস, উহা ভক্তিরসরাট্[১], রাধা ও কৃষ্ণের অথবা নর-নারীর মিলন-লীলাকে প্রতীক করিয়া ইহা কাব্য ও কথায় পরিস্ফুট হইয়াছে। বৈষ্ণব মধুরাখ্য ভক্তিরসের সবলতা ও দুর্বলতা উভয়ই এই প্রতীকের বিশিষ্টতায়। এক হিসাবে শাক্তের কোন প্রতীক নাই; কেবল আমি আর তুমি, অর্থাৎ আমি আর মা। মাটির মূর্তি বা মায়ের মূর্তি অর্থাৎ রূপধৃত প্রতিমা আসলে কোন প্রতীক নয়।

শাক্ত জানেন,—

মা বেটি কি মাটির মেয়ে মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥
করে অসি মুণ্ডমালা, সে মা-টি কি মাটির বালা,
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিবাইয়ে॥[২]

অথবা—

ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি,
জেনেও কি তাই জান না?
কোন্ প্রাণে তাঁর মাটির মূর্তি,
গড়িয়ে করিস্ উপাসনা॥[৩]

বৈষ্ণবের নাম-রূপের ন্যায় এই নাম-রূপ নিত্য নয়; মুহূর্ত মধ্যে ধ্যানানন্দে শাক্তের ভেদাভেদ ঘুচিয়া যায়, জ্ঞানোদয়ে তিনি অনুভব করেন,

(১) উজ্জ্বলনীলমণি, ১।২, ৩

(২), (৩) শ্রীরামপ্রসাদ সেনের রচিত

তারা আমার নিরাকারা।[১]

চিত্তাবস্থা-বিশেষে শাক্ত নির্বাণ বা অদ্বৈত জ্ঞানকে তুচ্ছ করিয়াছেন; তিনি চাহিয়াছেন জগৎকে এবং ভক্তিরসকেই বিশেষ ভাবে আস্বাদন করিতে,—

নির্বাণে কি আছে ফল,
জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন,
চিনি খেতে ভালবাসি।[২]

রামপ্রসাদের সম্বোধন প্রত্যক্ষ মাকে বা ঈশ্বরীকে সম্বোধন, এবং প্রত্যক্ষ মনকে সম্বোধন। রবীন্দ্রনাথও এইরূপ অনেক স্থলে বৈষ্ণব ভক্তি-সাধনার প্রতীক খসাইয়া প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'মনের মানুষ'।

এইজন্য শাক্তপদ খাঁটি গীতিকাব্য। ইহাতে ভক্ত কবির চিত্তই মুখ্য বা একমাত্র আলম্বন। বৈষ্ণব কাব্যে রাধাকৃষ্ণ থাকায় এবং তাহাদের ভাব-বিনিময় ও উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকায় বাহ্য লক্ষণে তাহা হয়তো গীতি-নাট্য। রামপ্রসাদ বা শাক্ত কবিগণের পদে ভক্ত কবি একাই নিজ চিত্তভাব নিবেদন করিয়া চলিয়াছেন; মা বা ব্রহ্মময়ীর কোন কার্য নাই, কথা নাই, তিনি কেবল কবির অদৃশ্য বিশ্বাসস্থল, সম্বোধনের পাত্র। কাজেই বৈষ্ণব ভাবের আবেদন পরোক্ষ, শাক্ত পদের আবেদন প্রত্যক্ষ। পদসাহিত্যে বৈষ্ণবপদ নায়ক, নায়িকা, সখা, সখী লইয়া গীতি-নাট্য, সূক্ষ্ম রোমাণ্টিক ভাবাদর্শ তাহার অবলম্বন; শাক্তপদ কেবল ভক্তচিত্তকে লইয়া শুদ্ধ গীতিকাব্য, এবং বর্ণনায় রোমাণ্টিক ভাব কোথাও নাই, বরং বাস্তব বর্ণনায় তাহা কোন কোন সময়ে স্থূল, প্রত্যক্ষ। মিষ্টিক উপাদান উভয়বিধ সাহিত্যেই কোন কোন পদে অনুভূত হয়। শাক্তপদে স্বভাবতঃ গৌরবোক্তির প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায়; বক্রোক্তি ও রসোক্তি উভয়বিধ সাহিত্যেই প্রচুর। অবশ্য বৈষ্ণবসাহিত্যে বর্ণনা-বৈদগ্ধ্য সর্বক্ষেত্রেই অনেক বেশী এবং অগ্রজ সাহিত্য বলিয়া রসে ও রচনায় শাক্তপদের উপর তাহার প্রভাব অনস্বীকার্য। তথাপি শাক্তপদ নিজধর্মে এবং নিজ বিশিষ্ট-গৌরবে মৌলিক শ্রীতেও সমুজ্জ্বল।

আমরা এইবার বৈষ্ণব গোস্বামিগণকৃত বৈষ্ণব পদরসের বিশ্লেষণের ন্যায় কাব্য-

(১), (২)—শ্রীরামপ্রসাদ সেনের রচিত।

বিচারের দৃষ্টি লইয়া শাক্তপদরসের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইব। বলা বাহুল্য, বর্তমান গ্রন্থে স্থান অল্প বলিয়া কেবল মাত্র মুখ্য আলোচনাই লিপিবদ্ধ হইবে।

আমাদের মতে শাক্ত পদাবলীর অবলম্বন-ভূত রস পঞ্চবিধ, যথা,—

বাৎসল্যরস, বীররস, অদ্ভুতরস, দিব্যরস এবং শান্তরস।

এই পঞ্চরসের মধ্য দিয়াই শাক্ত কবিগণের রচিত যাবতীয় পদের বিচিত্র আস্বাদন লাভ করা যায়।

শাক্ত পদসাহিত্যের প্রথম রস বাৎসল্যরস। উহা ত্রিবিধ,—বাৎসল্য, মিলন-বাৎসল্য ও বিরহ-বাৎসল্য। বাৎসল্যরস পরিস্ফুট মা মেনকা ও ছোট মেয়ে উমার মধ্যে। মিলন-বাৎসল্য প্রকাশ পাইয়াছে উমা হরের ঘরণী হইবার পর আগমনী-গানে, এবং বিরহ-বাৎসল্য বিজয়া-গানে। এই আগমনী ও বিজয়া গানের মধ্য দিয়াই শাক্ত পদাবলীর সার্বজনীন আবেদন সর্বাধিক পরিমাণে অনুভূত হয়। মহাকবি মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি আধুনিক কবিগণও ইহার ভাবসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া নব নব পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আগমনী ও বিজয়া গানের রচনায় রামপ্রসাদ-প্রমুখ প্রাচীন শাক্তকবিগণের মধ্যে বাঙ্গালার সমাজ-চৈতন্যের একটি দিক্ যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, তেমনই প্রাকৃতিক ভাব-সৌন্দর্য এবং লৌকিক কাহিনী ও শিল্পকলাকে এক অপরূপ আধ্যাত্মিক রস ব্যঞ্জনায় মধুরায়িত করিয়া বাঙ্গালার প্রাণধর্মের আর একটি দিক্ও সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

সেকালের বাঙ্গালী-সমাজের গৌরীদান-প্রথাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালার গৃহে গৃহে মাতাপিতা ও কন্যার অন্তরে যে ভাব-সাগর নিত্য উদ্বেলিত হইত, তাহারই জ্যোৎস্না-পক্ষ মিলন-বাৎসল্য—আগমনী-গান, এবং অন্ধকার-পক্ষ বিচ্ছেদ-বাৎসল্য—বিজয়া-গান। এই আগমনী ও বিজয়া গানের মধ্যে আমরা তিনটি বিশিষ্ট উপাদান উপলব্ধি করি।

প্রথম, বাঙ্গালার অপূর্ব শরৎ-প্রকৃতি। শরতের আরম্ভে ও অবসানে আগমনী ও বিজয়ার বিচিত্র সুর যেন প্রকৃতির কণ্ঠেই জাগিয়া উঠে। বর্ষার বারিধারা-তৃপ্ত ধরিত্রীর মুখে ফুটিয়া উঠে কমল-কুমুদের অমলিন হাসি, গলে দোলে শেফালি ফুলের সুরভিত মালা, অঙ্গে শুভ্রতা ছড়ায় কাশফুলের ধবল শোভা, মেঘমুক্ত আকাশে দীপ্তি পায় স্নিগ্ধতাময়ী জ্যোৎস্না অথবা সোনালি রৌদ্রের লাবণ্য। এই চিত্তহারী স্নিগ্ধ সুনির্মল সৌন্দর্যরাশি দেখিতে না দেখিতেই মিলাইয়া যায়, শরতের সোনার পুরীতে জাগিয়া উঠে শীতের শুষ্ক শ্মশান,—ক্ষণস্থায়ী মিলনের অন্তেই আসে দীর্ঘ বিরহ।

ইহাই বাঙ্গালা দেশে আগমনী ও বিজয়া গানের প্রাকৃতিক উপাদান। আশ্চর্যের বিষয়, ইহার প্রত্যক্ষ বর্ণনা প্রাসঙ্গিক গানগুলিতে প্রায় নাই বলিলেই চলে।

দ্বিতীয়, পুরাণ হইতে প্রাপ্ত কিন্তু বাঙ্গালীর সুপরিচিত এক লৌকিক উপাদান। ভিখারী হরের ঘর হইতে কন্যা উমা রাজেশ্বর পিতৃ-গৃহে মা মেনকার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে, তিনটি দিন পরেই স্বামী হর আসিয়া মেনকাকে কাঁদাইয়া উমাকে লইয়া যাইবেন। এই কৈলাস ও হিমালয় বাঙ্গালী গৃহস্থের হৃদয়-ভূমি। ইহা বাঙ্গালার ঘরে মায়ের ব্যথা ও মেয়ের ব্যথায়—উভয়ের অন্তরের কামনা-বেদনায় পরিপূর্ণ।

তৃতীয়,—ভক্তের ঘরে জগজ্জননী দুর্গা বৎসরান্তে আসিয়াছেন পূজা গ্রহণের নিমিত্ত। দশমী তিথিতে দেবীর বিজয়া। ইহাই বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব—দুর্গাপূজা। এই দুর্গাকে বাঙ্গালী দেবী-বুদ্ধিতে পূজা করিয়া আবার কন্যা-বুদ্ধিতে আদরও করেন এবং সিন্দুর পরাইয়া স্বামীর ঘরে পাঠাইয়া দেন।

বৈষ্ণব বাৎসল্যরসে ভগবানের ঐশ্বর্য, অর্থাৎ ঈশ্বরীয় ভাবের কিছুমাত্র মিশ্রণ নাই, তাহা কেবল মাধুর্য। শাক্ত কবিগণ অনেক সময়ে কন্যারূপের মাধুর্যের সহিত দেবীরূপের ঈশ্বরীয় ভাবের মিশ্রণ ঘটাইয়া দেবীকে ভালবাসিয়াছেন ও পূজা করিয়াছেন। দেবীবুদ্ধি অন্তরালে থাকিলেও শাক্তধর্মের কোন তন্ত্র-তত্ত্ব বা যোগ-রহস্য অনেক পদেই নাই, ইহা বিশুদ্ধ কাব্য। ইহাতে আছে এক অলৌকিক কারুণ্য, তাহারই বলে কানাই বলিতে যেমন যশোদার চক্ষে জল আসে, উমা বলিতে তেমনই মেনকার নয়নে অশ্রু-বন্যা বহিয়া যায়। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে বাৎসল্য-রসের অবলম্বনে বৈষ্ণব সাধনা পুষ্ট হয়, এখানে উহা মুখ্যতঃ কাব্যরস মাত্র। এই বাৎসল্যরসে রহিয়াছে মায়ের মমতাধিক্য, চিন্তাধিক্য, মেয়ের ভালবাসা, আবদার, অভিমান, উভয়ের ভয়, শঙ্কা, বিষাদ—কত ভাবের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ! শাক্তপদের বাৎসল্যভাব কেবল ভাবজগতে নয়, বাস্তবজগতেও ব্যাকুলতা, গভীরতা ও নিবিড়তায় অপূর্ব, তুলনায় অনেক সময়ে কানাই-এর গো-চারণ অবলম্বনে রচিত বৈষ্ণব বাৎসল্য-ভাব পোষাকী বলিয়া মনে হয়। এখানে ভালবাসার পাত্র মেয়ে, যে বাল্যকালে বিবাহের পর সত্যই পরের ঘরে চলিয়া গিয়াছে; ইহা গোচারণের জন্য শুধু দু' দণ্ডের অদেখা নয়।

আগমনী ও বিজয়া গানের আরম্ভ হয় মেনকারাণীর স্বপ্নদর্শনের বিবরণ দিয়া। বৈষ্ণব কবিতায় মিলনের পদ বিরহ-পদের তুলনায় তুচ্ছ; শাক্ত কবিতায় কিন্তু বিজয়া-গানের অপেক্ষা আগমনী-গানের ভাব-বৈচিত্র্য ও নাট্য-সৌন্দর্য অনেক বেশী।

বিজয়ায় প্রধানতঃ মাধুর্যপূর্ণ লৌকিক ভাব, এবং উক্তিও প্রধানতঃ মেনকার উক্তি। কোথাও আগমনীতে কোথাও কেবল মাধুর্যরস, কোথাও বা মাধুর্য ও ঐশ্বর্য,—বাৎসল্যরসের সহিত ভক্তিরস, কোন কোন স্থলে উভয় রসের মিশ্রণে অদ্ভুতরসও প্রকাশ পাইয়াছে নাটকীয় বিন্যাসও আগমনী-গানে নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে চলিয়াছে।

শাক্ত-বাৎসল্যের দুই-একটি উদাহরণ দিয়া বিভাগগুলি বুঝান হইতেছে।

উদাহরণ :—

গিরিবর, আর আমি পারিনে হে
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।—ইত্যাদি

—রামপ্রসাদ সেন

ইহা মাতা মেনকা ও কন্যা উমার আলম্বনে জাত শুদ্ধ বাৎসল্যরস ; বিশেষ ভাবে মিলন-বাৎসল্য বা আগমনীও নয়, অথবা বিরহ-বাৎসল্য বা বিজয়াও নয়। স্থায়ী ভাব স্নেহ বা বাৎসল্য রতি, উমার কাঁদা, স্তন্যপান না করা, ভূষণ ফেলিয়া মারা, প্রভৃতি অনুভাব ; অভিমান, বিষাদ, কোপ প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব ; উদ্দীপন বিভাব গগনে উদিত শশী। বর্ণনার নাটকীয় ভঙ্গীটি চমৎকার! লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে মাধুর্য ভাবটিই এখানে প্রবল।

গিরি এবার আমার উমা এলে
আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ কারো কথা শুন্‌বো না॥
যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে কর্‌বো ঝগড়া,
জামাই ব'লে মানবো না।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে,
ঘরের ভাবনা ভাবে না॥ —রামপ্রসাদ সেন

ইহা মেনকার উক্তি স্বামী গিরিরাজের প্রতি; বিবাহিতা উমাকে আনিবার প্রস্তাবে মেয়ের সহিত মায়ের মিলনে সুখ, মেয়েকে পুনরায় লইতে আসায় আসন্ন বিরহের দুঃখ, মায়ের না দিবার জিদ এবং মেয়ের স্বামীর ঘরের অভাব,—এই সকল চিত্র পরিচিত আনন্দ-বেদনার সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানেও লৌকিক ভাব প্রবল। মেনকার কুস্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন দেখিবার পর আগমনী-গানের ইহাই প্রথম রূপ। পরবর্তী রূপেরও একটি প্রসিদ্ধ পদ নিম্নে দেওয়া হইল,—

পুরবাসী বলে—"উমার মা,
তোর হারা তারা এলো ওই।"
শুনে পাগলিনীপ্রায়, অমনি রাণী ধায়,
কই উমা বলি কই!
কেঁদে রাণী বলে—"আমার উমা এলে,
একবার আয় মা, একবার আয় মা, করি কোলে।"
অমনি দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কাঁদি' রাণীরে বলে—
"কই মেয়ে বলে আন্‌তে গিয়েছিলে!
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ
জেনে, এলাম আপনা হতে।
গেলে নাকো নিতে,
র'ব না, যাব দুদিন গেলে॥" —গদাধর মুখোপাধ্যায়

ইহাই প্রকৃত আগমনী-গান। এখানে কেবল লৌকিক ভাব, কিন্তু তাহা বর্ণনাগুণে মানবীয়তার নিবিড় রস-সঞ্চারণে অন্ততঃ বাঙ্গালীর হৃদয়ে অপূর্ব অলৌকিক হইয়া উঠিয়াছে। নাটকীয় বিন্যাসটি এই গানের সর্বত্রই লক্ষণীয়। কন্যার মায়ের সহিত মিলনের সুখ, আবার অভিমানের রুদ্ধ দুঃখ, মায়ের অকস্মাৎ কন্যা-লাভের সুখ, সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের অভিযোগের লজ্জা ও দুঃখ, উভয়েই কিন্তু আত্মহারা, ক্রমে স্রোতের সহিত স্রোত মিলিয়া বাঙ্গালীর সংসার-স্বর্গের সুখ-দুঃখের অলকানন্দা ও মন্দাকিনী ধারা একবেণী হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া বহিতে লাগিল।

আগমনীর পর বিজয়া, সেই একই ভাব আসন্ন দুঃখের ও পরিপূর্ণ দুঃখের। মেনকা বলিতেছেন,—

ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে,
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার ॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা ডাকে বারবার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার ॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার ॥—রামপ্রসাদ সেন

মধুসূদন দত্তের "বিজয়া দশমী" নামক চতুর্দশপদী কবিতাটি গান না হইলেও বিজয়ার ভাবকে চমৎকার ফুটাইয়াছে। মেনকা বলিতেছেন,—

* * *

তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি' অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকুহরে।
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী। —মধুসূদন দত্ত

সাধক ও কবি সমাজে রামপ্রসাদ ধর্মবীর ও কবিবীর। মৃত্যু ও যমের বিরুদ্ধেই তাঁহার বীরত্বের ঘোষণা সর্বাধিক; মায়ের দেওয়া দুঃখের সম্বন্ধেও তাঁহার বিশ্বাস-বলিষ্ঠ হৃদয়ের বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার এই বিশ্বাসময় বীরত্বের সিদ্ধ মন্ত্রই হইল,—"আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা।"

উদাহরণ :—

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে, আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা,
বল্‌গে যা তোর যম রাজারে
আমার মতন নেছে কটা।

আমি যমের যম হইতে পারি,
ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা ॥ —রামপ্রসাদ সেন

অথবা—

মন কেন রে ভাবিস্ এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥
ভবে এসে, ভাব্ছো ব'সে
কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল,
সে কাল মায়ের পদানত ॥
ফণী হয়ে ভেকের ভয় এ যে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস্ কি জালের ভয়,
হয়ে ব্রহ্মময়ী-সুত ॥ —রামপ্রসাদ সেন

অথবা,—রামপ্রসাদের "এবার কালী তোমায় খাব" পদটি; এইরূপ আরও অনেক পদ আছে। রামপ্রসাদের পরবর্তী শাক্ত কবিগণের রচনায় এই বীরত্বের ভাবটি সুলভ নহে। বাস্তবিক পক্ষে বাঙ্গালা সাহিত্যেই এই বীরভাবের সাক্ষাৎ দুর্ঘট। এই সকল কবিতায় স্থায়ী ভাব হইতেছে যুদ্ধোৎসাহ,—পরম বিশ্বাস ও জ্ঞান-রূপ অস্ত্র লইয়া মৃত্যু-ভয় বা দুঃখ-ভয়কে বিনাশ করায় উৎসাহ; এই সমর রাজসিক নহে, সাত্ত্বিক; ইহা প্রকৃতপক্ষে 'সাধনসমর'।

অদ্ভুতরস প্রত্যক্ষ হয় দেবীর রূপবর্ণনায়; বীররস, রৌদ্ররস, ভয়ানকরস, এমন কি, বীভৎসরসেরও প্রকাশ অনেক রূপবর্ণনার কবিতায় আছে, সঙ্গে আছে সন্তানের প্রতি মায়ের অপূর্ব বাৎসল্য, যাহা সন্তানের হৃদয় হইতে শুদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়া তাহাকে প্রপত্তি-যোগে দীক্ষিত করে। এই বিভিন্ন রস অবলম্বন ও অতিক্রম করিয়া প্রধান হইয়া প্রকাশ পায় বিস্ময়-স্থায়িভাব অদ্ভুত-রস। রামপ্রসাদের বর্ণিত মাতৃমূর্তি বা কালীমূর্তি আবার সর্বাধিক বিস্ময়াবহ; কোমলে ভৈরবে, সৌন্দর্যে গৌরবে, মাধুর্যে ও ভীষণত্বে এবং এক অপরূপ গতি-চাঞ্চল্যে সমগ্র জীবনের বিচিত্র ভাবরাশি যেন যুগপৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া শক্তিরূপে বেগে প্রধাবিত হইতেছে। এই শক্তি-মূর্তির রূপ দিতে পারে এমন মৃৎ-শিল্পী ও চিত্র-শিল্পী আজও দুর্লভ। ইহা একান্তই দিব্য ভক্তের আরাধনার ধন, সৃষ্টি-

স্থিতি-সংহারশক্তির অবিচ্ছিন্ন লীলার যেন যুগপৎ প্রত্যক্ষ প্রকাশ! এই রূপের অবলম্বন-ভূত রসকে অদ্ভুতরস ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

রামপ্রসাদের রচনা হইতেই দুই-একটি উদাহরণ লওয়া যাইতেছে; যথা,—

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে,
গলিত চিকুর আসব-আবেশে,
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে,
ধরি করতলে গজ গরাসে॥"

*　　*　　*

দিতিসুতচয় সবার হৃদয়
থর থর কাঁপে হুতাশে।

অথবা,—

আরে ঐ আইল কে রে ঘনবরণী।

*　　*　　*

বামে অসিমুণ্ড, দক্ষিণে বরাভয়,
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়,
জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী॥

অথবা,—

নব নীল নীরদ-তনুরুচি কে?
ঐ মনোমোহিনী রে॥
তিমির শশধর, বাল দিনকর,
সমান চরণে প্রকাশ।
কোটি চন্দ্র ঝলকত শ্রীমুখমণ্ডল,
নিন্দি সুধামৃত ভাষ॥

*　　*　　*

বামার বামকরোপর খড়্গ-নরশির
সব্যে পূর্ণাভিলাষ।
শশি-শকল ভালে, বিরাজে মহাকালে,
ঘোর ঘন ঘন হাস॥

উদাহরণে দুর্মদগতিযুক্ত ভয়ঙ্কর রূপ এবং অপরূপ রূপ, বামকরে অসি ও নরমুণ্ড এবং দক্ষিণ করে বরাভয় লক্ষণীয়।

শাক্তের ভক্তিভাব মাতৃভাবকে আশ্রয় করিয়া পরিস্ফুট হয়, ইহা একান্তই নিষ্কাম শুদ্ধা ভক্তি; ধন, জন, জয় ও যশের কামনা ইহাতে কোথাও নাই। রামপ্রসাদের মধ্যে ইহা আবার আবদার, অভিমান, কোপ, সংশয়, অভিযোগ, দুঃখ ও হর্ষ—নানা সঞ্চারী ভাবের মধ্য দিয়া উল্লসিত হইয়াছে; রামপ্রসাদের এই মাতৃভাবকে আমরা বলিব মাতৃমহাভাব বা অপূর্ব মাতৃভাব; ভারতবর্ষের পুরাণ ও তন্ত্রেও ইহা দুর্লভ। পশুভাব ও বীরভাবের ঊর্ধ্বে তন্ত্রোক্ত শ্রেষ্ঠ ভাব 'দিব্যভাব' শব্দ দ্বারা ইহার একরূপ প্রকাশ হয়। এই দিব্যভাব হইতে জাত রসের নামও তাই কেবল ভক্তিরস না রাখিয়া দিব্যরস রাখা হইল।

উদাহরণ :—

মা মা বলে আর ডাক্‌ব না।
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী;
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা ব'লে আর কোলে যাব না॥
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না॥ —রামপ্রসাদ সেন

বাৎসল্য ও অদ্ভুত রস ভিন্ন শাক্তপদের বীর, দিব্য ও শান্ত রসে ভক্তকবির স্ব-চিত্তই মুখ্য আলম্বন বিভাব; বিষয়ালম্বন মা বা শক্তি যিনি চিতি বা জ্ঞানের সহিত অভিন্ন, উদ্দীপন বিভাব প্রায় কিছু থাকে না। আলোচ্য কবিতা দুইটিতে স্থায়ী ভাব দিব্যভক্তিকে অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে অভিমান, দৈন্য ও ক্ষোভ এবং ত্যাগ সঞ্চারী ভাব রূপে প্রকাশ পাইয়াছে; অনুরূপ অনুভাবও দেখা যাইবে।

শাক্ত সাহিত্যের শেষ রস শান্তরস। শাক্ত সাধনায় বাৎসল্যরস মুখ্যতঃ সাধনার রস নয়। ভক্তি-পূত বীররসের সাধনায় চিত্ত বীর্যশালী হইলে অদ্ভুতরসময়ী দেবীর ভাবমূর্তি উপলব্ধি হইতে থাকে, ক্রমশঃ জাগে দিব্য ভক্তি ও দিব্যরস, তাহারই

পরিণতি শান্তরসে। কোন কোন সময়ে দিব্যরস ও শান্তরসের প্রভেদ করা সম্ভবপর হয় না, উভয়ই এক হইয়া যায়; যথা,—

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়্‌বো লুটে, তখন তারা ব'লে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে, শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব ঘটে,
ওরে অন্ধ আঁখি দেখ মাকে, তিমিরে তিমিরহরা॥ —রামপ্রসাদ সেন

রামপ্রসাদের বর্ণিত উমার গোষ্ঠলীলা ও রাসলীলাও আছে। বলা বাহুল্য, ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণের ফল, প্রকৃত শাক্ত পদসাহিত্যের মধ্যে ইহাদের গণনা হয় না।

উপরে যাহা যাহা আলোচিত হইল, তাহা সকলই দ্রুতি-কাব্য, রসোক্তি। শাক্ত পদসাহিত্যে দীপ্তি-কাব্যেরও অভাব নাই, বরং প্রাচুর্যই আছে; এই সকল দীপ্তি-কাব্য অনেক সময়ে চমৎকার গৌরবোক্তি, কখনও বা অর্ধবক্রোক্তি; প্রসঙ্গ-বহির্ভূত বলিয়া এখানে আর আলোচনা করা হইল না।

এতক্ষণে আমাদের রস ও ভাবের মূল বিষয়গুলির আলোচনা সমাপ্ত হইল; প্রথম বিশ্লেষণ বলিয়া শাক্তপদ-সাহিত্যের কিছু বিশদ আলোচনা করিতে হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি

(১)

ধ্বনিবাদের উপস্থাপন

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে কাব্য-বিচারে ধ্বন্যালোকের অজ্ঞাতনামা পরমরসিক গ্রন্থকার ধ্বনিবাদের স্থাপনা করেন। এই মতবাদ নিঃসংশয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন আচার্য আনন্দবর্ধন ও আচার্য অভিনবগুপ্ত যথাক্রমে ধ্বন্যালোকের বৃত্তি ও টীকা রচনা করিয়া। আনন্দবর্ধনের কাল নবম শতাব্দী এবং অভিনবগুপ্তের কাল দশম-একাদশ শতাব্দী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাহা হইলে এই ধ্বনিবাদ অন্ততঃ এক সহস্র বৎসর প্রাচীন।

সমগ্ররূপে কাব্যবিচারে এবং কাব্যের আস্বাদনে ধ্বনিবাদ বিশেষ সহায়তা করে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনায় ধ্বনির সমধিক উল্লাস দেখা যায়, ধ্বনি যেন আরও সূক্ষ্ম, রমণীয় ও মহনীয় হইয়া উঠিতেছে। তাই আমাদের আরব্ধ কাব্য-বিচারে দ্রুতি-কাব্য ও দীপ্তি-কাব্য আলোচনার প্রসঙ্গেই ধ্বনিকাব্যের স্বরূপ উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমান সাহিত্যে তাহার বিশেষ উপযোগিতা থাকায় বর্তমান সাহিত্য হইতেই আলোচ্য উদাহরণগুলি লইয়া বিশ্লেষণ করা হইবে।

ধ্বনি অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ। কাব্যের ধ্বনি বলিতে বুঝায় কাব্যের একটি অর্থ যাহা কাব্যের শব্দরাশি দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বুঝায় না, বুঝায় ইঙ্গিতে আভাসে ব্যঞ্জনায়, কাব্যের বাচ্যার্থের অনুরণনক্রমে। কাব্যের বাচ্যার্থ একটি মাত্র, তাহা যখন বাধিত না হইয়া নিজ স্বরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে, অথচ তাহাকে অতিক্রম করিয়া পাঠকের চিত্তে একই সময়ে আর একটি অর্থ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই প্রতীয়মান অর্থটিকে বলা হয় ধ্বনি। এই প্রতীয়মান অর্থটি বাচ্যার্থ দ্বারা আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট হয়, এবং অনেক সময়ে তাহা হইতে সমধিক মনোহর হইয়া থাকে। আঘাতের পর মুখ্য ঘণ্টানাদ থামিলেও যেমন একটি অনুরণন চলিতে থাকে, ঠিক তেমনি চিত্তে বাচ্যার্থ প্রবেশ করিবার পর, তাহারই প্রসঙ্গক্রমে নূতন

অর্থের সূক্ষ্ম স্পন্দন উঠিতে থাকে। এই অর্থ হয় বাচ্যার্থ দ্বারা দ্যোতিত, ব্যঞ্জিত, বা প্রতীয়মান। যে ব্যাপারের ফলে এই ধ্বনি প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বলে দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা বা ধ্বনন ব্যাপার। ধ্বনিকে ইংরেজীতে বলে 'spirit' বা suggested sense; ধ্বনন-ব্যাপারকে বলে suggestion। যে শক্তির বলে এই ধ্বনি আসে, তাহাকে বলে দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনা-শক্তি, ইংরেজীতে বলে power of suggestion। Ogden ব্যঞ্জনাকে বলিয়াছেন evocation in the listener।

ধ্বনিবাদিগণ বলেন, "কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ।" —ধ্বন্যালোক, ১।১

—কাব্যের আত্মা হইতেছে ধ্বনি।

বর্তমানযুগের পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ভারতীয়গণের ন্যায় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিতে না পারিলেও কাব্যের ধ্বনি কত বড় সম্পদ, তাহা স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। অক্সফোর্ড বক্তৃতামালায় কাব্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া মনস্বী পণ্ডিত ব্র্যাড্‌লে বলেন,—

"What does poetry mean? This unique expression, which cannot be replaced by any other, still seems to be trying to express something beyond itself.........About the best poetry, and not only the best, there floats an atmosphere of infinite suggestion. The poet speaks to us of one thing, but in this one thing there seems to lurk the secret of all.

This all-embracing perfection cannot be expressed in poetic words or words of any kind, nor yet in music or in colour, but the suggestion of it in much poetry, if not all, and poetry has in this suggestion, this 'meaning,' a great part of its value......... It is a spirit. It comes we know not whence. It will not speak at our bidding, nor answer in our language. It is not our servant; it is our master."

—*Poetry For Poetry's Sake, Oxford Lectures On Poetry.*

—"কাব্যের অর্থ কি? এই চমৎকার উক্তি, যাহার পরিবর্তে অন্য কিছুই বসান যায় না, মনে হয় যেন সর্বদাই ইহার অতীত কোন কিছুকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।......শ্রেষ্ঠ কবিতায়, আর শুধু শ্রেষ্ঠ কবিতায় কেন, সকল

কবিতায়ই ব্যঞ্জনার এক পরিমণ্ডল যেন ভাসিতেছে। কবি আমাদের কাছে একটি বিষয় বলেন, কিন্তু এই একটি বিষয়েই যেন সকল বিষয়ের রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে।

"এই সর্বব্যাপী সম্পূর্ণতাকে কাব্যাঙ্গ-ভূত শব্দরাশি, অথবা অন্যবিধ শব্দরাশি দ্বারা, কিংবা সঙ্গীত বা চিত্র দ্বারাও প্রকাশ করা যায় না; কিন্তু ইহার ব্যঞ্জনা, সকল না হইলেও, অনেক কবিতায়ই বিদ্যমান; এবং এই ব্যঞ্জনা, এই অর্থের মধ্যেই কাব্যের মূল্যের একটি বড় অংশ নিহিত রহিয়াছে। ইহা একটি ভাবাত্মা। আমরা জানি না কোথা হইতে ইহার আবির্ভাব হয়। আমাদের নির্দেশে ইহা কথা বলিবে না, আমাদের ভাষায়ও উত্তর দিবে না। ইহা আমাদের দাস নয়, ইহা আমাদের প্রভু।"

এই অনির্বচনীয় প্রভুকল্প ধ্বনি-নামক কাব্যার্থকে নির্বচন ও বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন ভারতীয় অলঙ্কারাচার্যগণ। আমাদের অভিমত স্থাপন করিবার পূর্বে আমাদের দুইটি কর্তব্য রহিয়াছে; এক,—অলঙ্কার হইতে ধ্বনির উৎপত্তি কি ভাবে হইয়াছে, এবং ধ্বনিকার ও তাঁহার অনুগামিগণ ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি বলিতে সুনির্দিষ্ট রূপে কি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রয়োজনানুযায়ী তাহা উপস্থিত করা। দ্বিতীয়,—ব্র্যাড্‌লের ন্যায় অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে কি মন্তব্য ও বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাও সংক্ষেপে প্রদর্শন করা।

ব্যঞ্জনা-ব্যাপার ধ্বনিবাদিগণ প্রথম আবিষ্কার করেন নাই, তাঁহাদের প্রতিপক্ষ মতও অনেক ছিল,—ইহা ধ্বন্যালোকের প্রথম কারিকা হইতেই অবগত হওয়া যায়। কারিকাটি নিম্নে দেওয়া হইল,

> কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈ র্যঃ সমাম্নাত-পূর্ব
> স্তস্যাভাবং জগদুরপরে ভাক্তমাহু স্তথান্যে।
> কেচিদ্ বাচাং স্থিতমবিষয়ে তত্ত্বমূচু স্তদীয়ং
> তেন ব্রূমঃ সহৃদয়-মনঃ-প্রীতয়ে তৎস্বরূপম্॥ —ধ্বন্যালোক, ১।১

—'কাব্যের আত্মা ধ্বনি বলিয়া বুধগণ কর্তৃক পূর্বেই পরম্পরাক্রমে যাহা সমাখ্যাত হইয়াছে, তাহার অস্তিত্ব নাই বলিয়া একদল পণ্ডিত ঘোষণা করেন; অন্যদল বলেন উহা ভাক্ত বা লাক্ষণিক মাত্র, কেহ কেহ তাহার তত্ত্বকে বাক্যের বিষয়ে স্থিত নয় অর্থাৎ বাক্য দ্বারা বুঝান যায় না বলিয়া মন্তব্য করেন। তাই আমরা সহৃদয় ব্যক্তির মনঃপ্রীতির জন্য তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছি।'

এই কারিকা হইতে অবগত হওয়া যায় ধ্বনিকারের পূর্ববর্তী বুধগণ কেবলমাত্র ধ্বনিকে জানিতেন না, ধ্বনি যে কাব্যের আত্মা তাহাও জানিতেন। আরও বুঝা যায় ধ্বন্যালোক-রচনাকালে ধ্বনিবাদিগণের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন তিন দল, ধ্বনি-সম্পর্কে তাঁহাদিগকে বলা যায়,—অভাব-বাদী, অন্তর্ভাব-বাদী বা লক্ষণান্তর্ভাব-বাদী, এবং অনির্বচনীয়তা-বাদী।

এই কারিকার বৃত্তিতে আনন্দবর্ধন মন্তব্য করিয়াছেন,—

…তথাপি গুণবৃত্ত্যা কাব্যেষু ব্যবহারং দর্শয়তা ধ্বনিমার্গো মনাক্ স্পৃষ্টো লক্ষ্যতে।

—ধ্বন্যালোক, বৃত্তি, পৃঃ ১০

—'তথাপি একদল পণ্ডিত কর্তৃক গুণবৃত্তিদ্বারা কাব্য-সমূহে ব্যবহার দেখাইয়া ধ্বনি-মার্গ অল্প স্পর্শ করা হইয়াছে দেখা যায়।'

আচার্য অভিনবগুপ্ত টীকায় বৃত্তির 'পরম্পরা' শব্দ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

পরম্পরয়া ইতি—অবিচ্ছিন্নেন প্রবাহেণ তৈঃ এতদ্ উক্তম্, বিনাপি বিশিষ্টপুস্তকেষু বিবেচনাদ্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। —ধ্বন্যালোক, টীকা, পৃঃ ৩

—'পরম্পরয়া'-অর্থ—পূর্ববর্তী বুধগণকর্তৃক অবিচ্ছিন্নপ্রবাহে ইহা উক্ত হইয়াছে, অবশ্য বিশিষ্ট পুস্তকে তাঁহারা ইহার বিবেচনা বা আলোচনা করেন নাই;—ইহাই অভিপ্রায়।

তাহা হইলে স্বয়ং ধ্বনিকার, আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত ধ্বনিবাদের মুখ্য আচার্যত্রয়ই বলেন ধ্বনিবাদ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ না হইলেও পূর্বসূরিগণ কর্তৃক কিয়ৎ পরিমাণে আলোচিত হইয়াছিল। ইহার পরেও ধ্বনিকার উহ্য ভাবে এবং আনন্দবর্ধন স্পষ্ট ভাবে ভট্ট উদ্ভট প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, রূপকাদি অলঙ্কার একস্থলে বাচ্যরূপে স্থিত হইলেও অন্যস্থলে প্রতীয়মান হইতে পারে—ইহা তাঁহাদের কর্তৃক বহুল রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।[১] ধ্বন্যালোকের কারিকা-সমূহ পাঠ করিলেই উপলব্ধি হয় যে, পূর্বে আলোচনা-পরম্পরা না থাকিলে সহসা এইরূপ অন্তর্দৃষ্টি-পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ও পরিপক্ব মতবাদ গ্রন্থ-বদ্ধ হইতে পারে না।

অবশ্য ব্যঙ্গ্যার্থ অর্থে ধ্বনিশব্দ অথবা স্বতন্ত্র ভাবে ব্যঞ্জনাবৃত্তির স্বীকৃতি পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থে পাওয়া না গেলেও ব্যঞ্জনা-ব্যাপারের আলোচনা ও উল্লেখ অলঙ্কারাচার্য-গণের অলঙ্কার-প্রকরণে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ অলঙ্কার হইতেই ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির

(১) ধ্বন্যালোক, ২।২৮, এবং ঐ বৃত্তি, পৃঃ ১০৮

উৎপত্তি। সাধারণ ভাবে বলা যায় ব্যঞ্জনা বা দ্যোতনা না থাকিলে অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কার অথবা উপমাদি অর্থালঙ্কারেরই বা তাৎপর্য কোথায়? বিশেষ অর্থেও পর্যায়োক্ত, সমাসোক্তি, অপ্রস্তুত-প্রশংসা, ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি অলঙ্কারে ব্যঞ্জনা বা অবগমনের আশ্রয় ব্যতীত অলঙ্কারত্বই সিদ্ধ হয় না। পর্যায়োক্ত অলঙ্কার তো প্রকৃত-পক্ষেই ধ্বনি। আমরা দেখিতে পাই অলঙ্কারের ও গুণের ব্যাখ্যানে 'ব্যঞ্জনা' বা 'ব্যঙ্গ্য হয়' বুঝাইবার জন্য ভামহ প্রয়োগ করিয়াছেন 'গুণসাম্য-প্রতীতেঃ'[১] এবং 'গম্যতে ঽন্যোঽর্থঃ'[২]; দণ্ডী 'প্রতীয়তে'[৩] এবং 'ব্যঞ্জিতম্'[৪]; উদ্ভট 'অবগম'[৫]; রুদ্রট 'অর্থান্তরম্ অবগময়তি'[৬]। উদ্ভটের ব্যাখ্যাকার প্রতীহারেন্দুরাজ অলঙ্কার-আলোচনার শেষ ভাগে নিজেই প্রশ্ন করিয়াছেন,—সহৃদয়গণ-কর্তৃক যে ধ্বনি নামে কাব্যধর্ম অভিহিত হইয়াছে, তাহা উদ্ভট-কর্তৃক উপদিষ্ট হয় নাই কেন? প্রশ্ন করিয়া উত্তরও নিজেই দিয়াছেন,—

এষু এব অলঙ্কারেষু অন্তর্ভাবাৎ।—কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ, ৬।৯, বৃত্তি, পৃঃ ৮৫
—'তাহা এই সকল অলঙ্কারের অন্তর্ভূত আছে বলিয়া।'

এইরূপ মন্তব্য করিয়া তিনি উদ্ভটালঙ্কারের মধ্যেই বস্তু, অলঙ্কার ও রস—এই ত্রিবিধ ধ্বনি রহিয়াছে, দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই পূর্বোল্লিখিত ধ্বনিবাদের বিরুদ্ধ অন্তর্ভাববাদ। যাহা হউক, আমাদের লক্ষ্য করার শুধু এই যে, ইন্দুরাজ আনন্দবর্ধনের প্রায় এক শতাব্দী পরে আবির্ভূত হইয়াও ধ্বনিবাদকে স্বীকার করেন নাই, এবং ধ্বনি অলঙ্কারেরই অন্তর্ভূত এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

আনন্দবর্ধনের বৃত্তিতে উল্লিখিত গুণবৃত্তি শব্দ ভারতীয় দর্শনের একটি পরিচিত শব্দ, দণ্ডী[৭] ও উদ্ভটেও ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভট রূপকালঙ্কারে প্রস্তুত ও অপ্রস্তুতের সম্বন্ধ গুণবৃত্তিদ্বারা বুঝাইয়াছেন।[৮] এই গুণবৃত্তি কিন্তু ঠিক

(১) ভামহালঙ্কার, প্রতিবস্তূপমা, ২।৩৪
(২) ঐ , সমাসোক্তি, ২।৭৯
(৩) কাব্যাদর্শ, উদারগুণ, ১।৭৬
(৪) ঐ , উদাত্ত অলঙ্কার, ২।৩০৩
(৫) কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ, পর্যায়োক্ত অলঙ্কার, ৪।৬, পৃঃ ৫৫
(৬) কাব্যালঙ্কার, ভাবালঙ্কার, ৭।৪০,
(৭) কাব্যাদর্শ ১।৯৫ এবং ২।২৫৪
(৮) কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ, ১।১১

ব্যঞ্জনা নয়। যাহা হউক, ব্যঞ্জনা শব্দ না হইলেও তাহার মুখ্য ব্যাপার আমরা কোন কোন অলঙ্কারে সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধি করি। বস্তুতঃ প্রতীহারেন্দুরাজ যে পর্যায়োক্ত অলঙ্কারকে ধ্বনি বলিয়া বুঝাইয়াছেন,[১] তাহা কিছুমাত্র অসমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ববর্তীদের উপলব্ধ ব্যঞ্জনা-ব্যাপার বুঝাইবার জন্য আমরা পর্যায়োক্ত অলঙ্কারটিকে পর্যালোচনা করিব। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভামহ পর্যায়োক্তের সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

পর্যায়োক্তং যদন্যেন প্রকারেণাভিধীয়তে। —ভামহালঙ্কার, ৩।৮

—'বক্তব্য সাক্ষাৎ ভাবে না বলিয়া যেখানে অন্য প্রকার বা ভঙ্গীদ্বারা অভিহিত হয়, সেখানে পর্যায়োক্ত অলঙ্কার।'

বলা বাহুল্য, ইহাই মুখ্য ব্যঞ্জনা-ব্যাপার। বক্তব্য যদি বস্তু হয়, তবে ইহাই বস্তুধ্বনি হইবে, অলঙ্কার হইলে অলঙ্কারধ্বনি হইবে। ভামহের পর দণ্ডী একই অর্থ আরও স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন,—

অর্থম্ ইষ্টম্ অনাখ্যায় সাক্ষাৎ তস্যৈব সিদ্ধয়ে।
যৎ প্রকারান্তরাখ্যানং পর্যায়োক্তং তদিষ্যতে॥ —কাব্যাদর্শ, ২।২৯৫

—'অভিপ্রেত অর্থ সাক্ষাৎ ভাবে না বলিয়া তাহারই সিদ্ধির জন্য যে অন্য প্রকারে বলা হয়, তাহাই পর্যায়োক্ত।'

উদ্ভট ব্যঞ্জনা-ব্যাপারটি বুঝাইতে একটি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ;—

পর্যায়োক্তং যদন্যেন প্রকারেণাভিধীয়তে।
বাচ্য-বাচক-বৃত্তিভ্যাং শূন্যেনাবগমাত্মনা॥

—কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ, ৪।৬, পৃঃ ৫৫

এখানে মূল সংজ্ঞাটি ভামহ হইতে গৃহীত। কিন্তু দ্বিতীয় চরণে উদ্ভট বলিলেন,—পর্যায়োক্ত সম্ভবপর হয় বাচ্য-বাচকের বৃত্তি-শূন্য অবগমাত্মক একটি বৃত্তিদ্বারা ;—বাচ্য-বাচক বা অভিধাবৃত্তিদ্বারা নয়, তাহার অতিরিক্ত অবগম অর্থাৎ ব্যঞ্জনাস্বভাব একটি বৃত্তি দ্বারা।

এখানে প্রকৃতপক্ষে হয়তো উদ্ভটের অজ্ঞাতসারে বাচ্য-বাচক বৃত্তি বা অভিধা-বৃত্তির অতিরিক্ত একটি অবগম-বৃত্তি স্বীকৃত হইল, উহাই ব্যঞ্জনা-বৃত্তি। পণ্ডিতগণের মতে উদ্ভট ছিলেন ধ্বনিকার এবং আনন্দবর্ধনের পূর্ববর্তী। উদ্ভটের পূর্ববর্তী দণ্ডী

(১) কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ, লঘুবৃত্তি, পৃঃ ৮৬

'সুব্যঞ্জিতম্' শব্দ প্রায় তুল্যার্থে প্রয়োগ করিলেও এখানে স্পষ্টতঃ অভিধাবৃত্তির পরে নূতন বৃত্তি অবগমের কথা উল্লিখিত হওয়ায় তাৎপর্য অনেক বেশী হইয়াছে।

উদ্ভটের পরে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে আসিলেন ধ্বনিবাদের মুখ্য আচার্য ধ্বনিকার ও আনন্দবর্ধন। আনন্দবর্ধনের প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে, দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সূরি হেমচন্দ্র স্পষ্টতঃ 'ব্যঙ্গ্য' শব্দদ্বারাই পর্যায়োক্তের সংজ্ঞা করিলেন,—

ব্যঙ্গ্যস্যোক্তিঃ পর্যায়োক্তম্। — কাব্যানুশাসন, পৃঃ ৩১৬

—'ব্যঙ্গ্যার্থের কথনই হইতেছে পর্যায়োক্ত।'

পর্যায়ের অর্থ তিনি লিখিয়াছেন 'ভঙ্গ্যন্তর' বা অন্য ভঙ্গী। অতএব ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনিও যাহা, পর্যায়োক্তও তাহাই।

কনিষ্ঠ বাগ্‌ভট ইহারও অন্ততঃ অর্ধশতাব্দী পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আসিয়া 'ব্যঙ্গ্য' শব্দও বর্জন করিয়া সাক্ষাৎ ভাবে ধ্বনিবাদীদের ধ্বনিশব্দের দ্বারাই—

ধ্বনিতাভিধানং পর্যায়োক্তিঃ।[১]

—'ধ্বনির প্রয়োগই পর্যায়োক্ত অলঙ্কার।'

—বলিয়া পর্যায়োক্তের সংজ্ঞা নির্দেশ করিলেন; এবং 'ধ্বনিতোক্তি' বুঝিবার জন্য আনন্দবর্ধনের গ্রন্থের উল্লেখ করিলেন।

এখানে পর্যায়োক্ত এবং ধ্বনিকে একেবারে এক ও অভিন্ন করিয়া দেখান হইল।

এক্ষণে শেষ অলঙ্কারাচার্য সপ্তদশ শতাব্দীর পণ্ডিত-রাজ জগন্নাথের সুস্পষ্ট অভিমত তুলিলেই এই বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত হয়। তিনি বলিলেন,—

"ধ্বনিকার হইতে প্রাচীন ভামহ, উদ্ভট প্রভৃতি-কর্তৃক স্ব স্ব গ্রন্থে কোথাও ধ্বনি, বা গুণীভূতব্যঙ্গ্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়াই তাঁহাদের কর্তৃক ধ্বনি প্রভৃতি স্বীকৃত হয় নাই,—এইরূপ আধুনিক যুক্তি অসঙ্গত। কেননা সমাসোক্তি, ব্যাজস্তুতি, অপ্রস্তুতপ্রশংসাদি অলঙ্কার নিরূপণদ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে হইলেও গুণীভূতব্যঙ্গ্যের ভেদ-সমূহ তাঁহাদের কর্তৃকই নিরূপিত হইয়াছে। অন্য সকল প্রকার ব্যঙ্গ্য-প্রপঞ্চ পর্যায়োক্ত-অলঙ্কারের কুক্ষিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।"[২]

জগন্নাথও সুস্পষ্ট মন্তব্য করিলেন,—ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি প্রকারান্তরে ধ্বনিকারের

(১) কাব্যানুশাসন, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ৩৬-৩৭

(২) রসগঙ্গাধর, পৃঃ ৪১৪-৪১৫

পূর্বেও ছিল; গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য ছিল সমাসোক্তি, ব্যাজস্তুতি, অপ্রস্তুতপ্রশংসা প্রভৃতি অলঙ্কারে; এবং প্রধানীভূত ব্যঙ্গ্য অর্থাৎ ধ্বনি ছিল পর্যায়োক্ত অলঙ্কারে।

অলঙ্কারের আলোচনা হইতেই ব্যঙ্গ্যার্থ এবং ধ্বনির উদ্ভব ও পুষ্টি, ইহা প্রদর্শিত হইল। বামন যে বলিয়াছেন,—'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ।'[১]—অলঙ্কার আছে বলিয়াই কাব্য উপাদেয়, কিংবা কাব্যশাস্ত্রের নাম যে অলঙ্কার-শাস্ত্র,—ইহার অর্থ এখন অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

অলঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইলেও প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ ধ্বনিকে স্ব-স্বরূপে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এবং সেই জন্যই বহুধা বিভক্ত তাহার বিচিত্র রূপকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। এ যেন মাতৃ-অঙ্গ হইতে কন্যা-দেহের উৎপত্তি! প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ তাহাকে শিশু কন্যারূপেই দেখিয়াছেন। কিন্তু যৌবনারূঢ়া হইয়া রূপ-লাবণ্যে ভাব-সৌন্দর্যে উল্লসিতা সে কন্যা আজ স্বতন্ত্ররূপে নিজ সংসারে অধিষ্ঠিতা। এই যৌবনোচ্ছ্বসিতা সুন্দরীই ধ্বনি-কার ও আনন্দবর্ধনের আরাধিতা ধ্বনি। ধ্বনির বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী কালের পরিচয় ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে মুছিয়া গিয়াছে।

ধ্বনি-তত্ত্বের সার-ভূত যে যে অংশ বাঙ্গালাসাহিত্যের আলোচনা ও আস্বাদনের জন্য একান্ত আবশ্যক, তাহাই আমরা এখন সংক্ষেপে উপস্থিত করিব। যাঁহারা বিশদ আলোচনা চান, তাঁহারা ধ্বন্যালোক ও কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

(২)

ধ্বনির পরিচয় ও প্রকার

বৈয়াকরণ ও নৈয়ায়িকগণ শব্দের দুইটি বৃত্তি বা শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন—অভিধা ও লক্ষণা। নির্দিষ্ট শব্দ নির্দিষ্ট অর্থকেই বুঝাইয়া থাকে, সকল অর্থকে বুঝায় না। যে শক্তি দ্বারা শব্দ সাক্ষাৎভাবে সঙ্কেতিত অর্থকে বুঝাইয়া থাকে, তাহার নাম অভিধা, অভিধাই শব্দের মুখ্যশক্তি। অভিধা-শক্তিদ্বারা লব্ধ অর্থকে বলে অভিধেয় অর্থ, বাচ্যার্থ বা শক্যার্থ।

বাক্যে অভিধাশক্তি দ্বারা মুখ্যার্থের উপলব্ধিতে বাধা জন্মিলে, যে শক্তিবলে বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট প্রকৃত অর্থের বোধ হয়, তাহার নাম লক্ষণা।

(১) কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি, ১।১

লক্ষণাশক্তিদ্বারা প্রতীত অর্থকে বলে লক্ষ্যার্থ বা লাক্ষণিক অর্থ। স্মৃতিদ্বারা বাচ্যার্থের জ্ঞান হয়, লক্ষ্যার্থের জ্ঞান হয় অনুমানশক্তি দ্বারা। এই লক্ষণা আবার মূলতঃ দুই প্রকার—রূঢ়িলক্ষণা এবং প্রয়োজন-লক্ষণা। প্রয়োজন-লক্ষণাই শুদ্ধা লক্ষণা।

রূঢ়ি-লক্ষণার উদাহরণ:—কলিঙ্গ সাহসিক। কলিঙ্গ নামক দেশ সাহসিক হইতে পারে না বলিয়া শব্দটির অর্থ কলিঙ্গদেশবাসী; কলিঙ্গ শব্দ কলিঙ্গদেশবাসী অর্থে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। ইহা রূঢ়ি অর্থাৎ প্রসিদ্ধি, লোক-ব্যবহারহেতু এইরূপ প্রয়োগের প্রসিদ্ধি; ইহাদ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করা হয় নাই। কলিঙ্গ না বলিয়া কলিঙ্গদেশবাসী বলিলে কোন ক্ষতি হইত না।

প্রয়োজন-লক্ষণার উদাহরণ:—(১) গঙ্গায় ঘোষেরা বাস করে, (২) কুন্তগুলি (বল্লমগুলি) প্রবেশ করিল।

প্রথম বাক্যে গঙ্গা শব্দ গঙ্গাতীর বুঝাইতেছে; কেননা, গঙ্গায় অর্থাৎ গঙ্গাজলে কেহ বাস করিতে পারে না, মুখ্যার্থের এখানে বাধা হওয়ায় তদ্-যুক্ত গঙ্গাতীর অর্থ বুঝাইতেছে। এখানে লক্ষণার প্রয়োজন হইতেছে গঙ্গানদীর শীতত্ব পাবনত্ব প্রভৃতি বিশেষ করিয়া বুঝান। গঙ্গায় না বলিয়া গঙ্গাতীরে বলিলে তাহা এত পরিস্ফুটরূপে বুঝাইত না।

দ্বিতীয় বাক্যে কুন্তগুলি কুন্ত-ধারী সৈন্যদের বুঝাইতেছে, কেননা, অচেতন বলিয়া কুন্তেরা প্রবেশ করিতে পারে না; মুখ্যার্থের বাধা হওয়ায় কুন্ত-ধারী অর্থ বুঝাইতেছে; এখানে লক্ষণার প্রয়োজন কুন্তগুলির 'অতিগহনত্ব', এবং উদ্যত ও আক্রমণাত্মক ভাব বিশেষ করিয়া বুঝান; কুন্ত-ধারীরা বলিলে এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না।

আমাদের মনে হয়, লক্ষণা মুখ্যতঃ শব্দের শক্তি নহে, ইহা বাক্যেরই শক্তি, শব্দবিশেষকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় মাত্র; প্রকৃত পক্ষে ইহা শব্দের ও বাক্যের সৌন্দর্য বা অলঙ্কার, এক প্রকার বক্রোক্তি মাত্র। কার্যতঃ দেখাও যায়, এই লক্ষণা দ্বারা যাহা বুঝায়, ইংরেজী সাহিত্যে তাহা Metonymy ও Synecdoche নামক দুইটি অলঙ্কারের অন্তর্গত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া লক্ষণাশক্তিদ্বারা যাহা পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে অনুমানশক্তি দ্বারাই গম্য হয়। অবশ্য ব্যাকরণের বিচারে লক্ষণাশক্তি ও লাক্ষণিক অর্থ মান্য করিলে অর্থোপলব্ধির অনেক জটিলতার সহজ সমাধান হয়, এবং সেই জন্যই পূর্ব আচার্যেরা ইহা মান্য করিয়া থাকিবেন।

অভিধা বা লক্ষণা শক্তি নিজ নিজ অর্থ বুঝাইয়া বিরত হইলে যে শক্তিবলে শব্দের

ঐ বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ অবলম্বন ও অতিক্রম[১] করিয়া অপর একটি নূতন অর্থের প্রকাশ হয়, তাহার নাম ব্যঞ্জনা। ব্যঞ্জনাশক্তিদ্বারা প্রাপ্ত অর্থকে বলা হয় ব্যঙ্গ্যার্থ, প্রতীয়মান অর্থ, দ্যোতিত অর্থ বা ধ্বনি।

ব্যঞ্জনাকে মূলতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে,—শব্দগত বা শাব্দী এবং অর্থগত বা আর্থী। শাব্দী ব্যঞ্জনা আবার দুই প্রকার,—লক্ষণা-মূলা এবং অভিধা-মূলা।

যে ব্যঞ্জনাশক্তিদ্বারা লক্ষণার প্রয়োজনের প্রতীতি বা উপলব্ধি হয়, তাহাই লক্ষণা-মূলা ব্যঞ্জনা; যেমন 'গঙ্গায় ঘোষেরা বাস করে' বলিলে লক্ষণাশক্তিদ্বারা 'গঙ্গায়' অর্থ কেবল মাত্র 'গঙ্গাতীরে' পাওয়া যায়; শীতত্ব পাবনত্ব প্রভৃতি প্রয়োজন লক্ষণাশক্তিদ্বারা পাওয়া যায় না। তাহার প্রতীতি হয় লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনা শক্তিদ্বারা।

(১) ব্র্যাডলে *Poetry for Poetry's Sake* প্রবন্ধে প্রথমে বলিলেন,—কাব্য ইহার অতীত ('beyond itself') কিছুকে বুঝাইতে চেষ্টা করে; পরে টিপ্পনী করিয়া যাহা বলিলেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য,—

"Of course, I should add, it is not *merely* beyond them or outside of them. If it were, they (the poems) could not 'suggest' it. They are partial manifestation of it, and point beyond themselves to it, both because they *are* a manifestation and because this is partial."

—*Oxford Lectures on Poetry*, p. 33, Note G.

—'অবশ্য আমি আরও বলিতে চাই, ইহা কেবলমাত্র তাহাদের অতীত নয় অথবা বহির্ভূতও নয়। এইরূপ হইলে তাহারা (কাব্য) ইহার ব্যঞ্জনা করিতে পারিত না। তাহারা ইহার এক আংশিক প্রকাশ এবং তাহাদের নিজরূপ অতিক্রম করিয়া ইহার দিকেই ইঙ্গিত করে; কেন না তাহারা একটি প্রকাশও বটে, আবার এই প্রকাশ আংশিকও বটে।'

এখানে বাচ্য বা লক্ষ্যার্থের সহিত ব্যঙ্গ্যার্থের সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া বুঝান হইয়াছে। 'ইহা' অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যার্থ সারবস্তু—'spirit'; তাহারা অর্থাৎ কাব্য, এখানে বাচ্যার্থ। ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থের অতীত নয়। বাচ্যার্থ ব্যঙ্গ্যার্থের আংশিক প্রকাশ বলিয়াই তাহার পূর্ণ প্রকাশকে ইঙ্গিত করিতে পারে। ব্যঞ্জনা তাই বাচ্যার্থকে অবলম্বন ও অতিক্রম করিয়া পূর্ণ ব্যঙ্গ্যার্থকে প্রকাশ করে।

যে ব্যঞ্জনা শক্তিদ্বারা অনেকার্থ-শব্দের অভিধেয় অর্থকে আশ্রয় করিয়া অপর একটি অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাই অভিধা-মূলা ব্যঞ্জনা; যেমন,—শূলপাণি কর্তৃক কথিত হইতেছে। এখানে শূলপাণি শাস্ত্রকারের নাম, কিন্তু ইহার আর একটি অর্থ মহাদেব। প্রথম অর্থ অর্থাৎ বাচ্যার্থ প্রতীত হইবার পর শব্দের অনেকার্থতা আশ্রয় করিয়া অনুরণনক্রমে আর একটি অর্থ পাওয়া যাইতেছে—শূলপাণি শুধু শূলপাণি ন'ন, সাক্ষাৎ মহাদেব; মহাদেব কর্তৃকই কথিত হইতেছে। স্পষ্টতঃই দেখা যায়, এইরূপ ব্যঞ্জনার জন্য অভিধাশক্তি-মূলে শব্দের একাধিক অর্থ থাকা চাই, কিন্তু প্রকরণাদি দ্বারা মাত্র একটি অর্থ বাচ্য হওয়া চাই এবং এই বাচ্যার্থই মুখ্য হওয়া চাই। উভয় অর্থই যুগপৎ বাচ্য হইলে এবং যুগপৎ প্রতীত হইলে সেখানে শ্লেষ অলঙ্কার হয়, কোন ব্যঞ্জনা থাকে না।

এই উভয়বিধ ব্যঞ্জনাই শব্দগত বা শাব্দী, ইহারা শব্দব্যাপারকে অপেক্ষা করে বলিয়া মুখ্যতঃ শব্দশক্তি হইতে উদ্ভূত। এইজন্য এইরূপ ব্যঞ্জনা দ্বারা লভ্য ধ্বনিকে বলা হয় শব্দশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি।

বাকী রহিল অর্থ-গত ব্যঞ্জনা বা আর্থী ব্যঞ্জনা এবং অর্থশক্তি হইতে উদ্ভূত ধ্বনি বা অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি।

যে ব্যঞ্জনাশক্তি দ্বারা বাচ্যার্থকে আশ্রয় করিয়া বক্তা, বোদ্ধব্য, প্রকরণ, দেশ, কাল, কণ্ঠস্বর বা অঙ্গচেষ্টা প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য-হেতু অন্য একটি অর্থ প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম অর্থ-গত বা আর্থী ব্যঞ্জনা; যেমন,—'সূর্য অস্ত গেল'—এই বাক্যের বক্তা ও বোদ্ধব্য যদি গুরুশিষ্য হয়, তাহা হইলে অর্থ বুঝিতে হইবে সন্ধ্যা-বন্দনার বা পাঠের সময় উপস্থিত। বাক্যটির বক্তা ও বোদ্ধব্য যদি প্রভু ও ভৃত্য হয়, তবে অর্থ বুঝিতে হইবে গোধন আনয়ন বা দীপদান প্রভৃতি সান্ধ্য গৃহ-কার্যের সময় উপস্থিত। এইরূপে বাক্যটির বক্তৃ-বোদ্ধব্য-ভেদে আরও অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে। এখানে কেবলমাত্র শব্দ-গত কোন ব্যঞ্জনা-ব্যাপার নাই। শব্দ-ব্যাপারের অপেক্ষা না রাখিয়া বাক্যের একটি অর্থের দ্বারা অন্য একটি আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। অর্থশক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া এই ধ্বনিকে বলা হয় অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি।

ধ্বনি-কার সহৃদয়-শ্লাঘ্য কাব্যার্থের দুইটি ভেদের কথা বলিয়াছেন—বাচ্যার্থ ও প্রতীয়মান অর্থ। বাচ্যার্থ অভিধাশক্তি দ্বারা লভ্য মুখ্যার্থ; প্রতীয়মান অর্থ

ব্যঞ্জনা-শক্তি দ্বারা লভ্য ব্যঙ্গ্যার্থ। ধ্বনিকার বাচ্যার্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়া প্রতীয়মান অর্থ-সম্বন্ধে বলিতেছেন—

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব
বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং
বিভাতি লাবণ্যম্ ইবাঙ্গনাসু॥ —ধ্বন্যালোক, ১।৪

—'অঙ্গনাজনের লাবণ্যের ন্যায় মহাকবিগণের বাণীতে প্রতীয়মান অর্থ নামে অন্য একটি বস্তু থাকে, যাহা তাহাদের প্রসিদ্ধ অবয়বের অতিরিক্ত অন্য কিছু।'

অঙ্গনাজনের লাবণ্য যেমন তাহার অবয়বের অতিরিক্ত অন্য জিনিস, অথচ তাহা অবয়বের দ্বারাই প্রকাশিত হয়, প্রতীয়মান অর্থও সেই প্রকার কাব্যের অবয়বস্বরূপ শব্দ, অলঙ্কার, গুণ, রীতি প্রভৃতি লইয়া যে বাচ্যার্থ, তাহার অতিরিক্ত অন্য জিনিস; কিন্তু ঐ বাচ্যার্থ দ্বারাই তাহার প্রকাশ ঘটে। বাচ্যার্থ তাই মোটেই তুচ্ছ করিবার নয়। ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য হইলেও বাচ্যার্থকেই প্রথম উপাসনা করিতে হইবে,—

আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবান্ জনঃ।
তদুপায়তয়া তদ্বদ্ অর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ॥ —ধ্বন্যালোক, ১।৯

—'আলোক যিনি চান, তিনি যে প্রকার তাহার উপায়স্বরূপ দীপশিখায় যত্নবান্ হ'ন, ব্যঙ্গ্যার্থের যিনি আদর করেন, তিনিও সেই প্রকার বাচ্যার্থের প্রতি যত্নশীল হ'ন।

দীপপাত্র, তৈল, বর্তিকা, এমন কি শিখা ও তাপ যেন বাচ্যার্থ; ব্যঙ্গ্যার্থ হইতেছে দীপশিখা হইতে বিচ্ছুরিত তাহার প্রভা, তাহা গৃহের অন্তর ও বাহির সমস্তই আলোকিত করে।

এই ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির সংজ্ঞা দিতেছেন ধ্বনিকার,—

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থম্ উপসর্জনীকৃত-স্বার্থৌ।
ব্যঙ্‌ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ॥

—ধ্বন্যালোক, ১।১৩

—'যেখানে কাব্যের অর্থ বা শব্দ আপনাদিগকে অপ্রধান করিয়া সেই প্রতীয়মান অর্থকে ব্যঞ্জিত করে, সেখানে সেই ব্যঙ্গ্যার্থরূপ কাব্য-বিশেষই পণ্ডিতগণ কর্তৃক ধ্বনি বলিয়া কথিত হয়।'

থাটি ধ্বনি হইতে হইলে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য এবং সমধিক মনোহারিত্ব চাই। ব্যঙ্গ্যার্থ থাকিয়া তাহা যদি অপ্রধান হয় অর্থাৎ বাচ্যার্থ অপেক্ষা অধিক মনোহারী না হইয়া তাহা যদি বাচ্যার্থকেই অধিক মনোহারী করিয়া তুলে, তবে তাহা আসল ধ্বনিকাব্যের বিষয় হয় না। এইরূপে সমাসোক্তি, ভ্রান্তিমান্, সংশয় প্রভৃতি অলঙ্কারে ব্যঙ্গ্যার্থ থাকিলেও তাহা প্রকৃত ধ্বনিপদবাচ্য হয় না। বৃত্তিকার আনন্দবর্ধন বলিতেছেন,—

ব্যঙ্গ্য-প্রাধান্যে হি ধ্বনিঃ। ন চৈতৎ সমাসোক্ত্যাদিষু অস্তি॥

—ধ্বন্যালোক, ১।১৩, বৃত্তি, পৃঃ ৩৫

—'ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য থাকিলেই ধ্বনি হয়, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারে তাহা নাই।'

ধ্বনিকার এই কথাই প্রথম উদ্দ্যোতের চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ কারিকায় আরও স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাহুল্য বলিয়া এখানে আর উল্লিখিত হইল না।

এখন কয়েকটি উদাহরণ লওয়া যাইতেছে,—

নীলসিন্ধু, শ্বেত বেলা ; বেলায় তরঙ্গ-খেলা ;
দিতেছে বেলায় সিন্ধু শ্বেত পুষ্পহার,
গাহিয়া আনন্দ গীত, চুম্বি অনিবার। —প্রভাস, ১ম সর্গ

এখানে স্পষ্টতঃ সমাসোক্তি অলঙ্কার ; অপ্রস্তুত নায়কনায়িকার ব্যবহার সিন্ধু ও শ্বেত বেলার উপর আরোপ করিয়া অলঙ্কারটি সিদ্ধ হইয়াছে। এখানে বর্ণনার বাচ্যার্থ হইতে নায়ক-নায়িকার তাদৃশ ব্যবহাররূপ নূতন এক অর্থ বা বস্তু প্রতীয়মান হইতেছে, এবং তাহাই ব্যঙ্গ্যার্থ।

এখন প্রশ্ন এই,—আলোচ্য কাব্যাংশে ব্যঙ্গ্যার্থটি প্রধান, না বাচ্যার্থ প্রধান? লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে বাচ্যার্থই এখানে প্রধান, ব্যঙ্গ্যার্থরূপ সমাসোক্তি অলঙ্কার তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়া চমৎকারিত্ব বাড়াইয়াছে মাত্র। অতএব এই কাব্যাংশে আসল ধ্বনি নাই। ইহাকে তাই বলা হয় গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য, ব্যঙ্গ্যার্থ যেখানে মুখ্য না হইয়া গুণীভূত বা গৌণ হইয়াছে। ব্যঞ্জনা ব্যতীত সমাসোক্তি হয় না। সমাসে বা সংক্ষেপে উক্তি বলিয়া সমাসোক্তি ; এই সংক্ষিপ্ততাই এখানে ব্যঞ্জনার আশ্রয়।

ধ্বনিকার বলিয়াছেন,—

ব্যঙ্গ্যস্য যত্রাপ্রাধান্যং বাচ্যমাত্রানুযায়িনঃ।
সমাসোক্ত্যাদয়স্তত্র বাচ্যালংকৃতয়ঃ স্ফুটাঃ॥—ধ্বন্যালোক, ১।১৪

—'ব্যঙ্গ্য যেখানে কেবলমাত্র বাচ্যার্থের অনুযায়ী, অতএব অপ্রধান, সেখানে সমাসোক্তি প্রভৃতি স্পষ্টতঃ বাচ্যালঙ্কার।'

ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, ধ্বনিকার এবং তাঁহার মত অনুসরণ করিয়া আনন্দবর্ধন প্রভৃতি এইরূপ স্থলে ব্যঙ্গ্যার্থ পান, কিন্তু অপ্রধানরূপে। অতএব তাহা আসল ধ্বনি নয়।

আর একটি উদাহরণ লওয়া যাক, রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি। সমগ্র কবিতাটি সমাসোক্তি অলঙ্কারের চমৎকার উদাহরণ; ইংরেজী মতে এখানে **Personification**। এখানে কারারুদ্ধ মহাপ্রাণের গতি, বেগ, ব্রতসাধনার উন্মাদনা প্রভৃতি ধর্ম বা ব্যবহার গুহা-রুদ্ধ নির্ঝরের উপর আরোপ করিয়া নির্ঝরের বর্ণনা সিদ্ধ করা হইয়াছে। এখানেও তাই প্রকৃত বস্তু-ধ্বনি নাই, আছে এক অপ্রধান ব্যঙ্গ্যার্থ, যাহা দ্বারা নির্ঝর মহিমান্বিত হইয়াছে।

ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কারের একটি উদাহরণ লওয়া যাক,—

দেখ সখে, উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি-
প্রতিবিম্ব করি দরশন।
জলে কুবলয়-ভ্রমে বার বার পরিশ্রমে
ধরিবারে করয়ে যতন॥

এখানেও বলা যাইতে পারে যে, এই বাক্যে বাচ্য ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার, তাহার ব্যঞ্জনা হইতেছে একটি উপমা অলঙ্কার; কারণ এখানে আসল বক্তব্য হইতেছে সুন্দরীর নয়ন ও পদ্মের আশ্চর্য সাদৃশ্য। ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কারের সংজ্ঞা হইতেই বুঝা যায় যে, সেখানে কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ ভ্রম দুইটি বস্তুর সৌসাদৃশ্য জ্ঞাপন করিবে।

যাহা হউক, রচনায় ব্যঙ্গ উপমা ভ্রান্তিমান্‌কে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, ভ্রান্তিমান্‌ই সমধিক চমৎকার-জনক হইয়াছে। অতএব এখানেও অলঙ্কার-ধ্বনি নাই, ইহাও গুণীভূত ব্যঙ্গ কাব্য।

ধ্বনিকার ইহার পর দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে ধ্বনিকাব্যের নানা ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন; আমাদের বক্তব্য উপস্থিত করিবার পূর্বে মুখ্য ভেদগুলির হিসাব লওয়া প্রয়োজন; এবং তাহারও পূর্বে ধ্বনি শব্দ কোথা হইতে কি ভাবে গৃহীত হইল, উল্লেখ করা সঙ্গত।

ধ্বনিশব্দ আলঙ্কারিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন ব্যাকরণ-শাস্ত্র হইতে, ইহা তাহাদের আবিষ্কার বা সৃষ্টি নহে। কোন শব্দই এক প্রযত্নে উচ্চারণ করা যায় না, পর পর

একটি একটি বর্ণ করিয়া গোটা শব্দটি উচ্চারণ করিতে হয়। কলস শব্দ তিন প্রযত্নে তিনটি বর্ণের ক্রমিক ধারায় উচ্চারিত হইবে,—ক-ল-স। যিনি শুনিবেন, তিনিও তিন প্রযত্নে ক্রমিক ধারায় উহা শুনিবেন। তাঁহার চিত্তে 'ক' ও 'ল'-বর্ণের অনুভব-জনিত সংস্কারের সহিত চরম বর্ণ 'স' অনুভূয়মান হইবে। ব্যাকরণ-শাস্ত্রে শব্দের পূর্ব পূর্ব বর্ণের অনুভব-জনিত সংস্কারের সহিত অনুভূয়মান চরম বর্ণকে বলে ধ্বনি। এই 'ধ্বনি' দ্বারা শ্রোত্রে একটি ব্যাপার হইলে শ্রোত্রে শব্দ বা পদের বোধ হয় এবং পরে চিত্তে অর্থপ্রতীতি জন্মে। শ্রোত্রে অনুভূত পদই 'স্ফোট'। স্ফোট সাক্ষাৎভাবে অর্থের প্রতীতি জন্মায়, অতএব প্রধানীভূত। এই প্রধানীভূত স্ফোটের ব্যঞ্জক হইল 'ধ্বনি' বা চরম বর্ণাত্মক শব্দ।

ব্যাকরণশাস্ত্রের মতে চরমবর্ণাত্মক শব্দরূপে ধ্বনি যেমন প্রধানীভূত স্ফোটকে বুঝায়, সেইরূপ অলঙ্কারিকদের মতে বাচ্যার্থ-ধ্বনি কাব্যের প্রধানীভূত ব্যঙ্গ্যার্থকে বুঝায়।

ধ্বনির স্বরূপ নির্ধারণ করিয়া ধ্বনিকার ও আনন্দবর্ধন তাহাকে মূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা—

অ-বিবক্ষিত-বাচ্য এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য।

যেখানে বাক্যের বাচ্যার্থ মোটেই বিবক্ষিত অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বা অভিপ্রেত নয়, প্রতীয়মান অর্থই আসল অর্থ, সেখানে ধ্বনি অ-বিবক্ষিত-বাচ্য।

ইহাও আবার দুই প্রকার বলিয়া তাঁহারা দেখাইয়াছেন,—অর্থান্তরে-সংক্রমিত এবং অত্যন্ত-তিরস্কৃত। যেখানে বাচ্যার্থ নিজ অর্থ না বুঝাইয়া অর্থান্তর অর্থাৎ অন্য অর্থ বুঝায়, সেখানে তাহা অর্থান্তরে-সংক্রমিত ; যেমন,—

তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন তোমাকে বলি, এখানেই থাক।

এখানে 'বলি' পদের অর্থ 'উপদেশ করি', পদটির বাচ্যার্থ অভিপ্রেত নয়, তাহা অর্থান্তরে সংক্রমিত হইয়াছে।

যেখানে বাচ্যার্থ নিজ অর্থকে অত্যন্ত তিরস্কৃত অর্থাৎ দূরীভূত করিয়া একেবারে বিপরীত অর্থ বুঝায়, সেখানে তাহা অত্যন্ত তিরস্কৃত ; যেমন—

অনেক উপকার করিয়াছেন মহাশয়, এ বিষয়ে আর কি বলিব, এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া দীর্ঘকাল সুখে বাঁচিয়া থাকুন।

প্রস্তাবক্রমে ইহা কোনও অপকারী ব্যক্তির প্রতি অপকৃত ব্যক্তির উক্তি, আর্থী ব্যঞ্জনা দ্বারা বাক্যটির অর্থ ঠিক উল্টা,—

অনেক অপকার করিয়াছেন মহাশয়, এ বিষয়ে আর কিছু বলিবার নাই, এইরূপ অনুষ্ঠান আর না করিয়া শীঘ্রই আপনি মরুন।

আনন্দবর্ধনাচার্য "বিধিরূপে প্রতিষেধরূপঃ" বলিয়া প্রতীয়মান অর্থের যে উদাহরণটি[১] তুলিয়াছেন, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করা হইল,—

ভ্রম ধার্মিক! বিশ্রব্ধঃ স শুনকোঽদ্য মারিত স্তেন।

গোদাবরী-নদীকূল-লতাগহন-বাসিনা দৃপ্তসিংহেন॥—ধ্বন্যালোক, ১।৪, বৃত্তি

—'হে ধার্মিক! নিশ্চিন্ত হইয়া তুমি এখন ভ্রমণ করিতে পার। সেই কুকুরটি আজ গোদাবরী নদীর কূলে লতা-গহনের মধ্যে যে দৃপ্ত সিংহ বাস করে, তাহা দ্বারা নিহত হইয়াছে।'

শ্লোকটি ধ্বনির একটি উত্তম উদাহরণ, কোন প্রেমিকার প্রিয়মিলনকুঞ্জে এক ধার্মিক আসিয়া পুষ্প পত্র চয়ন করিয়া উহার গোপনীয়তা ও রমণীয়তা নষ্ট করিতেন। কিন্তু ঐ স্থানের একটি কুকুরের ভয়ে সাধুটি সর্বদা নিশ্চিন্ত মনে কুঞ্জে আসিতে পারিতেন না। তাঁহার প্রতি বিদগ্ধা প্রেমিকাটির উক্তি। বাচ্যার্থে পাওয়া যায় ভ্রমণ করার বিধি, কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি হইতেছে নিষেধবাক্য, একেবারে বিপরীত অর্থ। বাক্যটির তাৎপর্য এই যে, কুকুরটি নাই বটে, কিন্তু দৃপ্ত সিংহ বাহির হইয়াছে, অতএব সাবধান! তুমি এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাও।

এখানে অত্যন্ত-তিরস্কৃত অবিবক্ষিত-বাচ্য ধ্বনি।

ধ্বনির দ্বিতীয় মুখ্যভেদ হইতেছে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য। এখানে বাচ্যার্থ বিবক্ষিত অর্থাৎ বক্তার অভিপ্রেত হইয়াও তাহা অন্য-পর, অন্য একটি অর্থকে পর বা প্রধানরূপে ব্যঞ্জিত করে। বাচ্য অর্থটি বাচ্য হইয়াই থাকে, কিন্তু আর একটি অর্থকে অনুরণন-ক্রমে ব্যঞ্জিত করিয়া তাহাকেই প্রধান করিয়া তুলে। ইহাই প্রকৃত ধ্বনিকাব্যের বিষয়।

ইহাও আবার দুই প্রকার, অ-সংলক্ষ্যক্রম এবং সংলক্ষ্যক্রম। যেখানে বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থ উদ্ভবের ক্রম লক্ষ্য করা যায় না, বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ একই কালে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হয়, সেখানে অসংলক্ষ্য-ক্রম ধ্বনি। ব্যঙ্গ্যার্থ উৎপত্তির ক্রম কিছু থাকিলেও, তাহা উৎপল-পত্র-শত ভেদের ন্যায় এত দ্রুত ও সূক্ষ্মভাবে নিষ্পন্ন হয় যে, ক্রম সম্যক্ রূপে লক্ষ্য করা যায় না। রসাত্মক কাব্যমাত্রই সাধারণতঃ

(১) মূলে উদাহরণটি প্রাকৃত ভাষায় আছে, এখানে উহার সংস্কৃতছায়া দেওয়া হইল।

অসংলক্ষ্য-ক্রমধ্বনির উদাহরণ। স্থায়ী ভাব, সঞ্চারী ভাব, বিভাব ও অনুভাব আসিয়া কাব্যপাঠমাত্রই অন্তঃকরণে রসের সঞ্চার করে, রসোদ্বোধের ক্রম কাল-পারম্পর্য দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় না। আনন্দবর্ধন বলিতেছেন,—

যত্র সাক্ষাচ্ছব্দনিবেদিতেভ্যো বিভাবানুভাবব্যভিচারিভ্যো
রসাদীনাং প্রতীতিঃ স তস্য কেবলস্য মার্গঃ।

—ধ্বন্যালোক, ২।২৩, বৃত্তি, পৃঃ ১০২

—'যেখানে সাক্ষাৎ ভাবে শব্দ দ্বারা নিবেদিত বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ভাব হইতে রস প্রভৃতির প্রতীতি হয়, সেখানেই কেবল অ-লক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গ্য ধ্বনির বিষয়।'

তিনি কুমারসম্ভবকাব্যের বসন্তপুষ্পাভরণে সজ্জিতা উমার আগমন প্রভৃতির বর্ণনা, মদনের শরসন্ধান এবং কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য হরের উমা মুখের প্রতি নয়ন-পাত, এই সকল বর্ণনাই অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনির উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

নাম হইতেই বুঝা যায়, সংলক্ষ্য-ক্রম ধ্বনিতে বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতীতির ক্রম সম্যক্ রূপে লক্ষ্য করা যায়। বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতীতির কালের পৌর্বাপর্য স্পষ্টরূপে জানা যায়; উভয় অর্থ একইকালে প্রকাশিত হয় না। এখানেও অবশ্য বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থ অনেক বেশী রমণীয় হইয়া থাকে।

উদাহরণ,—

এবং বাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলা-কমল-পত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী॥ —কুমারসম্ভব, ৬।৮৪

—'দেবর্ষি এইরূপ বলিলে পিতার পার্শ্বে অধোমুখে উপবিষ্টা পার্বতী লীলাকমলের পত্রগুলি গণনা করিতে লাগিলেন।'

আনন্দবর্ধন এই শ্লোকটির আলোচনায় ইহাকে সংলক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গ্যের উদাহরণরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই শ্লোকের বাচ্যার্থ লীলাকমলের পত্রগণনা, কিন্তু ইহার সাক্ষাৎ কোন মনোহারিত্ব নাই, তাৎপর্য অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় দেবর্ষি নারদ হরের সহিত পার্বতীর পরিণয়ের প্রস্তাব আনায় পার্বতীর কুমারীসুলভ যে লজ্জা হইয়াছে, তাহা গোপন করিয়া তিনি যেন কিছুই শুনিতেছেন না, অন্যকার্যে মন দিয়াছেন—এইরূপ একটি ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এখানে লীলাকমল-পত্রগণনা দ্বারা পূর্বরাগের লজ্জারূপ ব্যঙ্গ্যার্থ ধ্বনিত করা হইয়াছে। ব্যঙ্গ্যার্থ-প্রতীতির ক্রমটি সংলক্ষ্য হইয়াছে এবং উহা বাচ্যার্থ হইতে সমধিক মনোহারী

হইয়াছে। এ কাব্যে স্থায়ী ভাব রতি, সঞ্চারী ভাব হইতেছে ব্যঞ্জিত লজ্জা। ইহাও যে অবসানে রস-ধ্বনি হইয়াছে, তাহা আনন্দবর্ধন লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য,—

ইহ তু সামর্থ্যাক্ষিপ্ত-ব্যভিচারিমুখেন রসপ্রতীতিঃ।

—ধ্বন্যালোক, ২।২৩, বৃত্তি, পৃঃ ১০৩

—'এখানে কিন্তু কাব্যার্থের সামর্থ্যদ্বারা যে ব্যভিচারী ভাব আক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহারই সাহায্যে রসের প্রতীতি হইতেছে।'

একটি সাধারণ উদাহরণ লওয়া হইতেছে,—

স্দূর গগনে কাহারে সে চায় ?
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায় ?
নবমালতীর কচিদলগুলি
আনমনে কাটে দশনে।—ক্ষণিকা, নববর্ষা

বাচ্যার্থ এখানে স্পষ্ট, তাহাতে কিছুমাত্র মনোহারিত্ব নাই। কিন্তু নববর্ষার বর্ণনা-প্রসঙ্গে পংক্তিটি পড়িলেই মনে আসে বিরহিণী বধূর চিত্র, ঘট লইয়া ঘাটে গিয়াছে সে জল আনিতে, বধূ আনমনা, সে ভাবিতেছে প্রবাসী প্রিয়তমের কথা, এদিকে বাতাসের হিল্লোলে ঘট কোথায় ভাসিয়া গেল! এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ উপলব্ধির ক্রমটি লক্ষ্য করা যায়, অতএব ইহা সংলক্ষ্য-ক্রম-ব্যঙ্গ্য ধ্বনির উদাহরণ।

বৈষ্ণব-পদসাহিত্য হইতে সংলক্ষ্য-ক্রম রস-ধ্বনির একটি উদাহরণ দেওয়া হইল,—

যমুনা সিনানে যাই আঁখি মেলি নাই চাই
তরুয়া কদম্ব-তল পানে।
যথা তথা বসি থাকি বাঁশীটি শুনি গো যদি
দুটি হাত থাকি দিয়া কাণে॥ —চণ্ডীদাস

যমুনাস্নানে গিয়া কদম্বতরুর দিকে না চাওয়া এবং বাঁশীটি শুনিলেই কানে হাত দিয়া থাকা হইতেছে বাচ্যার্থ। এখানে 'কালাপরিবাদ' এড়াইবার জন্য শ্রীমতী রাধিকার এই আত্মগোপনের চেষ্টা। রাধিকার আপাত-দৃষ্ট ঔদাসীন্য, বিরাগ বা বিদ্বেষভাব তাহার অন্তরের পরম অনুরাগ বা স্থায়ী ভাব রতিকে ব্যঞ্জিত করিতেছে। রাধিকার অন্তর আদরের কদম্বতরুর তলেই তাকাইতে চায় এবং কান ভরিয়া বাঁশীর স্থরই শুনিতে চায়। ব্যঙ্গ্যার্থই এখানে প্রধান ও সমধিক মনোহর এবং তাহা পাওয়া যাইতেছে নানা চিন্তা ও অনুসন্ধানের মধ্য দিয়া। এখানে কোন সঞ্চারী ভাব নয়,

স্থায়ী ভাব রতিরই ব্যঞ্জনা হইয়াছে। ক্রম স্পষ্টতঃ লক্ষণীয়, তাই এখানে সংলক্ষ্য-ক্রম রস-ধ্বনি।

ধ্বনিবাদিগণ অন্তদৃষ্টি হইতে ধ্বনিকে রস-ধ্বনি, বস্তু-ধ্বনি ও অলঙ্কার-ধ্বনি এই তিন প্রকারে ভাগ করিয়াছেন। রসধ্বনির উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে, ইহা প্রায়শঃ অসংলক্ষ্য-ক্রম, ক্বচিৎ সংলক্ষ্য-ক্রম। বস্তুধ্বনি এবং অলঙ্কার-ধ্বনি উভয়ই কিন্তু সংলক্ষ্য-ক্রম। যেখানে বাচ্যার্থ হইতে একটি বস্তু বা অলঙ্কার ব্যঞ্জিত হয় এবং উহা বাচ্যার্থ হইতে সমধিক মনোহারী হইয়া প্রধান হয়, সেখানে ধ্বনিকে যথাক্রমে বস্তুধ্বনি বা অলঙ্কার-ধ্বনি বলা হইয়া থাকে। ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থ হইতে প্রধান না হইলে ধ্বনি হয় না, তাহা গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা-সাহিত্য হইতেই দুইটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। শ্রীরামচন্দ্র দেবগণের আনুকূল্য এবং চামুণ্ডাদেবীর আশীর্বাদ পাইয়া থাকিলেও মেঘনাদ বধের জন্য লক্ষ্মণকে লঙ্কাপুরীর অভ্যন্তরে যাইতে দিতে চাহিতেছেন না। তিনি লক্ষ্মণকে বলিতেছেন,—

নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি! আমি বাঁধিনু তোমারে;
অসংখ্য রাক্ষস-গ্রাম বধিনু সংগ্রামে;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
সসৈন্যে; শোণিত-স্রোতঃ, হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে!
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে—
হারাইনু ভাগ্যদোষে; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী; তাহারে
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট! কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা।

—মেঘনাদবধ কাব্য, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৫২-৬৭

রামচন্দ্রের উক্তির মধ্যে যে বিলাপ ও নৈরাশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই এই কাব্যাংশের বাচ্যার্থ। কিন্তু সমস্ত বাচ্যার্থ অতিক্রম করিয়া ধ্বনিত হইতেছে আর একটি কথা—দুর্বার মেঘনাদ, অসীম তাঁহার পৌরুষ; তাঁহার সহিত যুদ্ধে বীরবর লক্ষ্মণও মুহূর্তে বিনাশ পাইবেন। ইহাই এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ, তাহাই প্রধান এবং অধিকতর মনোহর। এখানে বর্ণনীয় এবং বস্তু হইতে আর একটি বস্তু ধ্বনিত হইতেছে, অতএব এখানে বস্তুধ্বনি। সহজেই দেখা যাইতেছে, ইহা সংলক্ষ্য-ক্রম।

'ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়'—ইহাও বস্তু হইতে বস্তুধ্বনির সুন্দর উদাহরণ।

এইরূপে বস্তু হইতে অলঙ্কারও ধ্বনিত হয়; যথা—

দিবাকর, নিশাকর, দীপ, তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তমঃ নিবারণ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার॥ —কৃত্তিবাস-রামায়ণ

বাচ্যার্থ এখানে পরিস্ফুট, তাহা হইতে অনুরণন-ক্রমে ধ্বনিত হইতেছে, রামচন্দ্রের নিকটে দিবাকর, নিশাকর, দীপ, তারাগণ অপেক্ষা একা সীতার উৎকর্ষ; এই ব্যঙ্গ্যার্থই এখানে প্রধান এবং অধিকতর মনোহর। উপমেয়-উপমানের একের উৎকর্ষ এবং অপরের অপকর্ষ প্রতীত হওয়ায়, স্পষ্টতঃ এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কার, এবং তাহাই ধ্বনি। এই অলঙ্কার-ধ্বনি এখানে বস্তু হইতে পাওয়া যাইতেছে।

এইরূপ অলঙ্কার হইতে বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কার-ধ্বনি হইতে পারে, এবং সূক্ষ্মভেদে আরও নানা প্রকারের সংলক্ষ্য-ক্রম ধ্বনি হইতে পারে। আমাদের মুখ্য আলোচনার জন্য অনাবশ্যক বলিয়া এ বিষয়ে আর অগ্রসর হইলাম না।

আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেন, রসধ্বনি, বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি বলিয়া ধ্বনিকাব্যের যে তিনটি ভেদ, তাহা কারিকা-কার করেন নাই, করিয়াছেন বৃত্তিকার আনন্দবর্ধন।

এতৎ তাবৎ ত্রিভেদত্বং ন কারিকাকারেণ কৃতম্। বৃত্তিকারেণ তু দর্শিতম্।

—ধ্বন্যালোক, ৩৷১, টীকা, পৃঃ ১২৩

'বস্তু-অলঙ্কার-রসরূপে এই যে তিনপ্রকার ভেদ, তাহা কারিকাকার-কর্তৃক কৃত হয় নাই, কিন্তু বৃত্তিকার-কর্তৃক দর্শিত হইয়াছে।'

বৃত্তিকার রস সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন,—

রসাদয়ো হি দ্বয়োরপি তয়ো জীবভূতাঃ। —ধ্বন্যালোক, ৩৷৩৩, বৃত্তি, পৃঃ ১৮২।

—'রসাদিই নাট্য ও কাব্য এই দুইয়েরই জীব-ভূত।'

রসাদি বলিতে এখানে পারিভাষিক অর্থে রস, ভাব, ভাবাভাস, ভাবশান্তি, ভাবশবলতা বুঝায়। আবার বলিতেছেন,—

পরিপাকবতাং কবীনাং রসাদি-তাৎপর্য-বিরহে ব্যাপার এব ন শোভতে।
—ধ্বন্যালোক, ৩৷৪৩, বৃত্তি, পৃঃ ২২১

—'পরিপক্ব কবিদের এমন কোন ব্যাপার শোভা পায় না যাহাতে রসাদির তাৎপর্য নাই।'

আচার্য অভিনবগুপ্ত বিশেষ স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন,—

তেন রস এব বস্তুত আত্মা বস্ত্বলঙ্কারধ্বনী তু সর্বথা রসং প্রতি পর্যবস্যেতে।
—ধ্বন্যালোক, ১৷৫, পৃঃ ২৭, টীকা

—'সুতরাং রসই বস্তুতঃ আত্মা, বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি সর্বপ্রকারে রসেই পর্যবসান হয়।'

আবার বলিতেছেন,—

নহি তচ্ছূন্যং কাব্যং কিংচিদস্তি। —ধ্বন্যালোক, ২৷৩ টীকা, পৃঃ ১৫

—'রস-শূন্য কোন প্রকার কাব্য নাই।'

ধ্বনি-কার ভরতমুনি-ব্যাখ্যাত রস সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিলেও ধ্বনি ও রস পর্যবসানে এক এবং রসই কাব্যের আত্মা—এরূপ মত কখনও পোষণ বা প্রচার করেন নাই। তিনি স্পষ্ট ভাবে প্রথম কারিকার প্রথমাংশেই ঘোষণা করিয়াছেন,—

"কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি।" —ধ্বনিই কাব্যের আত্মা।

'রস কাব্যের আত্মা' অপেক্ষা 'ধ্বনি কাব্যের আত্মা' এ মত অনেক উদার এবং সত্যদর্শী। কারণ, ইহাতে রস-প্রধান রচনার ন্যায় বস্তু বা অলঙ্কারের ধ্বনি-প্রধান রচনাও সহজে কাব্যত্ব লাভ করে। এই মতের দুইটি দোষ আছে, একটি অব্যাপ্তি, অপরটি অতি-ব্যাপ্তি। প্রথমতঃ বক্রোক্তি বা রমণীয় বাগ্‌ভঙ্গীময় অনেক সার্থক রচনা আছে, যেখানে বস্তু বা অলঙ্কার বাচ্যার্থ স্বরূপেই প্রধান, ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি-স্বরূপে প্রধান নয়। এই সকল রচনাও কাব্যানন্দ পরিবেশন করিলে আমাদের মতে কাব্য, তাহা বক্রোক্তি কাব্য। এইটি সংজ্ঞার অ-ব্যাপ্তি দোষ। দীপ্তি-কাব্যের কয়েকটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করিলেই এ মন্তব্যের সমীচীনতা বুঝা যাইবে।

অতিব্যাপ্তি দোষ হইতেছে সেই স্থলে, যেখানে রচনা ধ্বনি-প্রধান হইয়াও সৎ কাব্য হয় না। বাক্যের কাব্যত্বের জন্য অলৌকিক আনন্দময়ত্ব চাই। ধ্বনির সহিত আনন্দময়ত্বের কোন নিত্য সম্বন্ধ তাঁহারা স্থাপন করিতে পারেন নাই। অতএব কাব্যের আত্মা আনন্দ না হইয়া ধ্বনি,—এই সংজ্ঞা আমরা মান্য করি কি করিয়া? যদি বলা হয় ধ্বনিই আনন্দ, এবং সেই জন্য ধ্বনিই কাব্য, তাহা হইলে আমাদের উত্তর এই,—ধ্বনিকে অলৌকিক আনন্দ বলিয়া যদি ধ্বনির কাব্যত্ব স্থাপন করিতে হয়, তবে আনন্দ শব্দ দ্বারাই মুখ্য কাব্য-লক্ষণ নির্দিষ্ট হওয়া সঙ্গত। কিন্তু ধ্বনি মাত্রই অলৌকিক আনন্দ, ইহা সত্য কি? কোনও গভীর অর্থ বা রমণীয় ভাব উদ্বুদ্ধ না করিয়াও কেবল বাগ্‌ভঙ্গীবশে ধ্বনি স্থাপিত হইতে পারে; তাহাতে কোন 'সাক্ষাৎকার' বা 'প্রতিভান' অর্থাৎ vision, অথবা কোন গাঢ় অনুভূতি নাও থাকিতে পারে; সেখানেও কি বলিতে হইবে কাব্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে?

অত্যন্ত-তিরস্কৃত ধ্বনির উদাহরণ-স্বরূপ ২৩৯-এর পৃষ্ঠায়, 'ভ্রম ধার্মিক' শ্লোকটি সৎকাব্য হইয়াছে কি? অবশ্য বাগ্‌ভঙ্গীর রমণীয়ত্ব সেখানে নিশ্চয়ই আছে। মনে হয়, এই রমণীয়ত্ব মনে রাখিয়াই ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলা হইয়াছে। ধ্বনিকার যেখানে বলিয়াছেন,—

> উক্ত্যন্তরেণাশক্যং যৎ তচ্চারুত্বং প্রকাশয়ন্।
> শব্দো ব্যঞ্জকতাং বিভ্রদ্ ধ্বন্যুক্তে র্বিষয়ী ভবেৎ॥

—ধ্বন্যালোক, ১।১৮

—'অন্য প্রকার উক্তি দ্বারা যে চারুত্ব প্রকাশ করা যায় না, তাহা প্রকাশ করিয়া শব্দ যখন ব্যঞ্জকতা আশ্রয় করে, তখন তাহা ধ্বনির বিষয় হইয়া থাকে।'

—সেখানে মনে হয়, ধ্বনি সর্বদাই চারুত্বের হেতু, এইরূপ একটি ধারণা ধ্বনিকারের ছিল, এবং চারুত্ব বা রমণীয়ত্বকে তিনি মুখ্য কাব্য-লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

আমরা পূর্বে যে স্বভাবোক্তি ও গৌরবোক্তি কাব্যের কথা বলিয়াছি, ধ্বনিকারের কাব্যসংজ্ঞা মানিতে হইলে, কাব্য-সাহিত্য হইতে তাহাদেরও নির্বাসন-ব্যবস্থা করিতে হয়; অবশ্য ইহা পূর্বোক্ত অব্যাপ্তি-দোষেরই অন্তর্গত। যাঁহারা 'ধ্বনি কাব্যের আত্মা' বুঝাইতে গিয়া রসকেই বস্তুতঃ আত্মা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের উৎসাহের ও রস-প্রীতির আতিশয্য স্বীকার করিলেও ধীর বিচারশীলতা এবং কাব্যপ্রীতিকে শ্রদ্ধা করা যায় না। বস্তু বা অলঙ্কার তাঁহাদের বিশ্লেষণ-প্রণালীতেও যেখানে প্রধান ব্যঙ্গ্য,

রস প্রধান নয়, সেখানেও অতিদূরগত ভাবে রসকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া তাহাদের রসাত্মক কাব্য পরিচয় দেওয়া অনুচিত।

আমাদের মনে হয়, আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের সার কথা রসতত্ত্ব, রসতত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট না থাকিলে ধ্বনিবাদ উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করিবে না। বস্তু-ধ্বনি ও অলঙ্কার-ধ্বনিও তাই রসে পর্যবসিত হয়, এইরূপ মত তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ আনন্দবর্ধনের পূর্বে অলঙ্কারাচার্যগণ শব্দ, অলঙ্কার, দোষ, গুণ, রীতি প্রভৃতি, অথবা তাহাদের একত্র সমাবেশ-বিষয়ে বিবিধ সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করিলেও কাব্যতত্ত্বের একটি মূল সূত্র কেহ নির্ধারণ করেন নাই। আনন্দবর্ধন এবং পরে অভিনবগুপ্ত রসই সকল কাব্যের জীব-ভূত বলিয়া সর্বপ্রথমে একটি সাধারণ মূল সূত্র স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। রসবাদ ও ধ্বনিবাদ বলিয়া দুইটি তত্ত্ব উপস্থিত হইলে অভিনবগুপ্ত কার্যতঃ উভয়কে উভয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উভয়ের একপ্রকার ঐক্যই বুঝাইতে চাহিলেন। ধ্বনি তিন প্রকার, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধ্বনি রসধ্বনি; আবার রসধ্বনির ন্যায় বস্তু-ধ্বনি ও অলঙ্কার-ধ্বনিও রসেই বিশ্রাম লাভ করে। রসই আসল বস্তু, রসই কাব্যের আত্মা, রসাদির তাৎপর্য-শূন্য কোন কাব্য-ব্যাপার নাই। এই সিদ্ধান্ত-সম্পর্কে আমাদের অভিমত আমরা প্রথম অধ্যায়ে স্থাপন করিয়াছি।

রসও ধ্বনি এই উক্তির চমৎকারিত্ব আমরা স্বীকার করি। কারণ, রসের যে উপলব্ধি-ক্রম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যাইবে বিভাব, স্থায়িভাব, সঞ্চারিভাব, অনুভাব সকল একত্র হইয়া চিত্তে যে ব্যাপার ঘটায়, তাহাতে আনন্দ-স্বরূপেব প্রকাশ হয়। বিভাবাদি কাব্যের বাচ্যার্থ, বাচ্যার্থের প্রতীতিক্রমে ব্যঙ্গ্যার্থ রূপ রস স্ফূর্ত হয়। তাই রস ধ্বনি। অবশ্য রস-নিষ্পত্তির প্রকৃত ব্যাপার পূর্বেই আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইয়াছে; ধ্বনিবাদিগণের সেখানে কোনও দান নাই।

ব্যঞ্জনাবৃত্তির স্বীকার লইয়া এই প্রসঙ্গে কোন আলোচনা আবশ্যক মনে করি না। মহিম ভট্ট প্রভৃতির ন্যায় বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ ব্যঞ্জনাবৃত্তি অস্বীকার করিয়া ধ্বনিবাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু পরবর্ত কালে প্রায় সকলেই ধ্বনিবাদ এবং তাহার মূলীভূত ব্যঞ্জনাবৃত্তি নির্বিরোধে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মহিম ভট্টের সকল যুক্তিই অশ্রদ্ধেয় নয়, এবং তাহা সহজভাবে খণ্ডনও করা যায় না। স্বয়ং আনন্দবর্ধন বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি নিরসন করিতে যাইয়া সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্থলে অনুমান-শক্তিকে একেবারে অসম্ভব বলিতে পারেন নাই; বরং বলিয়াছেন,—"বাচ্যার্থ হইতে

ভিন্ন একটি প্রতীয়মান অর্থ হয়, ইহা স্বীকার করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ইহা অনুমিতির বলে আসিলেই বা ক্ষতি কি ?"[১]

ব্যঞ্জনাবৃত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ ভাবে দুইটি কারণ উল্লিখিত হয়। প্রথম, শব্দ হইতে বাচ্যার্থের জ্ঞান যে প্রণালীতে হয়, বাচ্যার্থের ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি সেই প্রণালীতে হয় না। প্রণালীর ভিন্নতাই নূতন বৃত্তি স্বীকারের কারণ। প্রণালীর অভিনবতা রহিয়াছে বলিয়াই দীর্ঘব্যাপারবাদিগণের মতও স্বীকার করা যায় না। তাঁহারা বলেন, সবলে প্রেরিত তীর যেমন শত্রুর বর্ম ও চর্ম ভেদ করিয়া মর্ম ছেদ করিতে পারে, একমাত্র অভিধাবৃত্তিই সেই প্রকার বাচ্যার্থ বুঝাইয়া ক্রমে ব্যঙ্গ্যার্থও বুঝাইয়া থাকে। এখানে তীর একই বেগে একই উপায়ে কার্য সিদ্ধ করে বলিয়া তুলনা সঙ্গত হয় না।

উপায় বা প্রণালীর অভিনবত্বের জন্যই নূতন বৃত্তি স্বীকার আবশ্যক হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে,—বাচ্যার্থ সকল লোকের পক্ষে একই থাকিলেও ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকরণাদি-ভেদে নানা প্রকার অর্থ, এমন কি একেবারে বিপরীত অর্থও বুঝাইতে পারে। এই অবস্থায় বাচ্যার্থের অতিরিক্ত ব্যঙ্গ্যার্থ, অতএব শব্দের অভিধাবৃত্তির বাহিরে ব্যঞ্জনা-বৃত্তি স্বীকার না করিলে উপায় থাকে না।

(৩)

ধ্বনিবাদ সম্বন্ধে ইংরেজী সাহিত্যে আলোচনা

ভারতীয় প্রাচীন আচার্যগণের ব্যাখ্যাত ধ্বনিবাদের সারাংশ আমরা উপস্থিত করিলাম। এখন আধুনিক কালের অর্থাৎ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি ও পণ্ডিতগণ এই বিষয়ের আলোচনায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা পাইব। বলা বাহুল্য, শেকস্‌পীয়র এবং তাঁহার পূর্ব ও পরবর্তী শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবিগণের কাব্য ও নাট্য-প্রবন্ধে ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির নানাবিধ উল্লাস রহিয়াছে, মনীষী ব্যাখ্যাকারগণের টীকাসমূহে তাহা ব্যাখ্যাত হইলেও আলঙ্কারিক দৃষ্টি হইতে ধ্বনিবিচারের বিশেষ কোন চেষ্টা দেখা যায় নাই। শেলি, কার্লাইল কিংবা এবারক্রম্বি প্রভৃতির প্রবন্ধে স্থলবিশেষে ধ্বনিবাদের মর্মকথা অভিব্যক্ত হইলেও

---

(১) ধ্বন্যালোক, ৩।৩৩, পৃঃ ২০১, বৃত্তি।

শব্দার্থ-বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ ও বিচার আরম্ভ হইয়াছে সাম্প্রতিক যুগে রিচার্ডস্, অগ্‌ডেন, জেস্‌পার্‌সন প্রভৃতির আলোচনায়। অবশ্য এই আলোচনা অনগ্রসর বলিয়া এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বিশিষ্ট পরিবেশে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও প্রকাশ-ভঙ্গীর ভিন্নতা রহিয়াছে বলিয়া এখানেও সর্বাংশে তুলনার প্রশ্ন উঠে না, বিশেষভাবে তুলনা করিবার উপযুক্ত স্থানও এখানে নাই।

প্রথমেই কবি শেলীর সূক্ষ্মদর্শী কবিদৃষ্টিতে ধ্বনিতত্ত্ব কি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহাকবি দান্তের আলোচনা-প্রসঙ্গে শেলী বলিতেছেন,—

"All high poetry is infinite; it is as the first acorn, which contained all oaks potentially. Veil after veil may be undrawn, and the inmost naked beauty of the meaning never exposed. A great poem is a fountain for ever over-flowing with the waters of wisdom and delight; and after one person and age has exhausted all its divine influence which their peculiar relations enable them to share, another and yet another succeeds, and new relations are ever developed, the source of an unforeseen and unconceived delight." —*A Defence of Poetry*

—'সকল সমুন্নত কবিতাই অনন্ত: ইহা যেন প্রথম ওকবৃক্ষের বীজ, সকল ওকই উহার মধ্যে অব্যক্ত ভাবে রহিয়াছে। আবরণের পর আবরণ উন্মোচিত হইতে পারে, কিন্তু অর্থের অনাবৃত অন্তরতম সৌন্দর্য কখনও প্রকাশিত হইবে না। মহৎ কাব্য যেন এক প্রস্রবণ, নিত্যকাল তাহা হইতে প্রজ্ঞা ও আনন্দের সলিল উচ্ছ্বসিত হইতেছে; এবং একব্যক্তি ও একযুগ তাহার বিশিষ্ট সম্বন্ধানুযায়ী ইহার দিব্য প্রভাব নিঃশেষে গ্রহণ করিলেও, আর এক এবং তারপর আর এক যুগ আসে, নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়,—উহা এক অদৃষ্ট-পূর্ব এবং অচিন্তিত-পূর্ব আনন্দের উৎস।'

মহাকাব্যের ধ্বনির এক চমৎকার ব্যাখ্যা। এই ধ্বনি আছে বলিয়াই কাব্য-সাহিত্যে শকুন্তলা বা মেঘদূতের নব নব আস্বাদন সম্ভবপর হইয়াছে। এই আলোচনা বা আস্বাদন শেষ হইয়াছে, ইহা কোনও ব্যক্তি বা যুগ নিঃসংশয়ে বলিতে পারে না। শেলির কথারই যেন প্রতিধ্বনি করিয়া মনস্বী কার্লাইল মহাকবি শেকস্‌পীয়র সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন,—

"The latest generations of men will find new meanings in Shakespeare, new elucidations of their own human being; new harmonies with the infinite structure of the Universe;

concurrences with later ideas, affinities with the higher powers and senses of man." —*The Hero As Poet*

—'মানবের দূর ভবিষ্যৎ পুরুষও শেক্স্‌পীয়রের মধ্যে আবিষ্কার করিবে,—নূতন অর্থ, তাহাদের নিজ মনুষ্য-সত্তার নূতন স্বচ্ছ ব্যাখ্যান, বিশ্বের অনন্ত গঠন-বৈচিত্র্যের সহিত নব সঙ্গতি; পরবর্তী ভাবধারার সহিত ঐকমত্য, মানবের উন্নততর শক্তি এবং জ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠতা।'

এই সকলই সমগ্র প্রবন্ধ-গত ধ্বনি। এই রূপ কেবল বাক্য-গত ও শব্দ-গত নও আছে। শেলিই বলিতেছেন,—

"A single sentence may be considered as a whole, though it may be found in the midst of a series of unassimilated portions : a single word even may be a spark of inextinguishable thought."

—*A Defence of Poetry*

—'একটিমাত্র বাক্যই সমগ্র-রচনা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, যদিও ইহা কতকগুলি অপরিপক্ব রচনাংশের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে : এমন কি একটিমাত্র শব্দও অনির্বাণ চিন্তানলের বিস্ফুলিঙ্গ হইতে পারে।'

এই সকলই কিন্তু মুখ্যতঃ আর্থী ব্যঞ্জনা।

এই বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিত ব্র্যাড্‌লের স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু উক্তি এই প্রবন্ধের আরম্ভেই উদ্ধৃত হইয়াছে। অপর এক আধুনিক কাব্য-সমালোচক এবারক্রম্বি মহৎ কাব্যের ভাষায় 'magic incantation' অথবা যাদুকরী মন্ত্রশক্তির কথা বলিতে বলিতে মন্তব্য করিলেন—উহাতে থাকা চাই,—

"Unsuspected filaments of fine allusion and suggestion."

—*The Idea of Great Poetry*, p. 23

—'সুন্দর কাহিনী ও ধ্বনির অসংশয়িত পরাগ বা সূক্ষ্ম অংশগুলি।'

আবার বলেন,—

"...the language of a great poetry must always be notable for its enchantment, for its power of collecting many kinds of meaning round a single phrase ;" —*Ibid*, p. 40

—'মহৎ কাব্যের ভাষাকে সকল সময়েই তাহার ঐন্দ্রজালিক শক্তি, একটি মাত্র বাক্যাংশের চতুষ্পার্শ্বে বহুবিধ অর্থ আকর্ষণ করার শক্তির জন্য প্রসিদ্ধ হইতে হইবে।'

পূর্ব পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতির শেষভাগে যাহা বলা হইয়াছে, উহা শাব্দী ব্যঞ্জনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমার মনে হয় ইংরেজীতে যাহাকে *Law of Association* অর্থাৎ অনুষঙ্গ-ধর্ম এবং *Imagination* বা কল্পনা-শক্তি বলে, তাহার মধ্যে যথাক্রমে বাসনা-লোক ও ব্যঞ্জনা-ব্যাপার রহিয়াছে অনেকখানি। *Law of Association* মহামতি আরিস্টট্‌ল্ নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

মানবমনের ভাবনিচয় একত্র অবস্থান করিয়া এমন একটি শক্তি লাভ করে, যাহার বলে তাহাদের একটি ভাব অপর একটিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারে; অথবা প্রত্যেকটি আংশিক প্রকাশ সমগ্রভূত মূলের উদ্বোধ ঘটাইতে পারে। কাল-গত সম্বন্ধ, স্থান-গত সম্বন্ধ ও নৈকট্য, কার্য-কারণ-রূপে পরস্পর-সম্বন্ধ, সাদৃশ্য এবং বৈষম্য, এই পঞ্চবিধ উপায়ে অনুষঙ্গ-ধর্ম কার্যকরী হইয়া থাকে।[১]

লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে, একটি ভাবের বর্ণনাদ্বারা অপরটির প্রকাশ, অথবা অংশদ্বারা সমগ্রের প্রকাশ এবং প্রকরণাদির প্রসঙ্গ হইল ব্যঞ্জনা-ব্যাপারের মুখ্য কথা। এই বিষয়ে পূর্বেও কিছু আলোচনা হইয়াছে, বাসনা-লোকের প্রসঙ্গে আমাদের অভিমত-স্থাপনে আরও অনেক আলোচনা হইবে।

পণ্ডিতগণ বলেন মনস্বী এডিসন উক্ত অনুষঙ্গ-ধর্ম সর্বপ্রথম সাহিত্য-বিচারে প্রয়োগ করেন এবং তাহার ফলে ইংরেজী সাহিত্যে আধুনিক সমালোচনা-পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। এই পদ্ধতিরই অনুবর্তনে কালক্রমে এডিসন কাব্য পরীক্ষা ও কাব্য আস্বাদনের এক নূতন দৃষ্টি-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন। তাঁহার লিখিত "*The Pleasures of the Imagination*" প্রবন্ধে এই নূতন নীতির ব্যাখ্যান দৃষ্ট হয়। *Imagination* বা কল্পনাশক্তি বলিতে এডিসন যাহা বুঝিতেছেন, তাহা নিম্নলিখিত রূপে উপস্থিত করা যাইতে পারে,—

কাব্য এবং সুকুমার কলায় ইন্দ্রিয়াহৃত জ্ঞানের দ্বারা যাহা ব্যাখ্যা করা যায়, তাহার অপেক্ষা অধিক কিছু আছে। চিত্র-শিল্পী বা কবি চক্ষু বা কর্ণ দ্বারা অথবা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমবায় দ্বারা যাহা গ্রহণ করেন, নিজ নিজ শিল্পকার্যে তাহা হইতে অধিক সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাঁহারা অতিরিক্ত যাহা সৃষ্টি করেন, তাহা মানবমনের একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার ফলেই সম্ভব হইয়া থাকে। মনের সাধারণ ক্রিয়া হইতে

(১) Coleridge, *Biographia Literaria. Ch, V.*

বিশিষ্ট করিয়া বুঝিবার সুবিধার জন্য এই প্রক্রিয়াকে *faculty of the Imagination* অর্থাৎ কল্পনাশক্তি বলা যাইতে পারে।[১]

এই *Imagination*-এর চমৎকার সংজ্ঞা দিয়াছেন কবি সমালোচক কোল্‌রিজ তিনি উহাকে প্রথমে '*Primary Imagination*' ও '*Secondary Imagination*' বলিয়া দুই ভাগ করিয়া বলেন,—

"The primary Imagination I hold to be the living power and prime agent of all human perception, and as a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I am."

—*Biographia Literaria, Ch. XIII*

—'আমি মনে করি মৌলিক কল্পনাশক্তি হইতেছে মানবীয় সকল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জীবন্ত শক্তি ও প্রধান কার্যকারক বা প্রতিনিধি, অনন্ত 'অহম্ অস্মি'-এর মধ্যে যে শাশ্বত সৃষ্টি-কর্ম রহিয়াছে, সান্ত চিত্তে তাহারই পৌনঃপুনিক স্ফূর্তি।'

কোল্‌রিজের মতে *Secondary Imagination* বা গৌণ কল্পনা-শক্তি হইতেছে উক্ত মৌলিক শক্তিরই প্রতিধ্বনি, নূতন সৃষ্টির প্রেরণায় ইহা কখনও বিগলিত হয়, বিক্ষিপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়, অথবা এই ব্যাপার অসম্ভব হইলে ইহা ঐক্য ও আদর্শরূপ উপলব্ধির জন্য প্রবল চেষ্টা করে। বাস্তবিকই ইহা প্রাণ-পূর্ণ ও প্রাণ-প্রদ।[২]

প্রণিধান করিলে লক্ষ্য হইবে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যাত এই *Imagination* বা কল্পনা-শক্তির মধ্যে ব্যঞ্জনা-শক্তির পরিস্ফুট প্রক্রিয়া রহিয়াছে। কল্পনাশক্তি যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত মনের মূলীভূত জীবন্ত শক্তি হয়, এবং তাহা যদি যে নিখিল প্রবাহের মধ্যে আমার আমিত্ব প্রতিমুহূর্তে গোচরীভূত হইতেছে, দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন চিত্তে তাহারই প্রকাশধারা হয়, তবে এক সৃষ্টিকে অবলম্বন করিয়া নবতর সৃষ্টির প্রক্রিয়ারূপ ব্যঞ্জনা-ব্যাপার হইতে তাহার পার্থক্য খুব বেশি থাকে না, বরং সাদৃশ্যই থাকে বেশি। অন্ততঃ আমরা এ কথা বলিতে পারি, শব্দের অভিধা ও লক্ষণা-ব্যাপার যদি চিত্তের স্মৃতি ও অনুমান শক্তি হইতে আসিয়া থাকে, তবে ব্যঞ্জনা-ব্যাপার আসে এই কল্পনা-শক্তি বা 'faculty of Imagination' হইতে। কল্পনাশক্তি কবি-চিত্তেও কাজ করে এবং পাঠক-চিত্তেও কাজ করে, আবার বহির্জগতের বস্তু লইয়া কার্য করে এবং অন্তর্জগতের জ্ঞান ও অনুভূতি লইয়াও কাজ করে, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

---

(১) Worsfold, *The Principles of Criticism Ch. V*

(২) *Biographia Literaria, Ch. XIII*

তাই কল্পনাকে *Objective* বা বিষয়নিষ্ঠ এবং *Subjective* বা বিষয়িনিষ্ঠ রূপেও ভাগ করিয়াছেন,—

"...the objective imagination which visualises strongly the outward aspects of life and things; the subjective imagination which visualises strongly the mental and emotional impressions they have the power to start in the mind."

—*The Future Poetry, Style and Substance*

—'বিষয়-নিষ্ঠ কল্পনাশক্তি জীবন ও জগতের বাহ্য অবস্থাগুলি তীব্রভাবে প্রত্যক্ষ করে; বিষয়ি-নিষ্ঠ কল্পনাশক্তি চিত্তে যে সকল ভাবময় অনুভূতি উদ্বুদ্ধ করার শক্তি রাখে, তাহাদিগকে বলিষ্ঠরূপে প্রত্যক্ষ করে।'

এই *Subjective Imagination* বা বিষয়িনিষ্ঠ কল্পনাশক্তির মধ্যে ব্যঞ্জনার বিলাস রহিয়াছে, সন্দেহ নাই।

এই *Imagination* বা কল্পনাশক্তি হইতে প্রসূত প্রারম্ভিক কর্ম বা কর্ম-প্রবণতাকেই রিচার্ড্‌স্ বলিয়াছেন *attitude*; যথা,—

"These imaginal and incipient activities or tendencies to action, I shall call attitudes."

—*Principles of Literary Criticism, Ch. XV*

অতএব বলা যাইতে পারে কাব্য-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের যে অন্তঃস্ফুরণ ঘটে, তাহাই রিচার্ড্‌স্-কথিত *attitude*। এই অন্তঃস্ফুরণ মুখ্যতঃ হয় বাসনা-লোক। অতএব চিত্তের বাসনাত্মক স্ফুরণ-ব্যাপারেই *attitude*, ইহাই কাব্যাস্বাদের প্রথম প্রযোজক এবং রসোদয়ের পূর্বে রসানুকূল চর্বণা। বলা বাহুল্য, ইহার মূলীভূত শক্তি ব্যঞ্জনা। একই সময় চিত্তে পরস্পর-মিলিত বা পরস্পর-বিরুদ্ধ নানাবিধ অন্তঃস্ফুরণ হইতে পারে এবং তাহাদের উপরই কাব্যাস্বাদ নির্ভর করে।

রিচার্ড্‌স্ আরও বলেন,—যে কোন মুহূর্তে, যে কোন অবস্থায় বৈচিত্র্যময় বহু *attitude* মানব চিত্তে জাগিতে পারে,—

"At any moment, in any situation, a variety of attitude is possible."

Ibid, Ch. XXIV

ব্যঞ্জনাশক্তির বিচিত্র বিলাসের ফলেই এই *attitude*-এর বৈচিত্র্য আসিয়া থাকে।

আমরা এবার সাক্ষাৎ ভাবে অগ্‌ডেন ও রিচার্ড্‌স্‌-প্রমুখ আধুনিক পণ্ডিতগণের শব্দার্থ-তত্ত্বের আলোচনা-সমূহের কিঞ্চিৎ পরিচয় লইব। অগ্‌ডেন ও রিচার্ড্‌স্‌ যুক্তভাবে '*The Meaning of Meaning*' নামে যে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে শব্দার্থ-বিষয়ে পৃথিবীর নানাদেশের নানাযুগের বিভিন্ন মতবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা সাক্ষাৎ ভাবে কাব্য-উপলব্ধির জন্য যে ব্যঞ্জনা-ব্যাপারের সন্ধান করিতেছি, তাহার স্ফুট পরিচয় কিন্তু তাহাতে বেশি পাওয়া গেল না; অবশ্য এই গ্রন্থে নৈয়ায়িকতা ও দার্শনিকতার অভাব নাই। যাহা হউক, উহা হইতে সংগ্রহ করিয়া আমাদের অভিমতের অনুকূল মাত্র কয়েকটি স্থল প্রদর্শিত হইতেছে।

লেডি ওয়েলবি দীর্ঘকাল শব্দার্থ-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া অবশেষে মন্তব্য করিয়াছেন,—

"The one crucial question in all Expression is its special property, first of Sense, that in which it is used, then of Meaning as the intention of the user, and, most far-reaching and momentous of all, of implication, of ultimate Significance."[১]

—'সকলপ্রকার অভিব্যক্তিতে একমাত্র গুরুতর প্রশ্ন—ইহার বিশেষ ধর্ম কি? প্রথম হইতেছে বাচ্যার্থ, যে অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয়; তাহার পর লক্ষ্যার্থ, যাহা প্রয়োগকর্তার অভিপ্রায় বুঝায়; এবং সর্বাপেক্ষা সুদূর-প্রসারী ও অত্যাবশ্যক হইতেছে ব্যঙ্গ্যার্থ, যাহা ইহার চরম তাৎপর্য।'

এখানে সাধারণভাবে ত্রিবিধ অর্থেরই স্বীকৃতি এবং নির্দিষ্ট ক্রম পাওয়া গেল।

পাশ্চাত্ত্যখণ্ডে একদল মনস্তত্ত্ববিৎ বলেন,—

"From the psychological point of view Meaning *is context*."[২]

—'মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টি-ভঙ্গী হইতে অর্থ হইতেছে প্রকরণ।'

বক্তৃ-বোদ্ধব্য, দেশ, কাল, প্রভৃতির বিচিত্র অনুষঙ্গ হইতেই অর্থের বোধ হয়,— ইহাই উক্ত সূত্রের অর্থ। ডাঃ শিলার মন্তব্য করিয়াছেন,—

"Meaning is essentially personal.........what anything Means depends on *who* Means it."

—'অর্থ একান্ত ভাবেই ব্যক্তি-নিষ্ঠ······বস্তু কি অর্থ প্রকাশ করে, নির্ভর করে কে উপলব্ধি করে, তাহার উপর।'

(১) *Significs and Language* (*1911*), *p. 9*

(২) *The Foundations of Psychology*, by J. S. Moore (1921)

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হুগো মুন্‌স্টারবার্গ 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ' বুঝাইতে গিয়া প্রথমেই মন্তব্য করিয়াছেন,—

"The beauties of one school may Mean ugliness to another"[১]

—'এক পক্ষের নিকট যাহা সুশ্রী, অপর পক্ষের নিকট তাহা বিশ্রী বলিয়া মনে হইতে পারে।'

আবার মুরের মতবাদের সমালোচনা করিয়া অগ্‌দল বলেন,—

"Psychologically Meaning is context, but logically and metaphysically Meaning is much more than psychological context."[২]

—'মনোবিজ্ঞান অনুসারে অর্থ হইতেছে প্রকরণ, কিন্তু নৈয়ায়িক ও দার্শনিক মতানুসারে অর্থ মনোবিজ্ঞানের প্রকরণ হইতে অনেক বেশি।'

এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় অর্থের সম্যক্ উপলব্ধির জন্য নানা দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যে যে ব্যাপারের সন্ধান চলিতেছে, তাহাদের মধ্যে ব্যঞ্জনা-ব্যাপার একটি প্রধান।

অধ্যাপক মিলারের অভিমত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; তিনি বলেন,—

"That which is suggested is Meaning."[৩]

—'যাহা ব্যঞ্জিত হয়, তাহাই অর্থ।'

ফর্‌সাইথ বলেন,—

"The Suggestiveness of experience is inexhaustible."[৪]

—'অনুভবের ব্যঞ্জনা অফুরন্ত।'

এই জাতীয় সাধারণ স্বীকৃতি হইতে আমাদের বিশেষ কিছু লাভ হয় না, আমরা চাই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া ব্যঞ্জনার স্বরূপ ও বিভিন্ন রূপের প্রতিষ্ঠা ; এবং তাহা কতকাংশে সম্পন্ন করিয়াছেন আই. এ. রিচার্ড্‌স্। তিনি তাঁহার *Practical*

(১) *Eternal Values (1909), p. 1*

(২) *The Meaning of Meaning, Ch. VIII p. 292*

(৩) I. Miller : *The Psychology of thinking. (1909) p. 154*

(৪) Forsyth : *English Philosophy (1910), p. 183*

Criticism গ্রন্থে[১] (১৯৩০) মানুষের উচ্চারিত বাক্যকে চারিটি দিক্ হইতে বিচার করিয়াছেন, সেগুলি হইতেছে,—Sense, Feeling, Tone এবং Intention অর্থাৎ অর্থ, ভাব, স্বর বা প্রকৃতি এবং অভিপ্রায়। ইহাদের মধ্যে অর্থ এবং ভাব উভয়ই আমাদের বাচ্যার্থের মধ্যে পড়ে; কেননা sense বা অর্থ বলিতে বুঝায় বুদ্ধি-গত অর্থ—'*some thoughts*', এবং feeling বা ভাব বুঝায় হৃদয়-গত ভাব। Tone অর্থাৎ স্বর বা প্রকৃতি আসে '*an attitude to his listener*'—অর্থাৎ বক্তৃ-বোদ্ধব্য-সম্পর্ক হইতে। ইহাও এখানে বাচ্যার্থই বটে। বাক্যের উপলব্ধির জন্য এই স্বরের বিচার রিচার্ড্‌স্-এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচায়ক। বাকী রহিল Intention বা অভিপ্রায়; ইহাই আমাদের বিচারে ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি। ইহাকেই লেডি ওয়েল্‌বি পূর্বে বলিয়াছিলেন 'significance' এবং রিচার্ড্‌স্‌ও পরে বলিয়াছেন 'significance',—

"This significance is then the author's intention."

—*Practical Criticism*, p. 356

—এই তাৎপর্য বা ব্যঙ্গ্যার্থই তাহা হইলে গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

অতঃপর রিচার্ড্‌স্ ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে "*The Philosophy of Rhetoric*" গ্রন্থে শাব্দী ব্যঞ্জনার বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের দুইটি ভেদ উদাহরণ দিয়াই বুঝাইলেন।

তিনি বলেন,—*flash, flare, flame, flicker, flimmer*—এই শব্দগুলির মধ্যে *fl* ধ্বনিটি যেমন সর্বত্রই আছে, তেমনই আছে এক চলন্ত আলোর ব্যঞ্জনা—"a suggestion of a 'moving light'"[২]। রিচার্ড্‌স্ মনে করেন flare-বর্গের একটি 'fl' ধ্বনি হইতেই চিত্তের অন্তরালে ঐ বর্গের অপর শব্দগুলির এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সংশ্লিষ্ট অর্থ বা ছবির স্ফুরণ হইতে থাকে; তাহারই ফলে ঐ বর্গের যে কোন একটি শব্দ নব নব অর্থের ব্যঞ্জনা লাভ করে। শাব্দী ব্যঞ্জনার ইহা এক অভিনব বৈচিত্র্য। রিচার্ড্‌স্ এই প্রসঙ্গে তাই মন্তব্য করিয়াছেন,—একার্থবোধক শব্দের ধ্বনি-রূপ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন প্রকার বলিয়া তাহাদের শাব্দী দ্যোতনাও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে, এবং এই জন্য সাহিত্যের বিচারে এক ভাষার কথা অন্য ভাষায় অনূদিত হইলে তাহার শক্তি ও সৌন্দর্য অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়।

রিচার্ড্‌স্-এর দ্বিতীয় উদাহরণ হইতেছে পরিপূর্ণ শাব্দী ব্যঞ্জনার। বাক্যের মধ্যে

(১) Part III., Ch.I, pp. 181-86 এবং pp. 355-57

(২) *The Philosophy of Rhetoric*—Lec, III, pp. 59 & 62.

একটি শব্দের তাৎপর্য কখন কখন দুইভাবে বুঝিতে হয়,—ইহা কি অর্থ আকর্ষণ করে, এবং কি অর্থ দূরীভূত করে। কোনও কোনও সময়ে আবার অর্থটি তাহার আংশিক সদৃশ-প্রয়োগ হইতে বিচিত্র শক্তি আহরণ করিয়া থাকে ; ইহার প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করা যায়, স্পষ্টরূপে প্রমাণ করা যায় না।[১] অতঃপর তিনি মহাকবি শেক্সপীয়রের নাটক হইতে কয়েকটি পংক্তি তুলিয়া নিজেই উদাহরণগুলি পরিস্ফুট করিয়াছেন। মূল অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—

"Cleopatra, taking up the asp, says to it :
Come, thou mortal wretch,
With thy sharp teeth this knot intrinsicate
Of life at once untie ; poor venomous fool,
Be angry, and despatch !

Consider how many senses of *mortal*, besides 'death-dealing' come in ; compare : 'I have immortal longings in me.' Consider *knot* : 'This knot intrinsicate of life' : 'Something to be undone,' 'Something that troubles us until it is undone,' 'Something by which all holding together hangs,' 'The nexus of all meaning.' Whether the homophone *not* enters in here may be thought a doubtful matter. I feel it does. But consider *intrinsicate* along with *knot*. Edward Dowden, following the fashion of his time in making Shakespeare as simple as possible, gives 'intricate' as the meaning here of *intrinsicate*. And the Oxford Dictionary, sad to say, does likewise. But Shakespeare is bringing together half a dozen meanings from *intrinsic* and *intrinse* : 'Familiar,' 'intimate,' 'secret,' 'private,' 'innermost,' 'essential,' 'that which constitutes the very nature and being of a thing'—all the medical and philosophic meanings of his time as well as 'intricate' and 'involved'. What the word does is exhausted by no one of these meanings and its force comes from all of them and more. As the

(১) *The Philosophy of Rhetoric*, Lec. III, p. 63.

movement of my hand uses nearly the whole skeletal system of the muscles and is supported by them, so a phrase may take its powers from an immense system of supporting uses of other words in other contexts.

—*The Philosophy of Rhetoric, Lec. III, pp. 64-65*

এই অংশের অনুবাদ করিয়া লাভ নাই, কেননা শেক্‌স্‌পীয়র হইতে উদ্ধৃত মূল অংশ অনুবাদ করিলে শাব্দী ব্যঞ্জনার একটিও রক্ষিত হইবে না।

এখানে শাব্দী ব্যঞ্জনার চারি প্রকার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথম, mortal শব্দে বৈষম্য-সূত্রে বক্তার সম্পর্কে *immortal* শব্দও ধ্বনিত হইতেছে। দ্বিতীয়, knot শব্দের পাঁচ প্রকার অর্থ যুগপৎ প্রতীত হইতেছে। এইরূপ intrinsicate শব্দও এই প্রসঙ্গে ছয় প্রকার অর্থের দ্যোতনা করিতেছে, সকল অর্থই যেন পিণ্ডীভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। তৃতীয়, knot শব্দ হইতে homephone বা সমধ্বনি *not* শব্দ দ্যোতিত হইতেছে। চতুর্থ, intrinsicate এবং knot দুইটি শব্দ একসঙ্গে আবার নূতন অর্থ দ্যোতনা করিতেছে। যেমন বলা চলে, fool ও angry শব্দ একসঙ্গে থাকায় নূতন ধ্বনি আসিয়াছে,—*Fools are apt to be angry and pour out their venom*।

আরও বলা যায় despatch শব্দের *kill* এবং *send away* 'বধ কর' এবং 'লোকান্তরে প্রেরণ কর'—এই দুই প্রকার অর্থই এখানে সুসঙ্গত হইতেছে; এই ব্যঞ্জনা অবশ্য দ্বিতীয় ভেদের অন্তর্গত হইবে।

রিচার্ড্‌স্‌ শেষাংশে মন্তব্য করিয়াছেন,—intrinsicate শব্দটির শক্তি তাহার কোনও একটি অর্থ দ্বারা, অথবা মিলিত সকল অর্থ দ্বারাও নিঃশেষিত হয় নাই। আমাদের হস্ত-চালনার জন্য যে প্রকার পেশীসমূহের সকল অস্থি-পঞ্জরের শক্তি আবশ্যক হয়, একটি শব্দ ও বাক্যাংশও সেই প্রকার বিভিন্ন প্রকরণের বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ হইতে শক্তি লাভ করিয়া থাকে।

ইংরেজী সাহিত্যে Allegorical এবং Symbolical অর্থাৎ রূপক ও সাঙ্কেতিক রচনা প্রচুর; সংস্কৃতে ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে দুই এক খানি ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়; আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সময় হইতে ঐ জাতীয় রচনা কয়েকখানি প্রকাশিত হইয়াছে।

রূপক-কার প্রস্তুত সত্য—নিজের ভাব-সম্বেগ—পরিত্যাগ করেন যাহা স্পষ্টতঃ

অল্পসত্য বা অল্পবাস্তব, যাহা কাহিনী মাত্র, তাহার কথা বলিবার জন্য। সাঙ্কেতিক কবি প্রস্তুত সত্য পরিত্যাগ করেন গভীরতর সত্যের সন্ধান করিবার জন্য।[১] এই রূপক রচনা ও সাঙ্কেতিক রচনার প্রাণ রহিয়াছে ব্যঞ্জনাশক্তির বিচিত্র ও ব্যাপক প্রয়োগে। বর্তমান গ্রন্থে স্থানাভাব বলিয়া এই বিষয়ের আলোচনা এখানেই ক্ষান্ত করা হইল।

(৪)

ধ্বনির ব্যাপক তাৎপর্য

ধ্বনিকার ও আনন্দবর্ধনকে নমস্কার। অনাগত যুগের ভাব-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিবার চাবিটি দিয়াছেন তাঁহারা। প্রাচীনযুগে কবিচিত্ত মুখ্যতঃ অভিভূত হইয়াছে মানব-জীবনের ও সমাজ-জীবনের বিস্ময়কর বৃহৎ ব্যাপারসমূহ দেখিয়া। যে রূপেই তাঁহারা তাঁহাদের উপলব্ধিকে প্রকাশ করুন, গাথা, মহাকাব্য, পুরাণকাব্য বা মঙ্গলকাব্য, অথবা বিচিত্র কথাকাব্য ও নাট্যকাব্য, তাহা মুখ্যতঃ জীবনের নাট্যরসে পুষ্ট, সন্দেহ নাই। এই জন্য সমালোচক পণ্ডিতগণও অজ্ঞাতসারে নাট্যরসকে প্রয়োগ করিয়াই কাব্য বুঝিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কাব্য যেখানে নাট্য-হীন বিশুদ্ধ কাব্যধর্মে উজ্জ্বল, তাহার প্রকাশও হইয়াছে অল্প এবং তেমন বিশ্লেষণ হয় নাই কিছুই। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সভ্যতার পরিণত অবস্থায় মানুষ যখন অন্তর্জগতের সন্ধান পাইয়াছে এবং সন্ধান পাইয়াছে এক প্রাণময় পুলকময় নবীন নিসর্গ-জগতের, তখন হইতেই রচিত হইতেছে বিশুদ্ধ কাব্য, যাহাতে নাট্যরসের সম্পর্ক প্রায় নাই বলিলেই চলে। এই কাব্যরাশিই মুখ্যতঃ গীতিকাব্য নামে পরিচিত, ইহা মানব-সংস্কৃতির পরিণত যুগের সাহিত্য। এই গীতিকাব্য উপলব্ধি ও আস্বাদনের প্রধান উপায় যে ধ্বনি-বিচার, তাহা একটু নূতন করিয়া বুঝিতে হইবে।

---

(১) **"The allegorist leaves the given—his own passions—to talk of that which is confessedly less real, which is a fiction. The symbolist leaves the given to find that which is more real."**

The Allegory of Love, Ch. II., p. 45
by C. S. Lewis

পূর্বাচার্যগণের ব্যাখ্যাত ধ্বনি-তত্ত্ব দ্বারা নাট্যকাব্য বা মহাকাব্য বুঝা যায়, কিন্তু বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যকে বুঝিতে হইলে উক্ত ধ্বনি এবং ব্যঞ্জনা ব্যাপারের কিঞ্চিৎ অভিনব ব্যাখ্যা এবং অভিনব প্রয়োগ প্রয়োজন।

ধ্বনি অতি পুরাতন কথা। সৃষ্টিই ধ্বনিময়। আসল রূপকে আবৃত করিয়া বাহিরে চলিয়াছে নব নব রূপের খেলা; আসল শব্দকে ঢাকিয়া রাখিয়া উঠিতেছে নব নব শব্দতরঙ্গ। বাহিরের রূপ-সজ্জা, শব্দ-স্পন্দন এমনই যে আভাসে ইঙ্গিতে তাহারই মধ্যে ঝলকিত হইতেছে অন্তরের রূপ ও কথা। যাহার চোখ আছে সে দেখিতে পায়, যাহার কান আছে সে শুনিতে পায়। আমাদের অন্নময়, প্রাণময় এবং মনোময় সত্তার অন্তরালে লুকাইয়া রহিয়াছে তাহাদের ধ্বনি, আমাদের বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্তা। এ যেন আলো-ছায়ার খেলা, ছায়ারই পশ্চাতে রহিয়াছে উজ্জ্বল আলো আসল বস্তুকে প্রকাশ করিয়া। বিশ্বের সৌন্দর্যপ্রতিমা যেন অবগুণ্ঠন টানিয়া রহস্যময় মুখখানিকে রাখিয়াছে ঢাকিয়া। জগতে বিচিত্র দৃশ্য, বহু-বিচিত্র ঘটনা প্রতিমুহূর্তে অভিব্যক্ত হইতেছে; সে সকলই জগতের বাচ্যার্থ; তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে যে ধ্বনি, যে শক্তিস্বরূপ বীজ-ভূত অঘটন, তাহাকে প্রত্যক্ষ করে, এমন রসিক আছে কয়জন? জগতের এক অঘটন-ধ্বনিকে উপলব্ধি করিয়া বাচ্যার্থে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন কবি কালিদাস অপূর্ব কাব্য শকুন্তলায়। শকুন্তলা পড়িয়া সমগ্র কাব্যের ধ্বনি আবার মন্ত্রের ভাষায় ধ্বনিত করিয়াছেন কবি গেটে। কবি রবীন্দ্রনাথ তাহাই আবার রসানুকূল বিশদ ব্যাখ্যান করিয়া ধ্বনিতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন আমাদের। বিপুল মহাভারত পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, অধ্যায়ের পর অধ্যায় এবং পর্বের পর পর্ব পড়িয়া চলিয়াছি, কত রাজা, কত ঋষি, কত মানব, কত মহামানব, কত তুচ্ছ বা বৃহৎ ঘটনা, কত ব্যক্তি, কত জাতি, কত জীবন, কত যুদ্ধ, স্ত্রীপর্ব, শান্তিপর্ব, মহাপ্রস্থানপর্ব—সহস্র ঘটনার অজস্র ঝঙ্কার উঠিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সকলই মনের তলায় পড়িয়া যাইতে গেল; জগৎ ও জীবন কিছু মনে রহিল না। ধ্বনি উঠিতে লাগিল শান্তি, শান্তি—বিপুল বৈরাগ্য, কঠিন কর্তব্য, দুঃখ, শোক, দম্ভ, দ্বন্দ্ব, বঞ্চনা, সংঘর্ষ, উল্লাস ও অবসাদ, মৃত্যু ও স্তব্ধতা, সব অতিক্রম করিয়া স্থিতি ও গতি, শান্তি, শান্তি!—ইহাই মহাভারতের ধ্বনি। এই ধ্বনিই পরিস্ফুট হইয়াছে ঐ লক্ষ শ্লোকাত্মক বাক্যরাশিতে। বেদ বল, গীতা বল, রামায়ণ বল, মহাভারত বল, কাব্য, নাটক, নৃত্য, সঙ্গীত যাহাই বল, ভারতীয় সাহিত্যের ধ্বনি ও ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্বনি একই ধ্বনি—স্থিতি ও গতি এবং

উভয়ের সামঞ্জস্য, স্তব্ধ হিমালয়-বক্ষে ঝঙ্কারময়ী গঙ্গা, যেন হর-বক্ষে পার্বতী। চৈতন্য ও শক্তির লীলা ইহাই, স্থির চৈতন্য আর গতিময়ী শক্তি এবং তাহাদের ছন্দোময় সুষমাময় লীলা! আনন্দবর্ধন ধ্বনির কথা উল্লেখ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মকথা পরিব্যক্ত করিয়াছেন। বাচ্যার্থ সঙ্কেত করিতেছে ব্যঙ্গ্যার্থকে, আবার ব্যঙ্গ্যার্থ নিজেকে আবৃত রাখিতেছে বাচ্যার্থের স্বরূপে। শব্দ ও অর্থের ন্যায় বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের অপূর্বলীলা। বাচ্যার্থ ব্যঙ্গ্যার্থকে অন্তরে গূঢ় রাখিয়া অব্যক্ত মহিমায় বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি বাচ্যার্থের আশ্রয়ে অভিনব সৌন্দর্য লাভ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এ যেন,—

> ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে, গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
> সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে, ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
> ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া,
> অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ, সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা।
>
> —উৎসর্গ

প্রাচীন ভক্তকবি দাদূর কবিতাতে বিষয়টি যেন আরও পরিস্ফুট হইয়াছে,—

> বাস কহে হম্ ফুল-কো পাঁউ, ফুল কহে হম্ বাস।
> ভাষ কহে হম্ সত্-কো পাঁউ, সত্ কহে হম্ ভাষ।
> রূপ কহে হম্ ভাব-কো পাঁউ, ভাব কহে হম্ রূপ।
> আপস্-মে দউ পূজন চাহে—পূজা অগাধ অনূপ॥

—'ফুলের সৌরভ বলে আমি ফুলকে চাই, সূক্ষ্ম আমি নতুবা প্রকাশ পাইব কি করিয়া? ফুল বলে আমারও সৌরভকে চাই, স্থূল আমি নতুবা সার্থক হইব কি করিয়া? ভাষা বলে আমি সত্যকে চাই, তা না হইলে আমি যে কেহ নই! সত্য বলে আমি ভাষাকে চাই, নতুবা আমার প্রকাশই যে হয় না! রূপ বলে আমি ভাবকে চাই, তা না হইলে আমি নিষ্প্রাণ! ভাব বলে আমি রূপকে চাই, নতুবা আমার উল্লাস হইবে কি করিয়া? দুইজনেই আপোসে দুইজনকে পূজা করিতে চাহিল। এই পূজার রহস্য অগাধ এবং অনুপম।'

ধ্বনি ও বাচ্যার্থের লীলাও এইরূপ; ইহাও অগাধ এবং অনুপম। তাই বলিতেছিলাম ধ্বনি অতি পুরাতন কথা, সৃষ্টিই ধ্বনিময়। ধ্বনি যত প্রবল, শব্দাড়ম্বর তত কম। ধ্বনির চূড়ান্ত প্রকাশে আসে স্তব্ধতা। শেক্‌স্‌পীয়রের কাব্যের অকথিত মহিমা বুঝাইতে গিয়া কার্লাইল উক্তি করিয়াছেন,—

"Speech is great ; but silence is greater."

—*The Hero As Poet*

—'বাক্য বড় ; কিন্তু মৌনভাব আরও বড়।'

অনির্বচনীয় ব্রহ্মতত্ত্বের বেলায় মৌনকেই শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা বলা হয়,—

"মৌনব্যাখ্যা-প্রকটিত-পরব্রহ্মতত্ত্বম্‌··· ।"

রবীন্দ্রনাথের সাধনায় দেবীর চরণে কবির শ্রেষ্ঠ দান,—

"অকথিত বাণী, অগীত গান," —চিত্রা, সাধনা

—যে বাণী ভাষায় প্রকাশ হয় নাই, সুরেও ফোটে নাই, তাহাই যে কবির 'শ্রেষ্ঠ ধন'।

বিষয়টিকে এবার সংজ্ঞা-বিচার করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া বুঝান হইতেছে।

'ধ্বনন ব্যাপার' এই শব্দটির প্রয়োগ আমরা বেশি পছন্দ করি। ইহাদ্বারা কেবল আভাসে প্রকাশ নয়, অন্তর্নিহিত বস্তু বা অর্থের স্পন্দন এবং রসানুকূল চর্বণা সহজে বুঝান যাইতে পারে।

বাচ্যার্থ উপলব্ধির পর সমান অনুভূতির সূত্রে গাঁথা আমাদের বাসনালোক বা অন্তর্লোকে সমজাতীয় বস্তু বা ঘটনা স্পন্দিত হইতে থাকে, অতল চিত্ত-সাগরে দোলার পর দোলা লাগিতে থাকে এবং ঢেউয়ের পর ঢেউ জাগিতে থাকে। এ সেই অবস্থা যখন বলা যায়,—

হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে
খুঁজে না পাই কূল ;
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তুলে
ভিজে বনের ফুল। —গীতাঞ্জলি, ২০

—এই যে চিত্ত-লোকে স্পন্দন, দোলার সঞ্চার, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের উল্লাস,—ইহাই ধ্বননের স্পন্দনাত্মক দিক। এই স্পন্দন ব্যঞ্জিত ভাব বা অর্থের স্পন্দন, ইহাই ধ্বনির স্পন্দন। এই স্পন্দন শব্দ ও ছন্দ হইতেও আসে এবং ভাব ও অর্থ হইতেও আসে।

চর্বণাকে আমরা বলিব, ইক্ষুর রূপময় দেহখানি চিবাইয়া ইক্ষুর অন্তঃসার রসের নিষ্কাসন এবং চিবাইয়া চিবাইয়া উহার আস্বাদন। অনেকের মতে রসের পরিপাক রসের পান অপেক্ষা রসের ঐ চর্বণায়ই ভাল হয়। যাঁহারা মাতাল হইয়া বুঁদ হইয়া থাকিতে চান, তাঁহারা মধু-রস এক সঙ্গেই পান করেন, অপর রসিকেরা

ইক্ষুরসের স্তায় উহার চর্বণা করেন। (রসসিক্ত অর্থ বা বস্তুর এই যে পুনঃ পুনঃ আলোড়ন ও চিন্তন,—ইহাকেই আমরা চর্বণা বলিতে চাই।) কাজেই ধ্বনন-ক্রিয়ায় আগে আসে স্পন্দন, পরে হয় চর্বণা, এই উভয় লইয়া ধ্বনির প্রকাশ। ধ্বননের ধ্বন্ ধাতুর অর্থ যে শব্দ-স্পন্দন, তাহাই ইহার অভিপ্রেত অর্থের সম্পূর্ণতা দিতেছে।

আমরা পূর্বে যে ব্যঞ্জনার আলোচনা করিয়াছি, তাহাকে কিয়দংশে অনুমান বলিলে দোষ হয় না। বর্তমানেব আলোচ্য ধ্বনন বা ব্যঞ্জনা কিন্তু প্রধানতঃ অনুমানের বিষয় নয়। তাহা যাহা, তাহা বুঝাইতে ব্যঞ্জনাবৃত্তি বা ধ্বননবৃত্তি স্বীকারের একান্ত আবশ্যকতা রহিয়াছে। অনুমান-শক্তি দ্বারা যে অর্থ লভ্য হয়, তাহা সকল পণ্ডিতই প্রায় সমান ভাবে পাইতে পারেন। কিন্তু ধ্বননব্যাপার দ্বারা লভ্য অর্থ সকলের পক্ষে সমান নাও হইতে পারে। বক্তা, বোদ্ধব্য, প্রস্তাব বা দেশকাল প্রভৃতি বিচারদ্বারা যে অর্থ গম্য হয়, তাহাই কিয়দংশে অনুমানশক্তির বিষয়। বাসনা-লোক বা অন্তর্লোকের স্পন্দনের ফলে যে অর্থ ধ্বনিত হয়, তাহা বুদ্ধিগত অনুমানের বিষয় নয়, তাহা মুখ্যতঃ হৃদয়গত বাসনার বিলাস। বাসনালোক বা অন্তর্লোক বিচিত্র ভাব ও অর্থের সূক্ষ্ম অনুভূতিময় সংস্কার দ্বারা সমৃদ্ধ ও সংপ্রাণিত না হইলে অনেক ধ্বনন সেখানে জাগিবেই না, এবং সৎ কাব্যের সার্থক আস্বাদন অসম্ভব হইবে। ভাব বা Emotion প্রবল না হইয়া রম্যবোধ বা Aesthetic Sense প্রবল হইলেও হৃদয়ের ভাব-ভূমিতে নয়, বুদ্ধি-দীপ্ত বাসনারঞ্জিত জ্ঞান-ভূমিতে স্পন্দন ও চর্বণা আরম্ভ হইবে। ধ্বননব্যাপারের জন্য চাই দার্শনিকের বুদ্ধিপুরুষকে নয়, কাব্যরসিকের অনুভূতিপুরুষকে। এই অনুভূতিই পূর্ব-ব্যাখ্যাত প্রতিভান বা 'Vision', অর্থাৎ সাক্ষাৎকার। ইহার মধ্যে ভাবের স্ফূর্তি থাকিতে পারে, আবার অর্থের দীপ্তিও থাকিতে পারে। অর্থমাত্রই কিন্তু রম্যার্থ। আমাদের বক্তব্য এই,—যাহার বাসনালোক পুষ্ট নহে এবং অনুভূতি-শক্তি দুর্বল, তাহার পক্ষে আমাদের ব্যাখ্যাত ধ্বননব্যাপারময় কাব্যার্থের উপলব্ধি করা সুসম্ভব নহে। ধ্বনন-ব্যাপারের অনুকূল চিত্তশক্তির নাম অনুমান বা Inference নয়, তাহা হইতেছে কল্পনা বা Imagination। এই জন্যই বাসনা-লোক ও কল্পনা-শক্তির তারতম্য-অনুযায়ী একই কবিতা বিভিন্ন হৃদয়ে বিভিন্ন আবেদন উপস্থিত করিতে পারে। কার্যতঃও দেখা যায় ধ্বননব্যাপারে সমৃদ্ধ 'সোনার তরী' কবিতাটি স্বয়ং কবি হইতে আরম্ভ করিয়া কবিভক্তগণ ও পণ্ডিতগণ কতভাবে ব্যাখ্যান ও আস্বাদন করিয়াছেন, এটি একটি

চূড়ান্ত উদাহরণ। এখানে কাব্যের অস্পষ্টতাই ব্যাখ্যা-ভেদের একমাত্র কারণ নহে, ধ্বননের বৈচিত্র্য ও বাসনালোকের তারতম্যও একটি বড় কারণ।

পূর্ববর্তিগণ ধ্বনির তিন ভাগ করিয়াছেন,—রসধ্বনি, বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি। তাঁহাদেরই নির্দিষ্ট অর্থে এবং নির্দিষ্ট প্রয়োগের মধ্যে এই ধ্বনিভাগকে আমরা মান্য করিয়া লইতেছি। আমাদের প্রয়োজনের জন্য আমাদের ব্যাখ্যাত ধ্বনন-ব্যাপারকে আশ্রয় করিয়া ধ্বনিকে অন্য দুই ভাগে বিভক্ত করিতে চাই,—ভাবধ্বনি এবং অর্থধ্বনি।

প্রথম অধ্যায়ে কাব্য-সংজ্ঞা নির্দেশের সময়ে আমরা চিত্তের হৃদয়গত দ্রুতিগুণ এবং বুদ্ধি-গত দীপ্তিগুণ আশ্রয় করিয়া বস্তুর ভাব ও অর্থ এই দুইটি ভাগ স্বীকার করিয়াছি। কাব্য-পাঠে প্রধানতঃ ভাব অর্থাৎ emotion এবং অর্থ অর্থাৎ sense দুইই জাগে এবং সাধারণতঃ তাহাদের একটি হয় প্রধান, অপরটি থাকে দুর্বল। যদি কাব্যে ব্যঞ্জনা-ব্যাপার থাকে, তবে ভাব প্রধান থাকিলে ভাব হইতে অন্য ভাব বা অন্য অর্থ দ্যোতিত হইবে, এবং অর্থ প্রধান থাকিলে অর্থ হইতেও অন্য অর্থ বা অন্য ভাব দ্যোতিত হইবে। তাহা হইলে এই বিচারে ধ্বনি হইবে মোট দুই প্রকার—ভাবধ্বনি ও অর্থধ্বনি; ভাবধ্বনি ভাব বা অর্থ উভয় হইতে এবং অর্থধ্বনিও অর্থ ও ভাব উভয় হইতে আসিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে রিচার্ড্স্‌এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—

"Whether we proceed from the sense to the feeling or *vice versa*, or take them simultaneously, as often we must, may make a prodigious difference in the effect, altering not only the internal structure of the Total Meaning, but even such apparently unconnected features as the sound of the words".

—*Practical Criticism, Appendix, p. 357*

'আমরা অর্থ হইতে ভাবে যাই, অথবা ভাব হইতে অর্থে আসি, কিংবা উভয়কেই এক সঙ্গে গ্রহণ করি,—অনেক সময়ে তাহাও করিতে হয়,—ফল বিষয়ে কিন্তু বিস্ময়-জনক পার্থক্য হইতে পারে; ইহাতে, কেবল সমগ্র অর্থের আভ্যন্তরীণ গঠন নয়, কিন্তু শব্দসমূহের ধ্বনির ন্যায় আপাত-অসম্বদ্ধ অঙ্গগুলিও পরিবর্তিত হইতে পারে।'

ব্যঙ্গ্যধ্বনি বিষয়ে উক্তিটির সম্পূর্ণ উপযোগিতা না থাকিলেও তাহার উৎপত্তি ও ফল-বিষয়ের মন্তব্য অর্থপূর্ণ।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি অবস্থা-বিশেষে ভাব রসে এবং অর্থ রম্যবোধে পরিণত হইয়া কাব্যানন্দকে প্রকাশ করিয়া থাকে। এখানেও বলা চলে অবস্থা-বিশেষে ভাবধ্বনি রসে অতিসম্পন্ন হইয়া রসধ্বনিতে এবং অর্থধ্বনি রম্যবোধ-ধ্বনিতে পরিণত হইতে পারে। প্রাচীনগণের কথিত বস্তু ও অলঙ্কার উভয়ই আমাদের কথিত অর্থের অন্তর্গত হইবে, দীপ্তি-প্রধান সকল বিষয়ই অর্থের অন্তর্গত হইবে। কিন্তু অলঙ্কার-ধ্বনির বিশ্লেষণ ও আস্বাদন বাঙ্গালা সাহিত্যে কচিৎ হয় বলিয়া উহার আলোচনাদ্বারা বিষয়ের আরও সূক্ষ্ম বিভাগ করিয়া এখানে জটিলতা সৃষ্টি না করাই সঙ্গত মনে হইল। এমন কি ফলই আস্বাদনীয় বলিয়া ভাবধ্বনি ও অর্থধ্বনিকেই দেখান হইবে; তাহাদের উৎপত্তি বিচার করিয়া নানা বিভাগের উদাহরণ দিতেও বিরত রহিলাম।

যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ অলক্ষ্য-ক্রম হইয়া সাক্ষাৎ ভাবে রসকে জাগায় সেখানে রসধ্বনি, ইহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে; অলক্ষ্যক্রম রসধ্বনিতে ধ্বনন-ব্যাপার প্রায় নাই। পূর্ববর্তীদের বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি উভয়ই এখানে অর্থধ্বনির অন্তর্গত।

যে কাব্যে সাক্ষাৎ ভাবে আলঙ্কারিকদের কথিত অলক্ষ্যক্রম রস জাগে না, কিন্তু ধ্বনন-ক্রমে ভাব বা emotion জাগে, এবং তাহাই অন্তরে বেদনা বা উল্লাসের সঞ্চার করিয়া রসানুকূল চর্বণায় শেষ হয়, সেখানেই ভাবধ্বনি। এখানে পরিণামে রস-চর্বণা দেখা গেলে, তাহা হইবে রস-ধ্বনি। এইরূপ যে কাব্যে ধ্বনন-ক্রমে ভাব বা emotion অপেক্ষা অর্থ দ্যোতিত হয় বেশি, চিত্তে অন্তঃপ্রবৃত্তির জাগরণের ফলে অর্থের নানাপ্রকার রম্য দ্যোতন ও আলোড়ন চলে, সেখানে অর্থধ্বনি। এখানে পরিণামে রম্যবোধের প্রকাশ হইলে, তাহা হইবে রম্যবোধ-ধ্বনি বা বোধ-ধ্বনি।

রিচার্ড্‌স্ তাঁহার *Principles of Literary Criticism* গ্রন্থে Emotionকে —এখানে রসকে—কাব্যাস্বাদের প্রধান উপাদান মনে করেন নাই; রসানুকূল অন্তঃ-প্রবৃত্তির নানা জাগরণকে প্রধান স্থান দিয়াছেন। উদাহরণেই বিভাগগুলি স্পষ্ট হইবে। কিন্তু তাহার আগে বাসনালোক বা অন্তর্লোকের পরিচয় লওয়া আবশ্যক।

এই ধ্বনি প্রবন্ধ, বাক্য ও শব্দ আশ্রয় করিয়া যথাক্রমে প্রবন্ধ-গত, বাক্য-গত ও শব্দ-গত রূপে প্রকাশ পায়। প্রবন্ধ বলিতে বুঝায় সমগ্র রচনা; তাহা এক বিশাল মহাকাব্য হইতে পারে, আবার ক্ষুদ্র-কলেবর একটি গীতিকাব্য বা মহাকাব্যের সর্গ-বিশেষ বা অংশ-বিশেষও হইতে পারে। রচনার ঐক্য-গত শ্রী ইহাতে পরিস্ফুট হয়। প্রবন্ধ হইতেছে ঐক্য-বদ্ধ বাক্যরাশি, ইহার এক একটি বাক্যের আশ্রয়ে আবার বিশেষ ধ্বনি দ্যোতিত হইতে পারে; তাহাই বাক্য-গত ধ্বনি। ধ্বনি সাধারণতঃ

বাক্য-গত হইলেও বাক্যের এক একটি শব্দ আশ্রয় করিয়া তাহার বিশেষ দ্যোতনা হয়, সেখানেই পাওয়া যায় শব্দ-গত ধ্বনি।

সমুদ্র যত বৃহৎই হউক, দেখা যায় তাহার কতটুকু অংশ। দৃষ্টির বাহিরে পরম গভীরে অতল মহিমায় সে বিরাজমান। আমাদের চিত্তও ঐ সাগরের সদৃশ, কোথায় তাহার তল, কোথায় তীর, কে জানে? সাগরের ন্যায়ই এই চিত্ত তরলতার সঞ্চয়রাশি, জমাট কিছু থাকিলেও তাহা স্পর্শমাত্র বিগলিত হইয়া যায়, বাহির পবনের দোলা লাগিলেই তাহাতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতে থাকে, সে তরঙ্গ কখন কখন তাহার অন্তর্দেশকে চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ, মথিত করিয়া তুলে, বাহির করিয়া আনে তাহার বিচিত্র সঞ্চয়। সমুদ্রের বিচিত্র সঞ্চয় তাহার অগাধ জলরাশি, কঠিন পর্বত, দ্বীপ উপদ্বীপ, মণি-মাণিক্য প্রবালের রাশি, সে সঞ্চয় তাহার প্রীতির রসে সিক্ত এই অখণ্ড জগতের খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্যরাশি, বস্তুরাশি, কথারাশি ও ভাবরাশি! যাহা কিছু তাহার ভাল লাগিয়াছে, তাহার আদর ও পূজা লাভ করিয়াছে, তাহার চিত্তে প্রতিক্রিয়া-বলে গভীর আঘাত হানিয়াছে, সকলই সেখানে আপন হইয়া তাহার নিজ ভাণ্ডারে জমা রহিয়াছে; স্মরণমাত্র তাহারা অতল হইতে ভাসিয়া উঠিয়া সমস্ত জীবনের খণ্ড খণ্ড মুহূর্তকে এক অখণ্ড মহিমায় ঝলকিত করিয়া দেয়। ইহারা যেন শিশুদের খেলনা-সঞ্চয়, কোনটির সহিত কোনটির স্পষ্ট কোন যোগ নাই; বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাই তাহাদের স্বরূপ, শিশুর চোখে বিস্ময় জন্মাইয়াছে ইহাই তাহাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। আমাদের চিত্তও শিশুধর্মী। রূপময় ও ধ্বনিময় এই বিশ্বজগতের কত প্রতিবিম্ব, কত প্রতিধ্বনি ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে আমাদের অন্তর্লোকে ঘুরিয়া বেড়ায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

"যেমন বাতাসের মধ্যে পথের ধূলি, পুষ্পের রেণু, অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র শব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শীকর, পৃথিবীর বাষ্প,—এই আবর্তিত আলোড়িত জগতের বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত উড্ডীন খণ্ডাংশ সকল—সর্বদাই নিরর্থক ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের মনের মধ্যেও সেইরূপ। সেখানেও আমাদের নিত্য-প্রবাহিত চেতনার মধ্যে কত বর্ণ গন্ধ শব্দ, কত কল্পনার বাষ্প, কত চিন্তার আভাস, কত ভাষার ছিন্ন খণ্ড, আমাদের ব্যবহার-জগতের কত শত পরিত্যক্ত বিস্মৃত বিচ্যুত পদার্থসকল অলক্ষিত অনাবশ্যক ভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়।" —লোক সাহিত্য, পৃঃ ২৪

আমাদের অন্তর্লোকের ইহাই সত্যকার ছবি।

বাসনালোক অন্তর্লোকেই অবস্থিত, অন্তর্লোকের গভীরতম স্তরে তার অবস্থান।

ইহা এক প্রচ্ছন্ন স্মৃতি-লোকও বটে। বাসনা শব্দের অর্থ এখানে সাধারণ কামনা বা ইচ্ছা নয়। বাসনা শব্দ ভারতীয় দর্শনের একটি পারিভাষিক শব্দ, তাহার অর্থ চিত্তের সূক্ষ্মতম ও গূঢ়তম সংস্কার, যাহা মানুষের জন্ম আয়ুঃ ও ভোগের কারণ হয় এবং জন্মান্তরেও নাশ প্রাপ্ত হয় না। ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ আমরা যাহা কিছু জ্ঞান-গোচর করি এবং মনের মধ্যেও অপ্রেয়, প্রেয় বা শ্রেয় রূপে যে সমুদয় চিন্তা ও অনুভূতি লাভ করি, তাহাদের কতকগুলি বস্তুতে আমাদের গাঢ় প্রসক্তি, দৃঢ় অনুরাগ বা বিরাগ থাকে। তাহাদের জন্মমুহূর্ত শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা লয় পায় না, তাহারা স্মৃতির কোঠায় সঞ্চিত হয়। ইহাই প্রথম স্মৃতি-লোক। কালাত্যয়ে স্মৃতির কতক অংশ বিনষ্ট হয়, বাকী যাহা থাকে তাহা হইয়া যায় আরও সূক্ষ্ম অনুভূতিময় ও জ্ঞানময়। এই অনুভূতি ও জ্ঞান কোন্ সময়ে, কোন্ অবস্থায়, কোন্ ঘটনা বা ব্যক্তিবিশেষদের উপলক্ষ্য করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, মানুষ তাহা হইয়া যায় বিস্মৃত, তখন ঐ স্মৃতিকে আমরা বলি সংস্কার। সংস্কার তাই দেশকালাদিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়, এবং ক্বচিৎ মনের উপর ভাসিয়া উঠে। সংস্কারের সূক্ষ্মতম গূঢ়তম রূপ, প্রায় বীজ-ভূত অবস্থার নাম বাসনা। বাসনা শক্তির আদি এষণাময়, তাহাই জন্ম ও জীবন, জীবনের ভোগ ও যাবতীয় কর্ম ও জ্ঞানকে ধারণা করে। স্মৃতি, সংস্কার ও বাসনা—তিন লইয়া অন্তর্লোক।

অন্তর্লোক বা বাসনালোকের একটি সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'পত্রপুট' কাব্যে,—

> হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট
> গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে
> আমার চারিদিকে চিরকাল ধ'রে,
> আমি-বনস্পতির এরা কিরণ-পিপাসু পল্লব স্তবক,
> এরা মাধুকরী ব্রতীর দল।
> প্রতিদিন আকাশ থেকে এরা ভরে নিয়েছে
> আলোকের তেজোরস,
> নিহিত করেছে সেই অলক্ষ্য অপ্রজ্বলিত অগ্নিসঞ্চয়
> এই জীবনের গূঢ়তম মজ্জার মধ্যে।
> সুন্দরের কাছে পেয়েছে অমৃতের কণা
> ফুলের থেকে, পাখীর গানের থেকে,

প্রিয়ার স্পর্শ থেকে, প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি থেকে,
আত্মনিবেদনের অশ্রুগদ্‌গদ্‌ আকুতি থেকে,
মাধুর্যের কত স্মৃতরূপ কত বিস্মৃতরূপ
দিয়ে গেছে অমৃতের স্বাদ
আমার নাড়ীতে নাড়ীতে।
নানা ঘাতে প্রতিঘাতে সংক্ষুব্ধ
সুখ দুঃখের ঝোড়ো হাওয়া নাড়া দিয়েছে
আমার চিত্তের স্পর্শবেদনাবাহিনী পাতায় পাতায়
লেগেছে নিবিড় হর্ষের অনুকম্পন,
এসেছে লজ্জার ধিক্কার, ভয়ের সংকোচ, কলঙ্কের গ্লানি,
জীবন-বহনের প্রতিবাদ।
ভালোমন্দের বিচিত্র বিপরীত বেগ
দিয়ে গেছে আন্দোলন
প্রাণ-রস-প্রবাহে। —পত্রপুট, ১৩নং কবিতা

আবার আমরা যখন কোন বিষয় ভোগ করি, দৃশ্য দেখি, সঙ্গীত শুনি, অথবা স্বাদ ঘ্রাণ বা স্পর্শ লাভ করি, অথবা কোন বিষয় ভাবনা করি, তখন তাহা যদি রমণীয় হইয়া আমাদের চিত্ত অধিকার করে, তবে চিত্ত-বীণার তার উঠে গভীর সুরে বাজিয়া; সে সুরের গভীর স্পন্দন অন্তরের গহনে প্রবেশ করিতে করিতে স্মৃতি ও সংস্কারের স্তর ভেদ করিয়া বাসনালোকে তুলে আলোড়ন, বাসনার তন্ত্রীতে তুলে অনুরূপ প্রতিঝঙ্কার। সুপ্ত সূক্ষ্ম ভাবময় বা বোধময় বস্তুগুলি সহসা জাগ্রত হইয়া প্রাণ-স্পন্দনে প্রবল হইয়া উঠে এবং সমগ্র পুরুষসত্তাকে পর্যাকুল করে। ইহাই বাসনালোকের স্পন্দন বা ধ্বনন, ইহাই গভীর অন্তঃপ্রবৃত্তির জাগরণ। সহজ ভাষায় বলা চলে, বহির্জগতের স্পর্শে হৃদয়ে জাগে যে অনুভূতি, তাহা সমান অনুভূতির সূত্রে বিধৃত কিন্তু বিস্মৃতপ্রায় ভাব, অর্থ, বস্তু বা ঘটনাগুলিকে বাসনালোক হইতে যে জাগাইয়া তুলে, তাহাই বাসনালোকের স্পন্দন। ভরা বাদরের ঝর ঝর বারিধারা এবং 'শালের বনে থেকে থেকে' ঝড়ের দোলা দেখিয়া কবির চিত্তলোকে যে প্রবল অনুভূতির সঞ্চার হয়, তাহাই কবির বাসনালোক বিক্ষুব্ধ করিয়া জাগাইয়া দেয় বিগত যত বর্ষার সূক্ষ্মবোধময় বিপুল ভাব-সম্বেগকে। কবি তখন বিহ্বল হইয়া অনুভব করেন,—

অন্তরে আজ কি কলরোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙ্‌ল আগল,
হৃদয়মাঝে জাগল পাগল
আজি ভাদরে!
আজ এমন ক'রে কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে। —গীতাঞ্জলি

বাহিরে যাহা, ঘরেও তাহাই। মেঘের জটা উড়াইয়া দিয়া সেই পাগল বাহিরেও নৃত্য করিতেছে, কবির অন্তর্লোকেও নৃত্য করিতেছে!

কবি যখন কৌতুকময়ীর নিত্য নূতন কৌতুক-লীলা দেখিয়া অবাক্ বিস্ময়ে ভাবিতেছেন,—

এ-যে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে,
এ-যে লাবণ্য কোথা হ'তে ফুটে,
এ-যে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে
অন্তর-বিদারণ।
নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চ'লে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।
যে-কথা ভাবি নি বলি সেই কথা,
যে-ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে। —চিত্রা

—আমরা জানি তখন কবির জন্মজন্মসমৃদ্ধ আশ্চর্য বাসনালোক সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া কবির স্বভাবসত্তাকে গৌণ করিয়া তাঁহার দিব্যসত্তাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে এবং কবি-জীবনের সঞ্চিত সাধনার ধনরাশি মুঠা মুঠা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছে। কবির স্বভাবসত্তা জানে না তাঁহার দিব্যসত্তার ঐশ্বর্য কত বড়।

মহাকবি কালিদাসের একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক লইয়া পরীক্ষা করা যাইতেছে। হংসপদিকার গান শুনিয়া রাজা দুষ্মন্ত বিদূষককে তাহার নিকট পাঠাইলেন, রাজার চিত্ত কিন্তু তাহাতে প্রসন্ন হইল না। হংসপদিকার কণ্ঠোত্থিত সেই মনোহর সঙ্গীতটি

রাজার চিত্তে আনন্দের পরিবর্তে কেবলই দুঃখ ও উৎকণ্ঠার সঞ্চার করিতে লাগিল। দুর্বাসার শাপে তিনি শকুন্তলার ব্যাপার সম্পূর্ণ বিস্মৃত ছিলেন; তাই পুনঃ পুনঃ ভাবিয়াও কোন্ ভালবাসার জনের সহিত বিরহ ঘটিয়াছে বুঝিতে পারিলেন না। তখন রাজা পর্যাকুল চিত্তে বলিয়া উঠিলেন,—

> রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
> পর্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
> তচ্চেতসা স্মরতি নূনম্ অবোধপূর্বং
> ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি ॥ —শকুন্তলা, ৫ম অঙ্ক

—'রম্য দৃশ্য দেখিয়া কিংবা মধুর শব্দ শুনিয়া সুখী মানুষও যে পরম ব্যাকুল হইয়া উঠে,—তাহার কারণ, নিশ্চয়ই সে ভাব বা বাসনারূপে স্থিরবদ্ধ জন্মান্তরের সৌহার্দ-সমূহকে আপনার অজ্ঞাতসারে স্মরণ করে।'

'ভাব' শব্দের অর্থ কেহ করিয়াছেন 'হৃদয়', আমরা করিতেছি 'বাসনা', যাহা চিত্তের সূক্ষ্মতম ও গূঢ়তম সংস্কার। উভয় অর্থই কার্যতঃ এক, কারণ বাসনালোক হৃদয়ভূমিতেই অবস্থিত। হৃদয়ভূমি আর অন্তর্লোক একই কথা। এখানে রম্য দৃশ্য দেখিয়া ও মধুর সঙ্গীত শুনিয়া পরিপূর্ণ সুখের মধ্যেও মানুষের চিত্ত পর্যুৎসুক হইয়া উঠিল কেন? কারণ-স্বরূপ কালিদাস বলিতেছেন, বহিঃপ্রকৃতির মধুর স্পর্শে সুখী মানুষের সুখ যেন আরও গাঢ় হইয়া উঠিল এবং সমান অনুভূতির সূত্রে তাহার বাসনালোকে স্পন্দন তুলিল, জাগাইয়া তুলিল তাহাদের স্মৃতি যাহারা গভীর প্রেম ও সৌহার্দ দিয়া তাহাকে একদিন অনুরূপ সুখ দিয়াছে। তাহারা এখন বাসনালোকে কেবল ভাবমাত্র, তাহাদের রূপ নাই, রেখা নাই, বর্ণ নাই, অঙ্গ নাই, তাহারা ইন্দ্রিয়লোকের ধরা-ছোঁয়ার অগোচর। স্মৃতিলোকের দেশ, কাল, রূপ, ঘটনা সমস্ত মুছিয়া গিয়াছে, রহিয়াছে শুদ্ধ একটি ভাব-সংস্কার। মন চায় আকুল আগ্রহে সেই ভাবাবশিষ্ট রূপের সঙ্গ, তাহা পায় না, শতচেষ্টায়ও স্মৃতির পূর্ণ জাগরণ হয় না। স্মৃতি চলে 'অবোধপূর্ব', ভাবের আশ্রয়ের বিশিষ্ট কোন বোধ জাগে না। এ কেবল নিজের অজ্ঞাত অবচেতন লোকের স্পন্দন। তখন চিত্ত সুখের নিবিড় সঙ্গ পাইয়াও ব্যথায় ভরিয়া উঠে। এই অবোধপূর্ব স্মরণই বাসনা-লোকের স্পন্দন।

মহাকবি কালিদাস আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মেদুর মেঘ-মায়ায় দয়িতা-সঙ্গম-সুখী

জনের চিত্তেরও যে অন্যথা-ভাব[১] বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারও রহস্য মিলিবে এইখানে। আমাদের পল্লী-ছড়ায় যেখানে শুনিতে পাই,—

ও পারেতে কালো রং,
বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্,
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে॥

—সেখানেও ওই একই রহস্যের আবির্ভাব স্বীকার করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ।[২] বর্ষার প্রকৃতি এই ছড়ায় মেয়েটির বুকে সেই একই অবোধপূর্ব স্মরণ জাগাইয়া চিত্ত ব্যথিত ও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। উভয় স্থলেই ইহা বাসনালোকের স্পন্দন।

এইবার কয়েকটি উদাহরণ দিয়া আমাদের বক্তব্য বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

কাব্যে ধ্বননক্রিয়া দুই ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এক, কবি নিজেই বস্তু-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাহার অবলম্বনে জাত ধ্বননব্যাপার নিজেই কাব্যের অঙ্গীভূত করেন। রচনাকৌশলে এবং ভাবোল্লাসে তাহাতেও লোকোত্তর চমৎকারিত্ব থাকিতে পারে। কোন ব্যঙ্গ্যার্থ থাকে না বলিয়া এরূপ স্থলে আমাদের বর্ণিত ভাবধ্বনি বা অর্থধ্বনি সাধারণতঃ থাকে না; এবং সেই হিসাবে কাব্য ধ্বনিকাব্য হয় না। অবশ্য এরূপ রচনায় অনেক সময়ে রস পরিস্ফুট হয় এবং কাব্য প্রকৃত রসকাব্য হয়। এইরূপ কাব্যকে ধ্বননময় কাব্য বলা যাইতে পারে। পাঠকের ধ্বনন থাকিলে তাহা হইবে ধ্বনিকাব্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের 'একা' প্রবন্ধটি লইয়া বিচার করা যাইতেছে। বলা বাহুল্য, এ রচনা রস-রচনা, ইহা গুরুভার প্রবন্ধ নয়। উহার সারাংশ এই,—

—'মধুমাসে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে মধুর কণ্ঠের মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করায় তাহা অতি মধুর লাগিল। বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলিস্পর্শের ন্যায় ওই গীতধ্বনি তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল। সঙ্গীত শুনিয়া কমলাকান্তের পূর্বজীবনের আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে সুখে সেই আনন্দ তিনি অনুভব

(১) মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথা-বৃত্তি চেতঃ।
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুন র্দূরসংস্থে॥ —মেঘদূত, ১।৩

—'মেঘ দেখিলে সুখী পুরুষের চিত্তও অন্যথাভাব ধারণ করে; যে জন দূরে রহিয়াছে এবং প্রিয়জনের কণ্ঠালিঙ্গন চায়, তাহার আর কথা কি?'

(২) লোক-সাহিত্য, ছেলে-ভুলান ছড়া, পৃঃ ৩০।

করিতেন, সেই অবস্থা, সেই সুখ মনে পড়িল। মুহূর্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলেন। আবার তেমনি করিয়া মনে মনে সমবেত বন্ধু-মণ্ডলী মধ্যে বসিলেন, আবার সেই অকারণ-সঞ্জাত উচ্চহাসি হাসিলেন,…। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এ সঙ্গীত এত মধুর লাগিল।'…

এখানে কবির বাসনা-লোকের স্পন্দন এবং ধ্বননব্যাপার রচনার প্রধান অঙ্গ। এই ধ্বনন সম্পর্কে ক্রমশঃ নানা চিন্তন ও রসানুকূল অন্তঃপ্রবৃত্তির সুস্পষ্ট জাগরণও লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই সমুদয়ই সাহিত্যিক সৌন্দর্যে কখনও বা ভাব, কখনও রস, কখনও রম্যবোধকে সঞ্চার করিয়াছে। রসরচনার ইহাই এক প্রধান বৈশিষ্ট্য; ইহাতে প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্যার্থ বলিয়া বিশেষ কিছুই থাকে না, সবই পাঠকের নিকটে বাচ্যার্থের আকারে পরিবেশন করা হয়। এই রচনাকে কবির ধ্বননময় রচনা বলা চলে; কিন্তু ইহা ধ্বনি নয়।

'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থে নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্য স্মরণ করুন। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনাই নিম্নে তুলিয়া দিতেছি,—

'অনন্তর সমুদ্রের জনহীন তীরে, এইরূপে বহুক্ষণ দুইজনে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে রমণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"

'এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, যত যত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না, কিন্তু একটি শব্দে, একটি রমণীকণ্ঠসম্ভূত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়। সকলই লয়বিশিষ্ট হয়, সংসারযাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীত-প্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। নবকুমারের কানে সেইরূপ এই ধ্বনি বাজিল।

'"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" এই ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষ-বিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল, বৃক্ষপত্রে মর্মরিত হইতে লাগিল, সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রী মধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল।'

—কপালকুণ্ডলা, ১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ

এই চমৎকার রচনাটিও কবির ধ্বননময় রচনা; প্রতীয়মান অর্থরূপে কিছুই রাখা হয় নাই বলিয়া ইহা ধ্বনিকাব্য নয়। পাঠকের নিকটে কবির চিন্তা ও অনুভূতি

সকলই বাচ্যার্থে পরিস্ফুট। অথচ এখানে একটি মাত্র কথা একটি মাত্র মৃদু সুর যেন দীপশলাকার ন্যায় সামান্য আঘাতে দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বাসনালোকে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের 'সুখ' কবিতাটিও কবির ধ্বননময় রচনা। ইহার প্রথমার্ধ স্বভাবোক্তি কাব্যের উদাহরণ-প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। কবি বলিতেছেন,—

আজি মেঘমুক্ত দিন, প্রসন্ন আকাশ—
... ...
তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার,
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্মল বিস্তার,
মধ্যাহ্ন-আলোকপ্লাবে জলে স্থলে বনে
বিচিত্রবর্ণের রেখা। আতপ্ত পবনে
তীর উপবন হতে কভু আসে বহি'
আম্রমুকুলের গন্ধ, কভু রহি রহি
বিহঙ্গের শ্রান্ত স্বর॥

প্রকৃতির এই সুখময় সহজ ছবিখানি কবির মনের গহনে বাসনালোকে সহজ আনন্দের স্ফুরণ করিল। কবির ধ্বননক্রিয়া আরম্ভ হইল, কবি অনুভব করিলেন,—

আজি বহিতেছে
প্রাণে মোর শান্তিধারা। মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মতো। শিশু-আননের
হাসির মতন, পরিব্যাপ্ত বিকসিত,

নিসর্গকাব্য-পাঠে ইহাই কবিচিত্তের ধ্বনন-ক্রিয়া। তিনি সহজ ভাষায় ধরিয়া ছন্দে গাঁথিতে চাহিলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, বাচ্যার্থে তার প্রকাশ সম্ভবপর নয়। কবি পূর্ণ-প্রাণে আর একবার প্রকৃতির দিকে চাহিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করিলেন সেই সহজ সরল সুখ,—

চারিদিকে
দেখে' আজি পূর্ণপ্রাণে, মুগ্ধ অনিমিখে
এই স্তব্ধ নীলাম্বর স্থির শান্ত জল,
মনে হোলো সুখ অতি সহজ সরল॥ —চিত্রা

কাব্য-সৌন্দর্যে এই রচনা অপরূপ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা আমাদের সংজ্ঞা-অনুযায়ী ধ্বনিকাব্য নহে।

রবীন্দ্রনাথের অতি প্রসিদ্ধ রচনা 'বলাকা'-কবিতার সম্বন্ধেও একই প্রকার মন্তব্য করা চলে। উহাও নিসর্গদৃশ্যের অবলম্বনে কবিচিত্তের গাঢ় আলোড়নের ফলে কবির ধ্বননময় কাব্য হইয়াছে, রস-শ্রীতেও উহা সমুজ্জ্বল, কিন্তু উহাতে ভাবধ্বনি বা অর্থধ্বনি অল্প। তত্ত্বের অপূর্ব রূপোল্লাস ও রসোল্লাস থাকিলেও সকলই প্রায় বাচ্যার্থে পরিস্ফুট। অবশ্য এ কবিতার চরণ-বিশেষে ও শব্দ-বিশেষে মনোহর ধ্বনির লীলা আছে, তাহা পৃথক্ ভাবে আলোচ্য।

অনেক সময়ে কবি ধ্বননক্রিয়া নামে যাহা রচনা করেন, তাহা হৃদয়-গত ভাবানুভূতির কোন ব্যাপার নহে, নিছক চেষ্টাপ্রসূত বুদ্ধি-গত চিন্তনব্যাপার মাত্র। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' এবং হেমচন্দ্রের 'পদ্মের মৃণাল' ও নবীনচন্দ্রের 'সায়ংচিন্তা' এই তিনটি কবিতা তুলনা করিলে বক্তব্যটি সহজেই স্পষ্ট হইবে।

বলাকা-কবিতার প্রারম্ভেই একটি অপূর্ব নিসর্গ-দৃশ্য, তাহারও মধ্যে রহিয়াছে গতি-বেগ। সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বহিয়া চলিয়াছে, আকাশে আসিয়াছে রাত্রির জোয়ার, কালীর কালো প্রবাহে একে একে ভাসিয়া আসিতেছে তারাফুলগুলি…। সহসা হংস-বলাকার পাখার শব্দ সন্ধ্যার নিস্তব্ধ অন্ধকারে বিদ্যুৎছটার ন্যায় মুহূর্ত-মধ্যে দূর হইতে দূরে দূরান্তরে ছুটিয়া গেল। এই অপূর্ব গতি-বেগ যাহা কবি আবাল্য অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া বাসনালোকে খণ্ড খণ্ড সঞ্চয়-রূপে রাখিয়াছেন, সহসা বহির্জগতের আকস্মিক প্রবল আঘাতে তাহা অখণ্ড স্থায়ী ভাবরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। কবির নয়নে স্তব্ধতার ঢাকা আর রহিল না, বিশ্বজগৎময় তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন এক দুর্নিবার গতি, এক বেগের আবেগ। আভ্যন্তরীণ স্বরূপে পর্বতকেও মনে হইল বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ, মাটির আঁধার নীচে দেখিলেন মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা। বলাকার বেগের আবেগেই কবিতার জন্ম, বিশ্বের বেগের আবেগে তাহার সমাপ্তি; পরিসমাপ্তি হইয়াছে নিজ জীবনের ধাবমান গতিতে,—

অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনে রাতে
এই বাসা-ছাড়া পাখী ধায় আলো অন্ধকারে
কোন্ পার হ'তে কোন্ পারে।

বাসনালোকের আশ্চর্য আলোড়নের ফলে অদ্ভুত ধ্বননক্রিয়ার এখানেই শেষ। তারপরে যাহা, তাহা ধ্বননক্রিয়ারও গোচর নয়; একটি কথার রেখায় কবি মহাধ্বনিকে ইঙ্গিত করিয়া মৌন হইয়া গেলেন,—

ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।"

এই ধ্বনি একটা রহস্যময় প্রবল অনুভূতি, একমাত্র মৌনই তাহার ব্যাখ্যা।

হেমচন্দ্রের 'পদ্মের মৃণাল' কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ ;—

পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে
দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে—
কখন ডুবায় কায়, কভু ভাসে পুনরায়,
হেলে দুলে আশে পাশে তরঙ্গের কোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
শ্বেত আভা স্বচ্ছপাতা পদ্ম শতদলে গাঁথা
উলটি পালটি বেগে স্রোতে ফেলে তোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
একদৃষ্টে কতক্ষণ কৌতুকে অবশ মন
দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কল্লোলে
পদ্মের মৃণাল এক তরঙ্গের কোলে।

প্রথম পাঁচটি চরণ অন্ততঃ আমাদের চিত্তে একটি সম্পূর্ণ ছবির রস সঞ্চার করে। মৃণালের দোলার সঙ্গে অন্তর্লোকেও দেয় দোলা এবং লীলাময় আনন্দের সঞ্চার করে। কিন্তু আশ্চর্য! কৌতুকে অবশ-চিত্তে কত ক্ষণ চাহিয়া থাকিতেই কবির মনে সুখের নয়, শোকের বেগ উচ্ছ্বসিত হইল। সরোবরের সুনীল হিল্লোলে 'হেলে দুলে' খেলে মৃণাল, আর তার বুকে শতদলে গাঁথা পদ্মটি। ইহা কিরূপে শোকনামক স্থায়ী ভাবের উদ্দীপনা করিল, আমরা বুঝিতে অক্ষম। কবি যদি ইহার পর বাসনালোকের স্পন্দন দেখাইয়া শোকভাবকেই করুণরসে পরিণত করেন, তবু এক হিসাবে সার্থকতা হয়। কিন্তু কবি সোজা হৃদয়লোক হইতে বুদ্ধির লোকে প্রবেশ করিলেন এবং ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া আরম্ভ করিলেন দার্শনিক চিন্তা। তাঁহার নিকট তরঙ্গান্দোলিত লীলাময় মৃণালটি হইল ক্ষণস্থায়িত্বের প্রতীক। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—'অই মৃণালের মত হায় কি সকলি?' ভাবিতে লাগিলেন,—

'কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল? দোর্দণ্ড প্রতাপ যার কোথায় সে রোম? আরবের পারস্যের কি দশা এখন? আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি? কোথা বা সে ইন্দ্রালয়, কোথা সে কৈলাস?'—ইত্যাদি। সকলই কালের হিল্লোলে পদ্মের মৃণালের ন্যায় প্রহার সহিতেছে।

ইহাতে কবির ধ্বনন নাই কোথাও, 'অবোধপূর্ব' স্মরণ নাই কোথাও, আছে কেবল বোধ-পূর্বক চেষ্টাকৃত চিন্তনব্যাপার। বাঙ্গালী এক সময়ে এই কবিতার তারিফ করিলেও ইহা উৎকৃষ্ট কবিতা নয়, কেবল ছন্দ ও শব্দ গুণে ও চিন্তার মহত্ত্বে ইহা আদৃত হইয়াছিল।

নবীনচন্দ্রের 'সায়ংচিন্তা' কবিতাটি কাব্যাংশে আরও হীন। সন্ধ্যার একখানি সাধারণ বর্ণনা, ক্রমে বিহঙ্গ-নিচয় এবং গাভীগণের উল্লেখ এবং পরে গানরত রাখালশিশুর উল্লেখ। তার পর আসিল রাখালশিশুর কথা; ভারতের বর্তমান দুর্ভাগ্য, স্বদেশের রাজনীতি, পৃথিবীর ধর্মনীতি আরও কত কথা, রাখাল-শিশু এ সব কিছুই জানে না। সহসা কবির মনে পড়িল—

"আমিও ইহার মত ছিলাম নির্মল,
ছিলাম পরম সুখে সুপ্রসন্ন মনে,…" ইত্যাদি।

কেন কবি লেখাপড়া শিখিলেন, ভারতের ইতিহাস পড়িলেন, ভারতের পরাধীনতার কথা বুঝিতে পারিলেন…এইরূপ অনেক অনেক বিলাপ করিয়া কবি কবিতার শেষ করিলেন—

"রে বিধাতঃ!
কি দোষে ভারতভূমি দোষী ও চরণে?
কেন অভাগিনী সহে এতেক যন্ত্রণা,
ভারত নিশ্বাসে ভার, দিয়ে যাও সিন্ধুপার,
রাণী যিনি, কহ তারে এ সব যাতনা,
কাঁদিবেন দয়াময়ী ভারত-রোদনে।" —অবকাশরঞ্জিনী, ২য় ভাগ

এই কবিতার বিশ্লেষণের আর আবশ্যকতা আছে কি? ধ্বনন নাই ইহাতে কোথায়ও, আছে শুধু চেষ্টা-কৃত চিন্তন-ব্যাপার।

দ্বিতীয়প্রকার ধ্বননক্রিয়া হয় সহৃদয় সামাজিক- বা পাঠক-চিত্তে। কবি বস্তু-স্বভাব বর্ণনা করিয়া ধ্বনির বীজ তাহাতে গূঢ়ভাবে রাখিয়া দেন; নিজে কিছুই

পরিস্ফুট করেন না। কাব্যপাঠের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত বস্তু নিজভাববৈশিষ্ট্যে এবং কাব্য-নির্মাণকৌশলে পাঠকের বাসনালোকে আলোড়ন তুলিতে থাকে এবং প্রচ্ছন্ন ভাব বা অর্থটি ক্রমে ধরা দেয়; ইহাই আসল ধ্বনিকাব্য, ইহা সংলক্ষ্য-ক্রম ধ্বনি। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র কয়েকটি কবিতা লইয়া পরীক্ষা করিব।

এস হে এস সজল ঘন, বাদল বরিষণে;
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে এস হে এ জীবনে।
এস হে গিরিশিখর চুমি, ছায়ায় ঘিরি কানন ভূমি;
গগন ছেয়ে এস হে তুমি গভীর গরজনে।
ব্যথিয়ে উঠে নীপের বন পুলকভরা ফুলে।
উছলি উঠে কলরোদন নদীর কূলে কূলে
এস হে এস হৃদয়ভরা, এস হে এস পিপাসা-হরা,
এস হে আঁখি-শীতল-করা ঘনায়ে এস মনে॥ —গীতাঞ্জলি

কবিতাটি পড়িলেই চিত্ত যেন কার শ্যামল স্নেহে অভিষিক্ত হইয়া যায়, লাগে তাহাতে আনন্দের দোলা। ছন্দের তালে তালে ভাব জাগিতে থাকে এবং রসানুকূল অন্তঃপ্রবৃত্তির স্পন্দন আরম্ভ হয়। কবি যাহাকে ডাকিতেছেন, সে কি শুধুই বাহির আকাশের মেঘ, না মেঘমায়ার অন্তরালে হৃদয়াকাশের সুন্দর রস-বর্ষী প্রেমের দেবতা?

তোমার গতি লক্ষ্য করিতেছি, প্রেমাভিসারে তোমার যাত্রা, প্রকৃতিকে তুমি ধন্য করিয়াছ। গিরিশিখর চুম্বন করিয়া, কাননভূমি ছায়ায় ঢাকিয়া গভীর গর্জনে গগন ছাইয়া তুমি আসিতেছ! তোমার সাড়া পাইয়া প্রকৃতির অঙ্গে কি বিপুল হর্ষপুলক! নীপের বন ফুলে ফুলে ব্যথিত হইয়া উঠিল, নদীর জল রোদনের ছলে কূলে কূলে উছলিয়া উঠিল। তুমি কি আমার হৃদয় ভরিবে না, আমার পিপাসা নাশ করিবে না? তুমি এস, আমার মনে নিবিড় ভাবে এস।

এই বাচ্যার্থ পড়িলেই ক্রমশঃ ধ্বনি-অর্থ প্রকাশ পাইতে থাকে। মেঘ যতক্ষণ মেঘ থাকে, সে ঐ মেঘ-রূপেই আমার হৃদয়-দেবতা হইয়া যায়, বিশ্বের মধ্যে আমাকে ছড়াইয়া দিয়া তাহার আগমন ও পুলকস্পর্শ অনুভব করিতে থাকি এবং সেই স্পর্শে আমার আনন্দ তার পূর্ণতায় চোখের জলে মুক্তি পায়,—

আনন্দ আজ কিসের ছলে
কাঁদিতে চায় নয়ন-জলে,

বিরহ আজ মধুর হ'য়ে
করেছে প্রাণ ভোর।

তারপর 'ঐ টুকু ঐ মেঘাবরণ দু-হাত-দিয়ে ফেলো ঠেলে'—অন্তর একান্ত আকুল হইয়া উঠে পরম দয়িতের স্পর্শ পাইবার জন্য, বিরহ দূর করিয়া মিলন-রসে সিক্ত হইবার জন্য।

ইহা খাঁটি ধ্বনিকাব্য, এ ধ্বনি মুখ্যতঃ ভাবধ্বনি। ইহার ক্রমও লক্ষণীয়। এখানে কেবলমাত্র পাঠকের ধ্বননব্যাপার। কবির ধ্বননব্যাপারের ইঙ্গিত রহিয়াছে 'এস হে এ জীবনে', 'এস হে এস হৃদয়-ভরা', 'ঘনায়ে এস মনে' প্রভৃতি কয়েকটি ছোট বাক্যে।

এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণবসাহিত্যের গৌরচন্দ্রিকার বিশিষ্ট পদগুলির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহাদের বাচ্যার্থ গৌরাঙ্গ-বিষয়ক, সন্দেহ নাই; কিন্তু কবির শব্দসন্নিবেশগুণে এবং আমাদের বাসনালোকের পরিপোষণে বাচ্যার্থকে ছাপাইয়া অনুরূপ ভাব-সমন্বিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিচিত্র লীলারহস্য স্ফুরিত হইতে থাকে; যেমন,—

আজু কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান।
রজনী জাগইতে অরুণ-নয়ান॥
আলসে অবশ অঙ্গ ধরণে না যায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে বাঢ়াইতে পায়॥
চাঁদ মুখ শুকায়্যাছে কিসের কারণে।
অরুণ-অধর কেন হৈয়াছে মলিনে॥ —বাসুদেব ঘোষ

এখানে স্পষ্টতঃ খণ্ডিতার গৌরচন্দ্রিকা; ধ্বনি অর্থধ্বনি।

যাহা হউক, আমাদের প্রস্তাব অনুসরণ করিয়া গীতাঞ্জলি কাব্যেরই আর দুই একটি কবিতা লওয়া হইতেছে,—

লেগেছে অমল ধবল পালে
মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী বাওয়া।

সমস্ত কবিতাটি নহে, মাত্র ঐ দুইটি চরণ পড়িলেও ছন্দ ও ছবির ধর্মে হৃদয়ে যে প্রসন্নতার পুলকস্পর্শ লাগে, তাহাতেই বাসনালোক মথিত করিয়া আর একটি ছবি জাগে—অদৃশ্য কাণ্ডারী-চালিত আমাদের জীবন-তরীর গতিশীল ছবি।

কাব্যের ধ্বনি এখানে মুখ্যতঃ অর্থ-ধ্বনি। 'ওরে মাঝি ওরে আমার মানবজন্ম-তরীর মাঝি' (গীতাঞ্জলি)—এই কবিতাটি পড়িলেই ইহার ধ্বনির আংশিক উপলব্ধি হইবে।

ধ্বনি-কাব্যে অনেক সময়ে একটি সুস্পষ্ট অর্থ বা একটি গভীর অর্থ জাগে না; কিন্তু একটি অনুভূতি, কখনও হর্ষের, কখনও বা ব্যথার, হৃদয়ে ধ্বনিত হইতে থাকে। সে অনুভূতি বর্ণিত বস্তুর ব্যঙ্গ্যার্থ রূপেই স্ফুরিত হয় এবং চিত্তকে অনির্বচনীয় স্পর্শে বিহ্বল করে। ইহা লক্ষ্য ক্রম কি অলক্ষ্য-ক্রম, সকল সময়ে বলাও সহজ হয় না। পাশ্চাত্ত্যের Impressionist School অথবা নূতন Symbolist School-এর কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা'কাব্যের 'দিন শেষে' ('দিন শেষ হয়ে এল, আঁধারিল ধরণী') কবিতাটিকে ইহার এক উদাহরণ বলিয়া হয় তো গ্রহণ করা যাইতে পারে।

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালি-মালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এস গো শারদ লক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এস নির্মল নীল পথে,
এস ধৌত শ্যামল
আলো-ঝলমল
বনগিরি পর্বতে,
এস মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির ঢালা॥
ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে।

গুঞ্জর তান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝঙ্কারে,
হাসি ঢালা স্বর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।

হাসি-ঢালা স্বর যখন ক্ষণিক অশ্রুধারে গলিয়া পড়িল, তখনই আসিল রবীন্দ্রকাব্যের পূর্ণতা। এই পূর্ণতা শরৎসৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রকৃতির রাজরাজেশ্বরীরূপে আবির্ভাবে কবিচিত্তকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে; পাঠকচিত্তকেও পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। এ কাব্যে আলঙ্কারিকদের বিচারে রসধ্বনি আছে কিনা, সে কথা পৃথক্ বিচার্য। কিন্তু ইহাতে যে পরম সৌন্দর্যের উপলব্ধি-জনিত পূর্ণতা-বোধ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পূর্ণতার ভাব যখন অন্তর্লোকে প্রকাশিত হয়, তখন আলম্বন-ভূত চিত্রও যায় তলাইয়া, হৃদয় হয় তন্ময়, স্বয়ংপূর্ণ। এ পূর্ণতার স্পর্শ স্পর্শমণির স্পর্শের ন্যায় সকল তুচ্ছ ভাবনাকেও সোনা করিয়া তোলে, হৃদয়ের অন্ধকার হয় আলোকে উজ্জ্বল। কবিতার শেষ কয়টি চরণে ইহা পরিস্ফুট,—

রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি
ঝলকে অলককোণে,
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে।
সোনা হ'য়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলা॥ —গীতাঞ্জলি

এই কাব্যে যে শ্রেষ্ঠ ভাবধ্বনি রহিয়াছে, তাহা অনস্বীকার্য।

এই সুখময় পূর্ণতার বিপরীত ভাব বেদনাময় অপূর্ণতা; তাহা ধ্বনি-রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে 'সোনার তরী' কাব্যে 'সোনার তরী' কবিতায়,—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধানকাটা হ'ল সারা,
ভরানদী ক্ষুরধারা
খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা

প্রথমে ছন্দের সুরেই এক অপূর্ণতার বেদনা। পূর্ণ গম্ভীর আট মাত্রার পর্বের পর আসিল অপূর্ণ এবং অস্থির পাঁচ মাত্রার পর্ব; পরে পূর্ণতার উচ্ছ্বাসের পর আবার অপূর্ণ পর্ব। সমস্ত অপূর্ণতাকে মানিয়া লইয়া ছন্দ টাল সামলাইল। তারপর চিত্রে—ধান কাটা সারা না হইতেই বর্ষার আগমন,…'গান গেয়ে তরী বেয়ে' যে আসে তাহাকে চিনিয়াও চিনি না,…তরীখানিতে আমার সব ধান উঠিল, কিন্তু আমার উঠিবার বেলা—ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই,—ছোটো সে তরী! সে তরী সোনার ধান লইয়া চলিয়া গেল, শুধু আমিই পড়িয়া রহিলাম শূন্য নদীর তীরে একাকী! অপূর্ণতার বেদনা মৃদুস্পন্দনে চিত্তকে কেবলই বিহ্বল করিতে থাকে। ইহাই এ কবিতার ধ্বনি, ইহা স্পষ্টতঃ ভাবধ্বনি।

গুর্‌গন্‌ খাঁর নিষ্ঠুর ব্যবস্থায় যখন দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল, দলনীবেগম বাঁদী কুলসমকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা এইরূপ—

সেই অন্ধকার রাত্রে রাজপথে দাঁড়াইয়া দলনী কাঁদিতে লাগিল। মাথার উপর নক্ষত্র জ্বলিতেছিল;—বৃক্ষ হইতে প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধ আসিতেছিল—ঈষৎ পবনহিল্লোলে অন্ধকারাবৃত বৃক্ষপত্রসকল মর্মরিত হইতেছিল, দলনী কাঁদিয়া বলিল, "কুলসম্‌!" —চন্দ্রশেখর, ২য় খণ্ড, ২য় পরিঃ

দলনী কাঁদিয়া বলিল "কুলসম্‌"—ইহার মধ্যে ধ্বনি আছে, অর্থ-ধ্বনি, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার আগের নিসর্গ-বর্ণনা হইতে একটি চমৎকার ভাবধ্বনি পাওয়া যাইতেছে; সেইটি বাস্তবিকই আস্বাদনযোগ্য। আকাশে নক্ষত্রের দীপ্তি, নিম্নে কুসুমের গন্ধ এবং বৃক্ষপত্রের মর্মরশব্দ, তাহার মধ্যে দলনীর কান্না। একান্ত অসহায় দলনী; প্রকৃতি, শোভা-সৌন্দর্যশালিনী প্রকৃতি, সেও সুন্দরী দলনীর প্রতি উদাসীন, বিমুখ।

সমগ্র কবিতা বা প্রবন্ধেও এই ধ্বনি বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়, সমগ্র কাব্য বা নাট্যগ্রন্থের ধ্বনিও আলোচনার যোগ্য। সমগ্র কবিতার ন্যায় সমগ্র গ্রন্থেও পাঠশেষের আসল ফলশ্রুতি দিয়া ধ্বনির স্বরূপ বিচার্য। ধ্বনি বুঝাইতে গিয়া ২৫৯এর পৃষ্ঠায় ইহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়া উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। এখানে আর বিশদ আলোচনা করা হইল না।

ধ্বনি মুখ্যতঃ বাক্য-গত, প্রবন্ধ-গত ধ্বনিতে তাহারই বিলাস, পূর্বের উদাহরণ-গুলিতেই উহার বিচিত্র পরিচয় রহিয়াছে। এখানে অন্যবিধ বাক্য-ধ্বনির কথা বলা

হইতেছে। অনেক সময়ে গান বা কবিতার একটিমাত্র চরণেই ধ্বনি পরিস্ফুট হয়। মহাকাব্য, কথাকাব্য বা নাটকেও একটি মাত্র বাক্যে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় ধ্বনিটি চকিতে চিত্তে বিলসিত হইয়া উঠে। বিদ্যুৎ-স্ফুরণের ন্যায় একটিমাত্র বাক্যাশ্রিত ধ্বনি এত উজ্জ্বল হয় এবং পবন-তাড়িত সাগরের ন্যায় তাহাতে এত তরঙ্গ উঠিতে থাকে যে, কবি পরবর্তী অংশে নিজ ধ্বননক্রিয়া দ্বারা বিশদ করিলেও আমাদের চিত্তে তাহা বিশেষ কিছু প্রবেশ করে না, সে নিজের আলোকে দীপ্ত হইয়া নিজের ভাবতরঙ্গে ক্রমাগত দুলিতে থাকে এবং রসানুকূল চর্বণ দ্বারা নিজের মধ্যে মস্‌গুল হইয়া যায়। কবির ধ্বনন-ব্যাপার থাকিলেও পাঠকের ধ্বনন-ব্যাপার মুখ্য হয় বলিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র বাক্যগুলিকে ধ্বনিহ্ বলিতে চাই। ইহার নাম দেওয়া চলে বাক্য-ধ্বনি ; যেমন,—

(১) 'রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।' —চণ্ডীদাস
(২) 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম!' —চণ্ডীদাস
(৩) 'আমি কি দুঃখেরে ডরাই?' —রামপ্রসাদ
(৪) 'বসন পর, বসন পর মাগো! বসন পর তুমি!' —রামপ্রসাদ
(৫) 'যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো।' —রামপ্রসাদ
(৬) 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান্।' —ছড়া
(৭) 'এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটিরে।' —মানসী, একাল ও সেকাল
(৮) 'নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।' —মেঘনাদবধ কাব্য, ৬।৫২
(৯) 'ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, বনমাঝে, কি মনমাঝে॥' —রবীন্দ্রনাথ

যে সমুদয় শব্দ বা বস্তু সিদ্ধরস-তুল্য, যাহারা আমাদের চিত্তে ভাবরূপে মূর্ত থাকিয়া মুহূর্তমধ্যে লক্ষ্য-ক্রম না হইয়া আস্বাদমাত্রে পরিণত হয়, তাহাদের আশ্রয়ে এই বাক্যধ্বনি সহজেই পরিস্ফুট হইয়া থাকে। উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে প্রথম, দ্বিতীয়, সপ্তম ও নবম উদাহরণে রাধা বা শ্যামের, অথবা শ্যামের বাঁশীর উল্লেখই যথেষ্ট ; আমাদের চিত্তে এই কয়টি সিদ্ধরস বস্তু বহু-আস্বাদিত ভাব ও রসকে মুহূর্তমধ্যে মূর্ত করিয়া ধ্বনির সৃষ্টি করিয়া থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব সম্বন্ধে কথিত হয়,—

গোরার রা বলিতে নয়ন ঝরে,
ধা বলিতে ধরায় পড়ে।

এই চিত্র হয়তো কল্পিত নয়। রাধাভাব-বিগ্রহ গৌরাঙ্গ-দেবের বাসনালোক

মুখ্যতঃ যেন রাধাভাব-দ্বারাই নির্মিত, একটু স্ফুরণ হইলেই সেখানে প্রবল ধ্বনি-তরঙ্গ উঠিতে থাকে। শ্রীঅদ্বৈতের ভবনে গৌরাঙ্গদেব বিদ্যাপতির প্রসিদ্ধ পদটির—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।

—এই প্রথম দুই চরণ গাহিয়াই রজনী ভোর করিয়া দিলেন; কবিতাটির চমৎকার কবিত্ব সকল শেষাংশে, কিন্তু অতদূর শ্রীগৌরাঙ্গ পৌঁছিতে পারেন নাই। মন্দিরে মাধব—এই একটি কথাই তাঁহার ভাবলোকের পূর্ণ জাগরণ আনিয়া দিল।

এইরূপে রাম-সীতা সিদ্ধরস-মূর্তি। রামচন্দ্র যখন লক্ষ্মণ বা বিভীষণকে বলেন 'নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি,' তখন সহজেই আমরা অনুভব করিতে পারি, তাঁহার হৃদয়ের সে বেদনা অমেয়, অনমুমেয় এবং ভাষায় বচনাতীত। "বৃথা, হে জলধি! আমি বাঁধিনু তোমারে" প্রভৃতি বলিয়া রামচন্দ্র নিজেই সে দুঃখের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু আমরা জানি কেবলমাত্র হৃদয়ের ধ্বনি দ্বারাই তাহার উপলব্ধি হইতে পারে।

'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান'

—ইহাকে তো রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যকালের মেঘদূত কাব্য বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, ছড়াটি শুনিবা-মাত্রই—

"আমার মানসপটে একটি ঘন মেঘান্ধকার বাদলার দিন এবং উত্তালতরঙ্গিত নদী মূর্তিমান্ হইয়া দেখা দিত।" —লোকসাহিত্য

আমার বিশ্বাস এই অপূর্ব বাক্যটি সম্পর্কে অনেকেরই অনুভূতি ঐ প্রকার। ইহার ধ্বনিস্বভাব তাই স্পষ্ট। কবি রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে চার বছরের কন্যাটির উক্তি—'যেতে আমি দিব না তোমায়'—কি ধ্বনি-তরঙ্গ তুলিয়াছিল, তাহা 'যেতে নাহি দিব'—কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন কবি। এখানে বক্তা, বোদ্ধব্য এবং প্রকরণ-অনুযায়ী ঐ বাক্যটি অপূর্ব ধ্বনিকাব্য হইয়াছে। ইহার ধ্বনি কিন্তু 'সূর্য অস্ত গেল' বাক্যটির ধ্বনির ন্যায় নয়। সেখানে বাসনালোকের স্পন্দন নাই, আছে শুধু অনুমান-ঘটিত ব্যাপার।

'যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে র'লো।'

—এখানে বাক্যটি উপমামাত্র। কিন্তু প্রস্তুত বিষয়টিকে অতিক্রম করিয়া, উপমাটির নিজ বাচ্যার্থকেও অতিক্রম করিয়া বহুদূরে তরঙ্গিত হইতেছে ইহার ধ্বনি। চিত্রিত পদ্মে আসক্ত ভ্রমর, বস্তুর মায়ামূর্তি অবস্তুতে আবদ্ধ আমার মন; তারপর ঐ

সূত্রে দৈন্য, ভ্রান্তি, মোহ, মায়া, কত কি ভাবের জাগরণ! অনেক সময়ে অলঙ্কার-আশ্রয়ে ব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র-রূপে প্রকাশ পায়।

তৃতীয় এবং চতুর্থ বাক্যটি বিশেষ বাসনালোকে ধ্বনি-তরঙ্গ তোলে, সর্বত্র নাও তুলিতে পারে।

শব্দ-গত ধ্বনির কথা পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে। আমরা এতক্ষণ যে সকল ধ্বনির কথা বলিয়াছি, তাহা সমস্তই আর্থী ব্যঞ্জনার উদাহরণ। শব্দ-গত ধ্বনি কিন্তু শাব্দী ব্যঞ্জনা ও আর্থী ব্যঞ্জনা উভয় আশ্রয় করিয়া প্রতীত হইতে পারে। প্রথম প্রকার শব্দ-গত ধ্বনির উদাহরণ পাওয়া যাইবে অভিধা-মূলা ব্যঞ্জনায়।

…বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত
মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত,

—কাহিনী, ভাষা ও ছন্দ

—এই কবিতার 'বেদনা' শব্দটি লক্ষণীয়। উহার এক অর্থ 'ব্যথা' অপর অর্থ 'অনুভব'। প্রথম অর্থে ব্যথা শব্দটি বুঝাইতেছে ক্রৌঞ্চীর ব্যথার সহিত সমব্যথা; একই সঙ্গে আবার বুঝাইতেছে অন্তরে রুদ্ধ শক্তির পীড়া। অনুভব অর্থে বুঝাইতেছে প্রবল ভাবানুভূতি, যাহা অন্তরকে মথিত করিয়া ছন্দঃ-শক্তিকে স্ফূর্ত করিল। বেদনা শব্দ ব্যথা-অর্থে ক্রমে আর একটি অলঙ্কার-রূপ অর্থ ধ্বনিত করিল,—চরম বেদনায় অন্তর বিদীর্ণ করিয়া যেমন নব শিশুর জন্ম হয়, তেমনই কবিচিত্ত বিদীর্ণ করিয়া শক্তিধর নব ছন্দের জন্ম হইল।

বেদনা শব্দটিকে অবলম্বন করিয়া প্রায় একই সময়ে একজাতীয় চারিটি অর্থ মনের ভিতরে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটির একটি বাচ্যার্থ, অপরটি এবং তৃতীয়টি ব্যঙ্গ্যার্থ। চতুর্থ অর্থটি কিন্তু অভিধা-মূলা ব্যঞ্জনাবৃত্তির বলে আসে নাই। বাচ্যার্থটি স্বীকৃত হইবার পর তাহারই অর্থের চর্বণাক্রমে অলঙ্কার-স্বরূপ অর্থটি প্রকাশ পাইল। ইহা স্পষ্টতঃ অর্থ-ধ্বনি, শব্দ-গত অর্থধ্বনি।

আর্থী ব্যঞ্জনার আশ্রয়ে শব্দের বাচ্যার্থকে অবলম্বন করিয়া অপর যে অর্থ প্রতীয়মান হয়, তাহাই দ্বিতীয় প্রকার শব্দ-গত ধ্বনি।

আর একটি উদাহরণ লওয়া যাইতেছে,—

দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে

বসন্তের মাধবী মঞ্জরী
যেইক্ষণে দেয় ভরি'
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়-গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল। —বলাকা, শা-জাহান

এখানে মন্ত্র-শব্দের বাচ্যার্থ কি, এবং ব্যঙ্গ্যার্থ থাকিলে তাহাই বা কি? এই অংশ পড়িয়া প্রথমেই মনে হয় দক্ষিণ দিগাগত মলয় পবনের সঞ্চারে ভ্রমর গুঞ্জন করে, কুঞ্জবনে বসন্তের মাধবীলতা মঞ্জরিত হইয়া উঠে,—ইত্যাদি। কিন্তু কবিতাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'মন্ত্র গুঞ্জরণ' হইতে 'প্রেমের গুঞ্জরণ' রূপ একটি নূতন অর্থ দ্যোতিত হয় না কি? এবং তাহারই বলে 'দক্ষিণ' অর্থ যৌবন, 'কুঞ্জবন' অর্থ জীবন, 'মাধবী মঞ্জরী' প্রেম, 'মালঞ্চ' ও 'কুঞ্জবন' একই অর্থ, 'চঞ্চল অঞ্চল' পরিবর্তনশীল রূপ প্রভৃতি অর্থ আসে না কি? এই অর্থ আর্থী ব্যঞ্জনাশক্তি দ্বারা লভ্য অর্থধ্বনি। ইহা বাক্যগত ধ্বনি বটে, কিন্তু ইহা মুখ্যতঃ মন্ত্র শব্দ আশ্রয় করিয়া দ্যোতিত হইতেছে বলিয়া মন্ত্র শব্দকে শব্দ-গত ধ্বনির উদাহরণ বলিতে ইচ্ছা হয়।

যেখানে ভাব-বিশেষ্য অর্থাৎ abstract noun প্রয়োগ করিয়া বস্তুকে বুঝান হয়, সেখানে সাধারণতঃ ব্যঞ্জনাধর্মে বিভিন্ন অর্থ দ্যোতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে; যেমন,—

স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া; বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার; সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে। —চিত্রা, এবার ফিরাও মোরে

এখানে 'অপমান,' 'বেদনা,' 'অবিচার,' শব্দ কয়টি লক্ষণীয়। এই শব্দগুলির অর্থ রাষ্ট্রীয় অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা—সকল দিক্ হইতেই প্রযোজ্য; বস্তুতঃ একই সঙ্গে যেন তাহাদের প্রকাশ হইতেছে। একটি বাচ্যার্থ হইলে অপরগুলি হইবে ব্যঙ্গ্যার্থ।

এখানে এবং পূর্বেও আমরা ব্যঙ্গ্যার্থমাত্রকেই ধ্বনি বলিয়া আসিতেছি; কোন্‌টি মুখ্য এবং কোন্‌টি গৌণ তাহার বিচার করা হয় নাই, সকল সময়ে বিচার করা সম্ভবপরও নয়।

যে রচনায় স্বল্পকথা থাকে, সেখানেই ধ্বনির স্বাভাবিক ক্ষেত্র। এই জন্য সংহতি

ও সংক্ষিপ্ততা যদি প্রসাদগুণের বিরোধী না হয়, তবে সর্বত্রই আদরণীয়। জাপানী কবিতায়, গীতা ও বাইবেলের ভাষায় এবং কোন কোন সাম্প্রতিক কবিতায়ও ইহার সুষ্ঠু উদাহরণ পাওয়া যায়।

অজানাকে জানা লইয়াই আমাদের সাহিত্য। ইহা কেবল ইঙ্গিতে ও ব্যঞ্জনায়ই কতকটা সম্ভবপর। সঙ্গীতে হউক, কথায় হউক, নৃত্যে হউক, বা চিত্রে হউক, প্রকাশ কিন্তু মুখ্যতঃ সঙ্কেতে ও ইঙ্গিতে। কথার মধ্যে সঙ্গীতের সুর বা চিত্রের রূপ কতকটা ফুটিয়া উঠে বলিয়া কথার বা সাহিত্যের শক্তি সর্বাপেক্ষা বেশি, কিন্তু সে শক্তি তো ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনারই শক্তি। আমাদের লেখামাত্রই ইঙ্গিত, কথামাত্রই ইঙ্গিত। ইঙ্গিতই তো ধ্বনি, সৃষ্টিই তাই ধ্বনিময়।

চতুর্থ অধ্যায়

বস্তু ও বিভাব

(১)

বস্তু

ভারতের আদি অলঙ্কারশাস্ত্র বলিলে ভরতমুনি-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রেরই উল্লেখ করিতে হয়। এই নাট্যশাস্ত্রকে দেবগণ ও মুনিগণ বলিয়াছেন, 'নাট্যবেদ',[১] 'পঞ্চম বেদ',[২] 'সার্ববর্ণিক বেদ'[৩]; বলিয়াছেন ইহা 'বেদ-সম্মিত' অর্থাৎ বেদকল্প। ভারতীয়গণ কি শ্রদ্ধার দৃষ্টি লইয়া নাট্যকে এবং এখানে বলা যাইতে পারে কাব্যকে ভজনা করিতেন, তাহা ওই কয়েকটি স্বল্পাক্ষর শব্দ হইতেই প্রমাণিত হয়। নাট্য বা কাব্য বেদেরই ন্যায় জ্ঞানরাশি, কিন্তু ইহা কেবলমাত্র দ্বিজগণের আলোচ্য নয়, সকল বর্ণেরই ইহাতে সমান অধিকার। মহাভারতের ন্যায় ইহা পঞ্চম বেদ এবং মহাভারতের ন্যায় ইহাও ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। বস্তুতঃ মহাভারতও মুখ্যতঃ ধর্মগ্রন্থ বা ইতিহাস নয়, কাব্য[৪]; কাব্য বলিয়াই ভারতবর্ষে সকল সমাজে নিত্যকাল সমান ভাবে আদৃত হইয়া আসিতেছে।

এই সার্ববর্ণিক বেদের বিষয়বস্তুও কেবল সার্ববর্ণিক নয়, সার্বজগতিক, নিখিল জগতে এবং নিখিল মানবসমাজে যে কোনও বস্তুর কথা ভাবা যাইতে পারে, তাহাই নাট্য বা কাব্যের বিষয়-বস্তু। ভরতমুনি বলিতেছেন, নাট্য হইবে 'লোকবৃত্তানুকরণ',[৫]

(১) নাট্যশাস্ত্র, ১।৪ (২) নাট্যশাস্ত্র, ১।১২

(৩) নাট্যবেদ শব্দ দ্বারা কেবল নাট্যশাস্ত্র নয়, নাট্য অর্থাৎ drama বা রূপক-সমূহকেও বুঝাইয়াছে। বস্তুতঃ দেবতাদের প্রার্থনাই ছিল,—

ক্রীড়নীয়কম্ ইচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ ভবেৎ॥ —নাট্যশাস্ত্র ১।১১

(৪) বেদব্যাস ব্রহ্মাকে বলিলেন,—

কৃতং ময়েদং ভগবন্ কাব্যং পরমপূজিতম্॥—মহাভারত, আদিপর্ব, ১।৬১

ব্রহ্মাও উত্তরে বলিলেন,—

ত্বয়া চ কাব্যম্ ইত্যুক্তং তস্মাৎ কাব্যং ভবিষ্যতি॥—ঐ, ঐ, ১।৭২

(৫) নাট্যশাস্ত্র, ১।১১৩

'সপ্তদ্বীপানুকরণ',[১] 'সর্বকর্মানুদর্শক',[২] 'নানাভাবোপসম্পন্ন',[৩] 'নানাবস্থান্তরাত্মক',[৩] এবং 'সর্বশাস্ত্রার্থসম্পন্ন',[৪] ও 'সর্বশিল্পপ্রবর্তক'[৪]।

এই সার্ববর্ণিক বিষয়বস্তুর জন্যই নাট্য বা কাব্য রচনায় সর্বজনের যাবতীয় জ্ঞান, বিদ্যা ও শিল্পকলা প্রভৃতির আবশ্যকতা হয়। ভরত বলেন,—

ন তজ্‌জ্ঞানং ন তৎ শিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
নাসৌ যোগো ন তৎকর্ম নাট্যেঽস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে॥ —নাট্যশাস্ত্র, ১।১১৭

—'এমন জ্ঞান নাই, এমন শিল্প নাই, এমন বিদ্যা নাই, এমন কলা নাই, এমন যোগ বা কৌশল নাই এবং এমন কর্ম নাই, যাহা এই নাট্যে দৃষ্ট না হয়।'

এইরূপে কাব্য-সম্পর্কে ভামহ বলেন,—

ন স শব্দো ন তদ্ বাচ্যং ন স ন্যায়ো ন সা কলা।
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গম্ অহো ভারো মহান্ কবেঃ॥ —ভামহালঙ্কার, ৫।৩

—'এমন শব্দ নাই, এমন বিষয় নাই, এমন ন্যায় নাই, এমন কলা নাই, যাহা কাব্যের অঙ্গ হইতে না পারে। অহো! কবির কি মহান্ দায়িত্ব-ভার!'

কাব্যের কবি-সম্পর্কে অগ্নিপুরাণ বলিতেছেন,—

'অপার এই কাব্য-রূপ জগতে কবিই একমাত্র প্রজাপতি। এই বিশ্ব তাঁহার নিকট যেমন প্রীতিকর বলিয়া মনে হয়, তেমনই তাহা পরিকল্পিত হইয়া থাকে।

'কবি যদি কাব্যে শৃঙ্গাররসময় হইয়া কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন, এই জগৎও উক্ত রস-পূর্ণ বলিয়া মনে হইবে; তিনিই যদি বীতরাগ হইয়া যান, সেই সকলই নীরস বলিয়া প্রতিভাত হইবে।'[৫]

নাট্য বা কাব্য ও তাহাদের বিষয়-বস্তু এবং কবি-সম্পর্কে ভারতীয় প্রাচীন আচার্যগণের ধারণা কি মহান্, কি উদার! কবি যেন ব্রহ্মা, কাব্য যেন বেদ! মানবের যাবতীয় বিদ্যা, জ্ঞান ও শিল্পকলা এই কাব্য-বেদের অঙ্গীভূত। আর বিষয়-বস্তু? সপ্তদ্বীপাত্মক বহির্জগৎ, মানবের নানা ভাবময় অন্তর্জগৎ, অথবা কবির কল্পনার জগৎ, বিশাল জনসমাজের বিচিত্র চরিত্র, ঘটনা, কর্ম ও অবস্থা—সকলই কবিকর্ম-নৈপুণ্যের ফলে নাট্য বা কাব্যে রূপ লাভ করিতে পারে। কবির শক্তি থাকিলে সে শক্তি প্রচারে বাধা নাই কোথাও, সীমা নাই কোথাও।

(১) নাট্যশাস্ত্র, ১।১২০ (২) নাট্যশাস্ত্র ১।১৪
(৩) ঐ ১।১১২ (৪) ঐ ১।১৫
(৫) অগ্নিপুরাণ, ৩৪৫।১০, ১১

একদল সাম্প্রতিক সাহিত্যিকের মত এই যে, ব্যাধি, বেদনা, ব্যর্থতা ও বঞ্চনায় ভরা অসাম্য-পূর্ণ জগতের দৃশ্যমান অসুস্থ মূর্তিই কেবল সাহিত্যের বস্তু হইবে; অন্যথায় যে সাহিত্য সৃষ্ট হইবে, তাহা Escapism বা পলায়ন-বাদের ফল। একদল আবার সূর্যালোকিত বা জ্যোৎস্না-পুলকিত পথে মোটেই বিচরণ করিবেন না, লণ্ঠনের আলো জ্বালিয়া কেবল অন্ধকারপথেই বস্তুর সন্ধানে অভিসার করিবেন।

অবশ্য কবির বিভাবনাশক্তি এবং কাব্যনির্মাণশক্তি থাকিলে এই সকল ভাব ও উপাদান হইতেও প্রথম শ্রেণীর কাব্য রচিত হইতে পারে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। বস্তুতঃ দান্তে বা ভিক্টর হুগো তাঁহাদের বিশাল কাব্যচ্ছত্রের ছায়াতলে বহু বিষয়ের সহিত উক্ত বিষয়সমূহকেও একাসন দিয়াছেন। কিন্তু কাব্যের বস্তু-সম্পর্কে এইরূপ একদেশ-দর্শী সংকীর্ণ ধারণা সময়বিশেষে বা অবস্থাবিশেষে সার্থক হইলেও ইহা যে সত্যবিমুখ এবং মানবের প্রৌঢ় সংস্কৃতির পরিপন্থী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাচীনগণের মতবাদ তুলনায় কত সত্য ও উদার! সাহিত্য-বিচারেও আমাদিগকে মহাকাল এবং শাশ্বত মানব-প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল সত্য ও সত্য-জ্ঞাপক সূত্র নির্ধারণ করিতে হইবে।

ভরতমুনির ন্যায় পরবর্তী আচার্যগণও চমৎকার ভাবে বস্তু-লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন বা অর্বাচীন, অতীত বা অনাগত কোনও উপাদানকেই অশ্রদ্ধা বা অস্বীকার করা হয় নাই। বস্তু-সম্পর্কে দশরূপক-প্রণেতা ধনঞ্জয় বলেন,—

রম্যং জুগুপ্সিতম্ উদারম্ অথাপি নীচম্
উগ্রং প্রসাদি গহনং বিকৃতং চ বস্তু।
যদ্ বাপ্যবস্তু, কবিভাবক-ভাব্যমানং
তন্নাস্তি যন্ন রসভাবম্ উপৈতি লোকে॥ —দশরূপক, ৪।৮৫

—'রম্য, জুগুপ্সিত, উদার, কিংবা নীচ, উগ্র, চিত্তপ্রসাদকর, গহন অথবা বিকৃত যে সকল বস্তু, এমন কি অবস্তু—এরূপ কিছুই নাই, কবির ভাবনাশক্তি দ্বারা ভাব্যমান হইলে যাহা লোকে রসভাব প্রাপ্ত না হয়।'

উপনিষদে আছে,—

কো হ্যেবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।২৭

—'কে বাঁচিয়া থাকিত, কে নিঃশ্বাস ফেলিত, যদি এই আকাশ আনন্দ না হইত!'

কেবল সত্তার মধ্যেই জীবনের একটি গূঢ় আনন্দ আছে, পরম দুঃখের মধ্যেও যাহার অবিচ্ছিন্ন উপলব্ধি মানুষকে নূতন কর্মপথে চালিত করে।

মনে হয়, ধনঞ্জয় এই গূঢ় জীবনানন্দ উপলব্ধি করিয়াই কাব্যবস্তুর ঐরূপ সংজ্ঞা দিতে পারিয়াছেন।

আনন্দবর্ধন এই কথাকেই মনস্বিতাপূর্ণ একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন—

'এমন কোনও বস্তুই নাই যাহা চিত্তবৃত্তিবিশেষ না জন্মায়, এবং যাহার উপাদান বা গ্রহণ হইলে তাহা কবির অর্থাৎ কাব্যের বিষয় না হয়।'[১]

সহজ ভাষায় বলা যায়,—যাহা-কিছু চিত্তের গোচর হয়, তাহাই অবস্থা-বিশেষে কাব্যের বিষয় হইতে পারে।

কেবল ইয়াংসিকিয়াং-এর সুখসমৃদ্ধিময় চিত্র নয়, তাহার ভয়াবহ প্লাবন, জনবসতি-ধ্বংস, ভাসমান শবদেহের খেলা; কেবল সূর্য-চন্দ্র-তারকা নয়, বনের ক্ষুদ্র জোনাকি পোকা, দরিদ্র কুটীরের ক্ষীণ দীপ অথবা অমানিশার গভীর অন্ধকার; কেবল ঐশ্বর্য, সাম্রাজ্য, প্রাচুর্য নয়, দৈন্য, দুর্ভিক্ষ, অভাব; কেবল মহাপুরুষ বা কৃতীপুরুষ নয়, অতি সাধারণ বঞ্চিত ও অত্যাচারিত কৃষক বা শ্রমিক; কেবল ব্যক্তিমানস নয়, যুগ-মানস ও সমাজ-মানস—সকলই সমান ভাবে কাব্যের বিষয়বস্তু হইতে পারে, যদি তাহা উপযুক্ত সাড়া জাগাইয়া কবির অন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।

ধনঞ্জয় বলিয়াছেন বস্তু দূরের কথা, কবির প্রতিভা-বলে অবস্তু যাহা, যাহার সত্তা কেবলমাত্র কল্পনা-গত, তাহাও কাব্যের বিষয় হইয়া আনন্দ জন্মাইতে পারে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের—

কূর্মলোম-পটাচ্ছন্নঃ শশশৃঙ্গ-ধনুর্ধরঃ।
এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি খপুষ্প-কৃতশেখরঃ ॥[২]

—'কূর্মলোমের বসন পরিয়া শশশৃঙ্গের ধনু লইয়া এই বন্ধ্যার পুত্র চলিয়াছেন, মাথায় তাঁহার আকাশকুসুমের মালা!'

—এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটিতে অবস্তু অর্থাৎ অসম্ভব বস্তু-সমূহের বিচিত্র সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া পাঠকচিত্তে আনন্দের সঞ্চার করা হইয়াছে।

(১) ধ্বন্যালোক, ৩।৪৩, বৃত্তি, পৃঃ ২২০

(২) কবি কর্ণপূরের মতে এই রচনা যোগ্যতার অভাব-হেতু বাক্য হয় নাই, কিন্তু ইহা কাব্য হইয়াছে। দ্রষ্টব্য :—অলঙ্কারকৌস্তুভ, ১।২, বৃত্তি, পৃঃ ৮।

রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে বলিয়াছেন,—

"মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক্, অতথ্য হোক্ কিছুই আসে যায় না। এমন কি সেই অদ্ভুতের সেই অতথ্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয় তবে সাহিত্যে তাকেই সত্য ব'লে স্বীকার করে নেবে। মানুষ শিশুকাল থেকে নানাভাবে আপন উপলব্ধির ক্ষুধায় ক্ষুধিত, রূপকথার উদ্ভব তারি থেকে। কল্পনার জগতে চায় সে হোতে নানা খানা।"[১]

কাব্যের বস্তু-সম্বন্ধে কেবল ভারতীয়দের বিচার এইরূপ নহে, পাশ্চাত্ত্য কবি ও পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তও একই রূপ। মহাকবি শেক্স্পীয়র বলেন,—

"The poet's eye, in a fine frenzy rolling,
Doth glance from heaven to earth,
from earth to heaven ;
And as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes,
and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

—*A Midsummer Night's Dream*,
Act V., *Sc.* I., 12-17

—"কবির চক্ষু সুন্দর উন্মাদনায় ঘূর্ণ্যমান
কটাক্ষে নেহারে স্বর্গ হইতে ভূতল, এবং ভূতল হইতে স্বর্গ,
এবং কল্পনায় যেমন স্ফুরিত হয়
অজানা বস্তুরাশির রূপ,
কবির লেখনী গড়ে তাদের মূর্তি ;
শূন্য তুচ্ছ বিষয়কে দেয় বাসস্থান আর নাম।"

কবি শেলি গদ্যপ্রবন্ধে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—

"Poetry turns all things to loveliness ; it exalts the beauty of that which is most beautiful, and it adds beauty to that which is most deformed." —*A Defence of Poetry*

(১) শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত চিঠি, শান্তিনিকেতন, ৮ আশ্বিন, ১৩৪৩।

—'কাব্য সকল বস্তুকেই সৌন্দর্যে পরিণত করে ; অতি সুন্দর যাহা, তাহাকে ইহা মহিমান্বিত করে, এবং অতি কুৎসিত যাহা, তাহাতে সৌন্দর্য সংযোগ করে।'

স্বর্গ হইতে ভূতল এবং ভূতল হইতে স্বর্গ সর্বত্রই ছড়ান রহিয়াছে কাব্যের বিষয়বস্তু। কবির কল্পনা যেখানে বসে, সেখানেই জাগে রূপ, আসে নাম, রচিত হয় কাব্য।

কাব্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়া লী হাণ্ট্ প্রারম্ভেই বলিলেন,—

"Its means are whatever the universe contains ;"

—*What Is Poetry ?*

—'ভুবনে যাহা কিছু আছে, তাহাই কাব্যের উপায় বা উপাদান।'

এবারক্রম্বির উক্তি আরও সুন্দর এবং সম্পূর্ণ ; তিনি বলেন,—

"And the really characteristic thing about the art of poetry is its power to present the whole conceivable world...to present any thing which any faculty of ours can achieve or accept, as a moment of mere delighted living of self-sufficent experience."

—*The Idea of Great Poetry*, Ch. I., p. 16

—'কাব্যকলার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার এক শক্তি যাহা বোধ-গম্য সমগ্র জগৎকে বর্ণনা করে···আত্মসম্পূর্ণ জ্ঞান ও কেবল আনন্দময় জীবনের মুহূর্তরূপে আমাদের চিত্তবৃত্তি যাহা কিছু লাভ বা গ্রহণ করিতে পারে, তাহাও বর্ণনা করে।'

আনন্দবর্ধন ও এবারক্রম্বির কাব্য-গত বস্তু-জ্ঞানের সাদৃশ্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় উভয়েই চিত্তবৃত্তির ব্যাপারকে আগে লক্ষ্য করিয়াছেন।

এই বিষয়ে শপেনহরের মত বলিয়া কেরিট যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আমাদের তৃপ্ত করে। কেরিট লিখিতেছেন,—

"...there are not certain beautiful things beautiful each in its own certain way, but that everything in the world is capable of being found beautiful, perhaps in many different ways, if only we have the necessary genius."

—*The Theory of Beauty*, Ch. VI., p. 122

—'···প্রত্যেকটিই নিজ বিশিষ্ট ভাবে সুন্দর এমন কয়েকটি মাত্র সৌন্দর্যময় বস্তু নাই, কিন্তু জগতের প্রত্যেকটি বস্তুই সৌন্দর্যময় বলিয়া দৃষ্ট হইবার যোগ্য, সম্ভবতঃ বহু বিভিন্ন ভাবেই যোগ্য, যদি কেবল আমরা উপযুক্ত প্রতিভার অধিকারী হই।'

উপযুক্ত প্রতিভার বলেই ধনঞ্জয়ের কথিত কবি-ভাবনা দ্বারা ভাব্যমানতা সম্ভবপর হয়।

(২)

বিভাব

এখন প্রশ্ন,—এই বস্তু কি ভাবে বিভাব হয়, কি ভাবে চিত্তবৃত্তির গোচর হইয়া কবিভাবনা দ্বারা ভাব্যমান হইয়া থাকে ? বস্তুতঃ প্রশ্ন দুইটি নয়, প্রশ্ন একটিই মাত্র, কেননা বস্তুর বিভাবে পরিণত হওয়া, আর কবিচিত্তের গোচরীভূত হওয়া, অথবা কবি-ভাবনা দ্বারা ভাব্যমান হওয়া স্বরূপতঃ একই ব্যাপার।

সূক্ষ্মবিচারে বস্তু ও বিভাব এক নয়। বস্তু বিভাবে পরিণত হইয়া কাব্যরস জন্মায়, অথবা কাব্য-গত বিভাবের আদি রূপই বস্তু, যেমন দেবপ্রতিমার আদিরূপ মৃৎপিণ্ড মাত্র। বস্তু বহির্জগতের সত্তাময় পদার্থ, বিভাব কবির চিত্তজগতের বৃত্তিময় সত্তা। তাই বস্তু লৌকিক, বিভাব অলৌকিক।

কেবল বিভাব নয়, পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে কাব্যের বিভাব, ভাব ও রস সকলই অলৌকিক। যে ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রের প্রারম্ভে নাট্যের বিষয়বস্তু বুঝাইতে গিয়া সপ্তদ্বীপের যাবতীয় কর্ম, ঘটনা, ভাব ও অবস্থার কথা বলিলেন, তিনিই কিন্তু নাট্যের আত্ম-ভূত রসের বিশ্লেষণ-কালে বস্তু নয়, কেবল মাত্র বিভাবের কথাই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। বিভাব হইতেছে নাট্য বা কাব্যের শব্দে সমর্পিত বাহ্য জগতের বস্তু। এই বস্তু শব্দে সমর্পিত হয় কবিচিত্তের ব্যাপার-বিশেষের মধ্য দিয়া। কবি-চিত্তের এই ব্যাপার হইতেছে কবিচিত্তের অধিবাসন বা অনুরঞ্জন। এই অধিবাসন বা অনুরঞ্জন ক্রিয়া হইতেই অলৌকিকতা আসে এবং বস্তু বিভাবে পরিণত হয়। পূর্বেই দেখান হইয়াছে আনন্দবর্ধনাচার্য এবং এবারক্রম্বি উভয়েই কাব্যের বস্তু-বিচারে কবিচিত্তের ক্রিয়া বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন।

বস্তুসম্পর্কে কবিচিত্তের ব্যাপার কি ? প্রতিভানশালী কবি তাঁহার অপূর্ব প্রতিভান অর্থাৎ সাক্ষাৎদর্শন বা vision নামক শক্তিদ্বারা বহির্জগতের বস্তুকে উপলব্ধি করেন, এই উপলব্ধি কিন্তু ফটোগ্রাফি বা আলোক-চিত্রণ নয়। বাহ্য জগতের লৌকিক বস্তু তাহার যথাস্থিত রূপ-সমাবেশ লইয়া কবিচিত্তে প্রবেশ করিতে পারে না। কবি দর্শনের কালে দৃশ্য ঘটনার কোন কোন অংশ বিশেষ ভাবে

লক্ষ্য করেন, কোন কোন অংশ হয়তো মোটেই লক্ষ্য করেন না, কোন অংশ উনকৃত করিয়া কোন অংশ বা অতিকৃত করিয়া দেখেন। তারপর এই অংশসমূহ সমন্বয়ের মধ্য দিয়া কবিচিত্তে এক সুসংলগ্নতা ও সমগ্রতা লাভ করে; এবং কবির স্বাভাবিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি হইতে বিচিত্র অনুষঙ্গ-অনুযায়ী তাহার একটি তাৎপর্য—একটি ভাব ও অর্থরূপ দ্যোতিত হইয়া উঠে, ইহাই কবিচিত্তে বস্তু-স্বরূপের প্রকাশ, বা কবিচিত্তের অধিবাসন-ক্রিয়া। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারে বস্তুর লৌকিকতা ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হয় অলৌকিক, শব্দের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া তাহা হয় বিভাব। নাট্য বা কাব্যের কারবার এই বিভাব লইয়া।

এই বিভাব লইয়া কিন্তু Realism বা Idealism অর্থাৎ বস্তু-তন্ত্র বা ভাব-তন্ত্রের প্রশ্ন উঠে না, তাহা আসে বিশেষ বিভাব অথবা কবিচিত্তের বিশেষ ভাবনা-ভঙ্গী এবং কাব্যরচনার বিশেষ কৌশল-প্রয়োগ লইয়া। যে প্রক্রিয়ার কথা লিখিত হইল, তাহা সকলেরই চিত্তে বস্তু-গ্রহণের সময়ে অল্পাধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। সৃষ্টি-বিষয়ে কবি প্রজাপতির তুল্য বলিয়া তাঁহার চিত্তেই ইহা প্রবল ভাবে ঘটিয়া থাকে। ওয়াল্‌টার পেটার বলেন, সত্যসন্ধ ঐতিহাসিকের বেলায়ও ইহার অন্যথা হয় না,—

"Your historian, for instance, with absolutely truthful intention, amid the multitude of facts presented to him must needs select and in selecting assert something of his own humour, something that comes not of the world without but of a vision within."

—*Appreciations*, *Style*, p. 9

—'উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, ঐতিহাসিককে সম্পূর্ণ সত্য-নিষ্ঠ উদ্দেশ্য লইয়াও তাঁহার নিকট উপস্থাপিত রাশি রাশি ঘটনার মধ্য হইতে নির্বাচন করিয়া লইতে হয়; এবং এই নির্বাচনকালে তাঁহার নিজের ভাব বা প্রকৃতির এমন কিছু প্রয়োগ করিতে হয়, যাহা বহির্জগৎ হইতে আসে না, আসিয়া থাকে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি হইতে।'

(৩)

অনুকরণ

আমাদের মনে হয় বিভাবের সম্পাদনাই বস্তুর অনুকরণ, আরিষ্টটল্ যাহাকে বলিয়াছেন Mimesis বা Imitation। কবিচিত্ত দ্বারা বাহিরের বস্তু গ্রহণই বস্তুর

বিভাবতা সম্পাদন অথবা বস্তুর অনুকরণ। বিভাব বস্তুর সদৃশ হইয়াও বস্তুর নিখুঁত প্রতিচ্ছবি নয়। কবিচিত্ত জড় দর্পণ-সদৃশ নয় যে বস্তু তাহাতে সহজ নিয়মে প্রতিবিম্বিত হইয়া আপনি প্রকাশ পাইবে। বস্তুর অনুকরণের মধ্যেই বস্তুর এক অভিনব সংস্করণ ও অভিনব প্রকাশ হইয়া থাকে। বস্তু ও বিভাবের বাহ্য সাদৃশ্য উপলব্ধি করিয়াই প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন গ্রীসের আচার্যগণ ভাষায় ইহাকে অনুকরণ-প্রক্রিয়া বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন। অনুকরণ পশ্চাৎকরণ হইলেও ইহা করণ; এই করণ-ব্যাপারে সৃষ্টিব্যাপার কিছু নিহিত থাকিবেই। দেশ, কাল এবং বিষয়-সন্নিবেশের সহিত চিত্তাবস্থা নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। মন যাহাকে গ্রহণ করে, তাহাকে তাহার আত্মভূত করিয়া লয়। কবিচিত্তে বিষয়ের গ্রহণই বিষয়ের তৎকালের জন্য কবিস্বরূপতা প্রাপ্ত হওয়া। অতএব বস্তুর অনুকরণের মধ্যেই বস্তুর নবীকরণ বা নবসৃষ্টিকরণ থাকে। এমন কি কবি-নির্মিত কাব্য-পাঠেও পাঠকের চিত্তে বস্তুর যে প্রকাশ হয়, তাহা কবি-চিত্তের প্রকাশ হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, কেননা এখানেও বিষয়-গ্রহণের সঙ্গেই পাঠকের ব্যক্তি-বোধের মধ্য দিয়া বিষয়ের কিঞ্চিৎ নবীকরণ হয়। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন নিজ ভাবময় ব্যক্তি-বোধের মধ্য দিয়া, তাই তাঁহার রচিত মেঘদূত প্রবন্ধে অভিনব মেঘদূত প্রকাশ পাইয়াছে।

এই অনুকরণ কথাটি আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে, বিশেষতঃ শিল্প-শাস্ত্রে খুবই প্রচলিত।

বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি ভরত নাটককে বলিয়াছেন,—

"লোকবৃত্তানুকরণ," "সপ্তদ্বীপানুকরণ"।

পরবর্তী কালে দশরূপককার ধনঞ্জয়ও নাটকের অনুরূপ সংজ্ঞাই দিয়াছেন,—

"অবস্থানুকৃতি র্নাট্যম্।" —দশরূপক, ১

—'লোকসমাজের অবস্থার অনুকরণই নাট্য।'

বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"যথা নৃত্তে তথা চিত্রে ত্রৈলোক্যানুকৃতিঃ স্মৃতা।"

"নৃত্তং চিত্রং পরং মতম্।" —চিত্রসূত্র, ৩৫।৫, ৭

—'যেমন নৃত্যে তেমন চিত্রে উভয়েতেই ত্রৈলোক্যের অনুকরণ দেখা যায়। নৃত্যই শ্রেষ্ঠ চিত্র।'

শ্রীকুমার শিল্পরত্নগ্রন্থে চিত্রসম্বন্ধে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া লিখিয়াছেন,—

জঙ্গমা বা স্থাবরা বা যে সন্তি ভুবনত্রয়ে।
তৎ তৎ স্বভাবত স্তেষাং করণং চিত্রম্ উচ্যতে। —শিল্পরত্ন, ৪৬।২

—'তিন ভুবনে জঙ্গম বা স্থাবর অর্থাৎ গতিশীল বা স্থিতিশীল যাহা কিছু আছে, তাহাদের স্বাভাবিকভাবে তদ্রূপ করণই চিত্র।'

এখানে স্বাভাবিকভাবে তদ্রূপ করণই অনুকরণ।

ভরত নাট্যকে 'লোকবৃত্তানুকরণ' বলিবার পূর্বেই উহার স্বরূপ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"ত্রৈলোক্যস্যাস্য সর্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্তনম্।" —নাট্যশাস্ত্র, ১।১০৭

—'নাট্য হইতেছে এই নিখিল ত্রিলোকের ভাবরাশির অনুকীর্তন।'

উভয় উক্তির সামঞ্জস্য করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, অনুকরণ দ্বারা বস্তুর কেবল বাহ্যমূর্তি নয়, অন্তঃস্থিত ভাবমূর্তির পরিস্ফুটনও বুঝাইতেছে। 'ভাবানুকীর্তন' পূর্বে উল্লিখিত হওয়ায় বস্তুর প্রাণপ্রদ ধর্মের প্রকাশই মুখ্য এবং 'বৃত্তানুকরণ'কে, তদনুকল্প প্রকাশ বলিয়া গৌণ বুঝিতে হইবে। নাট্য-সমূহের কথাবস্তু বিশ্লেষণ করিলেই এই বিষয়ের যথার্থতা উপলব্ধি হইবে।

নাট্যশাস্ত্রের ন্যায় শিল্পশাস্ত্রেও লিখিত আছে,—

তত্র তত্রোচিতাকার-রসভাব-ক্রিয়ান্বিতম্।
চিত্রং বিচিত্রফলদং ভর্তুঃ কর্তুশ্চ সর্বদা॥ —শিল্পরত্ন, ৪৬।১২

—'চিত্রে সমুচিত আকার অর্থাৎ রূপ থাকিবে, আরও থাকিবে সমুচিত রস, ভাব ও ক্রিয়া; তবেই তাহা সর্বদা শিল্পকর্তা এবং তাঁহার ভর্তা অর্থাৎ প্রতিপালককেও বিচিত্র ফল দান করিবে।'

অনুকরণ হয় রূপের, তাহাই যখন শিল্পীর তুলিকাপাতে সমুচিত ভাব ও রসে এবং সমুচিত ক্রিয়া দ্বারা অভিব্যক্ত হইবে, তখনই সেখানে প্রকাশ পাইবে অন্তর্গূঢ় জীবনের মহিমা, যাহা অনুকরণের অতীত।

নৃত্য ও চিত্রশাস্ত্রে এই অনুকরণ কি এবং তাহা কি ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রাচীনকালে চিত্র-শাস্ত্র নৃত্য-শাস্ত্রের একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। চিত্রসূত্রে তাই লিখিত আছে,—চিত্রশাস্ত্রে যাহা অনুক্ত, তাহা নৃত্যশাস্ত্র হইতে বুঝিতে হইবে। নৃত্যে একদিকে আছে সঙ্গীত তালে তালে যাহার ছন্দস্পন্দন

অনুভব করা যায়, আর একদিকে আছে চিত্র প্রতিক্ষণে যাহা নটের অঙ্গ-বিন্যাসে প্রাণময় হইয়া জীবনকে পরিস্ফূর্ত করিয়া তুলে। এ জীবন যেমন বিচিত্র মনুষ্য-জীবন, তেমনই ইহা পশু-পক্ষী বৃক্ষ-লতা অথবা শৈল-সমুদ্রের জীবন। লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে নৃত্যে বা চিত্রে জীবনকে পরিস্ফূর্ত করার অর্থ সমুচিত ভাবাভিব্যক্তি দ্বারা বস্তুর প্রাণ-প্রদ ধর্মকে আবিষ্কৃত করা; ইহাই নৃত্য বা চিত্রের ত্রৈলোক্যানুকৃতি। একটি সহজ উদাহরণ লওয়া যাইতেছে। সাগর-নৃত্য বা লতা-নৃত্য, অথবা ঝটিকা-নৃত্য, কিংবা ঋতু-রঙ্গ-নৃত্য হইতেছে। ইহা স্পষ্ট যে অনুকরণ দ্বারা গ্রীক শিল্পিগণ যাহা বুঝিয়াছেন এখানে তাহা প্রয়োগ করার প্রশ্নই উঠে না; কেননা এই সকল প্রাকৃত বস্তুর যথা-স্থিত বা যথা-দৃষ্ট স্বরূপের অনুকরণ সম্ভব নয়। সাগর-নৃত্যে সফেন সলিলরাশি কোথায়? লতা-নৃত্যেই বা পেলব পুষ্প-পল্লব কোথায়? এমন কি নৃত্যচ্ছন্দে উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস অথবা দোলায়িত সুকুমার গতি কি অবিকল সমুদ্রবিক্ষোভ কিংবা লতার লীলায়িত ভঙ্গীর অনুরূপ? অথচ শাস্ত্রকার পণ্ডিতগণ অনুকরণ শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন; অনুকরণ-শব্দ দ্বারা তাই বুঝিতে হইবে একদিকে বস্তুর বাহ্যরূপের সদৃশীকরণ, অপর দিকে তাহার রূপাতীত প্রাণপ্রদ ধর্মের আবিষ্করণ। এই দুই ক্রিয়াকে একত্র করিয়া আমরা বলিতে চাই নবীকরণ। ইহাই ভারতীয় শাস্ত্রে ব্যবহৃত অনুকরণ-শব্দের অর্থ। ভারতীয় অজন্তা বা ইলোরার গুহা-চিত্র, অথবা ভাস্কর্যে নটরাজ কিংবা ধ্যানী বুদ্ধের প্রস্তর-মূর্তি লক্ষ্য করিলেই আমরা ভারতীয় অনুকরণ শব্দের সম্পূর্ণ দ্যোতনা উপলব্ধি করিতে পারিব।

চিত্র-শিল্পের দুইটি বিশিষ্ট পদ্ধতি অনুকারক ও ব্যঞ্জক। ভারতীয় চিত্রে ব্যঞ্জকপদ্ধতির প্রাধান্য, তাহা কখনও বস্তুর হুবহু নকল হইতে পারে না। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু আধুনিক ভাষায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন,—

"শিল্প হল সৃষ্টি। স্বভাবের অনুকরণ নয়। বাহ্য স্বভাবের মধ্যে সৃষ্টির যে আবেগ নিরন্তর ক্রিয়াশীল শিল্পীর স্ব-ভাবেও তারই প্রেরণা, তারই ক্রিয়া; সুতরাং অনুকরণের কথা উঠে না।...

আলংকারিকদের ভাষায় বলতে গেলে, শিল্প হল ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। একটু রূপ, একটু রঙ, একটু রেখা দিয়ে ইঙ্গিতে অনেকখানি ভাবনা ও বেদনার অনুষঙ্গ জাগিয়ে তোলা তার কাজ।" —শিল্পকথা, পৃঃ ৩৬

ভারতীয় শিল্পাচার্য নন্দলালের প্রমাণ আমাদেরই অনুকূলে। শিল্প অনুকরণ নয় বলিয়া প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের অনুকরণ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তিনি আরও পরিস্ফুট

করিয়াছেন। শিল্প কেন স্থূল অনুকরণ নয়, তাহার কারণটিও শিল্পাচার্য চমৎকার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এই অনুকৃতির মূলে রহিয়াছে এক বিস্ময়-বোধ বা অদ্ভুত রস, এক অপূর্ব 'wonder-spirit'। কবিচিত্ত যখন বাহ্য-জগতের বস্তু দেখিয়া চমৎকৃত হয়, জীবনের অসীম রহস্য উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হয়, তখনই অদ্ভুত রস সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে শব্দরাশি দ্বারা অনুকরণেচ্ছা জাগে, ইহাকেই আমরা বলি সৃষ্টির প্রেরণা। বস্তুর স্বরূপ প্রকাশদ্বারা বিস্ময়-ভাব উদ্বুদ্ধ না হইলে অনুকৃতির ইচ্ছা বা চেষ্টা হইতে পারে না; সকল সৃষ্টির মূলে তাই মানবচিত্তের বিস্ময়-ভাব, সকল রসে অনুস্যূত রহিয়াছে অদ্ভুত রস,—

'সর্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ'।

গ্রীক্ দার্শনিক আরিষ্টট্‌ল্ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কাব্য-সূত্রের প্রারম্ভেই কাব্য প্রভৃতিকে 'modes of imitation'[১]—অনুকরণ-প্রকার বলিয়াছেন। এই অনুকরণ শব্দটি আরিষ্টট্‌লের পূর্বে প্লেটো-কর্তৃক এবং প্লেটোরও পূর্ববর্তিগণ-কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ মনে করেন পূর্বকালাগত বলিয়া আরিষ্টট্‌ল্ শব্দটি কাব্য-স্বরূপ বুঝাইবার পক্ষে অনুপযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তবে তিনি অর্থ-ব্যাপ্তি ঘটাইয়া শব্দটিকে কার্যতঃ নূতন ভাবেই প্রয়োগ করিয়াছেন। আরিষ্টট্‌ল্ কাব্য-সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"...it is not the function of the poet to relate what has happened, but what may happen,—what is possible according to the law of probability or necessity." —*The Poetics, IX, I.*

—'কবির কার্য হইতেছে, যাহা ঘটিয়াছে তাহার নয়, কিন্তু যাহা ঘটিতে পারে,—সম্ভাব্যতা বা প্রয়োজনীয়তার বিধি অনুযায়ী যাহা ঘটনীয়, তাহার বর্ণনা করা।'

এইরূপে পরেও তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,—বস্তু-বিচারে অসম্ভব কিন্তু ঘটনীয় বস্তু অপেক্ষা সম্ভবপর অঘটনীয়তা সমধিক বরণীয়।[২]

আরিষ্টট্‌ল্ অন্যত্র আরও স্পষ্ট করিয়া নিপুণ চিত্রকরদের উদাহরণ দেখাইয়া বলিয়াছেন,—

(১) *The Poetics*, I, 2.

(২) *The Poetics*, *XXV*, 17 ; *XXIV*, 10.

"They, while reproducing the distinctive form of the original, make a likeness which is true to life and yet more beautiful."

—*Ibid*, *XVI*, 8

—'তাঁহারা মূলের বিশিষ্ট রূপ অঙ্কিত করিয়া এমন সাদৃশ্য পরিস্ফুট করেন, যাহা জীবন সম্বন্ধে সত্য, অথচ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মনোহর।'

—কবিও সেইপ্রকার বস্তু-সাদৃশ্য স্থাপন করিয়াও তাহাকে সমধিক সুন্দর করিয়া নির্মাণ করিবেন।

ইহার পূর্বে অনুকরণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াই আরিষ্টট্‌ল্ লিখিয়াছেন,—

"The poet being an imitator,...must of necessity imitate one of the three objects,—things as they were or are, things as they are said or thought to be, or *things as they ought to be.*"
(ইটালিক্‌স্ আমাদের দেওয়া) —*Ibid*, *XXV*, *1.*

—'কবি অনুকরণ-কারী বলিয়াই তিনটি বিষয়ের একটি অনুকরণ করিবেন,— বস্তুসমূহ যে ভাবে ছিল অথবা আছে, বস্তুসমূহ যে ভাবে আছে বলিয়া বলা বা মনে করা হয়, অথবা বস্তুসমূহের যে রূপ হওয়া উচিত।'

আরিষ্টট্‌লের সূত্রেই অনুকরণ শব্দের এই অর্থ-ব্যাপ্তি লক্ষ্য করিয়া বুচার তাহার অনুসরণে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, আরিষ্টট্‌ল্ '*Imitation*' শব্দ দ্বারা কাব্যে বুঝাইয়াছেন '*producing*' অর্থাৎ নির্মাণ করা, উৎপাদন করা অথবা '*creating according to a true idea*' অর্থাৎ কোন প্রকৃত ভাবানুযায়ী সৃষ্টি করা।¹

আমরা দেখিতেছি পাশ্চাত্ত্যেও অনুকরণ শব্দের দ্যোতনা আমাদের অনুকরণ শব্দের অনুরূপ। উভয়ই শেষ পর্যন্ত সদৃশীকরণ ও নবীকরণ—নব-সৃষ্টি-করণ বুঝায়।

এই বিষয়ে ওয়াল্‌টার পেটারের একটি উক্তি বাস্তবিকই মনোহর,—

'Literary art, that is, like all art which is in any way imitative or reproductive of fact—form, or colour, or incident—is the representation of such fact as connected with soul, of a specific personality, in its preferences, its volition and power."

—*Appreciations*, *Style.*

(১) Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art, *Ch. II*, p. 153

—'অন্যান্য শিল্প যে প্রকার বস্তু অর্থাৎ আকৃতি, বর্ণ বা ঘটনার কোনও রূপে অনুকরণ বা পুনর্নির্মাণ করে, সাহিত্য-শিল্পও সেই প্রকার এমন সকল বস্তু বর্ণনা করে, যাহা রুচি, ইচ্ছা এবং শক্তি বিষয়ে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি-বোধের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত।'

এখানে লেখক স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিলেন যে, সাহিত্যের অনুকৃত বা পুনঃনির্মিত বস্তু সর্বদাই *'soul of a specific personality'* বা বিশিষ্ট ব্যক্তি-বোধের সহিত অভিন্ন হইয়া প্রকাশ পায়। অনুকৃতি তাই কখনও আলোকচিত্রণ কিংবা দর্পণের প্রতিবিম্ব মাত্র নয়; তাহা বিশিষ্ট রুচিপ্রকৃতিময় ও নবসৃষ্টির স্পন্দনময় মানবাত্মায় প্রতিভান বা প্রকাশ।

দার্শনিক ক্রোচেও 'imitation of nature' অর্থাৎ নিসর্গানুকরণ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ইহা বিজ্ঞান-সম্মত ভাবেই বুঝায়,—

"Representation or intuition of nature, a form of Knowledge."

—'নিসর্গের অন্তঃস্থাপন বা উপলব্ধি, এক প্রকার জ্ঞানমাত্র।'

কিন্তু ইহার পরেই তিনি মন্তব্য করিলেন,—

অর্থোপলব্ধির স্বাভাবিক ক্রম আরও স্পষ্টরূপে অনুসৃত হইলে অন্য প্রতিপাদ্যটিও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় এবং তাহা হইতেছে,—

"...art is the *idealization* or *idealizing* imitation of nature."

—*Æsthetic*, Ch. II, p. 28.

—'নিসর্গের ভাবাঙ্গস্ফূরণ অথবা তাহার ভাবাঙ্গময় অনুকরণই আর্ট।'

অবশেষে ক্রোচে স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন জীবন্ত-প্রায় চিত্রিত মোমের মূর্তিগুলি বিস্ময় জন্মাইলেও উহারা আর্টের 'aesthetic intuition' বা সৌন্দর্যবোধগত আত্মোপলব্ধি দিতে পারে না। মায়া বা ইন্দ্রজাল রচনার আনন্দ অনেক নিম্নস্তরের, আর্টের আনন্দ শান্ত ও উর্ধ্বস্তরের।

(৪)

রূপ ও রস

বিভাবনা শব্দ লইয়া আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।[১] বিভাবিত করার অর্থ—আস্বাদরূপ অঙ্কুরটিকে উৎপত্তির যোগ্য করা, সহজ ভাষায় বলা যায়,—রসে

(১) কাব্যালোক, ১২১-১২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পরিণত করা। বস্তু তখনই বিভাব হয়, যখন তাহা কবিচিত্তের অধিবাসনে এমন রূপ লাভ করে, যাহাতে শব্দে সমর্পিত হইয়া সহজেই সামাজিকের চিত্তে ভাব বা রম্যার্থ উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাকে রসে বা রম্যবোধে পরিণত করিতে পারে। বিভাব তাই বাহিরের বস্তু নয়, বস্তুর কাব্য-গত রূপ। রূপই রসসৃষ্টি করে, বস্তু নয়।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। আমরা প্রথমাধ্যায়েই ভাব ও রম্যার্থ এবং রস ও রম্যবোধ—এই দুই প্রকার ভাগের কথা বলিয়াছি। যেখানে রস ও রম্যবোধের মধ্যে সূক্ষ্মভেদ করিবার প্রশ্ন উঠে না, সেখানে প্রচলিত সংস্কার-অনুযায়ী একমাত্র রস শব্দ প্রয়োগ করাই সুবিধা এবং এখানে তাহাই করা হইতেছে। বিভাব বা রূপের সম্পর্কে রস ও রম্যবোধের মধ্যে পার্থক্য করিবার কিছু নাই। তাই 'রস' বলিলে রস ও রম্যবোধ, এবং 'ভাব' বলিলে ভাব ও রম্যার্থ, এমন কি স্থল-বিশেষে উহাদের পরিণতি রস ও রম্যবোধও বুঝাইতে পারে। প্রসঙ্গ বুঝিয়া অর্থের ব্যাপ্তি বা সঙ্কোচ করিতে হইবে।

বিভাব ও ভাব সাহিত্যে অভিন্ন এবং অবিচ্ছেদ্য। বিভাব ও ভাব বলিতে এখানে রূপ ও রসই বুঝা যাইতেছে। উভয়ের মধ্যে কোন তুলনার প্রশ্ন উঠে না। তথাপি রসের অথবা রম্যবোধেরই সর্বময় প্রাধান্য বলা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে রূপ বুঝি বিশেষ কিছু নয়। ইক্ষুরসকে ইক্ষুদণ্ড হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝা গেলেও রসকে রূপ হইতে পৃথক্ করিয়া আস্বাদন সম্ভবপর নয়। তথাপি আলোচনার জন্য প্রশ্ন হইতে পারে,—রূপ প্রধান, না রস প্রধান? রূপ ও রস সত্যই অবিচ্ছিন্ন বলিয়া সঙ্গত প্রশ্ন হইতেছে,—রসাশ্রিত রূপ স্থায়ী, না রূপাশ্রিত রস স্থায়ী? রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে এই প্রশ্নটি আলোচনা করিয়াছেন এবং রূপের পক্ষেই রায় দিয়াছেন। রূপের মূল্য বা বিভাবের মর্যাদা কাহারও অপেক্ষা কম নয় বুঝাইবার জন্যই এই প্রশ্নের অবতারণা করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উত্তর নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"আমার মতো গীতি-কবিরা তাদের রচনায় বিশেষ ভাবে রসের অনির্বচনীয়তা নিয়ে কারবার করে থাকে। যুগে যুগে লোকের মুখে এই রসের স্বাদ সমান থাকে না, তার আদরের পরিমাণ ক্রমশঃই শুষ্ক নদীর জলের মতো তলায় গিয়ে ঠেকে। এইজন্য রসের ব্যবসা সর্বদা ফেল হবার মুখেই থেকে যায়। তার গৌরব নিয়ে গর্ব করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এই রসের অবতারণা সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন নয়। তার আর একটা দিক আছে যেটা রূপের সৃষ্টি। যেটাতে আনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, কেবলমাত্র অনুমান নয়, আভাস নয়, ধ্বনির ঝংকার নয়।...সাহিত্যের ভিতর দিয়ে

আমরা মানুষের ভাবের আকৃতি অনেক পেয়ে থাকি এবং তা ভুলতেও বেশি সময় লাগে না। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে মানুষের মূর্তি যেখানে উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে সেখানে ভোলবার পথ থাকে না। এই গতিশীল জগতে যা কিছু চলছে ফিরছে তারই মধ্যে বড় রাজপথ দিয়ে সে চলাফেরা করে বেড়ায়। সেই কারণে শেক্‌স্‌পীয়রের লুক্রিস এবং ভিনস অ্যাণ্ড অ্যাডোনিস-এর কাব্যের স্বাদ আমাদের মুখে আজ রুচিকর না হতে পারে—সে-কথা সাহস করে বলি বা না বলি ; কিন্তু লেডি ম্যাকবেথ অথবা কিং লীয়র অথবা অ্যাণ্টনি ও ক্লিয়োপেট্রা এদের সম্বন্ধে এমন কথা যদি কেউ বলে তা হলে বলব তার রসনায় অস্বাস্থ্যকর বিকৃতি ঘটেছে, সে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।···

তাই বলছি সাহিত্যের আসরে এই রূপসৃষ্টির আসন ধ্রুব।"

—সাহিত্যের স্বরূপ, পৃ. ৫১-৫২

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ রসের ব্যবসায়ী গীতিকবি বলিয়া এবং তাঁহার বর্ণিত রূপের মূল্য-সম্বন্ধে আমরা একমত বলিয়া, একটু দীর্ঘ হইলেও তাঁহার মন্তব্যের অনেকাংশ উদ্ধৃত হইল। কিন্তু রস-স্রষ্টা হইয়াও তিনি যেন রস-সম্বন্ধে সুবিচার করিতে পারেন নাই। রূপের মাহাত্ম্য বুঝাইতে আগেই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন রূপ আনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এই প্রত্যক্ষ অনুভূতিই তো রস। রস-হীন রূপ সাহিত্যের জগতে রূপই নয়, রস-দুর্বল কোন রূপ মহাকালের কোন চিত্রশালায় স্থান পাইতে পারে না। সৃষ্ট রূপকে চিত্র বলিলেই তাহা রস-লোকের বাহিরে যায় না, কেননা চিত্রের স্থায়িত্ব ও মূল্যও প্রধানতঃ রস-ব্যঞ্জনায়।[১] তাঁহার কথিত লুক্রিস্ প্রভৃতির উদাহরণও সঙ্গত নয়, কারণ উক্ত কবিতা দুইটি গীতিকাব্য-ধর্মে ইংরেজী সাহিত্যেও তেমন উৎকৃষ্ট নয়, এবং শেক্‌স্‌পীয়রের জীবিত কালেও তাঁহার প্রসিদ্ধ নাট্যসমূহের পার্শ্বে তাহাদের স্থান হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র শেক্‌স্‌পীয়রের রচনা বলিয়াই তাহা ভক্ত পাঠকমণ্ডলীর কৌতূহল উদ্রেক করে। রবীন্দ্রনাথ 'সখীপরিবৃতা শকুন্তলা'কে বলিয়াছেন চিরকালের ; মেঘদূত—গীতিকাব্য, তাহাও কি চিরকালের

(১) বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণে তৃতীয় খণ্ডে চিত্রশিল্পের আলোচনায় স্পষ্টতঃ নাট্যের আটটি রসকেই চিত্ররস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ভরত-প্রণীত রস-গণনার শ্লোকটিতে (দ্রষ্টব্য কাব্যালোক, পৃঃ ১১৩) 'নাট্যে' শব্দস্থলে 'চিত্রে' শব্দ বসাইয়া চিত্ররস গণনা করা হইয়াছে।

নয়? ভবভূতি ভারতীয় কাব্যের চিত্র-ভাণ্ডারে কোন অমররূপ দান করিতে পারেন নাই, স্বকালেও তিনি সুধীগণ-কর্তৃক সমাদৃত হ'ন নাই। কিন্তু পরবর্তী যুগে যুগে লোকের মুখে উত্তররামচরিতের গীতিকবিতার স্বাদ বাড়িয়াই চলে নাই কি? যুগে যুগে লোকের মুখে রসের স্বাদ সমান থাকে না সত্য, কিন্তু গীতিকবিতার রসপ্রবাহ কেবল একটানা ভাঁটা নয়, নব যুগে তাহাতে নব জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস আসিতে পারে, আসিয়াও থাকে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রাচীন সাহিত্যের কাদম্বরী প্রবন্ধে বলিয়াছেন রামায়ণ-মহাভারতের পর কালিদাসের যুগে ভারতীয় কাব্যে রূপ অর্থাৎ বিশিষ্ট চরিত্র-অঙ্কন অপেক্ষা ভাব ও রসের কারবারই চলিয়াছে বেশি। মন্তব্যটি আমরা অসার মনে করি না। কিন্তু ইহাতে কালিদাসের কাব্যের স্থায়িত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রেও চরিত্র বা রূপাঙ্কন অপেক্ষা রসের বিশ্লেষণ ও আলোচনারই প্রাধান্য দেখা যায়।

মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এখানে মুখ্যতঃ গীতি-কাব্য এবং নাট্য-কাব্য ও শ্রব্য-কাব্যের তুলনা করিয়াছেন; উহাতে রস ও রূপের তুলনা সম্পন্ন হয় নাই। এই সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই মন্তব্য করিয়াছি,—স্থায়ী ভাবাশ্রয়ে রচিত কবিতাই সাধারণতঃ স্থায়ী হয়, প্রাসঙ্গিক ভাব-জাত কবিতার সার্থকতা পরিবর্তনশীল যুগ-রুচির উপরই নির্ভর করে।

তাহা হইলেও সাহিত্যের আসরে রূপসৃষ্টির আসন ধ্রুব। কারণ উত্তম রসের আশ্রয়েই উত্তম রূপের সৃষ্টি, এবং উত্তম রূপের আলম্বনেই উত্তম রসের প্রকাশ। বস্তুতঃ প্রকৃত সাহিত্যে চন্দ্র ও জ্যোৎস্নার ন্যায় রূপ ও রস অভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-জগতে যে কয়টি শাশ্বতরূপের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটিই রসধর্মে সমান উজ্জ্বল। রসের প্রকাশের জন্যই তো রূপ, রূপের নির্মাণের জন্যই তো রস। এই আলোচনা নাট্য-ধর্মাশ্রিত কাব্য-সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। গীতিকাব্যে অনেক সময়ে বিভাব দুর্বল থাকে, ভাব হয় সর্বগ্রাসী; রূপ ও রসের সামঞ্জস্য যেন থাকে না। কিন্তু এই আলোচনা পৃথক্ ভাবে করা সঙ্গত; কারণ গীতিকাব্যের রূপ এবং আঙ্গিক ও তাহার প্রয়োগ-কৌশলও খানিকটা ভিন্ন রকমের।

(৫)

বিভাব বা রূপ-নির্মাণ

এখন প্রশ্ন, কাব্যে বস্তু হইতে কি ভাবে এই বিভাব বা রূপের গঠন হয়? দুইটি বিশিষ্ট পদ্ধতির কথা সকলেরই জানা আছে। এক, কোন পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক, অথবা প্রকৃত বস্তু গ্রহণ করিয়া তদাশ্রিত কবি-চিত্তের বিশিষ্ট ভাব ও রসের পরিস্ফুটনের নিমিত্ত তাহার আবশ্যকীয় রূপান্তর অর্থাৎ পরিবর্জন ও পরিবর্ধন ঘটান হয়। অপর, বহির্জগতের জীবন-ধারা উপলব্ধি করিয়া তৎকল্প কথাবস্তু পরিকল্পনা করা হয়। এই দুইটি বস্তুকে আমরা সংক্ষেপে বলি পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বা প্রকৃত বস্তু, এবং কাল্পনিক বা পরিকল্পিত বস্তু—প্রাচীনেরা বলিতেন 'উৎপাদ্য বস্তু'।[১] সম্পূর্ণ অনুকরণ-জাত[২] যথাস্থিত, যথাদৃষ্ট কোন বস্তু থাকিতে পারে না; আবার জীবন ও জগতের সহিত নিঃসম্পর্ক একান্ত মিথ্যা বা কাল্পনিক বস্তুও কিছু সম্ভবপর নয়।

কবির নির্মাণ-শক্তি সকল প্রকার কাব্যবস্তুতেই প্রযুক্ত হয়, কোথাও অংশতঃ কোথাও বা পূর্ণতঃ; কবির জগদ্‌ব্যাপারজ্ঞান, স্থির রসবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাদৃষ্টি সকল সৃষ্টির মূলসূত্র রূপে সমান ভাবে কাজ করে। কবি যে নির্মাণশক্তিদ্বারা নূতন যোজনা করেন, তাহার নিয়ামক তত্ত্বটি কি? ধ্বনি-কার ও আনন্দবর্ধন বলেন 'ঔচিত্য'[৩]। এখানে 'বিভাবৌচিত্য' বা বিভাব-গত ঔচিত্য; এইরূপে 'ভাবৌচিত্য' বা প্রকৃতিগত ঔচিত্য প্রভৃতিও আছে। কাব্যের শরীর হইল 'কথাশরীর', রস হইতেছে তাহার আত্মা। ঔচিত্য হইতেছে প্রসঙ্গানুযায়ী অভিপ্রেত রসের উপযোগিত্ব। কাব্যের বস্তু-বিচারে নায়কপ্রভৃতির কত প্রকার প্রকৃতি রহিয়াছে,— উত্তম, মধ্যম, অধম; আবার দিব্য, মানুষ, আসুর। আনন্দবর্ধন বলেন,—

(১) "তত্রোৎপাদ্যা যেষাং শরীরম্ উৎপাদয়েৎ কবিঃ সকলম্।"

—রুদ্রট-প্রণীত কাব্যালঙ্কার, ১৬।৩

—'যে সকল কাব্যশরীর কবি নিজেই সম্পূর্ণ-রূপে উৎপন্ন করেন, তাহারা উৎপাদ্য প্রবন্ধ।'

(২) অনুকরণ শব্দ প্রচলিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

(৩) ধ্বন্যালোক, ৩।১০-১৪, এবং আনন্দবর্ধনের বৃত্তি পৃঃ ১৪৪-৪৮ দ্রষ্টব্য।

তথাচ কেবলমানুষস্য রাজাদে বর্ণনে সপ্তার্ণবলঙ্ঘনাদিলক্ষণা ব্যাপারা উপনিবধ্যমানাঃ সৌষ্ঠবভৃতোঽপি নীরসা এব নিয়মেন ভান্তি। —ধ্বন্যালোক, বৃত্তি, পৃঃ ১৪৫

—'রাজা বা তৎসদৃশ মহিমান্বিত কেহ হইলেও তাঁহারা কেবল মানুষ বলিয়া সপ্তসমুদ্রলঙ্ঘন প্রভৃতি ব্যাপার-সমূহ উপনিবদ্ধ হইয়া যতই সৌষ্ঠবশালী হউক না কেন, ঔচিত্য-নিয়মে কাব্যে নীরস বলিয়াই মনে হয়।'

ইহার একমাত্র কারণ হইতেছে অনৌচিত্য বা অনুপযোগিত্ব।

এই বিষয়ে আরিষ্টট্‌লও বলিয়াছেন,—

"...the poet should prefer probable impossibilities to improbable possibilities." —*Aristotle's Poetics*, XXIV, 10.

—'কাব্যে কবির অসম্ভব ঘটনীয় বস্তু অপেক্ষা সুসম্ভব অঘটনীয় বস্তু নির্বাচন করা উচিত।'

তিনি পুনরায় বলেন,—

"Within the action there must be nothing irrational."

—*Aristotle's Poetics*, XV, 7.

—'ঘটনার মধ্যে এমন কিছুই থাকিবে না, যাহা যুক্তি বা প্রতীতির অগোচর।'

ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আচার্য অভিনবগুপ্ত বিষয়টি পরিষ্কার করিয়াছেন,—

যত্র বিনেয়ানাং প্রতীতি-খণ্ডনা ন জায়তে তাদৃগ্ বর্ণনীয়ম্।

—ধ্বন্যালোক, ৩।১৪ টীকা, পৃঃ ১৪৫

—'এমন ভাবে বর্ণনা করিতে হইবে, যাহাতে বিনেয় অর্থাৎ পাঠকগণের প্রতীতি খণ্ডন না হয়।'

বাহিরের বস্তু এমন ভাবে পরিকল্পিত হইয়া বিভাব-রূপে পরিণত হইবে, যাহাতে পাঠকের চিত্ত তাহাকে স্বাভাবিক বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারে। তাহা হইলেই কাব্য-কথা হইতে রসোদ্বোধ সহজ হইবে।

কাব্যশাস্ত্রের 'পরমার্থ' বলিয়া আনন্দবর্ধন যে শ্লোকটি দিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে,—

অনৌচিত্যাদ্ ঋতে নান্যদ্ রসভঙ্গস্য কারণম্।
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা॥ —ঐ, বৃত্তি, পৃঃ ১৪৫

—'অনৌচিত্য ভিন্ন কাব্যে রসভঙ্গের অন্য কোনও কারণ নাই। এই প্রসিদ্ধ ঔচিত্য-বন্ধই রস-তত্ত্বের পরম উপনিষৎ।'

উপনিষৎ আয়ত্ত হইলেই যেমন ব্রহ্মবিদ্যা স্ফুরিত হয়, কাব্যশাস্ত্রেও সেই প্রকার ঔচিত্য-বন্ধ আয়ত্ত হইলেই কাব্যরস প্রকাশিত হইয়া থাকে। আনন্দবর্ধন আলোচনার অবসানে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—

বিভাবাদ্যৌচিত্য-ভ্রংশ-পরিত্যাগে পরঃ প্রযত্নো বিধেয়ঃ।

—ধ্বন্যালোক, ৩।১৪ টীকা, পৃঃ ১৪৭

—বিভাব প্রভৃতির ঔচিত্যের স্খলন না হয়, সেই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রযত্ন করিবে। বিভাবাদির ঔচিত্য না থাকিলে কোন রসরচনাই সামাজিকের গ্রাহ্য হয় না। এখানেও আরিষ্টট্‌লের কথা স্মরণ করিতে পারি,—

"The second thing to aim at is propriety."

—*Aristotle's Poetics, XV.* 2

—'লক্ষ্য করিবার দ্বিতীয় বিষয় হইতেছে ঔচিত্য।'

কিন্তু বিভাবাদির ঔচিত্য অনুসরণ করিতে যাইয়া 'সিদ্ধরস' কথাবস্তু-সমূহের বেলায় কল্পনা শক্তির প্রয়োগে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। আচার্য আনন্দবর্ধন নিজ মতের সমর্থনে পূর্বাগত এই পরিকর-শ্লোকটি তুলিয়াছেন,—

সন্তি সিদ্ধরসপ্রখ্যা যে চ রামায়ণাদয়ঃ।
কথাশ্রয়া নতৈ যোজ্যা স্বেচ্ছা রসবিরোধিনী॥

—ধ্বন্যালোক, পৃঃ ১৪৮

—'যে সকল কথাবস্তুর আশ্রয়-ভূত রামায়ণাদি গ্রন্থ সিদ্ধরস বলিয়া কথিত, তাহাদের বিষয়ে রামায়ণাদিতে বর্ণিত রসের বিরোধী স্বেচ্ছা অর্থাৎ কবির নিজ ইচ্ছা বা কল্পনা যোগ করিবেন না।'

সিদ্ধরসের ব্যাখ্যা করিতেছেন অভিনবগুপ্ত,—

সিদ্ধঃ আস্বাদমাত্রশেষো, ন তু ভাবনীয়ে রসো যেষু।—ঐ, টীকা, পৃঃ ১৪৮

'যে কথাবস্তু আস্বাদমাত্রে পরিণত হইয়া থাকে, রস যেখানে বিভাবিত করিতে হয় না, তাহাই সিদ্ধ।'

রামায়ণ প্রভৃতির রাম-লক্ষ্মণ-সীতার কাহিনী আবাল্য শুনিতে শুনিতে তাঁহারা আমাদের মনে রসমূর্তিতে পরিণত হইয়া থাকে, কথাবস্তুর প্রসঙ্গ ব্যতিরেকেও তাঁহাদের নাম শোনা মাত্র আমাদের মনে তাঁহাদের বিশিষ্ট চরিত্র, আদর্শ, তাঁহাদের জীবনের মর্ম-গত ভাব উদিত না হইয়াই যেন রসে পরিণত হয়; রস যেন বস্তু হইতে আর বিভাবিত হয় না। ঐতিহ্য-প্রাপ্ত সর্বজনপ্রিয় জাতীয় জীবনের আদর্শ-ভূত

বস্তুই এইরূপ সিদ্ধরস হইতে পারে। অবশ্য দেশ যদি কখনও রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব-শূন্য হয়, বাঙ্গালীর ভাবদেহ যদি উহাদের সংস্কৃতি দ্বারা পরিপুষ্ট না হয়, তবে রাম-লক্ষ্মণ-সীতাও আর সিদ্ধরস বস্তু থাকিবে না।

আনন্দবর্ধন বলেন সিদ্ধরস বস্তুসমূহে কবি 'স্বেচ্ছা' অর্থাৎ স্বকীয় ইচ্ছা বা কল্পনা প্রয়োগ করিবেন না। যদি কথাবস্তুর পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে মূলরসের বিরোধী কোন কল্পনা করিবেন না। এই বিচার কেবলমাত্র সাহিত্যিক বিচার; রাজনৈতিক, নৈতিক বা সামাজিক বিচার নয়। সিদ্ধরস বস্তুতে কবি যত শক্তিশালীই হউন, বিরোধী রসসঞ্চারের চেষ্টা সহজে সার্থক হইতে পারে না। কবি মধুসূদন দত্ত মেঘনাদবধকাব্যে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে[১] দুর্বল ও ভীরুরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহা ঐতিহ্য-বিরোধী ও জাতীয়তা-বিরোধী বলিয়া তত নয়, যত সাহিত্যের সমুচিত রস-বিরোধী বলিয়া নিন্দনীয়। সীতা-চরিত্রে কল্পনাশক্তি তিনি অনুকূল ভাবে চালনা করিয়াছেন। তাঁহার তূলিকাপাতে সীতা যেন আরও মনোহর হইয়াছে, কিন্তু রাম-লক্ষ্মণ আমাদের চিত্তে কোন রেখাপাত করে নাই। এখানে বলা উচিত রাবণ-চরিত্র অঙ্কনেও তিনি বাল্মীকির বিরোধিতা কিছু করেন নাই। রাবণের ঐশ্বর্য, শক্তি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি—কোন বিষয়ই মূল রামায়ণে কিছুমাত্র অনুজ্জ্বল করিয়া অঙ্কিত নাই।

সিদ্ধরস-বিষয়ে মনস্বী ব্র্যাড্‌লের একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা অসঙ্গত নয়। *Poetry for Poetry's Sake* প্রবন্ধের পরে টিপ্পনীতে তিনি মন্তব্য করিতেছেন,—

"If an artist alters a reality (e. g. a well-known scene or historical character) so much that his product clashes violently with our familiar ideas, he may be making a mistake : not because his product is untrue to the reality (this by itself is perfectly irrelevant), but because the 'untruth' may make it difficult or impossible for others to appropriate his product, or because this product may be aesthetically inferior to the reality even as it exists in the general imagination."

—*Oxford Lectures on Poetry, Note B, p. 29.*

(১) মধুসূদনের লক্ষ্মণচরিত্রে পূর্বাপর সঙ্গতি নাই; এখানে ষষ্ঠ সর্গের মেঘনাদ-নিহন্তা লক্ষ্মণের কথা বলা হইতেছে। এই সকল অংশ এবং রামচরিত্রের নিন্দিত অংশও কবির 'স্বেচ্ছা'র ফল।

ইহার অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। এ যেন ভারতের প্রাচীন আলঙ্কারিকদের সিদ্ধান্তের আধুনিক ইংরেজ পণ্ডিত-কর্তৃক ব্যাখ্যান।

বিভাব-নির্মাণে কবির কল্পনাশক্তি প্রয়োগ-বিষয়ে প্রাচীন ভারতের আলোচনা বিশ্বনাথ একটি শ্লোকে গ্রথিত করিয়াছেন ; যথা,—

যৎ স্যাদ্ অনুচিতং বস্তু নায়কস্য রসস্য বা।
বিরুদ্ধং তৎ পরিত্যাজ্যম্ অন্যথা বা প্রকল্পয়েৎ ॥

—সাহিত্যদর্পণ ; ৬।৩০৪

—'কাব্য-বস্তুতে নায়কের বা রসের অনুচিত অথবা বিরুদ্ধ কিছু থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করিবে, না হয় অনুরূপে পরিকল্পনা করিবে।'

প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বস্তু হইতে বিভাব-নির্মাণে বস্তু যেখানে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক, সেখানেও কবির কল্পনাশক্তির মর্যাদা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা যে ঔচিত্যবোধের প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাহা কোন বাধা বা সীমা-নির্দেশ নয় ; তাহা কল্পনাশক্তির প্রাণ, উহার নিয়ামক গূঢ় ধর্ম ; তাহা না থাকিলে কল্পনাশক্তি অবাস্তব ও অসঙ্গতিপূর্ণ লঘু বিলাস হইয়া যায়। কল্পিত বা উৎপাদ্য বস্তু-সম্পর্কেও পাঠকের প্রতীতিসঞ্চার ছাড়া আর কোন নিয়ামক সূত্র রাখেন নাই। প্রতীতিসঞ্চারই হইল সমুচিত বাস্তবতা-বোধ।

(৬)

ঔচিত্য, সত্য ও তথ্য

কবিগণ স্ব-তন্ত্র, প্রজাপতির মতই স্বাধীন, অন্তরের অঙ্কুশ ছাড়া তাঁহাদের আর কোন অঙ্কুশই নাই। সেই অঙ্কুশই হইল ঔচিত্যবোধ। ইতিহাস ও কাব্যের প্রভেদ-সম্পর্কেও তাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন এবং নিপুণদৃষ্টি লইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

কবিনা প্রবন্ধম্ উপনিবধ্নতা সর্বাত্মনা রস-পরতন্ত্রেণ ভবিতব্যম্। তত্র ইতিবৃত্তে যদি রসাননুগুণাং স্থিতিং পশ্যেৎ, তাং ভঙ্‌ক্ত্বাপি স্বতন্ত্রতয়া রসানুগুণং কথান্তরম্ উৎপাদয়েৎ। নহি কবেঃ ইতিবৃত্তিমাত্রনির্বহণেন কিংচিৎ প্রয়োজনম্। ইতিহাসাদ্ এব তৎ-সিদ্ধেঃ। —ধ্বন্যালোক, ৩।১৪, বৃত্তি, পৃঃ ১৪৮

—'কাব্যপ্রবন্ধ রচনা করিতে যাইয়া কবি সর্বপ্রকারে রসপরতন্ত্র হইবেন। এই বিষয়ে ইতিবৃত্তে যদি রসের অনুকূল অবস্থা দেখা না যায়, তাহাকে ভাঙ্গিয়াও

স্বতন্ত্রভাবে রসানুকূল অন্য কথাবস্তু উৎপাদন করিবেন। কবির ইতিবৃত্তমাত্র সম্পাদন করিয়া কিছুই লাভ নাই। ইতিহাস হইতেই তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে।'

আসল কথা রস। যদি তাহারই প্রকাশ না হইল, তবে যতই তথ্যপূর্ণ হউক সে বস্তু ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত মাত্র। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িলে বস্তু যদি রসোজ্জ্বল হয়, তবে তাহাই করণীয়। লোকে ইতিহাসের আরাধনা করে তথ্য পাইবার জন্য, কাব্য অনুশীলন করে রসাস্বাদনের জন্য। তথ্য ও রস এক বস্তু নয়। তথ্য হইতে রস জন্মে; কিন্তু সকল তথ্য হইতেই রস জন্মে না, জন্মিতে পারে না। যে সকল ঘটনা বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন, সূত্রের একত্ব ও রূপের অখণ্ডত্ব এবং ভাবের উপযোগিত্ব যাহাদের মধ্যে স্পষ্ট নয়, তাহারা তথ্য হইতে পারে, কিন্তু কাব্যবস্তু অর্থাৎ বিভাব হইতে পারে না। বিভাবের মধ্যে থাকে একটি সুস্পষ্ট ঔচিত্য, আধুনিক সমালোচকদের ভাষায় যাহাকে বলা যায় সত্য, কাব্য-গত সত্য অথবা Poetic Truth; কবি-শক্তির বলে তাহা আসিয়া থাকে।

তাহা হইলেই প্রশ্ন, ইতিহাস-গত তথ্য এবং কাব্য-গত সত্যে পার্থক্য কি? ইতিহাসগত তথ্যে কোন কোন সময় সত্য অল্প-প্রচ্ছন্ন বা পরিস্ফুট থাকে, তখন একটি ভাব ও তদাশ্রয়ে রস কবিপ্রতিভা-গুণে সহজেই স্ফূর্ত হইয়া উঠে; সেখানে বিভাব-নির্মাণে সাধারণ পরিবর্তন ছাড়া বস্তুর রূপ প্রায় অক্ষতই থাকে। কিন্তু সমাজ-জীবনের তথ্যরাশিতেও মানবীয় বুদ্ধি অনেক সময় জীবন-নীতির সূক্ষ্ম শৃঙ্খলা-সূত্র, সমুচ্চ কার্যকারণ-পরম্পরা, অথবা ভাবের স্বাভাবিক প্রবাহধারা খুঁজিয়া পায় না। অথচ সে ঘটনায় অথবা চরিত্রাবলীতে এমন সকল বলিষ্ঠ অংশ থাকে, কবিচিত্তে যাহাদের আকর্ষণ দুর্বার। কবি তখন তাহাদের অবলম্বন করিয়া নূতন সৃষ্টির যোজনাদ্বারা অভিনব এবং সুসমৃদ্ধ বিভাব নির্মাণ করেন। মহাকবি কালিদাস-কৃত, রামায়ণ হইতে প্রাপ্ত রঘুবংশ এবং মহাভারত হইতে প্রাপ্ত শকুন্তলার আখ্যানবস্তু দুইটির তুলনা করিলেই তত্ত্বটি সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। শকুন্তলা নাটকে কবির উন্মেষশালিনী বুদ্ধি এবং অপূর্ব-বস্তু-নির্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞার চূড়ান্ত পরিচয় রহিয়াছে। এখানে বলা চলে মহাভারতের মহাকর হইতে তিনি লৌহ তুলিয়া প্রতিভার স্পর্শমণিযোগে তাহাকে অভিনব উজ্জ্বল ধাতুতে পরিণত করিয়াছেন। এখানে বস্তু হইতে বিভাবকে চেনা যায় না, নাম-সাদৃশ্য এবং ঘটনার আরম্ভ ও পরিণতির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ছাড়া আর সাদৃশ্য নাই কোথাও। মহাভারতের অতি স্থূল মৃৎপিণ্ড ছানিয়া তিনি মহাকালের মন্দিরে এক শাশ্বত সৌন্দর্য-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমরা

তাই বলিতে চাই, বিভাব অর্থাৎ রূপ এবং ভাব ও রস ফলতঃ এক, অভিন্ন। কিন্তু বস্তু ও বিভাব এক নয়। মাটি ও প্রতিমার যে সম্বন্ধ, অনেকটা সেই সম্বন্ধ বস্তু ও বিভাবের, তথ্য ও সত্যের। রস ও সৌন্দর্য মাটিতে প্রত্যক্ষ নাই, তথ্যেও নাই; আছে প্রতিমায় ও সত্যে। ভরত তাই রসের বিচারে বিভাব ছাড়িয়া বস্তুর আলোচনা বা উল্লেখ করেন নাই কখনও।

ইতিহাস ও কাব্য, অথবা তথ্য ও সত্য অর্থাৎ ঔচিত্য আলোচনায় ইহা একটি দিক্ মাত্র। ইহার অনুসরণেই অন্য কয়েকটি দিক্ স্পষ্ট হইবে।

কাব্য-জগতে সত্য কি? টেনিসন বলেন,—

"Poetry is truer than fact."

—কাব্য বস্তু হইতে অধিকতর সত্য।

শেলি বলেন,—

"There is a difference between a story and a poem, that a story is a catalogue of detached facts, which have no other connection than time, place, circumstances, cause and effect; the other is the creation of actions according to the unchangeable forms of human nature." —*A Defence of Poetry.*

—'বস্তু ও কাব্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। বস্তু হইতেছে অসংলগ্ন ঘটনাবলীর তালিকামাত্র, তাহাদের কাল, দেশ, অবস্থা, কারণ ও কার্য-গত সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কোনও সম্বন্ধ নাই। কাব্য হইতেছে মানবীয় প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় রূপানুযায়ী ঘটনা-সৃষ্টি।'

এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য কাব্যশাস্ত্রের আদিগুরু আরিষ্টটলের উক্তিই সর্বাধিক স্পষ্ট ও প্রামাণ্য। তিনি বলেন,—

"The poet and the historian differ not by writing in verse or in prose......the true difference is that one relates what has happened, the other what may happen. Poetry, therefore, is a more philosophical and a higher thing than history: for poetry tends to express the universal, history the particular."[১]

—*Poetics*, IX. 2, 3

(১) এই বিষয়ে ইংরেজ পণ্ডিত বেকনেরও প্রায় তুল্য অভিমত লক্ষণীয়। দ্রষ্টব্য—Bacon, de Aug. Scient. ii. 13.

—'কবি এবং ঐতিহাসিকের পার্থক্য পদ্য বা গদ্য লেখা লইয়া নয়। আসল পার্থক্য হইতেছে এই যে,—ইতিহাস বলে কি ঘটিয়াছে, কাব্য বলে কি ঘটিতে পারে। অতএব কাব্য ইতিহাস অপেক্ষা অধিকতর দার্শনিক এবং উন্নততর বস্তু; কারণ, কাব্য যাহা সার্বজনীন, তাহাকে প্রকাশ করিতে চায়; ইতিহাস চায় বিশেষকে।'

আচার্য আরিষ্টটলের এই উক্তি এবং আচার্য আনন্দবর্ধনের পূর্বোদ্ধৃত উক্তি কয়টি বিশ্লেষণ করিলে ফলতঃ একই কথা বুঝা যাইবে। অবশ্য আরিষ্টটল্ সার্বজনীন ও বিশেষ এই দুইটি রূপের উল্লেখ করিয়া বস্তু ও বিভাব-ধর্মের প্রভেদ স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। অপর পক্ষে আনন্দবর্ধন রচনার ঔচিত্য ও রসানুগুণতার উল্লেখ করিয়া বিভাবের নিয়ামক শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

যাহা ঘটিয়াছে তাহা, সর্বদাই যাহা ঘটিতে পারে তাহার অন্তর্ভুক্ত। 'ঘটিতে পারে' বলিয়া জগতের ও জীবনের সম্ভাবনীয়তা অর্থাৎ বিশ্ব-বিধির বাস্তব রূপ, মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত গভীরতর নীতি ও ধর্মের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহাই universal বা সার্বজনীন রূপ। ইহা আছে বলিয়াই কাব্যে দর্শন ও উন্নততর নীতির সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক কালেও যে ইতিহাস রচিত হইতেছে, তাহা ব্যক্তি-বিশেষের কার্যবিবরণীকেই মুখ্য করে; জাতি, সমাজ বা মানবতার দিক হইতে তাহার বিচার ও আবেদন এখনও অস্ফুট। ইতিহাস সিরাজদ্দৌল্লা বা ক্লাইভ কি করিয়াছিলেন বা বলিয়াছিলেন তাহারই বিবরণ মাত্র; কিন্তু তাঁহারাই যখন কোন নাটকে রূপ পান, তখন বাঙ্গালী ও ইংরেজ জাতির রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনাদর্শই ব্যক্তি-সত্তার অন্তরাল হইতে প্রকাশ পাইতে থাকে।

সাহিত্যে সার্বজনীনতা অন্য ভাবেও উপলব্ধি করা যায়। সর্বজন-গত ভাব কিন্তু ব্যক্তি-গত বা একজন-গত ভাবের বাহিরে নয়। কাজেই কবি নিজেকে এবং নিজের সমাজকে জানার মত করিয়া জানিলে প্রায় বিশ্বজন ও বিশ্বসমাজকেই জানা হয়। এক হিসাবে সাহিত্যেও দর্শনের ন্যায় বলা চলে,—

একস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।

—'একেকে জানিলেই সকলকে জানা হয়।'

সৎকবির আত্মগত অনুভূতিময় কাব্য বিশ্বজন নিত্যকাল আস্বাদন করিয়া থাকে। একের মধ্যেই সমাজ আছে। সমাজের মধ্যেও এক বহুরূপে বাস করে। প্রশ্ন জানা ক্রিয়া লইয়া। ঐতিহাসিক তথ্যানুরাগ বশতঃ বস্তুর বিচ্ছিন্ন সাধারণ

রূপকে দেখেন। কবি দেখেন স্রষ্টা ও ভোক্তার দৃষ্টি লইয়া বিশেষকে গৌণ করিয়া বস্তুর অবিশেষ অন্তররূপ, তাহাই বস্তুর সার্বজনীন রূপ।

এই বিশ্ববিধি, মানবপ্রকৃতির গভীরতর নীতি, ঘটনা-সমূহের সম্ভাবনীয়তাই কাব্য-গত সত্য। ইহা ইতিহাসে থাকে না, থাকে কবির প্রতিভার দৃষ্টিদ্যুতিতে, তাহারই ঝলকানিতে বস্তুর মর্ম-মূল হইতে বিভাবকমল বিকসিত হয় রস ও সৌন্দর্যময় বিচিত্র কাব্যাঙ্গের শত দল মেলিয়া। কাব্যগত সত্য-সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—

> নারদ কহিলা হাসি', "সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
> ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
> রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।" —ভাষা ও ছন্দ

এই জন্যই বলা হইয়া থাকে, কাব্য বা কবি তথ্যকে সত্যে পরিণত করেন। কাব্য-সত্য তথ্যকে অতিক্রম করিয়া তথ্যকে রসলোকে রূপায়িত করে। কাব্যে তথ্যই বিভাবে পরিণত হয়; বাস্তব আদর্শের রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, আদর্শও তদ্রূপ বাস্তব রূপ লাভ করিয়া সমৃদ্ধ হয়। আবার বলা হয়,—কবি স্বভাবকে অতিক্রম করেন; অবশ্য ইহা দ্বারা তিনি স্বভাবকে সুপরিস্ফুটই করেন, তাহার বিরোধিতা করেন না। এই ভাবে যে বিশিষ্ট রূপ সার্বজনীন কাব্য-সত্যকে ধারণ করে, অথবা সার্বজনীন কাব্য-সত্য যে বিশিষ্ট রূপকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, তাহাকে বলা হয় 'universal concrete' অর্থাৎ সার্বজনীন রূপমূর্তি; ইহাকেই আমরা বলিব সমুচিত বিভাব। ইহার সৃষ্টি করিয়াই পৃথিবীর মহাকবিগণ দেশে দেশে কালে কালে শাশ্বত মানবের অন্তরে অক্ষয় রস-সৌন্দর্যের অমর উৎসধারা মুক্ত করিয়া দেন।

(৭)

রসেই রসের সার্থকতা

'Art for Art's sake'

পাশ্চাত্ত্যদেশে এবং পরে আমাদের দেশেও 'Art for Art's sake'—এই সূত্রটি লইয়া বহু অনুকূল ও প্রতিকূল আলোচনা হইয়াছে। বস্তু-নির্বাচন, বস্তুর সংস্কার-সাধন এবং বস্তু হইতে বিভাব-নির্মাণ প্রসঙ্গে সূত্রটি পুনরায় আলোচিত হইতে পারে।

সূত্রটিকে বাঙ্গালায় বলা যায়,—আর্টেই আর্টের সার্থকতা ; আর্ট যদি কাব্য হয়, তবে কাব্যেই কাব্যের সার্থকতা। আর্ট বা কাব্য যদি রস-জ্ঞাপক হয়, তবে বলা চলে রসেই রসের সার্থকতা। অন্য-ভাষায় সূত্রটি দাঁড়ায় রসোদ্ভাবন বা সৌন্দর্য-সৃষ্টিই কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ; এবং এই উদ্দেশ্য দ্বারাই কাব্যের বিচার হইবে। কাব্যের মূল্য-নির্ধারণে কবিরই হউক, আর পাঠকেরই হউক, অন্য যে কোন নীতি-প্রয়োগ ভ্রান্ত, তাহাতে কাব্যের মর্যাদা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। আমাদের ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয়, তবে আমরা এই সূত্র সম্পূর্ণ সমর্থন করি। যে কোন আর্টের যে কোন সৃষ্টি হউক, তাহা যদি রসোদ্ভাবনে সমর্থ হয়, তবে তাহা শুদ্ধ, সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল হইবেই। আমরা এই গ্রন্থেব আরম্ভে ও মধ্যভাগে রসের যে স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে আর কোনও ব্যাখ্যার আবশ্যকতা হইবে না। সহৃদয় পাঠকের চিত্তে রসোৎপত্তি বা রসাস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার রজঃ ও তমোগুণ মন্দীভূত হইতে থাকে, উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রবল হইতে থাকে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ। তাহাব ভাব-তন্ময়তার সহিত আসে তাহার সাধারণীকরণ, অর্থাৎ সুখদুঃখ পাপপুণ্য ভালমন্দের সংস্কারময় পরিমিত ব্যক্তিবোধেব বিগলন। আমরা বলিতে পারি কাব্যরসাপ্লুতচিত্ত তৎকালেব নিমিত্ত সংস্কারের সমূর্ধ্বে উঠিয়া তাহার সংবিদানন্দময় স্বরূপের উপলব্ধি করে। অতএব রসসম্ভোগের ফলেই পাঠকের চিত্ত হয় শুদ্ধ, শান্ত ও আনন্দময়। পুণ্য জাহ্নবী-বারির অবগাহনে পাঠক যেন বিধৌত-পাপ হইয়া শুদ্ধ সৌন্দয লইয়া তৎকালের নিমিত্ত নব চেতনা লাভ করে।

বাস্তবজগতের বস্তু যাহাই থাকুক, তুচ্ছ ক্লেদময় পঙ্ক হইলেও যদি তাহা পঙ্কজের জন্ম দিতে পারে, তবে উহাতে দেবদেবের পূজার অর্ঘ্যও রচিত হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি রসোপলব্ধি এক আত্মোপলব্ধি, আত্মার এক অপূর্ব স্ফুরণ ও বিলাস ; ইহাই কাব্যের মৌলি-ভূত প্রয়োজন। ইহার পর আর কিছুই নাই।[১] আমাদের সিদ্ধান্ত এই,—যে কোন বিষয় যদি রসোৎপাদনে সমর্থ হয়, তবে তাহা পাঠকচিত্তকে উন্নত, উদার, সংস্কারমুক্ত ও শুদ্ধ করিবেই।

কবি কিন্তু মুখ্যতঃ পাঠকের এই চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনের জন্যই কাব্য রচনা করেন না, উপদেশ-প্রচার অথবা জাতি ও জীবন-সংগঠনকে একমাত্র লক্ষ্য করিয়াও লেখনী চালনা করেন না। এই সকলই সৎকাব্য-পাঠের গৌণ ফল, অথবা সৎকাব্য রচনার উপায় বা উপকরণ মাত্র। ধর্মপ্রচার, নীতি প্রচার, রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রচার

(১) এই বিষয়ে কাব্যালোকের ৮-৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

সৎকাব্যের মুখ্য লক্ষ্য নয়; তাহা কাব্যে থাকিতে পারে, এবং সুখদুঃখ, পাপপুণ্য আরও অনেক কিছু থাকিতে পারে, বা থাকিবেই, কিন্তু তাহা কাব্যকমলের পঙ্কমাত্র, অথবা কাব্যাত্মার শরীর বা উপাদান মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-বিচারে বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন,—

"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে। কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য, কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ-সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি-বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।" —বিবিধ প্রবন্ধ, উত্তরচরিত

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বাহ্যজগতের বস্তুরাশিতে সুখ দুঃখ বা মোহোৎপাদক ধর্ম যাহাই থাকুক, কবিপ্রতিভা-বলে যদি রসের প্রকাশ ঘটে, তবে সে সকলই হইবে কেবল আনন্দময়; লৌকিক উপাদানের ধর্ম অলৌকিক রসে প্রবল হইয়া থাকিতে পারে না। জলের উপরে পদ্ম এবং দুধের উপরে নবনীত ভাসিয়া বেড়াইবে।

উদ্দেশ্যমূলক একজাতীয় কাব্য ও কথা-সাহিত্য সকল দেশেই রচিত হইতে দেখা যায়। ইহাতে কান্তাসম্মিত মধুর ও হিতকর বাক্যের বর্ষণ হইয়া থাকে; ইহাতে আর্টের ধর্মও যে সকল সময়ে অপরিস্ফুট, তাহা নয়। তথাপি আমরা বলিব এই জাতীয় সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আবেদন রসাত্মক না হইলে তাহা স্থায়ী সাহিত্য হইবে না এবং সাহিত্য-প্রদর্শনীতে তাহার স্থান নাই। এইরূপ রচনা সাময়িক বিষয় লইয়া রচিত হইলে, তাহাদের আবেদনও হইবে সাময়িক এবং সময় অতীত হওয়ার সঙ্গেই উহা মূল্যহীন হইয়া যাইবে। উহা যদি সাময়িক বিষয়ের পরিবর্তে মানবজীবনের সহিত দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ কোন শাশ্বত জ্ঞান ও নীতি প্রদর্শনের জন্য রচিত হয়, তাহা হইলে হয়ত দীর্ঘকাল উহার পঠন পাঠন বা আদর থাকিবে; কিন্তু সে আদর হইবে মুখ্যতঃ সাহিত্যকে নয়, বর্ণিত জ্ঞান ও নীতিকে। জ্ঞান ও নীতিমূলক রচনার ন্যায়ই উহার হইবে প্রতিষ্ঠা; বাগ্‌ভঙ্গী সুষ্ঠু থাকিলে উহা নীরস গ্রন্থ হইতে সমধিক আদৃত হইবে মাত্র; কিন্তু উহা সাহিত্য বলিয়া পূজিত হইতে পারে না। রসধর্মে ন্যূন হইলে অন্য ধর্মে যতই মহীয়ান্ হউক, তাহা স্থায়ী ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়। তবে যদি এমন রচনা হয় যাহা রস-গৌরবে ও বিষয়-গৌরবে যুগলভাস্করের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল, তবে তাহা যে সাহিত্যে কাল-জয়ী শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ সহস্রাধিক বৎসর

ধরিয়াও যে সকল কাব্যের প্রভা অপরিম্লান, তাহাদের অধিকাংশেই এই মহনীয় বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। অবশ্য এখানেও শ্রেষ্ঠতার মুখ্য কারণ ভূয়িষ্ঠ রসবত্তা।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে 'Art for Art's sake'—এই নীতির উৎপত্তির ইতিহাস ও পরবর্তী প্রয়োগ ধীর-প্রকৃতি কবি ও কাব্যরসিকগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না। প্লেটো, আরিষ্টট্ল্, লেসিং, রাস্কিন্, ম্যাথ্ আর্ণল্ড প্রভৃতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যে সুন্দর, সত্য ও শিবময় আদর্শের বিরুদ্ধে সুইনবার্ণ, অস্কার ওয়াইল্ড প্রমুখ নব্য সাহিত্যিকগণ যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তাহার ফলে এই সূত্রটি রচিত হয়। একদল কবি 'sense of fact' বা বাস্তববোধের নামে উচ্ছৃঙ্খলতার—আত্মঘাতী বিলাস-লালসার স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন, জগৎ ও জীবনের অনাবৃত স্থূল রূপকে মুখ্য করিয়া তাঁহারা বস্তু-তন্ত্র বা 'Realism' এর নামে যে সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তাহা এই দেশে এক সময়ে 'কামায়ন' সাহিত্য নামে পরিচিত হইয়াছিল।

ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ঐদেশে ও এদেশে বড় অল্প হয় নাই। স্কট, জেম্স্, চেষ্টারটন[১] প্রমুখ পণ্ডিতগণ তীব্র ভাষায় ইহার সমালোচনা করেন। আমাদের দেশে শরচ্চন্দ্র পর্যন্ত প্রকারান্তরে বলিয়াছেন,—Art for Art's sake সত্য হোক বা মিথ্যা হোক প্রকৃত সাহিত্য কদাচ 'immoral এবং অকল্যাণকর হ'তে পারে না।'[২]

আমাদের মনে হয় বিবদমান উভয় দলই সত্যদর্শন হইতে বঞ্চিত। সাহিত্যে যাহারা রস ও সৌন্দর্যকে প্রধান না করিয়া তাহাকে নীতি-উপদেশের বাহন করিয়াছেন, অথবা যাহারা উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া বশে ধর্ম-নীতির বোধ-নিরপেক্ষ হইয়া কল্পিত রসসৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন, সাহিত্য-ধর্মের প্রয়োগ-বিচারে এই দুই দলই ভ্রান্ত। দুই দলেরই রচনায় যেখানে প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে দেখিব উহাদের স্বীকৃত কোন নীতিই প্রবল হইতে পারে নাই, প্রবল হইয়াছে বিশুদ্ধ রস ও সৌন্দর্য সম্পাদনের শাশ্বত নীতি।

প্রশ্নটি সাক্ষাৎ ভাবেই আলোচনা করা যাইতেছে। উপাদান বা বস্তুর ধর্ম কবি, কাব্য বা পাঠককে স্পর্শ করে কি না? সমাজে যাহা কুনীতি, কুরুচি, অশ্রদ্ধেয় বা কুৎসিত ব্যাপার বলিয়া পরিচিত, তাহা লইয়া রসোজ্জ্বল কাব্য রচিত হইতে পারে কি না? এই বিষয়ে প্রাচীন আলঙ্কারিক রুদ্রট বলিয়াছেন,—

(১) "There must always be a moral soil for any great aesthetic growth." —*G. K. Chesterton*

(২) স্বদেশ ও সাহিত্য

নহি কবিনা পরদারা এষ্টব্যা নাপি চোপদেষ্টব্যাঃ।
কর্ত্তব্যতয়াম্ন্যেষাং ন চ তদুপায়োঽভিধাতব্যঃ॥
কিং তু তদীয়ং বৃত্তং কাব্যাঙ্গতয়া স কেবলং বক্তি।
আরাধয়িতুং বিদুষ স্তেন ন দোষঃ কবেরত্র॥—কাব্যালঙ্কার, ১৪।১২-১৩

—'কবি পরদার ইচ্ছা করিবেন না, অন্যের কর্তব্য বলিয়া কিছু উপদেশ করিবেন না, তাহার উপায়ও কিছু বলিবেন না। কিন্তু তিনি কেবল এই বিষয়ক বৃত্তান্ত বিদ্বান্‌দিগের তৃপ্তির জন্য কাব্যের অঙ্গ-ভূত করিয়া বলিয়া যান। ইহাতে কবির দোষ কিছুই নাই।'

রুদ্রট কবিধর্ম ও কাব্যধর্মের নিরপেক্ষতার কথা বলিতে চাহিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবি শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার বাণী-মন্দির গ্রন্থে[১]এই মতবাদের বিশদ আলোচনা করিয়া ইহার ভয়াবহ পরিণাম বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু কিন্তু নির্লিপ্ত শিল্পি-দৃষ্টি লইয়া পুরী-মন্দিরের গাত্রস্থিত বদ্ধকাম মূর্তিগুলির উল্লেখ করিয়াও বিষয়টি সমর্থন করিয়াছেন,—

"সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে সুনীতি-দুর্নীতির ভেদ টেনে আনা শিল্পের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। কারণ, সামাজিক সংস্কারে যা নিন্দনীয় তাই হয়তো শিল্পীকে রসবোধে উদ্বোধিত ক'রে এমন কিছু রচনা করাতে পারে যা শিল্প হিসাবে অন্য হাজার হাজার লোককে সংস্কারবদ্ধ খণ্ডিত ধারণার ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ রসোপলব্ধিতে নিয়ে যাবে। বিষয়-বিশেষকে লোকে বলবে দুষ্ট কিন্তু মায়াবী তুলির স্পর্শে তাতে বিষয়াতীত এমন কিছু ফুটে উঠবে যা অভিনব। যে দেখে বা যে অনুভব করে সেই বিষয়ীর দৃষ্টি-ভঙ্গীর ইতর-বিশেষে ও চেতনার তারতম্যেই নির্ভর করে বিষয়টি সুনীতি-দুর্নীতির স্তরেই থেকে যাবে, না তার ঊর্ধ্বে উঠ্‌বে।" —শিল্পকথা, পৃঃ ১৪

জারম্যান্ কবি ও দার্শনিক ফ্রেড্‌রিক শিলার Aesthetic Education of Man বিষয়ে যে পত্রাবলী লিখিয়াছেন, তাহাতে কেবল 'Art for Art's sake'-এর আর্ট নয়, সর্বপ্রকার বিশেষ ও নির্বিশেষ আর্ট-সম্পর্কেই ভূয়োদর্শন ও ভূয়িষ্ঠ অধ্যয়নের ফলে এক কঠিন মন্তব্য করিয়াছেন এবং উহা প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিৎ সি, জি, ইয়ুং সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। কয়েকটি মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"The fact must cause one to reflect in almost every epoch of history, when the arts blossomed and taste ruled, one finds that

(১) বাণীমন্দির পৃঃ ৫৩২-৫৬১ দ্রষ্টব্য

humanity declined; furthermore *not one single example can be shown* of a people where a high level and a wide universality of aesthetic culture went hand in hand with political freedom and civic virtue, or where beautiful manners went with good morals or polished behaviour with truth."[১]

—'বিষয়টি অবশ্যই সকলকে ভাবিত করিয়া তুলিবে। ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেক যুগে যখন আর্টগুলি বিকসিত হয় এবং সুরুচি শাসন করে, তখনই দেখিতে পাওয়া যায়, মানবতার অবনতি ঘটিয়াছে। আরও বলা যায়, এমন একটি জাতির উদাহরণও দেখান যাইবে না, যেখানে সৌন্দর্য-গ্রাহিণী সংস্কৃতির উচ্চ মান এবং সর্ব-ব্যাপকতা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও নাগরিক ধর্মের সহিত সমান তালে অগ্রসর হইয়াছে, অথবা শোভন আচার এবং সদাচার, কিংবা মার্জিত ব্যবহার ও সত্য একসঙ্গে চলিয়াছে।

শিলার ইহার পরে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, তিনি অতীত পৃথিবীর যে দিকেই দৃষ্টিপাত করেন, দেখিতে পান সুরুচি ও স্বাধীনতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে এবং—

..."*beauty establishing her sovereignty only upon the ruins of the heroic virtues.*"

—'সৌন্দর্য বীরধর্মের ধ্বংসাবশেষের উপর আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।'

শিলার অবশেষে নিজেই ভীত হইয়া মন্তব্য করিয়া বসিলেন যে, মানুষের প্রকৃত সংস্কৃতির বিরোধী বলিয়া সৌন্দর্যানুভূতির বৃত্তি-নিচয়ের অনুশীলনে উৎসাহ দেওয়া উচিত কিনা বিবেচ্য।

এই সকল আলোচনার সার মর্ম এই :—রসোপলব্ধি ও সৌন্দর্যোপলব্ধি মানুষকে গ্রাম্যতা দোষ হইতে মুক্ত করিয়া সুমার্জিত ও সুরুচি-সম্পন্ন করিলেও তাহার চরিত্রকে বীর-ধর্ম-চ্যুত করিয়া কোমল ও শিথিল করে, দুর্বল ও নিস্তেজ করে, এমন কি কখনও কখনও তাহাকে সত্য ও সদাচার হইতেও ভ্রষ্ট করে।

কবি শিলার চাহিয়াছিলেন সৌন্দর্য-বিজ্ঞানের সহায়তায় মানবজাতির মুক্তি। দার্শনিক শিলার গবেষণা করিয়া বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন। মনস্বী ইয়ুং দার্শনিক শিলারের অভিজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লইয়া মন্তব্য করিয়াছেন,—

(১) C. G. Jung-এর Psychological Types (H. Godwin Baynes কর্তৃক সম্পাদিত ইংরেজী অনুবাদ, ১৯২৩), পৃঃ ১০৮-১০৯।

…"beauty needs her opposite as a necessary condition of her existence."

—*Psychological Types*, p. 109

—'সৌন্দর্য আপন অস্তিত্ব রক্ষার একান্ত প্রয়োজনেই বিপরীতকে চায়।'

গ্রীক্ মনীষী প্লেটো তাঁহার কল্পিত রাজ্য হইতে কবি ও কাব্য নির্বাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রেও কাব্য-বিরোধী বচন পাওয়া যায়, যথা,—

কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়েৎ।—'কাব্যালাপ বর্জন করিবে।'

কবি ও কাব্যের বিরুদ্ধে তাঁহাদের অভিযোগও হয়তো এই জাতীয়ই ছিল।

আমাদের দেশেও সম্প্রদায়-বিশেষে, জাতি-বিশেষে, এমন কি অনেক ব্যক্তির এবং অনেক কবি ও শিল্পীর কাব্য ও শিল্পচর্চার যুগবিশেষে এই অভিজ্ঞতার সমর্থন পাওয়া যায়। কবি ও সুরশিল্পী সমাজে আদৃত হইলেও নট বা অভিনেতার সামাজিক সম্মান ছিল না। অনেক সময়ে কবি আবার এক জাতীয় ব্যঙ্গের পাত্রও হইয়া থাকেন।

প্রশ্নটি তাই নিপুণভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। সর্বাগ্রে প্রথম প্রশ্নটিই আলোচিত হইতেছে ;—উপাদান বা বস্তুর ধর্ম কবি ও পাঠককে স্পর্শ করে কি না ?

রসাধ্যায়ে আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি রসের প্রকাশ ঘটে ভাবাশ্রয়ে ভাব-তন্ময় চিত্তে। জগন্নাথ বলিয়াছেন,—

'রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ।'[১]

রতি-প্রভৃতি ভাব-দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা বিশিষ্ট না হইলে চিৎ-সত্তা রস-রূপে প্রকাশ পাইতে পারে না। অতএব রস শুদ্ধ-স্বরূপে যতই অলৌকিক, এমন কি অতীন্দ্রিয় হউক না কেন, ভাবকে তাহার অবলম্বন করিতেই হইবে। কাব্যাস্বাদনে রসই আসুক, আর রম্য-বোধই আসুক, ভাব ও অর্থের প্রভাব এড়াইবার উপায় নাই ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে রস আলোচিত হইয়াছে, তাহা সকল কবি ও কাব্যের আদর্শ-ভূত শুদ্ধ রস। প্রত্যক্ষ জগতে তাহার দোহাই দিয়া ভাবকে অস্বীকার করার কোন পথ খোলা নাই।

রসাধ্যায়ে আমরা পুনরায় মন্তব্য করিয়াছি—ভাবহীন রস নাই এবং রসহীন ভাব নাই। ভরতমুনিই এই সূত্রটি প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন,—

ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ। —নাট্যশাস্ত্র, ৬।৪০

(১) দ্রষ্টব্য—কাব্যালোক, পৃঃ ১৯-২০ এবং পৃঃ ৯০।

রসের বিশুদ্ধ স্বরূপ সম্পূর্ণ মান্য করিয়াই বলা যাইতে পারে উৎকৃষ্ট কাব্যেও বিশুদ্ধ রসাস্বাদনের সঙ্গে ভাবের কিঞ্চিৎ আস্বাদন চলে, এবং ভাবকাব্যেও প্রবল ভাবানুভূতির সহিত রসের স্বল্প স্পর্শ পাওয়া যায়। মোট কথা কাব্যানন্দ লাভের উপলক্ষ্যে আমাদের হৃদয় ও বুদ্ধিও বিভাবগত ভাব ও অর্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়। সে ভাব ও অর্থ সমাজ-প্রচলিত আমাদের অভ্যস্ত স্বাভাবিক পরিমণ্ডলের ভাব ও অর্থ না হইলে আমাদের ব্যক্তি-সত্তায় একটা আকস্মিক আলোড়ন ও কম্পের সঞ্চার করিয়া থাকে।

ভাব ও অর্থ আসে বিভাব বা বস্তু হইতে। অতএব বস্তু-গত ধর্ম পাঠককে কেবলমাত্র স্পর্শ করে না, গভীর ভাবে আলোড়িতও করে। কাব্যানন্দ দীর্ঘস্থায়ী নয়, রজস্তমোগুণ আবার আসিয়া বর্ষার জলদ-সঞ্চারের ন্যায় জ্যোতির্ময় সত্ত্বগুণকে আচ্ছন্ন করে। কালে আমাদের চিত্তে থাকে ঐ অলৌকিক আনন্দের স্মৃতি, আর অনুভূত ভাব ও অর্থরাশি। কাজেই বস্তু অথবা বস্তু-জাত ভাব ও অর্থ যদি দুর্নীতিপূর্ণ হয়, তাহা পাঠকের চিত্ত-বিকৃতি ঘটাইলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। যাহারা বলেন নগ্ন সৌন্দর্য, পুরী মন্দিরের গাত্র-সংলগ্ন বন্ধ-কাম মূর্তিগুলি দ্রষ্টাকে সুনীতি-দুর্নীতির সংস্কার-বদ্ধ খণ্ডিত ধারণার ঊর্ধ্বে রসোপলব্ধির পুণ্য লোকে উত্তোলিত করে, তাঁহাদের কথা স্বীকার করিয়াই বলিতেছি যে, তাহা স্বল্পক্ষণের নিমিত্ত মাত্র, সাধারণ লোকের চিত্তে পরেই চর্বণা চলে রূপাশ্রিত রসের নয়, রসাশ্রিত রূপের। মানুষের দৈবী প্রকৃতির প্রকাশ ক্ষণস্থায়ী, তাহার পরেই সে স্বভাব-ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া সুখ-দুঃখ-মোহের এবং উচ্চ বা নীচ ভাবের বশীভূত হয়। অবশ্য গভীর রসানুভূতি যাহাদের চিত্তে বিমল আনন্দের উৎস-মুখ খুলিয়া দেয়, সেইরূপ ভাগ্যবান্ সহৃদয়গণের কথা স্বতন্ত্র।

কাজেই জীবনের সহিত সাহিত্যের গভীর যোগ বর্তমান; শ্রেষ্ঠ কাব্যে সেই যোগটি থাকে প্রচ্ছন্ন, অন্তরালবর্তী, অন্তস্তলবাহী; চূড়ার উপর ময়ূর-পাখার ন্যায় শোভা পায় রস। কাব্য সকল বস্তু লইয়া রচিত হইতে পারিলেও এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সকল বস্তুই সর্বদা সৎ কাব্যের সমান উপাদান নহে। কবিশক্তি তুল্যরূপ থাকিলেও সৎ বস্তু হইতে নিকৃষ্ট কাব্য এবং অসৎ বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা সাধারণতঃ সম্ভবপর হয় না। বস্তুতঃ কাব্য নির্মাণে বস্তু-বিচারের প্রয়োজন নাই, সকল বস্তুই সকল সময়ে তুল্য—এই মত এক হিসাবে ভ্রান্ত।

কবির সম্বন্ধে আর কি বলিব? রাজশেখর মন্তব্য করিয়াছেন,—

স যৎ-স্বভাবঃ কবি স্তদনুরূপং কাব্যম্।

—কাব্যমীমাংসা, ১০ম অধ্যায়

—'কবি যে স্বভাবের হইবেন, কাব্যও তদনুরূপ হইবে।'

কাব্যে যদি পৌরুষ-নাশী জঘন্য লোল লালসা পরিব্যাপ্ত থাকে, অথবা 'কলাকৈবল্য' বলিয়া কামনার কমপুষ্প দ্বারা দেহের দেহলীতে কেবল কন্দর্পের অর্চনাই চলে, তবে বুঝিতে হইবে কবিচিত্ত উহাই; কয়লা কয়লার খনি হইতেই আসিয়া থাকে, সোনার খনি হইতে আসে সোনা।

সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি এই যে, সমাজ ও জীবন হইতেই কাব্যের বস্তু আহৃত হয়। বস্তু বা বিভাব-জাত ভাব কাব্যাশ্রয়ে সহৃদয় পাঠকচিত্তকে তন্ময় করিয়া রসোপলব্ধি ঘটায়। তন্ময়তা জন্মাইতে না পারিলে রসের প্রকাশ হইতে পারে না। অতএব বস্তু-নির্বাচনে সর্বাগ্রে পাঠক-সমাজের সুরুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। অবশ্য কবিই প্রথম পাঠক, তিনি প্রকৃত কবি হইলে তিনিই সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি, তাঁহাকে জন্ম দিয়া ভাবপুষ্ট করে সমাজ। কবি আবার একদিকে যেমন সমাজের সৃষ্টি, অন্যদিকে তেমন সমাজের স্রষ্টা। অতএব শ্রেষ্ঠ কবি স্বভাবতঃ এমন বস্তুই নির্বাচন করেন, যাহা বিভাব হইয়া দেশ জাতি সমাজ ও পাঠক-গোষ্ঠীর মনে চমৎকারময় বিস্ময়বোধের সৃষ্টি করে, ত্যাগ ও ধর্মময় মহত্ত্বের পূর্ণ আদর্শে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করে, শ্রেয় ও প্রেয়ের সামঞ্জস্য ঘটাইয়া জীবনে বলাধান করে, এবং জাতির ও ব্যক্তির অগ্রগতিতে সহায়তা দেয়, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করিয়া তাহার পূর্তির সঙ্কেত জানায়,—এক কথায় বলা চলে মানুষকে আত্মচৈতন্যে প্রবুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিশ্বাস-ভূয়িষ্ঠ, বল-ভূয়িষ্ঠ ও কর্ম-ভূয়িষ্ঠ করে। বস্তু-জগতের বর্ণনায়ও কবি বস্তুর অন্তর্লোকের স্পন্দন শুনাইয়া স্বরূপধর্মে তাহার অপরূপত্ব গোচর করেন, এবং বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ পরিস্ফুট করিয়া দেন। সে বস্তুও তাই জাগায় আত্মচৈতন্য ও সমাজচৈতন্য, আনে দৃঢ় আত্মপ্রতিষ্ঠা। কেবল রসসৌন্দর্যের সম্পাদনে কবি জগদ্-বিমুখী হইলে উপযুক্ত বিভাবের অভাবে তাহা আকাশকুসুমের ন্যায় কল্পনার জগতে প্রস্ফুটিত হইয়া তখনই ঝরিয়া যায়। সমুচিত বিভাব হইতেই সমুচিত ভাব জন্মিয়া সহৃদয় সামাজিককে তন্ময় করিতে পারে, এবং রসোৎপাদনে সমর্থ হয়। পৃথিবীর চিরস্থায়ী কাব্যগুলির বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে কি বিপুল বৈভব রহিয়াছে তাহাদের বিভাব-রাশির! এমন কি রসসৌন্দর্যের অনবদ্য মূর্তি শকুন্তলা নাটক, কিংবা কুমারসম্ভব কাব্যের বস্তুও মঙ্গলময় সমাজশক্তির এবং প্রেম-শক্তির

সমন্বিত মহিমা কি ভাবে প্রকট করিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

যাহা সমাজ-কর্তৃক সামাজিক জীবনে দুর্নীতি বলিয়া অবজ্ঞাত, তাহা কি করিয়া সহৃদয় পাঠকের চিত্তে এমন ভাব জন্মাইতে পারে, যাহাতে তিনি তন্ময় হইয়া যাইবেন ? ইংরেজী সাহিত্যে অথবা আমাদের সাহিত্যে যে সব রচনা দুর্নীতি বলিয়া নিন্দিত, তাহাদের অধিকাংশই রসোত্তীর্ণ রচনা নয়, ভাবোত্তীর্ণ মাত্র। হয়তো সে সকলও কাব্য, তবে মহৎ বা শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়। ভাবের যেমন মনোহারিত্ব আছে, তেমন আছে দুর্বার বেগ। রস শান্ত, সুস্থির, আত্ম-সম্পূর্ণ, শিব ; ভাব তাহার বিপরীত ধর্ম। শৃঙ্গাররতি, বা ক্রোধ, বা উৎসাহ, বা শোক, বা ভয়, বা দেশপ্রীতি—প্রত্যেকটি ভাবেরই ভাবস্বরূপে অসীম শক্তি, ব্রহ্মপুত্রের বন্যাপ্রবাহ, অথবা নায়গারার জলপ্রপাতও যেন তাহার কাছে তুচ্ছ। ইহাদের প্রত্যেকটি ভাবই সৃষ্ট জগৎ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে, আবার ধ্বংসস্তূপ হইতে তৎসমুদয় নবীন ভাবে সংগঠনও করিতে পারে। লঙ্কা-যুদ্ধ বা ট্রয়-যুদ্ধেব মূলে ছিল একটি ভাব—শৃঙ্গাররতি ভাব। এই দৈত্যদল পূজা করে কেবল শিবদেবতাকে, শিবের শাসনেই তাহারা থাকে শান্ত। এই রসই শিব।

কবির দিক হইতে বলা যায়, দিব্য কবি বিজ্ঞানময় অথবা আনন্দময় ভূমিতে সর্বসংস্কারের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রতিভানশক্তির প্রভাবে কাব্য রচনা করেন। সে কবি যে বস্তুকেই গ্রহণ করুন, তাঁহার শুদ্ধ দৃষ্টির দ্যুতিতে দুর্নীতিও এমনভাবে বিভাবিত হয় যে, ভর্জিত বীজের ন্যায় তাহা ফলোৎপাদনে অক্ষম, চিত্রাঙ্কিত ভুজঙ্গের ন্যায় বিষবিস্তারে অসমর্থ। তাঁহাদের নির্মিতি আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া দেয়, স্থূল বস্তুসত্তার প্রতি আমরা থাকি উদাসীন। আমরা বিচিত্র পরিবেষ্টনীর মধ্য-গত করিয়া তাহার মূল্য নির্ধারণ করি।

কিন্তু অনেক কবিই তো মনোময় লোকে বিহার করেন ; হাঁ, তাঁহারা অনেকেই রসের নামে ভাব উৎপন্ন করিয়া অশ্বত্থামার ন্যায় দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। মনোময় লোকেও আমাদের দুইটি প্রকৃতি আছে, উচ্চতর প্রকৃতি বা দেবপ্রকৃতি, এবং নিকৃষ্ট প্রকৃতি বা পশু প্রকৃতি। মানুষ মননের বলে শিক্ষা, সাধনা ও অনুশীলনদ্বারা ক্রমশঃ দেবস্বভাব-সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে কোন প্রকৃতিতেই কিন্তু মানুষের তন্ময়তা বা সমাধি আসিতে পারে। পাতঞ্জল যোগদর্শনে কথিত আছে ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ—চিত্তের এই পঞ্চভূমির যে কোন একটি ভূমিতে

সমাধি হইতে পারে।[১] বিক্ষিপ্তভূমি মানবচিত্তের সহজ অবস্থা, একাগ্রভূমি ও নিরুদ্ধভূমি উর্ধ্বতর অবস্থা, ক্ষিপ্ত ও মূঢ়ভূমি নিম্নাবস্থা। ইন্দ্রিয়াহৃত বিষয়ের প্রতি একান্ত আকর্ষণ বশতঃ চিত্ত মুগ্ধ হইলে যে অবস্থা হয়, তাহা মূঢ়ভূমি। এই মূঢ়ভূমিতে যে ইন্দ্রিয়ানন্দ লাভ হয়, তাহার সহিত কাব্যানন্দ, এমন কি ব্রহ্মানন্দেরও দূর-গত স্বল্প সাদৃশ্য রহিয়াছে। বৃহদারণ্যকের ঋষি যেখানে ব্রহ্মানন্দ বুঝাইতে গিয়া প্রিয়তমা পত্নীর আলিঙ্গনের উপমা[২] উপস্থিত করিয়াছেন, সেখানে এই জাতি-গত সাদৃশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন। বিজ্ঞান-ভৈরবেও অনুরূপ অভিমত দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের অভিমত এই,—সদসৎ নির্বিচারে কেবল ইন্দ্রিয়ানন্দে উন্মত্ত হইয়া যাঁহারা কাব্য রচনা করেন, তাঁহারা মনোময় লোকের এই মূঢ়ভূমিতে বর্তমান। তাঁহাদের রচিত কাব্যও কাব্য। স্থূল ও অস্বাস্থ্যকর ইন্দ্রিয়ানন্দও আনন্দ। আনন্দও তো কত প্রকার আছে,—দেবতার আনন্দ অর্থাৎ আমাদের আদর্শ-লোকে আমাদের শুদ্ধ সত্তার আনন্দ; আবার আছে নিম্নসত্তার আনন্দ—মানুষানন্দ, গন্ধর্বানন্দ, অসুর বা পিশাচলোকের আনন্দ। আসুরী বা পৈশাচী প্রকৃতি যে আনন্দে রমণ করিয়া উল্লসিত হয়, আমাদের মানব-সমাজের সহৃদয় বিদগ্ধ পুরুষের তাহাতে তৃপ্তি হইবে কি করিয়া? তাই বলি সকল আনন্দই আনন্দ নয়, সকল কাব্যই কাব্য নয়, সকল বারিই গাঙ্গ বারি নয়। আমরা আদর্শভূত কবি ও কাব্য লইয়াই আলোচনা করিতেছি। শুনিয়াছি মন্দিরের শত্রু দৈত্যদানবদের তৃপ্ত করিবার জন্যই জগন্নাথমন্দিরের বহির্গাত্রে বন্ধকাম মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল, উহারা উহাতেই প্রীত হইয়া ভুলিয়া থাকিবে, ভিতরে আর উৎপাত করিবে না। ভিতরে আছেন রসের দেবতা, চিন্ময় আনন্দময় শুদ্ধ প্রভায় সর্বদিক্ উজ্জ্বল করিয়া।

এইবার শিলার কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া যাইতেছে। আমরা নূতন করিয়া একটি কথাই মাত্র বলিতে চাই। কেবল আর্ট বা সৌন্দর্যকলার সাধনে শিলার মানব-জাতির ঐক্য ও মুক্তি চাহিয়াছিলেন। কাব্যের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ বজায় রাখিয়াই বলিতে চাই এই চাওয়াটাই ভুল। ইহা অতিরিক্ত আর্ট-প্রীতি মাত্র; ইহা সম্যক্ দর্শন নয় এবং তাই সত্যদর্শনও নয়। মনুষ্যত্ব-গঠন এবং মানবচিত্তের পূর্ণ-সংস্কার সম্পাদনের জন্য অনেক উপায়ের একটি উপায় আর্টের অনুশীলন, কোনও

(১) পাতঞ্জলদর্শন, ১।১, ভাষ্য

(২) দ্রষ্টব্য:—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৩।২১

একটি মাত্র উপায় দ্বারা মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠারূপ মানবজাতির মুখ্যতম ও মহত্তম উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে না। ব্র্যাড্‌লে ঠিকই বলিয়াছেন,—

"The offensive consequences often drawn from the formula 'Art for Art' will be found to attach not to the doctrine that Art is an end in itself, but to the doctrine that Art is the whole or supreme end of human life." —*Poetry For Poetry's Sake.*

"'—আর্টের জন্যই আর্ট' এই সূত্র হইতে যে অনিষ্টকর প্রভাব প্রায়ই আসিয়া থাকে, তাহা 'আর্টই আর্টের উদ্দেশ্য' এই মতবাদের সহিত সম্পর্কিত নয় বলিয়া দেখা যায়; প্রকৃত পক্ষে তাহা আর্টই মানব-জীবনের পূর্ণ পরম উদ্দেশ্য, এই মতবাদের সহিতই সম্বন্ধ।"

বস্তুতঃ আর্টই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, মহত্তম উদ্দেশ্যও নয়, অন্যতম উদ্দেশ্য। ধর্মবোধ, নীতি-বোধ, প্রীতি-বোধ, দেশাত্মবোধ প্রভৃতিও জীবনের উদ্দেশ্য। ইহাদের সহিতই অন্তরালে চিত্তের গভীরে যুক্ত হইয়া প্রকাশ পায় রসবোধ আর রম্যবোধ। আর্ট অন্যবোধ-নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র বোধ নহে, জীবনের মহত্তম লক্ষ্য হইতেছে আত্মবোধ; উপরে যতগুলি বোধের কথা লিখিত হইল, তাহারা পরস্পর-সমন্বিত হইয়া পুষ্ট করে আত্মবোধকে। আর্টের বোধ বা রসবোধকেও আত্মবোধের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে।

ফ্লোবেয়ারের ন্যায় যাহারা অসুখী না হইবার জন্য উপদেশ দেন,—

"...to shut yourself up in art, and count everything else as nothing."

—'নিজেকে আর্টেই বন্দী করিয়া রাখিতে এবং অন্য সকল কিছুকেই তুচ্ছ করিতে,'

—তাহাদের সম্বন্ধে অনেকের স্বভাবতঃ সন্দেহ হয় যে, মনুষ্যত্বের যথাযথ অনুশীলন তাহাদের হয় না।

শিলার যে যে দেশ ও সভ্যতার কথা চিন্তা করিয়া উক্ত প্রকার মন্তব্য করিয়াছেন, সন্ধান লইলে জানা যাইবে, তাহাদের অধঃপতনের কারণ কেবলমাত্র আর্টপ্রীতি নহে; আর্টপ্রীতির সহিত ধর্ম, নীতি, বীরাদর্শ, ত্যাগাদর্শ যদি আর্টের ন্যায়ই অনুশীলিত হয়, তবে তাদৃশ ভয়ের কোন কারণ থাকে না। শিলারের স্বপক্ষে শুধু এই বলা যায় যে, আর্ট বা কাব্যকলার কেবল কলা-ভাবে আরাধনা মানব-হৃদয়কে কোমল করে, কিছুটা

তেজোহীন ও বলহীন করে। ভাব ও সৌন্দর্যের অতিশীলনে এক মত্ততা জন্মে, তাহাই চারিত্রিক দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়। বৈষ্ণবপদাবলী কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রায় অতুলনীয়, মানবচরিত্রে তাহার প্রভাব সম্বন্ধে এবং গৌরবোক্তি-বহুল শাক্তকাব্যের প্রভাব সম্বন্ধে ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়ের অভিমত[১] আমরা স্মরণ করিতে পারি।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ সকলেই কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মানবহিতসাধন ইহা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। ভরতমুনি নাট্যের ফল সম্বন্ধে পূর্বে দুঃখার্ত ও শ্রমার্ত-দিগের 'বিশ্রান্তিজনন'[২] এবং পরে সকলেরই চিত্তে 'বিনোদজননে'র[৩] কথা উল্লেখ করিয়া মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন,—

ধর্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং হিতং বুদ্ধিবিবর্ধনম্। ।
লোকোপদেশ-জননং নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥—নাট্যশাস্ত্র, ১।১১৫-১৬

—'এই নাট্য ধর্ম বৃদ্ধি করিবে, যশ ও আয়ু বৃদ্ধি করিবে, লোকের হিত করিবে এবং বুদ্ধি বৃদ্ধি করিবে, লোককে উপদেশ দান করিবে।'

অভিনবগুপ্ত ভাষ্যে মন্তব্য করিলেন,—

"নাট্য গুরুর ন্যায় উপদেশ দান করে কি? না, করে না। কিন্তু বুদ্ধি বিবৃদ্ধ করে, নিজের সদৃশ প্রতিভাই বিতরণ করে।"[৪]

অভিনবগুপ্তের মন্তব্যের ব্যাখ্যা এই,—নাট্য সাক্ষাৎ ভাবে গুরুর ন্যায় উপদেশ দান করে না, কিন্তু জগৎ ও জীবনের ঘটনারাশি উপস্থিত করিয়া অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি দ্বারা প্রতিভার বিকাশ ঘটায়, এবং নিজের মঙ্গলসাধনে তাহাকে উদ্যুক্ত করে।

ভামহ সাধুকাব্যের ফলস্বরূপ ধর্মার্থকামমোক্ষে ও বিচিত্র কলায় বিচক্ষণতা দান এবং সকলকে প্রীতি দানের কথা উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রথম মধু লেহন করিয়া পরে লোকে কটু ঔষধও পান করিয়া থাকে, সেইরূপ স্বাদু কাব্যের সহিত মিশ্রিত হইলে লোকে শাস্ত্রপাঠ করিতেও প্রবৃত্ত হইতে পারে।[৫]

ভামহ আরও বলেন প্রতিপাদ্য বস্তুর মাহাত্ম্য দ্বারাই কাব্য-সম্পদ উজ্জ্বল হইয়া

(১) দ্রষ্টব্য :—কাব্যালোক, পৃঃ ২১২-২১৩
(২) নাট্যশাস্ত্র, ১।১১৫
(৩) ঐ ১।১২৪
(৪) ঐ ১।১১৫, ভাষ্য পৃঃ ৪১
(৫) ভামহালঙ্কার, ১।২, ৫।৩

থাকে। উদ্ভটও প্রায় অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন,—অমরদ্রুম যে প্রকার সুমেরুর গুণে, কাব্যও সেই প্রকার আশ্রয়-সম্পত্তি অর্থাৎ আলম্বন-বস্তুর ধর্মেই মহত্ত্ব লাভ করে। রুদ্রটের বাক্য আরও স্পষ্ট.—প্রবন্ধের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে উদার চরিত্রকে অবলম্বন করিতে হইবে। মম্মট স্পষ্টতম করিয়া গৌণ ও মুখ্য সকল উদ্দেশ্য একটি কারিকায় গুছাইয়া লিখিয়াছেন।[১] মম্মট রস-বাদের এক প্রধান আচার্য; তাঁহার লেখা হইতে নিঃসন্দেহে প্রতীতি হয় যে, কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সদ্যঃ পরনির্বৃতি লাভ; গৌণ উদ্দেশ্যসমূহ হইতেছে যশোলাভ, অর্থলাভ, লোকব্যবহার-জ্ঞান, অমঙ্গলবিনাশ এবং কান্তাসম্মিত মধুর উপদেশ প্রয়োগ।[২]

এই মতকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আমাদের ব্যাখ্যান এই,—কাব্য পাঠ একটি স্বতন্ত্র রসাস্বাদ, শুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহা আত্ম-সম্পূর্ণ এবং আত্মবোধ; রসেই রসের পরম সার্থকতা। রস-লোকের আনন্দময় ভূমিতে দাঁড়াইয়া কাব্যের দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য আমরা স্বীকার করিব না। মম্মটের বর্ণিত সদ্যঃপরনির্বৃতি নামক লক্ষ্যকেই আমরা কাব্যের মৌলি-ভূত লক্ষ্য বলিতেছি. এবং তাহারই ব্যাখ্যা-ক্রমে পূর্বের বাক্যগুলি উচ্চারণ করিয়াছি।

শ্রীকুমারও অনুরূপভাবে শিল্পবিদ্যার লোকহিতসাধনের উদ্দেশ্য নিষেধ-মুখে বলিয়াছেন,—

অতোঽন্যদ্ অশুভং চিত্রং বিপরীতফলপ্রদম্।
ন লেখয়েৎ তন্ন লিখেল্লোকদ্বয়-সুখেচ্ছয়া॥ —শিল্পরত্ন, ৪৬।১৩

'ইহলোক ও পরলোকে সুখ ইচ্ছা করিলে উহা হইতে অন্য প্রকার চিত্র, যাহা লোকসমাজে অশুভ ঘটায় ও বিপরীত ফল দান করে, কদাচ কেহ লেখাইবেন না এবং নিজেও লিখিবেন না।'

বস্তুতঃ সকল দেশেই দেখা যায় শিল্পবিদ্যার সঞ্জীবন ও রস-স্পন্দনের মূলে রহিয়াছে

(১) দ্রষ্টব্য—কাব্যালোক, পৃঃ ১১-১২।

(২) মম্মট ত্রিবিধ উপদেশের কথা বলিয়াছেন,—প্রভুসম্মিত আদেশ, সুহৃৎ-সম্মিত পরামর্শ ও কান্তাসম্মিত উপদেশ; বেদে থাকে প্রথমটি, পুরাণ-ইতিহাসে থাকে দ্বিতীয়টি; সৎ কাব্যে থাকে শেষটি। এই শেষটিতেই কান্তা সরসতা দ্বারা চিত্ত অভিমুখী করিয়া বুঝাইয়া দেন,—

"রামাদিবদ্ বর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ।" —কাব্যপ্রকাশ, ১।২, বৃত্তি

—রামাদির ন্যায় চলিবে, রাবণাদির ন্যায় নয়।

আধ্যাত্মিক মহাপুরুষগণের ধর্মবোধির প্রেরণা। ভারতীয় নৃত্যশাস্ত্রে কথিত আছে নৃত্য, গীত ও বাদ্য বিষ্ণুপূজায় প্রশস্ত, কিন্তু 'নৃত্য-বিক্রয়-কারক' সর্বদা বর্জনীয়।[১]

কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন সৃষ্টিতে, একটি কার্যের অনেক ফল থাকিতে পারে এবং অনেক কারণও থাকিতে পারে; তাহাদের একটিই হয় মুখ্য, অপরগুলিকে আমরা পরে স্বীকার করি এবং বলি গৌণ। এই সকল স্থলে গৌণ অর্থ আনুষঙ্গিক মাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্যের তাহা সহচারী, তাহা হইতে প্রায় স্বতঃই সিদ্ধ হয়, সেজন্য পৃথক্ চিন্তা ও প্রয়াস বড় লাগে না। বিদ্যালাভ হইলে যশোলাভ, অথবা তাহার বলে উচ্চপদ বা অর্থ-লাভ আপনি আসিতে পারে। এইরূপে কাব্য রচনা বা পাঠ করিলে আনন্দলাভের সহিত বিদ্যা, সমাজজ্ঞান, উপদেশ, যশ ও অর্থ লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু এই সকলের প্রেরণায়ই কবিগণ ও পাঠকগণ মুখ্যতঃ কাব্য আরাধনা করেন না। জগৎ ও জীবনের সহিত কাব্যের সম্বন্ধ থাকিবেই, কিন্তু কখনও তাহা প্রকট হইয়া রসসত্তাকে অন্তরাল করিয়া স্বয়ং প্রধান হইবে না; তাহা থাকিবে প্রচ্ছন্ন, স্নায়ুমণ্ডলীর ন্যায় গোপনভাবে অন্তঃসঞ্চারী।

এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র সকলের রচনারই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বহুবিধ ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমক সাহিত্যের ধুরন্ধরগণও অনেকে নানাভাবে অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, ইংরেজ লেখকগণেরও সদৃশ অভিমত অনেক আছে। স্থানাভাবে আমরা আর ঐসকল উল্লেখ করিলাম না।

আধুনিক যুগে যেখানে Theodore Komisarjevsky মন্তব্য করেন,—

"It is absurd to assert, as some do, that the art of the theatre is a purely aesthetic function and has nothing to do with 'propaganda' either moral, religious, or political."

—*The Theatre and a Changing Civilisation*, P-2.

—'অনেকে যে বলেন অভিনয়-কলা একটি বিশুদ্ধ রসাত্মক ব্যাপার মাত্র, এবং নীতি, ধর্মনীতি ও রাজনীতি-বিষয়ক প্রচারের সহিত একেবারে সম্পর্ক-শূন্য, ইহা একান্ত অযৌক্তিক।'

—তখন ইহা অনেকাংশে উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু ইহার পর যখন শুনিতে পাই,—

(১) বিষ্ণুধর্মোত্তর, ৩৪-২৮, পৃঃ ৩৩১

"No book written at the present time can be 'good, unless it is written from a Marxist or near-Marxist point of view."

—*Upward—The Mind in Chains*.

—'বর্তমানকালে লিখিত কোন গ্রন্থই 'ভাল' হইতে পারে না, যদি না তাহা মার্ক্সীয় অথবা প্রায়-মার্ক্সীয় দৃষ্টি-ভঙ্গী হইতে লিখিত হয় ;'

অথবা যখন শুনি,—

"Art, an instrument in the class struggle, must be developed by the proletariat as one of its weapons."

Freeman, *Proletarian Literature in U.S.A.*

—'আর্ট শ্রেণী-সংগ্রামের একটি যন্ত্র, তাহা দরিদ্র শ্রমিক-সঙ্ঘ কর্তৃক তাহাদের অন্যতম অস্ত্র-হিসাবেই অনুশীলিত হইবে ;'

—তখন মনে হয় রাষ্ট্রীয় দলপতিদের দণ্ডনীতি আর্টের উপরে উদ্যত হইয়াছে, এবং আর্ট বিদ্বজ্জন-কথিত রাজেন্দ্রাণীর সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাসীবৃত্তি অথবা পণ্যাঙ্গনা বেশযোষার বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে।

এখানে আর 'Art for Art's sake' নয়, Art for only 'Propaganda's' sake। ইহা আর্ট হিসাবে আর্টের মৃত্যু।

খারকভ সাহিত্য-সম্মেলনে লেখকগণের জন্য উল্লিখিত নীতি-সমূহের[১] দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

(1) "Art is a class weapon."

—'আর্ট হইতেছে শ্রেণীসংগ্রামের একখানি অস্ত্র।'

(2) "Every proletarian artist must be a dialectical materialist. The method of creative art is the method of dialectical materialism."

—'প্রত্যেক শ্রমিক শিল্পীকে ডায়েলেক্‌টিক্যাল জড়বাদী হইতে হইবে। সৃষ্টি-ক্ষম শিল্পকলার পদ্ধতি হইতেছে ডায়েলেক্‌টিক্যাল জড়বাদের পদ্ধতি।'

আর্টকে যদি একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক বা সামাজিক মতবাদের অচ্ছেদ্য লৌহ-নিগড়ে শৃঙ্খলিত করা হয়, তবে তাহা হইবে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভীষণ দুর্দিন, সভ্যতার ট্র্যাজিডির শেষ অঙ্ক। ইহা মানবমনকে এবং বায়ু-প্রবাহকে বাঁধিবার চেষ্টা!

(১) Stephen Spender : *The Destructive Element*, p. 232.

মানবমনের স্বাধীনতা ও মর্যাদাবোধ ঘুচাইয়া তাহাকে যদি কলুর চোখঢাকা বলদের মত কেবল মার্ক্সীয় অথবা যে কোন নির্দিষ্ট মতবাদের ঘানিতেই ঘুরান হয়, তবে সে মনের নব নব উন্মেষ—অপূর্ববস্তু দর্শন ও নির্মাণের ক্ষমতা চিরতরে ঘুচিয়া যাইবে। মানব যেন তাহার শেষ লক্ষ্য লাভ করিয়াছে! যেন শেষ সত্য উপলব্ধি করিয়াছে! কি অন্ধতা!

(৮)

কবি ও বিভাব

বস্তু বিভাবে রূপায়িত হয় কবিপ্রতিভা-বলে কবি-চিত্তের বিশেষ অধিবাসন-ক্রিয়ার ফলে। কবি-প্রতিভা ও কবি-চিত্ত সম্বন্ধে এই গ্রন্থে নানাপ্রসঙ্গে নানারূপ আলোচনা করা হইয়াছে। কাব্যের বস্তু যে জগৎ ও যে সমাজের, কাব্যের কবিও সেই জগৎ ও সেই সমাজের। উভয়ের মধ্যে সাধর্ম্য ও সারূপ্য রহিয়াছে বলিয়াই কাব্যের উদ্ভব সম্ভবপর হয়। আবার কবি স্বয়ং তাঁহার কাব্যের প্রথম পাঠক বা সামাজিক। কবিচিত্তের একাংশ—এক প্রধান অংশ এই বিশাল জগৎ ও সমাজ, আর এক অংশ—এক প্রধান অংশ পাঠক বা সামাজিক; উভয়ের সমন্বিত সত্তাকে আত্মভূত করিয়া সমূর্ধ্বে রহিয়াছে দিব্য কবি-সত্তা আপন বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় মহিমায় অধিষ্ঠিত। কবি তাই সমাজ এবং সামাজিক, আবার সমাজ-সামাজিকের অতীত।

কবিকে জন্ম দেয় তাঁহার সমাজ, দেশ, তাঁহার প্রাচীন ঐতিহ্য, আধুনিক সংস্কৃতি, অতীতের সিদ্ধি ও বর্তমানের সাধনা, এমন কি ভবিষ্যতের সাধ্য ভাবাদর্শ। অতীত ও বর্তমান-দ্বারা যে কবিহৃদয় গঠিত হয়, তাহার স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় ভবিষ্যতের ভাবাদর্শ। দেশ ও সমাজ আত্মোপলব্ধির জন্য—অন্তরের অব্যক্ত রুদ্ধ বেদনা এবং অনুপলব্ধ মুক্তির কামনাকে রূপায়িত করিবার জন্য কর্মজগতে যেমন সৃষ্টি করে মূর্ত মহাশক্তি বজ্রধর নায়ক, ভাবজগতে তেমনই সৃষ্টি করে যুগন্ধর মহাকবি—স্বদেশাত্মার বাণীমূর্তি। মিলিত দেবশক্তি-সমুদ্ভূত ভগবতীর ন্যায়, দুগ্ধমন্থনজাত নবনীতের ন্যায় সকলের সকল শক্তির জীবন্ত বিগ্রহ হইয়া উদ্ভূত হ'ন কবি; তিনি দেশ ও কালের কণ্ঠে ধ্বনিত করেন ভাষা এবং জাতির হৃদয়ে সঞ্চারিত করেন নব নব আশা।

মহাপুরুষগণ এবং শক্তিধর কবিপুরুষগণ কেবল দেশ ও কালের সৃষ্টি নহেন, তাঁহাদের প্রতিভার পূর্ণপ্রকাশে দেশ ও কালকেও তাঁহারা নবীন মূর্তিতে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, বরণ করিয়া আনেন নবযুগ। এইখানেই সাধারণ পুরুষের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য। কবির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাই যুগানুগ হইয়াও যুগাতিগ। শ্রেষ্ঠ কবি অথবা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর প্রকাশ আপাতদৃষ্টিতে দেশকালপাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও সূক্ষ্ম রসজ্ঞ দৃষ্টিতে উপলব্ধি হয় যে, তাহা পরিচিত দেশকালপাত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। এই যুগানুগতা অতিক্রম করিয়া যুগাতিগ ধর্মের পরিস্ফূর্তি না হইলে কোনও কাব্য বা শিল্প সর্বকালীন ও সর্বজনীন পদবী লাভ করিয়া শাশ্বত হইতে পারে না।

শ্রেষ্ঠ কবি তাঁহার দিব্য প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করেন বর্তমানের অতীত অনাগত জগৎকে। যে দুর্বার বেগে অদৃষ্ট শক্তি ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে সম্মুখের দিকে নব নব সৃষ্টির সম্ভাবনার মধ্য দিয়া নিখিল জগৎ ও সমাজকে, কবি যেন তাহা এক সূক্ষ্ম অনুভূতিশক্তি দ্বারা অন্তরের গূঢ় অন্তরতম স্পন্দনে উপলব্ধি করেন। তিনি বীজের মধ্যে মহাবৃক্ষকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তিনি শুনিতে পান অনাগত কালের পদধ্বনি। তখনই কবি হ'ন ঋষি।

এই দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন কবিই শ্রেষ্ঠ কবি, তিনিই ঋষি-কবি। সে জাতি ধন্য, সে সমাজ কৃতার্থ, যেখানে এই ঋষি-কবির আবির্ভাব সম্ভব হয়।

কবির কণ্ঠে যে কাব্য-গীতি ঝঙ্কৃত হয়, তাহাতে খণ্ড বা পূর্ণ ভাবে রূপ লাভ করে একটা দেশ, তাহার সিদ্ধি ও সংস্কৃতি, তাহার সুখদুঃখ আনন্দবেদনা, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা-আদর্শ, তাহার দীর্ঘকালের সাধনায় পুষ্ট ভাষা ও শব্দরাশির বিপুল সম্পদ্। কিন্তু দিব্য দৃষ্টির বলে যখন তিনি অনাগতকে প্রায় প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি যে সাহিত্য রচনা করেন, তাহাতে আসে জাতির পক্ষে সত্য পথ নির্দেশ,—জাতির প্রেয়োবোধ ও শ্রেয়োবোধের প্রেরণা। জগতের গতিপথে তিনি জগৎকে শুদ্ধ ও সুন্দর করিয়া আরও অগ্রবর্তী করিয়া দেন, বরণ করিয়া আনেন ভবিষ্যৎকে তাহার অপূর্ণতা ও অশোভনতা, তাহার অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য যথাসম্ভব দূরীভূত করিয়া। এ কল্পনা সত্যদর্শী, এখানে পলায়নবাদ বা আত্মশরণ নাই, রহিয়াছে অগ্রগতি এবং আত্মপ্রসার। বিধাতার সৃষ্টিকে মানুষ যদি নিজের সাধনা, সত্য ও ভাবদৃষ্টি দিয়া মহান্—মহত্তর, পূর্ণ ও পূর্ণতর করিয়া না লইতে পারে, তবে সে আর মননশীল মানুষ কি? মানবজাতির শৈশবে পৃথিবীর কি রূপ ছিল, আর

আজ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধনায় কৃষি-শিল্প ও সমবায়ের ফলে কি রূপ হইয়াছে! মানবের অভ্যুদয়-লাভের প্রবল তাড়নায় বাহ্য-জগতে বিস্ময়কর পরিবর্তন আসিয়াছে। ইহা মানবেরই নূতন সৃষ্টি, তাহারই স্বপ্ন-দর্শনের বাস্তব রূপ। ঠিক তেমনই পরিবর্তন আসিয়াছে মানবের অন্তর্জগতে, সে বর্বর, অসভ্য বা অর্ধসভ্য মানব আর নাই। আজও সে তাই পরিচিত জীবন-বিধি, সমাজ ও রাষ্ট্রশক্তি, এবং ব্যক্তি-মানসের বিচিত্র বিলাসকে একান্ত করিয়া সত্য ও সনাতন বলিয়া মানিয়া লইতে পারে না। মানবাত্মার নব নব পরিস্পন্দ রুদ্ধ বা শুদ্ধ হইলে ঘটিবে তাহার মৃত্যু। তাই দেশমুখ্য শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ—কবিগণ ও শিল্পিগণ স্বপ্ন দেখেন, বাস্তবকে শেষ রূপ বলিয়া স্বীকার করেন না। ইহারই ফলে ধর্মে সমাজে রাষ্ট্রে, মানবের বহুমুখী চেতনায় নব-জন্ম—দেব-জন্মের গান ধ্বনিত হয়, আদর্শলোক বাস্তব রূপ লইয়া দেখা দিতে থাকে। যাহা আছে তাহাকে তুচ্ছ করিতে হইবে না, কিন্তু তাহাকে শেষ প্রাপ্তিও মনে করিতে হইবে না; যাহা আসিতে পারে এবং আসিবে নিশ্চয়, সেই দিকে ধ্রুব দৃষ্টি রাখিয়া রূপ ও রসের সৃষ্টি করেন কবিগণ, সেখানেই তাঁহারা ঋষি বা Prophets।

মানুষের সৃষ্টি অবধি এই অগ্রগতি, জীবনের বিকাশ-মুক্তির অনন্ত সাধনাই চলিয়াছে। এই সাধনায় শ্রেষ্ঠ দান কবির, প্রাণকে প্রবুদ্ধ করিতে পারেন তিনি। বস্তু-জগতের আশ্রয়ে মিথ্যা কল্পনা-জগৎ নয়, সুন্দরতর ও মহত্তর বস্তুজগৎ—যাহা মানুষের শক্তি ও সাধনায় উপলব্ধি করা সম্ভবপর, এমন সত্য কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করিবেন ঋষি-কবি। মানবে মানবে জাতিতে জাতিতে ঘুচিয়া যাইবে অ-প্রীতি, অ-সঙ্গতি ও অ-সাম্যের সম্পর্ক। দেবতা মানবের মধ্যে হইবেন জাগ্রত, ভূতল হইবে স্বর্গ।

এখানে বলা আবশ্যক, কবির উদ্দেশ্য কেবল আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক বা সামাজিক প্রসন্নতা নয়, কখনও কখনও অদৃষ্ট ও অদৃশ্য শক্তির দুর্বার খেলা, অথবা দৃষ্ট ও দৃশ্য শক্তির বিচিত্র লীলা বর্জন করিয়া কবি যেন উদ্দেশ্য-বিহীন শুদ্ধ সৌন্দর্যও নির্মাণ করিয়া থাকেন। আমরা প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভেই দেখাইয়াছি, ইহা প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিষ্প্রয়োজনের বা অবসর-বিলাসের আনন্দ নয়, ইহাতে আছে কেবল বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় পুরুষের বোধিময় আত্ম-প্রসাদন।

কবি-গত মুখ্য আলোচনা হইতেছে কবির দৃষ্টি-ভঙ্গী বা কবি-চিত্তের বিশেষ ভাবনা-ভঙ্গী লইয়া। ইহারই নানা ভেদ পাশ্চাত্ত্য দেশে Realism, Idealism,

Romanticism, Classicism প্রভৃতি নামে পরিচিত। আমরা বলিতে পারি বস্তুতন্ত্র, ভাবতন্ত্র, রোমাণ্টিক তন্ত্র, ক্লাসিক তন্ত্র প্রভৃতি। এইগুলি একদিকে যেমন কবিচিত্তের বিশেষ ভাবনা-ভঙ্গী, আর একদিকে তেমনই কাব্যরচনার বিশেষ কৌশল। কবির প্রতিভা বিশেষ হইতে আসে বিশেষ ভাবনা-ভঙ্গী, এবং ভাবনা-ভঙ্গী হইতে আসে বিশেষ রচনা-কৌশল। রাজানক কুন্তক বলেন,—

যৎ কিঞ্চনাপি বৈচিত্র্যং তৎ সর্বং প্রতিভোদ্ভবম্। —বক্রোক্তিজীবিত, ১।২৮

—'যাহা কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাহা সকলই কবি-প্রতিভা হইতে উদ্ভূত।'

এই প্রতিভার মধ্যে কবিস্বভাব নিহিত। কুন্তক ইহার পূর্বেই বৃত্তিতে মন্তব্য করিয়াছেন,—

কবিস্বভাব-নিবন্ধনত্বেন কাব্যপ্রস্থানভেদঃ। —ঐ, ১।২৪, বৃত্তি

—'কবিস্বভাবে নানা ভেদ আছে বলিয়াই কাব্যে প্রস্থান-ভেদ ঘটে।'

টি, এস্, ইলিয়ট যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন,—

"...'classic' and 'romantic'—a pair of terms belonging to literary Politics," —*What is a Classic?* p. 9

—'ক্লাসিক এবং রোমাণ্টিক, দুইটি শব্দ—সাহিত্যিক রাজনীতিতে তাহাদের স্থান।'

বাস্তবিক পক্ষে ইহা শুদ্ধ সাহিত্য-নীতি নহে, সাহিত্য-জগতের দলগত রাজনীতি মাত্র, কবির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া ইহার বিচার চলে।

এই সকল 'ইজ্‌ম্' বা মতবাদের মূল কথাটি আমরা পূর্বেই বলিয়াছি—কবিচিত্তের বিস্ময়-বোধ বা 'wonder-spirit'। বস্তু-তন্ত্র বা ভাব-তন্ত্র অথবা রোমাণ্টিক তন্ত্র কোন কিছুই বস্তুর নিজস্ব ধর্ম নহে, উহা মুখ্যতঃ কবি-চিত্তেরই ধর্ম। অনেকের ধারণা রোমাণ্টিক তন্ত্রেই যত বিস্ময় ও রহস্য-বোধ, 'সুন্দরের সহিত অদ্ভুতের পরিণয়,' অথবা 'কল্পনা-প্রবণতার অস্বাভাবিক বিকাশ';[১] বস্তু-তন্ত্র নিছক গদ্য, শুষ্ক বিজ্ঞানের সদৃশ। ইহাই যদি হইবে, তবে তাহার বস্তু কাব্যের উপাদান হয় কি করিয়া? এখানেও প্রকৃতপক্ষে একই বিস্ময়-বোধ কাজ করে; তবে তাহা রহস্য উপলব্ধি করে জীবনের কঠিন সংগ্রামে, রাজপথে ধরণীর ধূসর ধূলিতে, মধ্যাহ্নরৌদ্রের দীপ্ত দাহে, বিকৃত বীভৎস অন্ধ-কবন্ধের উৎকট উল্লাসে। কল্পিত সৌন্দর্য অপেক্ষা বস্তুর

(১) 'An extra-ordinary development of imaginative sensibility.'—Herford

স্বভাবস্পন্দ যেখানে পরিস্ফুট, সেখানেই বস্তুতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। মূলে কাজ করে একই বিস্ময়-বোধ। রোমান্টিক-তন্ত্র ও বস্তু-তন্ত্রে বরং বস্তু নির্বাচন লইয়া রুচি-বিরোধের প্রশ্ন উঠে; যাহা রোমান্টিক, তাহা বস্তুতান্ত্রিক নয়; যাহা বস্তুতান্ত্রিক, তাহা হয়তো রোমান্টিক নয়। কিন্তু ক্লাসিক তন্ত্র এবং রোমান্টিক তন্ত্রে প্রকৃত বিরোধ নাই কোথাও, উহারা কাব্যের ক্ষেত্রে পরস্পরের পরিপূরক। যাহা সৃষ্টি-ভঙ্গীতে ক্লাসিক, তাহা দৃষ্টি-ভঙ্গীতে রোমান্টিক হইতে পারে। কবি কালিদাসের কাব্য অনেক সময়ে তাহাই। ক্রোচে *Problemi* গ্রন্থে যথার্থই বলিয়াছেন,—

"A great poet is both classic and romantic."

—'শ্রেষ্ঠ কবি যুগপৎ ক্লাসিক ও রোমান্টিক।'

ক্রোচে তাঁহার *Æsthetic* গ্রন্থেও *realistic* ও *symbolic* এবং *classic* ও *romantic* বস্তুর তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিভিন্ন যুগের এবং রুচির সমালোচকগণের বিশ্লেষণ হইতেই ধরা পড়ে—উহাদের সত্য শাশ্বত লক্ষণ বলিয়া নিশ্চিতরূপে কিছু নির্ণয় করা কঠিন।[১]

(১) *Æsthetic*, XI, pp. 115-116.

পঞ্চম অধ্যায়

শব্দ ও অর্থ

(১)

শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক

কাব্য হইতেছে কথা-শরীর। শব্দার্থই এই কথা। তাই বলা হইয়া থাকে—

তস্য শব্দার্থৌ শরীরম্।'

—'শব্দার্থই তাহার শরীর।'

কবি কথা-শরীর নির্মাণ করিয়া ভাবের বস্তুকে রূপায়িত এবং রসায়িত করেন। আচার্য অভিনবগুপ্তের একটি বাক্যাংশ আমরা পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছি 'শব্দে সমর্প্যমাণঃ'—'শব্দে সমর্পিত হইয়া'। আমরা বলিয়াছি কবি-চিত্তের ভাবনা-দ্বারা অধিবাসিত হইলেই বস্তু শব্দে সমর্পিত হয় এবং বিভাব হয়। শব্দ বলিতে বুঝায় কবির চিত্ত-গত অর্থ এবং অর্থের বাহন ধ্বনি।[২] আমরা কান দিয়া শুনি ধ্বনি, তাহাই চিত্তে গিয়া ধ্বনি-রূপের ও সঙ্কেতিত অর্থ-রূপের সাহায্যে যুগপৎ বস্তুকে প্রকাশ করে। ধ্বনি (sound) ও অর্থ (sense)—এই উভয়ের সাহিত্য বা সংযোগের ফলে শব্দের উৎপত্তি হয়। এই সাহিত্য অর্থাৎ 'বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ' হইতে পরবর্তী কালে ঐ পদটি শব্দ-নির্মিত যাবতীয় রচনা, এবং তাহারও পরবর্তী কালে শব্দ-নির্মিত দ্রুতি বা দীপ্তিগুণময় কাব্যাত্মক বিশিষ্ট রচনা বুঝাইয়া আসিতেছে। শেষোক্ত অর্থে সাহিত্য শব্দ কবিবাঙ্‌নির্মিত কাব্য শব্দেরই অপর রূপ। এই বিশিষ্ট অর্থে কাব্য শব্দ প্রাচীন, সাহিত্য শব্দ মধ্যযুগীয়। আমরা এই প্রবন্ধে বিশিষ্ট অর্থেই সাহিত্য শব্দ বুঝাইয়া শব্দার্থের সাহিত্য-ধর্ম নির্ণয় করিতে চাই।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ কি নিত্য?—এই প্রশ্ন লইয়া ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রে

---

(১) সাহিত্যদর্পণ-ধৃত বচন, দ্রষ্টব্য ঐ, ১।২, বৃত্তি।

তুলনীয়—রাজশেখর-কৃত কাব্য-পুরুষ বর্ণনা—'শব্দার্থৌ তে শরীরম্।' কাব্য-মীমাংসা, ৩য় অধ্যায়। অথবা, 'শব্দার্থৌ বপুরস্য।'—একাবলী, ১।১৩।

(২) ধ্বনি এই প্রবন্ধে ব্যঙ্গ্যার্থ নয়, নাদ, রব অর্থাৎ sound অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

আমাদের দেশে ও পশ্চিম দেশে অনেক আলোচনা হইয়াছে। প্রশ্নটিকে উল্টাইয়া ধরিলে একটি দিক্ পরিষ্কার হয় বলিয়া মনে হয়,—অর্থ ও শব্দের সম্বন্ধ কি নিত্য? সহজেই উত্তর আসিবে 'না'। প্রথমতঃ অর্থ ও ধ্বনি এক জাতীয় পদার্থ নয়; অর্থ হইতেছে মনোগত ভাব, ধ্বনি শ্রুতিগ্রাহ্য শব্দ। অর্থ আমরা বাগিন্দ্রিয়ের সহায়তায় ধ্বনি-সঙ্কেতে, হস্তের সহায়তায় চিত্র-সঙ্কেতে বা লিপি-সঙ্কেতে, অথবা অন্যবিধ সঙ্কেতে, হস্ত-পদের সহায়তায় নৃত্য-সঙ্কেতে কখনও বা চক্ষুর সহায়তায় দৃষ্টি-সঙ্কেতে, প্রকাশ করিয়া থাকি। জগৎকে মনের মধ্যে গ্রহণ করি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহায়তায়, গৃহীত জগৎকে মন হইতে বাহিরে প্রকাশ করি বাক্-পাণি-পাদ এই তিন কর্মেন্দ্রিয়ের সহায়তায়। জ্ঞানেন্দ্রিয়-সমূহের মধ্যে একমাত্র চক্ষুর বিশিষ্টতা আছে; চক্ষুর চঞ্চল গতি এবং বিচিত্র দৃষ্টি-দ্যুতি মনোভাবকে খানিকটা প্রকাশ করে। চক্ষু যেন আত্মার দর্পণ! বস্তুকে যখন গ্রহণ করিয়া চিত্তে একটি 'আকৃতি'[১] বা concept গঠন করি, তখন ধ্বনি সর্বপ্রকার আকৃতির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে না, থাকে শুধু শব্দ-বিষয় গ্রহণের বেলায়। আবার অর্থকে যখন নব সৃষ্টির প্রেরণায় বাহিরে প্রকাশ করিতে উদ্যত হই, তখনও—যেমন চিত্রাঙ্কনের বেলায়—ধ্বনি তার নিত্য সহচর নয়। অতএব সাধারণভাবে বলিতে পারি অর্থের সহিত ধ্বনির নিত্য সম্পর্ক নাই। অর্থ শব্দের আশ্রয় ভিন্নও গৃহীত ও দ্যোতিত হইতে পারে।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, বিশিষ্ট ধ্বনির সহিত বিশিষ্ট অর্থের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, অথবা নিত্য সাহিত্য আছে কিনা। এখানেও আমাদের উত্তর, 'নাই'। একই ধ্বনি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন অর্থের সঙ্কেত করে। আবার একই অর্থ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ধ্বনির সহিত যুক্ত হইয়া বিভিন্ন শব্দে পরিণত হয়। একই ধ্বনি একই ভাষায় অনেক

(১) আচার্য শঙ্কর বলেন,—

আকৃতিভিশ্চ শব্দানাং সম্বন্ধো, ন ব্যক্তিভিঃ। ব্যক্তীনাম্ আনন্ত্যাৎ সম্বন্ধ-গ্রহণানুপপত্তেঃ। —বেদান্তসূত্রভাষ্য, ১।৩।২৮

—'শব্দসমূহের সম্বন্ধ আকৃতিসমূহের সহিত (with concepts, species); ব্যক্তিসমূহের সহিত (with percepts, individuals) নহে। ব্যক্তিসমূহ অনন্ত বলিয়া সম্বন্ধ-গ্রহণই সম্ভবপর হয় না।'

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত concept-এর বাঙ্গালা করিয়াছেন 'বীজ-ভাব'। (সাহিত্য পরিচয়, পৃ. ২)

অর্থের জ্ঞাপন করে। আবার একই অর্থ একই ভাষায় অনেক ধ্বনিদ্বারা জ্ঞাপিত হয়। একই ধ্বনি একই ভাষায় একই অর্থে নির্দিষ্ট থাকিলেও কালক্রমে নানাবিধ সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে, অথবা বিচিত্র অনুষঙ্গ-ধর্মে অর্থের প্রসার, অর্থের সঙ্কোচ এবং নূতন অর্থের সংযোগ-হেতু নূতন তাৎপর্য লাভ করিয়া থাকে;—এখানে ধ্বনি স্থির থাকিলেও অর্থের চলে বহুমুখী গতি-প্রবাহ। আবার অর্থ স্থির থাকিলেও ধ্বনির নানা পরিবর্তন ঘটিতে থাকে, হয়তো পরিবর্তিত শব্দটিকে পরে আর চেনাই যায় না। কখনও কখনও ভাষার একটি অর্থ একটি ধ্বনিদ্বারা প্রকাশিত হইতে থাকিলেও, তদ্‌-বিজ্ঞাপক কোন কোন পূর্ব ধ্বনির ব্যবহারই লোপ পায়, শব্দটি মৃত হইয়া অভিধানে সমাহিত হইয়া থাকে। অন্য দিকে শক্তিশালী কবিগণ এবং পণ্ডিতগণ ধ্বনিতে কেবল নূতন অর্থই যোজনা করেন না, নূতন অর্থে নূতন ধ্বনি প্রয়োগ করিয়া নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কাজেই একই ভাষায় বিশিষ্ট অর্থেই বা ধ্বনি ও অর্থের অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য বলিব কি করিয়া? সমাজের স্বীকৃত সঙ্কেত সমাজের প্রয়োজনে ও পরিবর্তনে পরিবর্তিত হইলে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

আমাদের প্রয়োজনে আমরা এইমাত্র স্বীকার করিতে পারি যে, ভাষায় যেখানেই শব্দ[১] আছে, সেখানেই সঙ্কেতিত কোন-না-কোন অর্থ আছে এবং যেখানেই অর্থ চিত্ত-গত হইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে, সেখানেই তাহা লোকপ্রচলিত একটি শব্দ-সঙ্কেতে ধরা পড়িয়াছে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ও আচার্য শঙ্কর ইহা লক্ষ্য করিয়াই বলিয়া থাকিবেন শব্দের সম্বন্ধ রহিয়াছে 'আকৃতি' বা concept-এর সহিত।[২] আমরা তাই

(১) শব্দ আবার ধ্বনি, বা sound অর্থে ব্যবহৃত হইল। প্রাচীনেরা আলোচনার জন্য শব্দ(word)কে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগের নাম শব্দ (sound) রাখিয়াছেন, অপর ভাগের নাম রাখিয়াছেন অর্থ (meaning)।

(২) মহাভাষ্যকার বলেন,—"কস্তর্হি শব্দঃ? যেন উচ্চারিতেন সাস্না-লাঙ্গুল-খুর-বিষানিনাং সম্প্রত্যয়ো ভবতি স শব্দঃ। অথবা প্রতীত-পদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দ ইত্যুচ্যতে।"

—তাহা হইলে শব্দ কি? যাহা উচ্চারণ করিলে গলকম্বল, লাঙ্গুল, খুর ও শৃঙ্গযুক্ত বস্তুর সম্প্রত্যয় বা চিত্তে জ্ঞান হয়, তাহাই শব্দ (এখানে গো শব্দ); অথবা যে ধ্বনিদ্বারা লোকে পদার্থ প্রতীত হয়, তাহাই শব্দ বলিয়া কথিত হয়।

আচার্য শঙ্কর 'আকৃতি'র সহিত শব্দের সম্বন্ধ বলিয়া ইহাই বুঝাইয়াছেন। দ্রষ্টব্য—পৃঃ ৩৩৩, পাদ-টীকা।

বলিতে পারি শব্দ ও অর্থের মধ্যে আপেক্ষিক নিত্য সম্বন্ধ বর্তমান। শব্দ গঠিত হয় 'আকৃতি' বা concept বুঝাইবার জন্য। সঙ্কেতের সৃষ্টিই হয় সঙ্কেতিত অর্থ বুঝাইবার জন্য। অতএব সঙ্কেত ও সঙ্কেতিত-এর সম্বন্ধ নিত্য, বাচক শব্দ ও বাচ্য অর্থ এই উভয়ের পরিবর্তন হইতে পারে ; তাই শব্দার্থের সম্বন্ধ নিত্য নয়, কিন্তু আপেক্ষিক নিত্য। শৈশব হইতে পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ এত গভীর ও দৃঢ় হয় যে, মনে হয়, চিত্তে উহাদের একটি আর একটির অবিনা-ভাবেই থাকে। ক্রোচে বলিয়াছেন,—

"Every true intuition or representation is, also, *expression*. That which does not objectify itself in expression is not intuition or representation,..." —*Æsthetic*, Ch. I., p. 13

—'প্রত্যেকটি খাঁটি উপলব্ধি বা অন্তরুপস্থিতি একটি অভিব্যক্তিও বটে। বিষয়-রূপে যাহার অভিব্যক্তি হয় না, তাহার উপলব্ধি বা অন্তরুপস্থিতিও হয় না।'

এই অভিব্যক্তি কেবল শব্দাভিব্যক্তি নয়, রূপাদি দ্বারা অভিব্যক্তিও বটে।

যাহা হউক, অর্থের জন্যই আমরা শব্দের আরাধনা করি, কেবল শব্দের জন্য শব্দের বিশেষ মূল্য নাই। সাহিত্যের উদ্দেশ্য শব্দ-সহায়তায় অর্থ-নিবেদন। শব্দ অর্থের এক ধ্বনি-সঙ্কেত মাত্র। এই ধ্বনি-বিজ্ঞান ও সঙ্কেত-বিজ্ঞান এক দুরূহ বিজ্ঞান, এই বিষয়ে এখনও অনেক আলোচনা করিবার আছে ; কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তাহার স্থান নাই।

সাহিত্য শব্দটির উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করিলেও শব্দার্থ-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য খানিকটা উপলব্ধি হইবে।

শব্দার্থের সাহিত্য-ধর্ম আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয়। সাহিত্য শব্দ বর্তমানে সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় কাব্য, নাটক ও কথা—যে কোন প্রকার রুতি বা দীপ্তি-গুণাত্মক রচনা বুঝাইয়া থাকে। কাব্য শব্দও সংস্কৃতে ঐরূপ সকলপ্রকার অর্থ বুঝাইয়া আসিতেছে ; সাহিত্য সেখানে কাব্য শব্দের সমার্থক রূপেই ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালায় কিন্তু কাব্য শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া কেবলমাত্র ছন্দোবদ্ধ রচনা—মহাকাব্য বা গীতিকাব্য প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে, বড় জোর কখনও বা নাট্য-কাব্য নামে নাটককেও বুঝায়। কাব্য শব্দ সুপ্রাচীন কাল হইতেই প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে ; সাহিত্য শব্দের এইরূপ প্রয়োগ বোধ হয় মাত্র হাজার বৎসর পূর্বে রাজশেখরের সময়ে আরম্ভ হয়, ভোজদেব এবং বিশেষ ভাবে কুন্তক শব্দটিকে প্রচলিত

অর্থে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বাঙ্গালায় আবার সাহিত্য শব্দ অর্থ-প্রসারের ফলে দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল প্রকার শব্দার্থময় রচনা বুঝায়। আমরা বলিতে পারি বাঙ্গালায় কাব্য শব্দের হইয়াছে অর্থ-সঙ্কোচ এবং সাহিত্য শব্দের অর্থ-প্রসার।

অবশ্য শব্দ দুইটির ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োজন ভিন্ন প্রকারের। সাহিত্য দ্বারা বুঝায় মিলিত শব্দার্থ, এখানে শব্দার্থের মিলিত সত্তার মহিমা। কাব্য দ্বারা বুঝায় কবি-কর্ম বা কবির বস্তু, এখানে কবির মহিমা। ফলিতার্থে শব্দ দুইটি এক হইয়াছে।

(২)

শব্দ ও অর্থের সাহিত্য

প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহ প্রথম কাব্যের সংজ্ঞা করেন,—

শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্। —কাব্যালঙ্কার, ১।১৬

—'শব্দ ও অর্থ সহিত অর্থাৎ মিলিত হইলে কাব্য হয়।'

কাব্যশাস্ত্রে শব্দার্থের যুক্ত সম্বন্ধ এবং তাহা বুঝাইবার জন্য বিশেষণ রূপে 'সহিত' শব্দের প্রয়োগ এই প্রথম লক্ষ্য করা গেল। কেহ কেহ মনে করেন এখানে ব্যাকরণ-গত বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ মাত্র অভিপ্রেত হইয়াছে; রচনার ব্যাকরণ-গত বিশুদ্ধি ও যথার্থতা, এবং সম্বন্ধের ঔচিত্য বা উপযুক্ততা ভিন্ন ভামহ 'সহিত শব্দ' দ্বারা অন্য কিছু বিশিষ্টভাবে লক্ষ্য করেন নাই। ভামহ এবং দণ্ডী অলঙ্কারশাস্ত্রে রচনার গুণই বিশেষ ভাবে বিচার করিয়াছেন; অর্থের পরিস্ফুট বিচার আরম্ভ হইয়াছে পরে উদ্ভটের সময় হইতে।

পরবর্তী কালে 'সাহিত্য' শব্দ উহ্য রাখিয়া অনুরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন রুদ্রট[১], মম্মট[২], বিদ্যাধর[৩] প্রভৃতি আলঙ্কারিক এবং কালিদাস[৪], মাঘ[৫] প্রভৃতি কবিগণ।

---

(১) রুদ্রট—"ননু শব্দার্থৌ কাব্যম্।" —কাব্যালঙ্কার, ২।১

(২) মম্মট—"তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ কাপি।" —কাব্যপ্রকাশ, ১।৪

(৩) বিদ্যাধর—"শব্দার্থৌ বপুরস্য", —একাবলী, ১।১৩

(৪) কালিদাস—"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে।" —রঘুবংশ, ১।১

(৫) "শব্দার্থৌ সৎকবিরিব দ্বয়ং বিদ্বান্ অপেক্ষতে॥"

কাব্য অর্থে স্পষ্ট করিয়া 'সাহিত্য' শব্দ প্রয়োগ করেন রাজশেখর তাঁহার কাব্য-মীমাংসাগ্রন্থে দশম শতাব্দীতে। তিনি এক কাব্যপুরুষ এবং সাহিত্যবিদ্যাবধূ কল্পনা করিলেন, কাব্যপুরুষ সাহিত্যবিদ্যাবধূর ধর্মপতি।[১] এই সাহিত্যবিদ্যা বোধ হয়, কাব্য ও কাব্যশাস্ত্র, অর্থাৎ Poetry ও Poetics দুইই বুঝাইত। যাহা হউক, রাজশেখর সাহিত্যবিদ্যার ব্যাখ্যা করিলেন,—

শব্দার্থয়ো র্যথাবৎ সহভাবেন বিদ্যা সাহিত্যবিদ্যা।

—কাব্যমীমাংসা, ২য় অধ্যায়

—'শব্দ ও অর্থের যথাযথ সহভাবে যে বিদ্যা, তাহাই সাহিত্য-বিদ্যা।'

সহভাব অর্থই সাহিত্য। এখানে ভামহের 'সহিত' শব্দ গুণবাচক বিশেষ্য হইয়া সাহিত্য হইয়াছে এবং বুঝাইতেছে দ্রব্যকে। সাহিত্য হইতেছে 'সহিতয়োঃ ভাবঃ'—দুই সহিতের ভাব, তাহাই সহভাব। রাজশেখর শব্দার্থের ব্যাকরণ-গত বাচ্য-বাচক সম্বন্ধের অতিরিক্ত কোন বিশিষ্ট সুকুমার ও সূক্ষ্ম সম্বন্ধ ধারণা করিয়াছেন কি না বলা যায় না। বস্তুতঃ পরবর্তী ভোজদেবের কালেও একাদশ শতাব্দীতে অন্ততঃ দক্ষিণদেশে ব্যাকরণ-গত এই অর্থ প্রবল ছিল, কিন্তু অলঙ্কার-গত বিশিষ্ট অর্থও যুক্ত হইতেছিল। ভোজদেব 'সাহিত্য' শব্দই প্রয়োগ করিয়া শৃঙ্গার-প্রকাশ গ্রন্থে তাহার ব্যাখ্যান করিতেছেন,—

"সাহিত্য কি? শব্দার্থের যে সম্বন্ধ, তাহাই সাহিত্য। উহা দ্বাদশ প্রকার,—অভিধা, বিবক্ষা, তাৎপর্য, প্রবিভাগ, ব্যপেক্ষা, সামর্থ্য, অন্বয়, একার্থীভাব, দোষহান, গুণোপাদান, অলঙ্কারযোগ এবং রসাবিয়োগ।"[২]

ভোজরাজ সাহিত্যকে শব্দার্থের দ্বাদশপ্রকার সম্বন্ধের মধ্যে নিঃশেষে উপলব্ধি করিয়াছেন। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে উহার প্রথম আট প্রকার সম্বন্ধ ব্যাকরণ-গত শব্দার্থের সম্বন্ধ। পরবর্তী চারিপ্রকার সম্বন্ধ অলঙ্কারশাস্ত্র-গত শব্দার্থের সম্বন্ধ; উহারা যথাক্রমে কাব্যে দোষ-পরিত্যাগ, গুণ-গ্রহণ, অলঙ্কার-প্রয়োগ এবং রসের অবিয়োগ বা নিত্য অবস্থিতি। ভোজরাজ শব্দার্থের সাহিত্য দ্বারা সমগ্র ব্যাকরণ-শাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্রই বুঝাইয়াছেন। তাঁহার শৃঙ্গার-প্রকাশ ও সরস্বতীকণ্ঠাভরণ গ্রন্থ দুইখানিও এই ধারণা-অনুসারে রচিত। ডাঃ ভি. রাঘবন্ বলেন, ভোজরাজ তাঁহার

(১) কাব্যমীমাংসা, ৩য় অধ্যায়। —শিশুপালবধ, ২।৮৬

(২) ডাঃ ভি রাঘবন্-এর ইংরেজী গ্রন্থ শৃঙ্গার-প্রকাশ (পৃঃ ৯৩) হইতে গৃহীত এবং অনূদিত।

বিপুল গ্রন্থে স্ব-বিরোধী উক্তি করিয়া কেবল ব্যাকরণ-গত আটটি সম্বন্ধকেও এক স্থলে সাহিত্য বলিয়াছেন।

আমাদের বক্তব্য কেবল এই,—ভোজরাজের সময়ে মালব দেশে শব্দার্থের সাহিত্য বলিতে ব্যাকরণ-গত অর্থ বুঝাইয়া অলঙ্কারশাস্ত্র-গত বিশিষ্ট সম্বন্ধ বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।[১]

পণ্ডিতগণ মনে করেন ভোজদেব ও রাজানক কুন্তক একই শতাব্দীতে—একাদশ শতাব্দীতে অলঙ্কার-গ্রন্থ রচনা করেন। ভোজদেব ছিলেন দক্ষিণ ভারতবর্ষের মালবদেশবাসী; কুন্তক উত্তর ভারতবর্ষের কাশ্মীরদেশবাসী। এই কাশ্মীরই অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রধান আচার্য আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত এবং মম্মটভট্টের জন্মভূমি। আনন্দবর্ধন ও মম্মটভট্ট যথাক্রমে কুন্তকের দুই শতাব্দী আগে এবং এক শতাব্দী পরে, কিন্তু অভিনবগুপ্ত, বোধ হয়, একই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কুন্তক সাহিত্য-পদের যে সংজ্ঞা নির্দেশ ও ব্যাখ্যান করেন, তাহা আজ পর্যন্তও অতুলনীয়। কুন্তকের ভাষায়ই আমরা বিষয়টি সংক্ষেপে উপস্থিত করিব। সাহিত্য-পদের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে কুন্তকের আত্মপ্রসাদ ও প্রচ্ছন্ন গৌরববোধ দেখিয়া মনে হয় পদটির অলঙ্কারশাস্ত্র-গত বিশিষ্ট সম্বন্ধ-রূপ অভিনব দৃষ্টি-ভঙ্গী আনিয়াছেন তিনিই। একটু শ্লাঘার সহিতই কুন্তক বলিতেছেন,—

ন পুনরেতস্য কবিকর্মকৌশলকাষ্ঠাধিরূঢ়ি-রমণীয়স্য অদ্যাপি কশ্চিদপি বিপশ্চিদ্ অয়ম্ অস্য পরমার্থ ইতি মনাক্ মাত্রম্ অপি বিচারপদবীম্ অবতীর্ণঃ। তদ্ অদ্য সরস্বতীহৃদয়ারবিন্দ-মকরন্দবিন্দুসন্দোহ-সুন্দরাণাং সৎকবি-বচসাম্ অন্তরামোদ-মনোহরত্বেন পরিস্ফুরদ্ এতৎ সহৃদয়-ষট্‌চরণ-গোচরতাং নীয়তে।

—বক্রোক্তি-জীবিত, ১।১৬, বৃত্তি, পৃঃ ২৬-২৭

—'কবিকর্মকৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি-হেতু রমণীয় এই যে সাহিত্য, তাহার

(১) এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, পণ্ডিত সমুদ্রবন্ধ অলঙ্কার-সর্বস্ব গ্রন্থে (ত্রিবেন্দ্রাম সংস্করণ, পৃঃ ৪) কাব্যকে বিশিষ্ট শব্দার্থ-যুগল বলিয়া তাহার বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন পঞ্চ প্রকারে, যথা,—(১) উদ্ভট প্রভৃতির স্বীকৃত অলঙ্কার-বৈশিষ্ট্য, (২) বামনের স্বীকৃত গুণ-বৈশিষ্ট্য, (৩) কুন্তকের স্বীকৃত ভণিতি-বৈচিত্র্য-রূপ-বৈশিষ্ট্য, (৪) ভট্টনায়কের স্বীকৃত ভোগকৃত্ব-রূপ বৈশিষ্ট্য, এবং (৫) আনন্দবর্ধনের স্বীকৃত ব্যঙ্গ্য-রূপ বৈশিষ্ট্য। এখানে ভোজের সাহিত্য-সংজ্ঞাকে আরও পরিপাটী করিয়া কাব্যসংজ্ঞা রূপে উপস্থিত করা হইয়াছে।

পরমার্থ কি, তাহা আজ পর্যন্ত কোন পণ্ডিত অল্পমাত্রও বিচার করিয়া দেখান নাই। সরস্বতীর হৃদয়ারবিন্দের মকরন্দবিন্দুসমূহের সৌন্দর্য লইয়া শোভা পায় সৎকবিগণের বাক্যরাশি। তাহাদের অন্তঃস্থিত পরিমলের মনোহারিত্ব লইয়া স্ফুরিত হয় সাহিত্য। আজ তাহা সহৃদয় ভৃঙ্গগণের গোচর করা হইতেছে।'

কুন্তক যে প্রশংসা ভবিষ্যৎ কালের নিকট চাহিয়াছিলেন, তাহা দিবার জন্যই আমরা অনুবাদ-সহ বাক্যটি তুলিয়া দিলাম।

এ গৌরব কুন্তকের প্রাপ্য। ভোজদেবের ক্ষমতা বিভিন্ন গ্রন্থের সংগ্রহ-ব্যবস্থায় ও সমন্বয়-করণে, কুন্তকের বৈশিষ্ট্য মৌলিক চিন্তন ও গভীরার্থ দর্শনে। কুন্তকের ছিল অমল প্রতিভার তত্ত্বদর্শী প্রভা। ভোজ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, কুন্তক নব সৃষ্টি করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ধ্বন্যালোক গ্রন্থখানির প্রভাবে কুন্তকের বক্রোক্তি-জীবিত গ্রন্থ পণ্ডিত-সমাজে উপযুক্ত আদর পায় নাই; এবং বর্তমান কালেও উহার উল্লেখযোগ্য কোন বিশ্লেষণ হয় নাই।

কুন্তক ও ভোজ উভয়েই ভামহের 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্।'—এই সূত্র ভিত্তি করিয়া বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। উহাকে যদি বীজ-স্বরূপ গণ্য করা যায়, তবে অঙ্কুর হইতেছে রাজশেখরের সূত্র,—"শব্দার্থয়ো র্যথাবৎ সহভাবেন বিদ্যা সাহিত্য-বিদ্যা।" কুন্তকের আলোচনা একেবারে পুষ্পফল-সমন্বিত বৃক্ষ। ভোজ একই সময়ে যে অস্থির আলোচনা করিয়াছেন, তাহার মূল্য কেহ দেন নাই। ভোজের আলোচনায় অবশ্য দোষ-ত্যাগ এবং গুণ, অলঙ্কার ও রস-গ্রহণ রূপ বিচিত্র কবিকর্মের সকল দিকই স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাও ভোজের সংগ্রহশক্তিরই পরিচায়ক, শব্দার্থের বিশিষ্ট ধর্মের ব্যাখ্যান ইহাতে কিছুই স্পষ্ট হয় নাই। ভোজের আলোচনায় সাহিত্য-পদের মধ্যে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-গত যাবতীয় সম্বন্ধ অন্তর্ভূত হওয়ায়, ঐ পদটি বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাপক ভাবে সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাও বুঝাইতেছে। এই দিক্ দিয়া বলিতে পারা যায় শব্দার্থসম্বন্ধ-জনিত সকল প্রকার রচনা—এমন কি বৈজ্ঞানিক রচনাও—বুঝাইতে সাহিত্য-সংজ্ঞা তিনিই প্রথম দিয়াছেন। অবশ্য সংস্কৃত-ভাষায় উহা স্বীকৃত হয় নাই, উহার প্রয়োগ চলিতেছে আধুনিক কালের বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে; ইহা ইংরেজীর *literature* শব্দের অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভোজের ব্যাখ্যায় সাহিত্যপদের এইরূপ অর্থ-ব্যাপ্তির বীজ ছিল।

এইবার আমরা কুন্তকের ব্যাখ্যান সংক্ষেপে উপস্থিত করিব।

কুন্তক প্রচ্ছন্ন ভাবে আত্মগৌরব ঘোষণা করিয়াই সাহিত্যের সংজ্ঞা করিলেন,—

সাহিত্যম্ অনয়োঃ শোভাশালিতাং প্রতি কাপ্যসৌ।
অন্যূনানতিরিক্তত্ব-মনোহারিণ্যবস্থিতিঃ॥

—বক্রোক্তিজীবিত, ১।১৭, পৃঃ ২৭

—'সাহিত্য হইতেছে উহাদের অর্থাৎ শব্দার্থ-যুগলের এক অলৌকিক বিন্যাস-ভঙ্গী, যাহা ন্যূনতা ও অতিরিক্ততা বর্জিত হইয়া মনোহারী হয় এবং শোভাশালিতা প্রাপ্ত হয়।'

এই সাহিত্য পদটি এখানে গুণবাচক বিশেষ্য ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা বস্তুতঃ শব্দার্থ-যুগলের মনোহারী বিন্যাসভঙ্গী। বক্রোক্তিজীবিত গ্রন্থের প্রারম্ভেই কুন্তক প্রতিজ্ঞা করিলেন,—

সাহিত্যার্থ-সুধাসিন্ধোঃ সারম্ উন্মীলয়াম্যহম্। —ঐ, পৃঃ ১

—'সাহিত্যার্থরূপ সুধাসিন্ধুর সার আমি প্রকটিত করিব।'

এখানে সাহিত্য শব্দ কাব্য বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কুন্তক প্রথম উন্মেষেই সাহিত্যের সংজ্ঞা দিবার পূর্বে কাব্যের সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং তত্ত্বতঃ একই কথা বলিয়াছেন,—

শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি।
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি॥ —ঐ, ১।৭, পৃঃ ৭

—'সহিত অর্থাৎ মিলিত শব্দার্থযুগল কাব্যজ্ঞ-গণের আহ্লাদ-জনক বক্রতাময় কবিব্যাপারপূর্ণ রচনাবন্ধে বিন্যস্ত হইলে কাব্য হইয়া থাকে।'

কাব্যজ্ঞ রসিকগণের 'অদ্ভুতামোদচমৎকার'[১] বিধানের জন্য কাব্য বা সাহিত্যের সৃষ্টি। সাহিত্য ও কাব্য শব্দের অর্থ পর্যবসানে এক হইলেও উহাদের ব্যুৎপত্তি-গত দ্যোতনা ভিন্ন প্রকার। পূর্বেই বলা হইয়াছে কাব্য হইতেছে কবি-সৃষ্ট বস্তু বা কবি-কর্ম, ইহাতে কবি অর্থাৎ রচনার ব্যক্তিত্বময় উপাদানই প্রধান। সাহিত্য হইতেছে শব্দ ও অর্থের সাহিত্য বা সুষমাময় মিলন, কুন্তক যাহাকে বলিয়াছেন শব্দার্থের 'পরস্পর সাম্য-সুভগ অবস্থান'[২];—ইহাতে শব্দার্থ অর্থাৎ রচনার নৈর্ব্যক্তিক উপাদানই প্রধান। প্রতিপাদ্য বস্তুটির দুই ভিন্ন দিক হইতে সংজ্ঞা নির্দেশের চেষ্টায়

---

(১) বক্রোক্তিজীবিত, পৃঃ ১
পদটির অর্থ,—অদ্ভুতরসপূর্ণ আনন্দময় চমৎকার। ইহাই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।

(২) ঐ, বৃত্তি, পৃঃ ২৭

দুইটি ভিন্ন শব্দের উৎপত্তি; দুইটি অর্থের মিলনে পূর্ণ ফলিতার্থটি পাওয়া যাইতেছে। সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহারে কাব্য ও সাহিত্য সমার্থক হইয়া গিয়াছে; কুন্তকের দুইটি সংজ্ঞা হইতেও তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

এইবার আমরা যথাক্রমে কারিকা দুইটির ব্যাখ্যা করিব। কুন্তক বৃত্তিতে বলিতেছেন,—

সহিতয়োর্ভাবঃ সাহিত্যম্।[১]

—'সাহিত্য হইতেছে সহিত দুইটির ভাব।'

সহিত অর্থ মিলিত, এখানে বিশিষ্ট প্রকারে মিলিত। অতএব 'সহিত দুইটি'র অর্থ,—বিশিষ্ট প্রকারে মিলিত শব্দার্থ-যুগল।

এই মিলন কি প্রকার? ন্যূনতা ও অতিরিক্ততা বা বাহুল্যশূন্য, অতএব মনোহারী মিলন। শব্দ ও অর্থ কেহ কাহারও অপেক্ষা ছোট বা নিকৃষ্ট হইবে না, আবার বড় বা উৎকৃষ্টও হইবে না। তাহারা হইবে 'পরস্পর-স্পর্ধিত্ব-রমণীয়',[২]—পরস্পরকে স্পর্ধা করিয়া সমানভাবে বড় হইয়া পরস্পরের সংযোগে রমণীয়। অতএব কেবল 'কবিকৌশল-কল্পিত-কমনীয়তা'[৩]-পূর্ণ শব্দ কাব্য হইবে না, আবার কেবল 'রচনাবৈচিত্র্য-চমৎকারকারী' অর্থও কাব্য হইবে না। কুন্তক বলেন,—

বাচকো বাচ্যং চ ইতি দ্বৌ সম্মিলিতৌ কাব্যম্।[৪]

—'বাচক ও বাচ্য দুই সম্মিলিত হইয়া কাব্য হয়।'

বাচক হইতেছে শব্দ, যাহা অর্থকে বলে বা বুঝায়, এবং বাচ্য হইতেছে অর্থ, যাহা বলা হয় বা বুঝান হয়। এই দুই-এর মধ্যেই পৃথক্ ভাবে,—

প্রতিতিলম্ ইব তৈলম্ তদ্বিদাহ্লাদকারিত্বং বর্ততে।[৫]

—'প্রতিতিলে তৈলের ন্যায় কাব্যজ্ঞগণের আহ্লাদ বা আনন্দের কারণ বর্তমান।'

পৃথক্ শব্দ বা ধ্বনি চিত্তে আনন্দ দেয়, পৃথক্ অর্থও আনন্দ দেয়। শব্দ ও অর্থ উভয়ের মধ্যেই পৃথক্ ভাবে অনুকূল চিত্ত-স্পন্দনের কারণ আনন্দের বীজ নিহিত থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে,—বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ তো সকল শব্দার্থেই আছে, অতএব সকল শব্দার্থই তো নির্বিচারে সাহিত্য হইতে পারে। উত্তরে কুন্তক বলিতেছেন,—

(১) বক্রোক্তিজীবিত, বৃত্তি, পৃঃ ২৭

(২) ঐ, বৃত্তি, পৃঃ ২৭

(৩), (৪), (৫)—ঐ বৃত্তি, পৃঃ ৭

বিশিষ্টম্ এব ইহ সাহিত্যম্ অভিপ্রেতম্। কীদৃশম্? বক্রতা-বিচিত্র-গুণালঙ্কার-সম্পদাং পরস্পর-স্পর্ধাধিরোহঃ। তেন

সম-সর্বগুণৌ সন্তৌ সুহৃদৌ ইব সঙ্গতৌ।
পরস্পরস্য শোভায়ৈ শব্দার্থৌ ভবতো যথা ॥১৮ [১]

—'বাচ্য-বাচক বা শব্দার্থের বিশিষ্ট সম্বন্ধই সাহিত্য বলিয়া অভিপ্রেত। কি প্রকার? বক্রতা দ্বারা বিচিত্র গুণালঙ্কার-রূপ সম্পদ্-সমূহের পরস্পর স্পর্ধা-সহকারে অধিরোহণই উক্ত সম্বন্ধের বিশিষ্টতা। অতএব,—

শব্দ ও অর্থ সর্বথা তুল্য-গুণ ও সজ্জন দুই মিলিত সুহৃদের ন্যায় পরস্পরের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।'

কেবল বাচ্য-বাচক সম্বন্ধের দ্বারা কাব্য-শরীর শব্দার্থের সাহিত্য হয় না, সেজন্য চাই সম্বন্ধের বিশিষ্টতা অর্থাৎ তাহার সৌকুমার্য ও সূক্ষ্মতা। ইহা সম্পন্ন হয় শব্দ-গত ও অর্থ-গত গুণ ও অলঙ্কারের উপযুক্ত সমানবৃদ্ধিতে, যাহা পরস্পরের শোভা বৃদ্ধি করিয়া সমগ্র শব্দার্থের শোভা বৃদ্ধি করে। কুন্তক এই বৈশিষ্ট্যকে এখানে বলিয়াছেন 'পরস্পর-স্পর্ধাধিরোহ', পরে বলিয়াছেন 'পরস্পর-স্পর্ধিত্ব'[২]। এই পরস্পর-স্পর্ধিত্ব প্রতিযোগিতা-মূলক হইলেও শত্রুভাবাপন্ন নয়, মিত্রভাবাপন্ন। কুন্তক বলিয়াছেন এই স্পর্ধিত্ব সর্বগুণে তুল্য মিলিত সুহৃদযুগলের ন্যায়। পণ্ডিত পরাশরভট্ট এই সম্বন্ধ বুঝাইয়াছেন সৌভ্রাত্র-সম্বন্ধ দ্বারা।[৩] সৌহার্দ এবং সৌভ্রাত্র প্রায় একই সম্বন্ধ। যেখানে সম্বন্ধ অন্য প্রকার অর্থাৎ একের স্ফীতি বা উৎকর্ষ এবং অপরের শুষ্কতা বা অপকর্ষ, সেখানে সৌষম্য নষ্ট হইয়াছে, সাহিত্য হয় নাই। কুন্তক পরেও দ্বিতীয় উন্মেষে প্রযত্ন-বিরচিত শব্দালঙ্কার প্রয়োগে ঔচিত্য-হানি এবং সাহিত্য-হানি হয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন,—

ব্যসনিতয়া প্রযত্ন-বিরচনে হি প্রস্তুতৌচিত্য-পরিহাণে বাচ্য-বাচকয়োঃ পরস্পর-স্পর্ধিত্ব-লক্ষণ-সাহিত্য-বিরহঃ পর্যবস্যতি।[৪]

—'অতিশয় আসক্তি-হেতু বর্ণগুলি প্রযত্নপূর্বক বিরচিত হইলে প্রস্তুত বিষয়ে ঔচিত্য-হানি হয়, এবং ফলে বাচ্য-বাচকের পরস্পর-স্পর্ধিত্বরূপ সাহিত্য-গুণ নষ্ট হয়।'

(১) বক্রোক্তিজীবিত, বৃত্তি, পৃঃ ১০-১১
(২) ঐ, বৃত্তি, পৃঃ ১২
(৩) 'পদানাং সৌভ্রাত্রাৎ'—শ্রীগুণরত্নকোষ, ৮ম শ্লোক
(৪) বক্রোক্তিজীবিত, ২।৪, বৃত্তি, পৃঃ ৮৪

কবিওয়ালা-গণের রচনায় অনুপ্রাস ও যমকের অতিঘটা যে যেখানে, সেই সকল স্থলই ইহার উদাহরণ।

আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি,—শব্দার্থের বাচ্য-বাচক-গত সাধারণ সম্বন্ধ-রূপ সাহিত্য হইতেছে সাহিত্য শব্দের ব্যাকরণগত 'আকৃতি' বা grammatical concept ; এবং বিশিষ্ট সম্বন্ধ হইতেছে কাব্য-গত 'আকৃতি' বা poetic concept।

শব্দ ও অর্থের পৃথক্ সংজ্ঞা নির্দেশ করিতেছেন কুন্তক,—

শব্দো বিবক্ষিতার্থৈকবাচকোঽন্যেষু সংস্বপি।
অর্থঃ সহৃদয়াহ্লাদকারি-স্বস্পন্দসুন্দরঃ॥ —বক্রোক্তিজীবিত, ১।৯

—'অন্য কয়েকটি বাচক থাকিলেও যাহা বিবক্ষিত অর্থাৎ অভিপ্রেত অর্থের একমাত্র বাচক হয়, তাহাই শব্দ।

সহৃদয়ের হৃদয়ে আহ্লাদ জন্মাইয়া স্ব-স্পন্দে অর্থাৎ স্ব-ভাবে যাহা সুন্দর হয়, তাহাই অর্থ।'

এই প্রসঙ্গে চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়া কুন্তক লিখিতেছেন,—

কবিবিবক্ষিত-বিশেষাভিধানক্ষমত্বম্ এব বাচকত্ব-লক্ষণম্,…প্রতিভায়াং তৎ-কালোল্লিখিতেন কেনচিৎ পরিস্পন্দেন পরিস্ফুরন্তঃ পদার্থাঃ প্রকৃত-প্রস্তাব-সমুচিতেন কেনচিদ্ উৎকর্ষেণ বা সমাচ্ছাদিত-স্বভাবাঃ বিবক্ষাবিধেয়ত্বেন অভিধেয়তা-পদবীম্ অবতরন্তঃ……[১]

'—কবির অভিপ্রেত অর্থের বিশেষভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতাই বাচকত্বের বা শব্দের লক্ষণ। …

পদার্থ-সমূহ কবিপ্রতিভায় তৎকালোচিত এক বিশেষ পরিস্পন্দদ্বারা পরিস্ফুরিত হয়। প্রকৃতবস্তুর উপযুক্ত এক বিশেষ উৎকর্ষদ্বারা তাহাদের স্ব-ভাব সমাচ্ছাদিত হয়। কবির অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারে বলিয়া উহা অর্থ বলিয়া কথিত হয়।'…

বাক্য দুইটি, বিশেষভাবে শেষেরটি গভীরার্থ-পূর্ণ। এক অর্থ বুঝাইবার জন্য অনেক শব্দ থাকিলেও যেটি বিশেষ ভাবে কেবলমাত্র কবির অভিপ্রেত অর্থাৎ কবির ভাবময় বিশেষ অভিপ্রেত অর্থকেই বুঝায়, সেইটিই আসল শব্দ। এই শব্দকেই ওয়াল্টার পেটার বলিয়াছেন,—

'The unique word'—অদ্বিতীয় শব্দ।

(১) বক্রোক্তিজীবিত, পৃঃ ১৭-১৮

তিনি বলিয়াছেন,—

"The one word for the one thing, the one thought, amid the multitude of words, terms, that might just do : ...—the unique word, phrase, sentence, paragraph, essay or song, absolutely proper to the single mental presentation or vision within."

—*Appreciations*, *Style*, p. 29

—'কাজ চালাইতে পারে এমন এক রাশি শব্দ ও পদের মধ্যে একটি বস্তু, একটি চিন্তার জন্য সেই একটি শব্দ···—অদ্বিতীয় শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য, অনুচ্ছেদ, প্রবন্ধ অথবা গান সকলই একটি মাত্র মানসিক ব্যাপার অথবা অন্তরের প্রতিভানের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত।'

কুন্তকই পূর্বে লিখিয়াছেন,—

অপরেষু তদ্বাচকেষু বহুষু অপি বিদ্যমানেষু, সামান্যাত্মনা বক্তুম্ অভিপ্রেতো যোঽর্থঃ তস্য বিশেষাভিধায়ী শব্দ।[১]

—'তদ্বাচক অন্য শব্দ অনেক থাকিলেও সাধারণভাবে বলার জন্য অভিপ্রেত যে অর্থ, তাহারই বিশেষাভিধায়ী অর্থাৎ বিশিষ্টতা-বাচক যাহা, তাহাই প্রকৃত শব্দ।'

এই শব্দের গীত-ধর্মিতার কথাও বলিয়াছেন কুন্তক,—

গীতবৎ হৃদয়াহ্লাদং তদ্বিদাং বিদধাতি যৎ।[২]

—'সাহিত্য কাব্যজ্ঞ-গণের হৃদয়ে সঙ্গীতের ন্যায় আনন্দ জন্মাইয়া থাকে।'

এখানে সাহিত্য বলিতে সাহিত্যের শব্দার্থ-যুগলের শব্দকেই প্রধানতঃ বুঝাইতেছে। আবার শব্দ বলিতে কেবল একটি শব্দ নয়, শব্দের সহিত শব্দের এবং বাক্যের সহিত বাক্যের সাহিত্য বা সংযোগ-হেতু কাব্যে যে অপূর্ব শব্দ-বন্ধ ও বাক্য-বন্ধ রচিত হয়, তাহাও বুঝাইতেছে। সাহিত্য শব্দের পরবর্তী ব্যাখ্যায় ইহা সুস্পষ্ট হইবে।

শব্দের গীতধর্মিতা-বিষয়ে কার্লাইল বলিয়াছেন,—

"...all speech, even the commonest speech, has something of song in it :... ..Poetry, therefore, we will call musical thought."

—*The Hero as Poet.*

'—সকল বাক্যে, এমন কি অতি সাধারণ বাক্যেও সঙ্গীতের কিছু অংশ আছে। ···অতএব সাহিত্যকে আমরা বলিব সঙ্গীতময় চিন্তা।'

(১) বক্রোক্তিজীবিত, বৃত্তি, পৃঃ ১৬
(২) ঐ, বৃত্তি, পৃঃ ২৯

সাহিত্য বা কাব্যের এই সঙ্গীতময় চিন্তার সঙ্গীত হইতেছে শব্দার্থযুগলের শব্দ বা ধ্বনি (sound), এবং চিন্তা হইতেছে অর্থ (sense)।

লী হাণ্ট বলেন,—

"Poetry includes whatsoever of painting can be made visible to mind's eye, and whatsoever of music can be conveyed by sound and proportion without singing or instrumentation."

—*What is Poetry ?*

—'সাহিত্যের মধ্যে রহিয়াছে চিত্রণের যাহা কিছু মানসচক্ষুর গোচর হইতে পারে, তাহা ; এবং গীত বা বাদ্য ভিন্ন সঙ্গীতের যাহা কিছু ধ্বনি ও সৌষম্য দ্বারা সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহা।'

এখানেও সাহিত্য বা কাব্যে চিত্র হইতেছে শব্দার্থযুগলের অর্থ-গত ধর্ম এবং সঙ্গীত হইতেছে শব্দ বা ধ্বনি-গত ধর্ম।

অর্থের ব্যাখ্যায় কুন্তক যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। অর্থ বা বস্তু তৎকালোচিত এক বিশেষ পরিস্পন্দ দ্বারা কবি-প্রতিভায় পরিস্ফুরিত হয়। মনে হয়, কুন্তক বলিতে চান,—প্রত্যেকটি বস্তুর যথাস্থিত যথাদৃষ্ট রূপ কখনও কাব্যের সামগ্রী হইয়া উঠে না। প্রতিভান-শালী কবি-চিত্তে বস্তু গৃহীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পরিস্পন্দ, আলোড়ন এবং পরিস্ফুরণ। পরিস্ফুরণ হইতেছে কবির অন্তর্লোকের বা ভাবলোকের। তাহারই ফলে কবিভাবের অধিবাসনে বস্তু ভাবময় রূপ লাভ করে। ইহা সর্বথা পরিদৃশ্যমান বহির্বস্তুর অনুরূপ নহে। এই জন্য কুন্তক বলিলেন, —বস্তু তখন এক বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে এবং তাহার স্বভাব যেন সমাচ্ছাদিত হয়। বস্তুর যথাস্থিত বহির্ভাব ক্ষুণ্ণ হওয়াই তাহার স্বভাব সমাচ্ছাদিত হওয়া। ইহাই বস্তুর বিভাবতা-প্রাপ্তি, যাহা পূর্বাধ্যায়ে নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে। সাহিত্যে বা কাব্যে অর্থ ও বিভাব একই, অর্থ বাহ্যজগতের বস্তু নহে। এই জন্যই অর্থ সহৃদয়ের হৃদয়ে আহ্লাদ জন্মায় এবং স্বস্পন্দে বা স্বভাবে সুন্দর হয়। এখানে স্বস্পন্দ অর্থ বস্তুর কবি-চিত্ত-গত ভাবময় বা বোধময় যে রূপ, তাহার স্পন্দ, ইহারই ফলে রসানুকূল বিচিত্র চর্বণা হয়।

কুন্তক একই শ্লোকে পর পর শব্দ ও অর্থের সংজ্ঞা দেওয়ায় উভয়ের সাহিত্য বা বিশিষ্ট সম্বন্ধও বুঝিতে হইবে। অর্থ যখন স্বস্পন্দ-সুন্দর হয় তখনই কবির অন্তর্লোকে এবং পরে বহির্লোকে অনুরূপ প্রতিস্পর্ধী শব্দের সঞ্চার হইতে থাকে। অর্থ যেমন

ভাবময়, শব্দও তেমন ভাবময় হইয়া সুহৃদ্‌যুগলের ন্যায় অপূর্ব সাহিত্য রচনা করে ; তাহারই ফলে আসে 'অদ্ভুতামোদচমৎকার'।

এবারক্রম্বি যাহাকে কাব্যের প্রাণ-ভূত প্রথম প্রয়োজন বলিয়া নাম দিয়াছেন 'Incantation' বা মন্ত্রশক্তি, তাহা কুন্তকের আদর্শ-ভূত শব্দার্থ-সাহিত্য। তাহার ব্যাখ্যায় এবারক্রম্বি বলেন,—

"I will call it, compendiously, 'incantation' : the power of using words so as to produce in us a sort of enchantment ; and by that I mean a power not merely to charm and delight, but to kindle our minds into unusual vitality, exquisitely aware both of things and of the connexions of things."

—*The Idea of Great Poetry*, p. 18.

—'ইহাকে আমি সংক্ষেপে বলিব মন্ত্রশক্তি, আমাদের অন্তরে এক প্রকার সম্মোহন উৎপাদনের জন্য শব্দ-প্রয়োগের শক্তি ; এবং ইহা দ্বারা আমি বুঝিতেছি কেবল মুগ্ধ এবং হৃষ্ট করিবার শক্তি নয়, আমাদের চিত্তকে অসাধারণ প্রাণ-প্রাচুর্য দ্বারা উদ্দীপ্ত করার শক্তি। ইহা বিশেষ ভাবে বস্তু বা অর্থনিচয়, এবং তাহাদের সম্বন্ধ বিষয়ে সজাগ থাকে।'

এখানে এবারক্রম্বি শব্দের মধ্যে যে মন্ত্রশক্তি চাহিয়াছেন, তাহা মুগ্ধও করে, উদ্দীপ্তও করে।

শব্দ ও অর্থের এইরূপ প্রয়োগ না হইলে কি হয়, সে বিষয়ে কুন্তকই বলিতেছেন,—

অর্থঃ সমর্থবাচকাসদ্ভাবে স্বাত্মনা স্ফুরন্ অপি মৃতকল্প এব অবতিষ্ঠতে। শব্দোঽপি বাক্যোপযোগিবাচ্যাসম্ভবে বাচ্যান্তর-বাচকঃ সন্ বাক্যস্য ব্যাধিভূতঃ প্রতিভাতি।[১]

—'সমর্থবাচক অর্থাৎ শক্তিশালী শব্দের অসদ্ভাব হইলে অর্থ আপনার মধ্যে স্ফুরিত হইয়াও মৃতকল্প হইয়া অবস্থান করে। শব্দও বাক্যোপযোগী অর্থ না পাইলে অন্য বাচ্য বা অর্থ বুঝাইয়া বাক্যের ব্যাধি-ভূত বলিয়া প্রতিভাত হয়।'

অর্থের মৃতকল্পত্ব ঘুচাইয়া প্রাণ দিতে পারে সমুচিত শব্দ, আবার শব্দের ব্যাধি বিতাড়ন করিয়া বাক্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে সমুচিত অর্থ। শব্দের ও অর্থের সমুচিত সাহিত্যই তাই অলঙ্কারশাস্ত্র-গত প্রকৃত সাহিত্য।

এই শব্দার্থ-গত সাহিত্যের অর্থের প্রসার ঘটাইয়া, কুন্তক পরে যাহা বলিলেন,

(১) বক্রোক্তি-জীবিত, বৃত্তি, পৃঃ ১৪

তাহাকে আমরা বাক্য-গত সাহিত্য বলিয়া বুঝাইতে পারি। কাব্য-সংজ্ঞার 'সহিতৌ' শব্দের ব্যাখ্যানে কুন্তক বলিলেন,—

সহিতৌ ইত্যত্রাপি...শব্দস্য শব্দান্তরেণ বাচ্যস্য বাচ্যান্তরেণ চ সাহিত্যং পরস্পর-স্পর্ধিত্বলক্ষণমেব বিবক্ষিতম্। অন্যথা তদ্বিদাহ্লাদকারিত্বহানিঃ প্রসজ্যেত।[১]

—" 'সহিতৌ'—এখানেও এক শব্দের সহিত অন্য শব্দের এবং এক অর্থের সহিত অন্য অর্থের সাহিত্য, অর্থাৎ পরস্পরস্পর্ধিতলক্ষণই বুঝান হইয়াছে। অন্যথায় কাব্যজ্ঞগণের আহ্লাদকারিত্বের হানি হইবার সম্ভাবনা।'

কুন্তক পরেও পুনরায় সাহিত্য-সংজ্ঞায় সাহিত্য শব্দের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে বলিলেন,—

তত্র বাচকস্য বাচকান্তরেণ বাচ্যস্য বাচ্যান্তরেণ সাহিত্যম্ অভিপ্রেতম্,[২]

—'এই বিষয়ে বাচক শব্দের অন্য শব্দের সহিত, বাচ্য অর্থের অন্য অর্থের সহিত সাহিত্য বুঝান হইতেছে।'

শব্দরাশি হইতে নির্বাচন করিয়া সম্যক্‌রূপে উপযুক্ত, সৌষ্ঠবময় ও শক্তিশালী শব্দ এক এক করিয়া চয়ন করিতে হইবে। তাহার পর ধ্বনি-সামঞ্জস্য ও অর্থ-সামঞ্জস্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে বয়ন করিতে হইবে। তবেই এক অখণ্ড বাক্য অখণ্ড বসনের ন্যায় পূর্ণতায় মূর্ত হইয়া উঠিবে, ইহাই প্রকৃত বাক্য-গত সাহিত্য, শব্দের সহিত শব্দের এবং একই প্রচেষ্টায় অর্থের সহিত অর্থের মিলনে তাহা সম্পন্ন হয়। কুন্তকের পূর্ব কথা হইতে ধরিয়া লইতে পারি এই মিলন কতিপয় সুহৃদের মিলন।

কুন্তকের এই আলোচনার শেষ মন্তব্য হইতে আমরা সমগ্র প্রবন্ধ-গত সাহিত্যও বুঝাইতে পারি।

কুন্তক সাহিত্য-সংজ্ঞার ব্যাখ্যানের শেষ ভাগে তিনটি শ্লোকে বলিলেন,—

যেখানে বৈদর্ভী প্রভৃতি মার্গ, মাধুর্যাদি গুণ, অলঙ্কারবিন্যাস, বক্রতা-বিন্যাস, বিচিত্র বৃত্তি ও ঔচিত্য এবং বিবিধ রস, শব্দ ও অর্থ এই উভয়কে আশ্রয় করিয়া পরস্পর স্পর্ধা করিয়া বিদ্যমান, সেখানেই প্রকৃত সাহিত্য রহিয়াছে বলিয়া কথিত হয়।[৩]

---

(১) বক্রোক্তিজীবিত, বৃত্তি, পৃঃ ১২

(২) ঐ, বৃত্তি, পৃঃ ২৭

(৩) ঐ, শ্লোক সংখ্যা—৩৪, ৩৫, ৩৬ ; পৃঃ ২৮

ইহাই সমগ্র প্রবন্ধ বা রচনা-গত সাহিত্য। এখানে সাহিত্য শব্দের প্রয়োগ আরও প্রসার লাভ করিয়াছে। এখানে কেবলমাত্র শব্দের সহিত অর্থের মিলন নয়, অথবা শব্দের সহিত শব্দের এবং অর্থের সহিত অর্থের মিলনও নয়, শব্দার্থ-গত এবং বাক্য-গত সাহিত্য অতিক্রম করিয়া এই সাহিত্য। রচনার রীতি, গুণ, অলঙ্কার, বক্রতা, বৃত্তি ও ঔচিত্য এবং রস সকলই যেখানে মিলিত শব্দার্থের আশ্রয়ে এরূপভাবে স্ফূর্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেকটি যেন প্রত্যেকটির সহিত স্পর্ধা করিয়া চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া অপূর্ব সৌষম্য ও সামঞ্জস্যের মধ্যে প্রত্যেকের ও সকলের এবং সমগ্রের শোভা অতিসম্পন্ন করিয়াছে, সেখানেই প্রবন্ধ বা রচনার আদর্শভূত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। এই প্রবন্ধ-গত সাহিত্য যেন সুহৃৎ-সঙ্ঘ, আনন্দের ঘন মূর্তি!

শ্রেষ্ঠ কবিগণের রচনায় এই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উদাহরণ রহিয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত 'অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়ম্ অলূনং কররুহৈঃ'—শ্লোকটি[১] একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ; ইহার বিশদ বিশ্লেষণও ঐ স্থলে দৃষ্ট হইবে। কিংবা মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গের দৃশ্য[২] আর একটি উদাহরণ। সমগ্র শকুন্তলা নাটক, বা মেঘনাদবধ কাব্য, কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে', বা 'চঞ্চলা' প্রভৃতি কবিতা সমগ্র প্রবন্ধ-গত সাহিত্যের উত্তম উদাহরণ। পণ্ডিত ওয়াল্টার পেটার 'Style' বুঝাইতে গিয়া রচনা-গত এই সাহিত্যেরই সর্বাধিক মূল্য দিয়াছেন। তিনি ক্রিয়ার পশ্চাতে কর্তা, অর্থাৎ কাব্যের পশ্চাতে কবিকেও লক্ষ্য করিয়াছেন; যথা,—

"All the laws of good writing aim at a similar unity or identity of the mind in all the processes by which the word is associated to its import .. ..To give the phrase, the sentence, the structural member, the entire composition, song, or essay, a similar unity with its subject and with itself :—style is in the right way when it tends towards that. All depends upon the original unity, the vital wholeness and identity, of the initiatory apprehension of view.' —*Appreciations, Style*, p. 22

—'শব্দ অর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবার সকল প্রক্রিয়াতেই ভাল লেখার নিয়মাবলী

(১) কাব্যালোক, পৃঃ ৪৮
(২) ঐ, পৃঃ ৪৯

মনের তদ্রূপ ঐক্য ও সারূপ্যের প্রতি লক্ষ্য করে। শব্দ সমষ্টি, বাক্য, বাক্যাঙ্গ, সমগ্র রচনা, সঙ্গীত, অথবা প্রবন্ধকে ইহার বিষয়বস্তু এবং ইহার নিজের সহিত তদ্রূপ ঐক্যবদ্ধ করিতে হইলে যদি তদভিমুখী গতি থাকে, তবে স্টাইল অর্থাৎ সাহিত্যই প্রকৃত পথ। প্রারম্ভিক উপলব্ধিময় দৃষ্টির মৌলিক ঐক্য, প্রাণগত সমগ্রতা ও সারূপ্যের উপরই সকল নির্ভর করে।'

এখানে 'unity'-র প্রকৃত অনুবাদ গুণবাচক বিশেষ্যপদ 'সাহিত্য'; আবার স্টাইলেরও খাঁটি বাঙ্গালা 'সাহিত্য'। কবি-আত্মার সহিত বস্তু ও শব্দার্থের মিলনেই তো জন্ম লয় আসল সাহিত্য। তাই কবিই তো সাহিত্য বা স্টাইল। পেটার এই সকল কথাই পরে সুপ্রচলিত একটি মাত্র ক্ষুদ্র বাক্যে প্রতিফলিত দেখিয়াছেন,—

"The style is the man."[১]

—'স্টাইল অথবা সাহিত্যই আসল মানুষটি।'

বীজ যে অর্থে বৃক্ষ, সেই অর্থেই স্টাইল বা সাহিত্য হইতেছে লেখকের আসল সত্তা। ব্র্যাড্‌লেও কাব্য-বিচারে শ্রদ্ধার সহিত পেটারের নাম উল্লেখ করিয়া পেটারের প্রদত্ত স্টাইলের এই মূল লক্ষণ অভিব্যক্ত করিয়াছেন।[২]

কুন্তক সাহিত্য-বিষয়ক এই অপূর্ব সন্দর্ভ যে উক্তি দিয়া সমাপ্ত করিয়াছেন, তাহা যেন আরও চমৎকার,—

অপর্যালোচিতেঽপ্যর্থে বন্ধসৌন্দর্যসম্পদা।
গীতবৎ হৃদয়াহ্লাদং তদ্বিদাং বিদধাতি যৎ ॥১৭
বাচ্যাববোধনিষ্পত্তৌ পদবাক্যার্থবর্জিতম্।
যৎ কিমপ্যর্পয়ত্যন্তঃ পানকাস্বাদবৎ সতাম্ ॥১৮
শরীরং জীবিতেনেব স্ফুরিতেনেব জীবিতম্।
বিনা নির্জীবতাং যেন বাক্যং যাতি বিপশ্চিতাম্ ॥১৯[৩]

—অর্থ যদি পর্যালোচনা করিতে নাও পারা যায়, তথাপি সৌন্দর্য-সম্পদের বিন্যাস কাব্যজ্ঞগণের হৃদয়ে সঙ্গীতের ন্যায় আহ্লাদ জন্মায়। আর অর্থের উপলব্ধি হইলে পদ ও বাক্যের অর্থ অতিক্রম করিয়া সুধীগণের অন্তরে উহা পানকরসের আস্বাদের ন্যায় অনির্বচনীয় কিছুর আস্বাদ দান করে। জীবিত বা প্রাণ-শক্তি ভিন্ন শরীরের,

(১) *Ibid*, পৃঃ ৩৫

(২) Poetry For Poetry's Sake, পৃঃ ১৯

(৩) বক্রোক্তি-জীবিত, বৃত্তি, পৃঃ ২৯

অথবা স্ফুরিত বা স্পন্দন ভিন্ন প্রাণ-শক্তির যেরূপ অবস্থা হয়, সাহিত্যের স্ফুরণ না হইলে সুধীগণের বাক্যও সেইরূপ নির্জীবতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অর্থোপলব্ধি না হইলেও কাব্য-শ্লোকের ধ্বনিপরম্পরা যে চিত্তে রসাপ্লুত বা রম্যবোধে দীপ্ত অলৌকিক আনন্দের সঞ্চার করে, এবং অনেক সময়েই দ্যোতিত অর্থের ফলশ্রুতি জন্মায়, তাহা পূর্বেও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাই কাব্যের সঙ্গীতধর্ম। কুমারসম্ভব কাব্যের শ্লোকার্থ বুঝিতে না পারিলেও তাহাদের ধ্বনি-মাহাত্ম্য কিশোর-চিত্তকে কিরূপ আবিষ্ট করিত, তাহা রবীন্দ্রনাথ জীবন-স্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন।[১] শেষ বয়সের—

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি,
তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি।"

—এই গানে কাব্যে বা জীবনে সঙ্গীত-ধর্মের চূড়ান্ত মহিমা প্রকাশ করা হইয়াছে।

কুন্তকের প্রজ্ঞা-পূর্ণ রস-বিদগ্ধ মন্তব্য হইতেছে এই যে, সাহিত্যে পানকরসের আস্বাদের ন্যায় শব্দার্থ বা পদবাক্যের অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি আশ্চর্য নূতন আস্বাদ লাভ করা যায়। পানকরসের উপমাটি রসের স্বরূপ-প্রকাশের জন্য সম্পূর্ণ সমর্থন না করিলেও[২] এখানে আমরা সমর্থন করি। অথচ সে আলোচনার কাব্যই এখানে সাহিত্য হইয়াছে। সেখানে বিচারে আমাদের প্রধান দৃষ্টি ছিল ঊর্ধ্বতম সংবিদানন্দরূপ রসের দিকে, বিভাব ও ভাব অতিক্রম করিয়া যাহাকে পাইবার চেষ্টা করিতে হয়; এখানে কিন্তু আমাদের প্রধান দৃষ্টি পদ-বাক্য, গুণালঙ্কার প্রভৃতির সাহিত্যের দিকে, তাহারই মহিমা বুঝাইবার জন্য সকলের মিশ্রণে উদ্ভূত নূতন আস্বাদনের কথা বলা হইয়াছে।

পানকরসের উপমার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, এলা, শর্করা, মরীচ প্রভৃতি যোগে যে স্নিগ্ধ সুস্বাদু পানীয় প্রস্তুত হয়, তাহাতে উপাদানীভূত ওই সকল সামগ্রীর আস্বাদ ছাড়াও স্বতন্ত্র এক বিশিষ্ট মধুর আস্বাদ লাভ করা যায়। কাব্যেও সেইরূপ শব্দার্থ গুণালঙ্কার প্রভৃতির বিশিষ্ট আস্বাদের সঙ্গে তাহাদের হইতে বিলক্ষণ একটি অপূর্ব নূতন আস্বাদ পাওয়া যায়। উহাই হইতেছে শব্দার্থ ও গুণালঙ্কার প্রভৃতির সাহিত্যের রস। 'সাহিত্য' অর্থ পরিপাটী সংযোগ এবং সৌষ্ঠবময় মিশ্রণ ও একীভাব; তাহা হইতে জাত নূতন আনন্দই সাহিত্যের বিশিষ্ট আনন্দ। বলা বাহুল্য, ইহাই

---

(১) জীবন-স্মৃতি, পৃঃ ৫৯

(২) দ্রষ্টব্য—কাব্যালোক, পৃঃ ৮৫

প্রথমাধ্যায়ে ব্যাখ্যাত রস বা রম্যবোধ। ইহাই সাহিত্যের আত্মা; ইহারই আবির্ভাবে কাব্য উজ্জীবিত হয়, আনন্দাপ্লুত হয়; ইহারই অভাবে কাব্য নিষ্প্রাণ হইয়া অকাব্য হইয়া যায়।

কুন্তকের এই আলোচনা সেই যুগের সংস্কৃত-সাহিত্যে অভিনব, বর্তমানযুগেও উহা অতুলনীয়, প্রায় সম্পূর্ণ। আমরা মাত্র দুইটি ত্রুটির কথা বলিতে পারি, ইহা না বলিলেও তেমন ক্ষতি হয় না। প্রথম, শব্দের সঙ্গীত-ধর্মের কথা যেমন উল্লেখ করা হইয়াছে, তেমনই অর্থের চিত্রধর্মের কথা উল্লিখিত হইলে বর্ণনা সম্পূর্ণ হইত। দ্বিতীয়, শব্দার্থের মিলন বুঝাইতে সুহৃদ্-যুগলের উপমা সর্বথা সঙ্গত হয় নাই। তদপেক্ষা মহাকবি কালিদাসের 'পার্বতী-পরমেশ্বর' বা অর্ধনারীশ্বরের উপমা বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ সকল দিক হইতেই মনোহর।

শব্দ ও অর্থের যেখানে তুল্যফল, সেখানেও উভয়ের জাতিভেদ আছে; দুই সুহৃদের উপমায় এই ভেদ পাওয়া যায় না, তাহারা সর্বথা এক প্রকার, কেহই কাহারও পরিপূরক নহে। শব্দের সহিত শব্দের, অর্থের সহিত অর্থের, অথবা বাক্যের সহিত বাক্যের সাহিত্য বুঝাইতে সুহৃদ্-যুগলের উপমা সুসঙ্গত। কিন্তু মুখ্য সাহিত্য শব্দার্থের; উভয়ের সত্তা ও সম্বন্ধ নিত্য না হইলেও যতক্ষণ শব্দ আছে ততক্ষণ তাহার একটি বিশিষ্ট অর্থও আছে। বাল্যকাল হইতে শব্দ-সঙ্কেত ও সঙ্কেতিত অর্থ পুনঃ পুনঃ শুনিতে শুনিতে ও ব্যবহার করিতে করিতে দুইই বস্তুতঃ এক হইয়া যায়। তখন শব্দ শুনিলেই তাহার নির্দিষ্ট অর্থ ভাসিয়া উঠে, আবার অর্থের কোন ভাবে দ্যোতনা হইলেই শব্দটি চিত্তে পরিস্ফুরিত হয়। অতএব আমাদের প্রয়োজনে এই বিচার হইতে উভয়ের সম্বন্ধ আপেক্ষিক নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; এবং এই জন্যই সুহৃদ্‌যুগলের উপমা অপেক্ষা অর্ধনারীশ্বরের উপমা, এমন কি ধর্মপতি ও ধর্মপত্নীর উপমাও সমধিক সার্থক। সেখানে উভয়ে ভিন্ন জাতি এবং দৃশ্যতঃও ভিন্ন, কার্যতঃও কেহই স্বয়ং স্বতন্ত্র ও পূর্ণ নহেন; উভয়ের মিলনে উভয়ে উভয়ের পরিপূরক হইয়া পরম ঐক্য ও পরম পূর্ণতা লাভ করে। পার্বতী-পরমেশ্বর অর্থ প্রকৃতি-পুরুষ ধরিলেও একই রূপে ব্যাখ্যা করা চলিবে। কাব্যেও শব্দার্থকে কখনও পৃথক্ করিয়া উপলব্ধি করা যায় না; কারণ, শব্দসত্তা অর্থময় এবং অর্থসত্তা শব্দময়। কবিচিত্তে অর্থের স্ফুরণ শব্দের আশ্রয়েই ঘটিয়া থাকে। কাব্যের রূপ ও রস, অথবা শব্দ ও অর্থ কেহ পৃথক্ করিয়া বিশ্লেষণ বা পৃথক্ আস্বাদন করিতে পারে না। চিত্রাঙ্কনে রেখা ছাড়া কি চিত্রের কোনও অস্তিত্ব আছে? রেখাই চিত্র এবং

চিত্রই রেখা। কাব্যেও সেই প্রকার শব্দই অর্থ এবং অর্থই শব্দ, উভয়ে অভিন্ন, তাহাতেই কাব্যের প্রকাশ। 'পার্বতী-পরমেশ্বরৌ' যে 'বাগর্থৌ ইব সম্পৃক্তৌ', তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই তুলনার ফলে 'বাগর্থৌ' অপ্রস্তুত উপমান হইলেও তাহারই মহিমা বাড়িয়াছে বেশি। এখানে 'বাগর্থৌ' দ্বারা ব্যাকরণ-গত ও অলঙ্কার-গত সকল প্রকার 'সাহিত্য'ই বুঝিতে হইবে। কেবল তাহাই নয়, 'পার্বতী-পরমেশ্বরৌ' যে প্রকার 'জগতঃ পিতরৌ', জগতের অভিন্ন সৃষ্টিশক্তি—দেখা যাইতেছে 'পিতরৌ' শব্দের মধ্যে মাতৃ-শব্দ লুক্কায়িত রহিয়াছে, একটি দ্বিবচনে তাহার ইঙ্গিত মাত্র—সেই প্রকার 'শব্দার্থৌ'ও 'জগতঃ পিতরৌ'। শব্দার্থ-যুগল এক হইয়া পরম মিলনে বিচিত্র রূপরসময় এই কল্পিত কাব্য-জগতের সৃষ্টি করিতেছে। ব্যঞ্জনাশক্তিবলে এই ব্যাখ্যা প্রতীতি হইতেছে। কবি কালিদাসের সমগ্র শ্লোকটি হইল,—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ॥ —রঘুবংশ, ১।১

—'বাগর্থের ন্যায় সম্বন্ধ-যুক্ত জগতের মাতাপিতা পার্বতী-পরমেশ্বরকে বাগর্থ-লাভের জন্য বন্দনা করি।'

বাগর্থ-লাভের বাচ্যার্থ কেবল মাত্র শব্দ ও অর্থ সম্পদ্ লাভ করা, কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ উহাদের অভিন্ন সাহিত্য দ্বারা কাব্য-জগৎ সৃষ্টি করা। 'পার্বতী-পরমেশ্বরৌ'-এর পাঠ কেহ কেহ করেন 'পার্বতীপ-রমেশ্বরৌ,—অর্থ হইবে হর ও হরি। তাঁহারাও পরস্পরের পরিপূরক গুণ-যুক্ত, কাজেই এ ব্যাখ্যা অন্য কারণে সঙ্গত না হইলেও আলোচ্য দিক্ হইতে বেশি আপত্তি নাই।

লিঙ্গপুরাণে পার্বতীর এক নাম আছে 'বাণী' বা বাক্, রুদ্রহৃদয়োপনিষদে শিবের এক নাম আছে 'অর্থ'[১]। পার্বতী-পরমেশ্বর যেন সাক্ষাৎ বাগর্থ। ইহাদের মধ্যে উমা বাক্-স্বরূপা ব্যক্ত ; মহেশ্বর অর্থস্বরূপ অব্যক্ত,—

ব্যক্তং সর্বম্ উমারূপং, অব্যক্তং তু মহেশ্বরম্।[২]

কালিদাসের এই উপমা সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে বিদ্যাধরের "বন্দেঽর্ধ-নারীশ্বর"[৩] বন্দনায়।

—অর্ধনারীশ্বরমূর্তি !—উভয়ে এক, কেহ বড় নয়, কেহ ছোট নয়। ইহাই সাহিত্যে জগন্মঙ্গল পরম আদর্শ।

(১) "রুদ্রোঽর্থোঽক্ষরঃ সোমা তস্মৈ তস্মৈ নমো নমঃ।" —রুদ্রহৃদয়োপনিষৎ, ২৩
(২) ঐ, ১০ (৩) একাবলী, ১।১০

পাশ্চাত্ত্য সুধীগণ বাগর্থের এই অভেদ সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন। কবি শেলি 'sounds' এবং 'thought'[১] অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের পরস্পরের সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধ কি প্রকার বিচার করেন নাই। কার্লাইল একটি সার্থক উপমা দিয়া উহা অনেকটা স্পষ্ট করিয়াছেন; যথা,—

"For body and soul, word and idea, go strangely together here as everywhere." —*The Hero As Poet*

—'কেননা, দেহ ও আত্মা, শব্দ ও অর্থ এই স্থলে এবং সকল স্থলেই আশ্চর্য রূপে সহ-গামী।'

এবারক্রম্বির মন্তব্য আরও অর্থপূর্ণ, তিনি বলেন,—

"Poetry does not consist of separable qualities ; if it exists at all, it exists as an indivisible whole."

—*The Idea of Great Poetry*. p. 17.

—কাব্যের ধর্মগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা যায় না; যদি কাব্যই হইয়া থাকে, তবে ইহা অবিভাজ্য সমগ্ররূপেই বর্তমান থাকিবে।

বিষয়টি নিঃসংশয়ে স্পষ্ট করিয়াছেন মনস্বী ব্র্যাড্‌লে,—

"Just as there the lines and their meaning are to you one thing, not two, so in poetry the meaning and the sounds are one : there is, if I may put it so, a resonant meaning, or a meaning resonance." —*Poetry For Poetry's Sake.*

—'ঠিক যেমন হাসির রেখাগুলি এবং তাহাদের অর্থ আপনাদের কাছে একই বস্তু, দুই নয়, কাব্যেও সেই প্রকার অর্থ ও ধ্বনি এক: আমি এইরূপ বলিতে পারি—ওখানে আছে এক ধ্বনিময় অর্থ, অথবা অর্থময় ধ্বনি।'

শব্দ-সম্বন্ধে একজন অর্বাচীন এবং একজন প্রাচীন আলঙ্কারিকের মত উল্লেখ করিতে পারি। সপ্তদশ শতাব্দীতে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ শব্দার্থের সাহিত্যের পরিবর্তে কেবলমাত্র শব্দের উল্লেখ করিয়া কাব্য-সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়াছেন,—

রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্

(১) A Defence of Poetry

বৃত্তিতে নিজেই লিখিতেছেন,—

"শব্দার্থযুগল কাব্যশব্দবাচ্য নয়। কেননা অনুকূলে কোন প্রমাণ নাই। কাব্য উচ্চস্বরে পঠিত হয়, কাব্য হইতে অর্থ অবগত হওয়া যায়, কাব্য শুনিয়াছি অর্থ বুঝিতে পারি নাই,—এইরূপ বিশ্বজনীন ব্যবহার হইতেই বুঝা যায় শব্দ-বিশেষেরই কাব্যতা হয়।"[১]

এই শব্দ অর্থ কেবল ধ্বনি বা sound। পূর্ববর্তী আচার্য কুন্তকের পর্যালোচনার পর এই যুক্তি এত অশ্রদ্ধেয় বলিয়া মনে হয় যে, এই প্রসঙ্গে উহার উল্লেখও হয়তো সঙ্গত হয় নাই।

প্রাচীন আচার্য দণ্ডী শব্দের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সে শব্দ কিন্তু মুখ্যতঃ ধ্বনি-সহ সঙ্কেতিত অর্থ। দণ্ডী বলিয়াছেন,—

ইদম্ অন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতি রাসংসারং ন দীপ্যতে॥ —কাব্যাদর্শ, ১।৪

—'শব্দ-নামক জ্যোতি সকল সংসার দীপ্ত না করিলে এই সমগ্র ত্রিভুবন অন্ধ তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত।'

শব্দ-জ্যোতিঃ সুন্দর উক্তি। এই জ্যোতিঃ কিন্তু অর্থও বটে, যাহা ধ্বনি-সঙ্কেতে চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদান দ্বারা সংসারযাত্রা-নির্বাহ সম্ভবপর করে। জ্যোতিঃ যেমন দীপ বা তৎসদৃশ কোন দহনশীল বস্তু ছাড়া থাকিতে পারে না, অর্থও সেই প্রকার আমাদের সংসার-যাত্রায় ধ্বনি ছাড়া থাকিতে পারে না। এখানে দণ্ডী স্পষ্টতঃ শব্দজ্যোতিঃ দ্বারা শব্দ-গত কেবল ধ্বনি নয়, শব্দার্থ-যুগলকেই বুঝাইয়াছেন।

এই শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে দণ্ডী বলিয়াছেন যে, সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে ইহা কামদুঘা ধেনুর ন্যায় আমাদের সেবা করিয়া সর্বার্থ সিদ্ধ করে, অন্যথায় দুষ্প্রযুক্ত হইলে তাহা প্রয়োগকর্তার গোত্ব অর্থাৎ মূর্খত্বই প্রমাণ করিয়া থাকে।[২] দণ্ডীর এই উক্তি পাতঞ্জল মহাভাষ্যের সেই প্রসিদ্ধ বাক্যই স্মরণ করাইয়া দেয়; যথা,—

একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্ ভবতি,

—'একমাত্র শব্দ সম্যগ্ জ্ঞাত হইয়া সুপ্রযুক্ত হইলে স্বর্গে এবং ইহলোকে সর্বকাম পূরণ করে।'

(১) রসগঙ্গাধর, পৃঃ ৫
(২) কাব্যাদর্শ, ১।৬

এই শব্দও শব্দার্থযুগল, মুখ্যতঃ ব্যাকরণানুযায়ী বিশুদ্ধ ও যথার্থ শব্দই বুঝায়। আমরা শব্দের এই প্রয়োগ লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম।

আমাদের আলোচনা-অনুসারে সাহিত্য শব্দ ক্রমান্বয়ে বুঝায়,—

(১) শব্দার্থের ব্যাকরণ-গত সাহিত্য ;

(২) শব্দার্থের অলঙ্কার-গত সাহিত্য—শব্দের সহিত অর্থের এবং অর্থের সহিত শব্দের সাহিত্য ;

(৩) শব্দের সহিত শব্দের এবং অর্থের সহিত অর্থের সাহিত্য ;

(৪) রীতি, গুণ, অলঙ্কার, বক্রতা, বৃত্তি ও রস—এই সকলের পরস্পর সাহিত্য।

ইহারই ফলে পানকরসের ন্যায় সকল উপাদানের অতিরিক্ত এক নূতন আস্বাদ আবির্ভূত হয়, তখনই ঘটে সাহিত্যের পরম সার্থকতা।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য লইয়া নানাস্থানে নানারূপ আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্য গ্রন্থে তিনি লিখিতেছেন,—

"সহিত শব্দ হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে ভাষায়-ভাষায় গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন তাহা নহে,—মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগ-সাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে-দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে—তাহারা বিচ্ছিন্ন।" —বাংলা জাতীয় সাহিত্য

সাহিত্য শব্দের পূর্ব-ব্যাখ্যাত অর্থেরই প্রসার ঘটাইয়া এখানে রবীন্দ্রনাথ উহাদ্বারা ব্যাকরণ বা অলঙ্কার-গত অর্থ অতিক্রম করিয়া বুঝাইয়াছেন সমাজ-গত ও সংস্কৃতি-গত এবং কাল-গত সাহিত্য বা মিলন। এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের সৌষম্যময় সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা কাব্যই যাহার অপর নাম, সেই সাহিত্যের প্রথম কথা নহে, শেষ কথা—ফলশ্রুতি।

আমরা বলিতে পারি,—সাহিত্যের সর্বত্রই সাহিত্য এবং তাহা দ্বৈতাদ্বৈত। চারিটি বিভিন্ন দিক্ হইতে ইহার বিচার চলে।

প্রথম, কাব্যের দিক্ হইতে সাহিত্য :—ধ্বনি যেখানে অর্থ-নিরপেক্ষ ভাবে কেবলমাত্র ধ্বনি-স্বরূপ দ্বারাই অর্থকে দ্যোতিত করে এবং অর্থও যেখানে সহজভাবে অনুরূপ ধ্বনি চিত্তে আকৃষ্ট করে, বা জাগায়, সেখানেই আদর্শ-ভূত শব্দার্থ-সাহিত্য। ইহাকেই আমরা অর্ধনারীশ্বর মূর্তি বলিয়াছি, এবং এখন বলিতেছি দ্বৈতাদ্বৈত রূপ।

ধ্বনি ও অর্থ-রূপ দ্বৈত সমগ্র শব্দরূপ এক অদ্বৈতে স্ফূর্ত হইয়াছে। ইহাই শব্দের সৃষ্টি। কিন্তু কেবল বিচ্ছিন্ন শব্দ দ্বারা বাক্য হয় না, কাব্যও হয় না। এই সাহিত্যই তাই প্রসার-ক্রমে সুগঠিত শব্দের সহিত শব্দান্তরের সাহিত্য দ্বারা বাক্যরূপে বিলসিত হয়। ইহাকে আমরা কতিপয় সুহৃদের মিলন বলিয়াছি। বিভিন্ন শব্দরূপ বহুর সাহিত্য দ্বারা বাক্যরূপ একটি অখণ্ড অর্থ ধ্বনিত হয়, এখানেও তাই দ্বৈতাদ্বৈত লীলা। এই বাক্যই বস্তুতঃ কাব্যের মূল unit বা উপদান-তত্ত্ব।

পরবর্তী স্তরে বাক্য ও বাক্যের সাহিত্য দ্বারা একটি সুসংলগ্ন, সুসম্পন্ন, সমগ্র ও সম্পূর্ণ প্রবন্ধ বা কবিতা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। ইহা সাধারণ দৃষ্টিতে সুহৃৎসঙ্ঘের ন্যায়, প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টিতে ইহা ঐ অর্ধনারীশ্বরের ন্যায়ই দ্বৈতাদ্বৈত ভাবসম্পন্ন; কেননা, এখানে কবিচিত্তের আদি প্রেরণা-রূপ একটি বীজীভূত শব্দার্থশক্তি পরিস্ফুতি লাভ করিয়া কাব্য বা মহাকাব্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে মহাকাব্যের অর্থ একটি এবং মহাকাব্যের ধ্বনিরূপও একটি। আমরা তাই বলি সাহিত্য সর্বাবস্থায়ই সাহিত্য, এবং ইহা দ্বৈতাদ্বৈত, অর্ধনারীশ্বরমূর্তি।

দ্বিতীয়, কবির দিক্ হইতে সাহিত্য :—সাহিত্য-সম্বন্ধে শব্দার্থের এই ব্যাখ্যাও যেন 'বাহ্য', তাহারও আগে রহিয়াছে কবি-মনের সহিত সমাজ-মন বা বিশ্ব-মনের সাহিত্য। ইহারই ফলে শব্দার্থের উপাদানে কাব্য-প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়। কবিমন একদিকে বিচিত্র বিশ্বসত্তাকে গ্রহণ করে, অপরদিকে একই কালে বিশ্বের বিচিত্র সত্তা কবিমনকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়। ইহাই কারণ, কার্যস্বরূপ অভিব্যক্ত হয় ধ্বনি ও সুর এবং অর্থ ও ভাব; ইহাদের সাহিত্যের কথাই পূর্বে বলা হইয়াছে।

সাহিত্যের লীলাও সৃষ্টির লীলা, ইহা যুগল লীলা, সে যুগল হরগৌরীই হউন, বা হরিহরই হউন—দ্বৈতের সাহিত্যে এক বা অদ্বৈতের লীলাই আসল কথা ও শেষ কথা। সাহিত্য বলিলেই একাধিক বস্তুর সত্তা ও তাহাদের সাহচর্য বা ঐক্য বুঝায়। তাই বলা চলে দ্বৈত বা বহুর মধ্যে এক—অদ্বৈতের বিলাসই সাহিত্য। অহরহ নিসর্গজগতে, পশুজগতে, বিশেষ ভাবে মানবজগতে, বিকাশ বা বাধা, এবং প্রীতি বা বিদ্বেষমূলে নব নব বিস্ময়ের সঞ্চার ও নব নব ঘটনার সৃষ্টি হইতেছে। তাহারা প্রবেশ করে কবিচিত্তে, নির্লিপ্ত নৈর্ব্যক্তিক কবিচিত্তের অধিবাসনে ঘটে কবিমন ও বিশ্বমনের সাহিত্য ও বস্তুস্বরূপের প্রকাশ। বিশ্বমন সদাপ্রকাশশীল, বস্তুর স্পন্দনধর্মে তাহার সজীব ক্রিয়া, এবং একপ্রকার মননশীলতা অনুভব করা যায়। এই ক্রিয়া থাকে বলিয়াই কবি-নির্মিতি শব্দার্থে কবির অগোচরে সহৃদয় পাঠকচিত্তে কাব্যের শ

শব্দ ও বাক্য অতিক্রম করিয়া শব্দোত্তর ও বাক্যোত্তর শক্তি থাকিতে পারে; ইহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ, ইহার পরিচয় রচনার ব্যঞ্জনা-ধর্মে।

তৃতীয়, পাঠকমন ও কবিমনের সাহিত্য :—কবি-সৃষ্ট শব্দার্থময় কাব্যের প্রকাশ হয় সহৃদয় পাঠকচিত্তে। কবি একজন ব্যক্তিমাত্র ন'ন, তিনি রসস্রষ্টা ও জগদ্ব্যাপারের দ্রষ্টা। এই উভয় মনের সাহিত্যের ফলে পাঠকও হ'ন বিচিত্র জগদ্ব্যাপারের নবীন দ্রষ্টা ও ভোক্তা। ইহাই তো সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফল।

এই চতুর্থ বা শেষ সাহিত্যের তাৎপর্য খানিকটা ব্যাখ্যা করিয়াছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। উহা কবি ও পাঠকের এবং মানবজাতির দেশ-গত, কাল-গত এবং সংস্কৃতি-গত সাহিত্য বা মিলন। এই সাহিত্যের ফলে অতীতের সহিত ভবিষ্যতের মিলন হয় বর্তমান কালের মধ্যে। কবির রচনাগুণে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল তাহাদের সকল সিদ্ধি ও ঐশ্বর্য এবং সাধনা ও আশা লইয়া স্ফুরিত হয় বর্তমান কালের পাঠক চিত্তে। এইরূপে বিচিত্র দেশ এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিও মানুষের সহিত মানুষের সর্বপ্রকার ব্যবধান ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এক অন্তরঙ্গ ভাব-বন্ধন লাভ করে বর্তমানের একটি মানবের মধ্যে। একটি মানবই তো বিশ্বমানব, এবং সে তখন হয় নিত্যকালের মানব! অখণ্ড দেশে অখণ্ডকালে মানব জাতির অখণ্ড সংস্কৃতি লইয়া দাঁড়াইয়া ঐ একটি মানব—সহৃদয় পাঠক! তাহারই মধ্যে বিশ্বমানবের শাশ্বত অভিব্যক্তি ও পরম প্রতিষ্ঠা, উহাই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফল, হাঁ উহাই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফল সন্দেহ নাই!

(৩)

শব্দ

শব্দ বলিতে বুঝিব সাধু বা চলিত, দেশী বা বিদেশী যে কোন শব্দ যাহা আমাদের জাতি ও সংস্কৃতি-অনুযায়ী মনোগত অর্থকে সুষ্ঠু ও সম্যক্ রূপে প্রকাশ করিতে পারে। প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিলেও সেই সময়কার প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষা-সমূহকে অবজ্ঞা করেন নাই। প্রত্যুত তিনি মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, গৌড়ী, লাটী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন।[১] এই বিষয়ে

(১) কাব্যাদর্শ, ১।৩২, ৩৪, ৩৫

রাজশেখর-কৃত কাব্য-পুরুষের বর্ণনাও লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে "শব্দার্থযুগল কাব্যপুরুষের শরীর, সংস্কৃতভাষা মুখ, প্রাকৃতভাষা বাহু, অপভ্রংশ জঘন, পৈশাচ পাদযুগল, মিশ্রভাষা বক্ষোদেশ"।[১] পূর্বকালের সংস্কৃত-নামক 'দৈবী বাক্' এখন আর প্রচলিত নাই। তাহা হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষাও অনেক দিন হয় লুপ্ত হইয়াছে। আজ যে ভাষার জয়যাত্রা তাহা আমাদের ঘরে বাহিরে, সভায় ও সাহিত্যে সর্বত্র সমান ভাবে আদৃত হইতেছে। দেশব্যাপী ভাষা বা বাঙ্‌ময় একটিই, আমাদের বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালাভাষা। ভাষার গৌরব বুঝাইতে পূর্বেই দণ্ডীর কথিত শব্দ-নামক জ্যোতির কথা বলা হইয়াছে। উহারই কেবল পূর্বে দণ্ডী অন্যভাবে ভাষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে লিখিয়াছেন,—

বাচামেব প্রসাদেন লোকযাত্রা প্রবর্ততে ॥ —কাব্যাদর্শ, ১।৩

'—বাক্যের প্রসাদেই লোকযাত্রা বা লোক-ব্যবহার চলিয়া থাকে।'

যে ভাষার প্রসাদে মানবসমাজ সংসারযাত্রা নির্বাহ করে, তাহাই হইল আসল ভাষা, কাব্যের ভাষাও তাহাই। কাব্যের ভাষা সমাজের নিত্যব্যবহার্য ভাষা অথবা লৌকিক ভাষা হইতে বেশী দূরবর্তী হওয়া উচিত নহে। জনসমাজের সহজবোধ্য না হইলে সে ভাষায় রচিত কাব্য কাহাদের উপকারে আসিবে? তাই প্রাচীন সংস্কৃত-পদ-বাহুল্য অথবা আধুনিক ইংরেজী বাক্-পদ্ধতি দুইই সাহিত্যে নিন্দনীয়। কাব্যের শব্দ-প্রয়োগ ও গঠন-রীতি এমন হইবে যাহাতে তাহা বিনা ব্যাখ্যানে পাঠার্থী জনের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ভট্টি তাঁহার ব্যাকরণ-বিভীষিকাময় দুরূহ ও দুর্বোধ কাব্যখানি রচনা করিয়া বড়াই করিয়া বলিয়াছিলেন,—

ব্যাখ্যা-গম্যম্ ইদং কাব্যম্ উৎসবঃ সুধিয়াম্ অলম্।
হতা দুর্মেধস শ্চাস্মিন্ বিদ্বৎ-প্রিয়তয়া ময়া ॥ —ভট্টিকাব্য, ২২।৩৪

—'আমার এই কাব্য কেবলমাত্র ব্যাখ্যার সহায়তায়ই বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা সুধীগণের বিপুল উৎসব-স্বরূপ। বিদ্বান্‌দের আমি ভালবাসি বলিয়া এই কাব্য বিষয়ে অল্পবুদ্ধিগণ আমাদ্বারা হত হইল!'

কাব্যের রচনা হয় সকলকে আনন্দ দিবার জন্য, সেখানেই যদি দুরূহতা সঞ্চার করিয়া সাধারণ শিক্ষিতগণকে ঠেকান হয়, তবে আর কাব্য-নির্মিতির সার্থকতা বিশেষ কিছু থাকে না, কবি হ'ন আত্ম-ঘাতী।

(১) কাব্যমীমাংসা, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ৬

পণ্ডিতগণ বলেন ভট্টির সম-সাময়িক ছিলেন অলঙ্কারাচার্য ভামহ। বোধ হয় তিনি এই উক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন,—

কাব্যান্যপি যদীমানি ব্যাখ্যাগম্যানি শাস্ত্রবৎ।
উৎসবঃ সুধিয়ামেব হন্ত দুর্মেধসো হতাঃ॥ —ভামহালঙ্কার, ২।২০

—'এই সকল কাব্যও যদি শাস্ত্র-গ্রন্থের ন্যায় ব্যাখ্যার সহায়তায় বুঝিতে হয়, তবে সুধীগণেরই উৎসব বটে। হায়! হায়! মন্দবুদ্ধিগণ মারা গেল!'

কাব্য ও শাস্ত্র এক নয়। কাব্য প্রীতি ও আনন্দের নিমিত্ত, শাস্ত্র দুর্লভ জ্ঞানের নিমিত্ত।

বাস্তবিক পক্ষে কাব্যের আনন্দ কোন একটি বিশিষ্ট ভাষার উপর একান্তভাবে নির্ভর করে না; যে কোন ভাষার সুষ্ঠু উক্তিবৈচিত্র্য হইতে তাহা আসিয়া থাকে। দান্তে যে ভাষায় 'ডিভাইনা কমেডিয়া' মহাগ্রন্থ রচনা করিয়া ভাষাকে অমর করিয়া নিজে অমর হইয়াছেন, সে ভাষার শক্তি ও সম্মান ইতালীদেশে পূর্বে কি ছিল? বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙ্গালা গদ্য ভাষা ও সাহিত্যই বা কি ছিল? অন্যান্য শিল্পের ন্যায় ভাষাও একটি শিল্প, প্রতিভাবান্ পুরুষেরা তাহার সৃষ্টি ও পুষ্টি ঘটাইয়া থাকেন, স্থূল ও মূঢ় উপাদানে প্রাণ সঞ্চার করিয়া তাহাকে মানস-জাত অপূর্ব বিজ্ঞানদ্যুতিতে দিব্য রূপে উদ্ভাসিত করিয়া তুলেন। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যের যে কোন ভাষার উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস খুঁজিলে এই তত্ত্ব উপলব্ধি হইবে। কর্পূরমঞ্জরী নাটিকা সংস্কৃত ভাষা ত্যাগ করিয়া প্রাকৃত ভাষায় কেন রচিত হইয়াছে, তাহার কারণ উল্লেখ করিতে যাইয়া কবি রাজশেখর প্রস্তাবনায় বলিলেন,—

উত্তিবিসেসো কব্বো ভাসা জা হোই সা হোদু।

—'উক্তি-বিশেষই কাব্য, ভাষা যাহা হইবার, হউক।'

ভোজরাজ একেবারে স্পষ্ট বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন,—

"তেষু উক্তি-প্রধানং কাব্যম্।"
"—শব্দ-প্রধানং শাস্ত্রম্।"
"অর্থ-প্রধানম্ ইতিহাসঃ।" —শৃঙ্গারপ্রকাশ, ২য় খণ্ড

—'তাহাদের মধ্যে কাব্যে হইতেছে উক্তি বা বাগ্‌ভঙ্গীর প্রাধান্য, শাস্ত্রে হইতেছে শব্দের প্রাধান্য, এবং ইতিহাসে অর্থের প্রাধান্য।'

শব্দের সম্বন্ধে শব্দার্থযুগলের আলোচনার সময়ে আমরা আবশ্যকীয় অনেক কথাই বলিয়াছি। আরও দুইটি ভিন্ন বিষয় আলোচনা করিবার রহিয়াছে।

শব্দ-সম্পর্কে প্রথম ও প্রধান কথাই তাহাদের উৎপত্তি বা গঠন-প্রকার লইয়া। ইহা মুখ্যতঃ ব্যাকরণ-শাস্ত্রের আলোচনার বিষয়। ধ্বনিবিজ্ঞান ও সঙ্কেতবিজ্ঞানও ব্যাপক ভাবে এই ব্যাকরণশাস্ত্রের অঙ্গ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় নূতন শব্দ গঠিত হইয়াছে খুব অল্পই, মাতা বা মাতামহী স্থানীয়া প্রাকৃত বা সংস্কৃত ভাষা হইতেই তাহার বাঙ্ময় শরীরের উদ্ভব। নূতন নূতন অর্থ বা বস্তু গ্রহণের সঙ্গে তাহাদের বাচক শব্দও অনেক সময়ে বহির্দেশ বা বহির্ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। কাজেই বাঙ্গালা শব্দরাশির অধিকাংশের উৎপত্তি-আলোচনা বাঙ্গালা ব্যাকরণশাস্ত্রের মুখ্য বিষয় নয়।

পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী শব্দ-কথা গ্রন্থে বিশেষ ভাবে, এবং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহারও পূর্বে শব্দতত্ত্ব গ্রন্থে সাধারণভাবে বাঙ্গালাভাষার নিজস্ব ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারাত্মক শব্দসমূহের উৎপত্তি ও দ্যোতনা-বিষয়ে মনোহর আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গের আলোচনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই ; এমন কি আমাদের মনে হয়, সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয়যোগে মৌলিকশব্দ-গঠনের মনস্তত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনাও শেষ হয় নাই, তাহাকে আরও কিছুদূর অগ্রসর করা চলে। যাহা হউক, এই সমস্তই বর্তমান কাব্য-তত্ত্বের আলোচনার বাহিরে।

কাব্যতত্ত্বের দিক হইতে শব্দের ধ্বনিরূপের বিচারে প্রথম ও প্রধান আলোচ্য হইতেছে ছন্দঃ, শব্দালঙ্কার এবং রীতির একটি দিক। ছন্দঃ প্রাচীনকাল হইতেই পৃথক্ যত্নে পৃথক্ শাস্ত্র হিসাবে আলোচিত হইবার গৌরব লাভ করিয়াছে। বেদে ছন্দঃ ছয় বেদাঙ্গের একটি অঙ্গ, সংস্কৃতেও ছন্দঃশাস্ত্র অলঙ্কারশাস্ত্রের বাহিরে এক পৃথক্ বিদ্যা। বাঙ্গালার ছন্দঃশাস্ত্রও স্বকীয় গৌরবে প্রায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিষয়টি বৃহৎ বলিয়াই এই খণ্ডে আমরা উহার মূল-তত্ত্বের আলোচনা-বিষয়েও বিরত রহিলাম। এইরূপ শব্দালঙ্কার ও রীতি-বিষয়েও এই খণ্ডে বিশেষ কোন আলোচনা সম্ভবপর হইল না।

(৪)

অর্থ

কাব্যতত্ত্বানুগত অর্থের প্রধান আলোচনা হইতেছে শব্দের শক্তি-নির্ণয়। তৃতীয় অধ্যায়ে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা শক্তির বিচার করিয়া আমরা তাহা সম্পন্ন করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে অভিধা ও লক্ষণাশক্তি মুখ্যতঃ ব্যাকরণশাস্ত্রের আলোচ্য।

শব্দের ব্যঞ্জনা-শক্তিতেই কাব্য-শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা, এবং সেই জন্য আধুনিক দৃষ্টি লইয়া আমরা ব্যঞ্জনা ও ধ্বনির বিশদ বিচার করিয়াছি। ইহার পরেই অর্থ-সম্পর্কে প্রধান আলোচ্য হইতেছে অর্থালঙ্কার এবং পরে গুণ, বৃত্তি, এবং রীতির অপর দিক্‌টি। রস ও রম্যবোধকেও অর্থের আলোচনার ভিতর আনিতে হইবে। রস ও রম্যবোধ, অথবা ভাব ও রম্যার্থের আলোচনা পূর্বে সম্পন্ন করা হইয়াছে।

ধ্বনির সঙ্গীতধর্মের ন্যায় অর্থের চিত্রধর্মের কথা প্রসঙ্গতঃ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কাব্যে ধ্বনিগুণে ও ছন্দোগুণে সঙ্গীতধর্ম পরিস্ফুট হয়। ধ্বনিগুণ দুই প্রকার,—এক, রীতির জন্য রসানুকূল বর্ণ-রচনা; দ্বিতীয়, অনুপ্রাস ও যমক অলঙ্কার। এই দুইটিকে এবং ছন্দকে লইয়া সঙ্গীতধর্ম তিন প্রকার। সামান্য অর্থও সঙ্গীতধর্মের সমাবেশে অসামান্য হইয়া উঠে। সেইরূপ চিত্রধর্মেও অর্থসম্পদ্ প্রকাশ পায়; কথাদ্বারা যাহা বুঝান যায় না, চিত্রধর্মে তাহা পরিস্ফুট হয়। কাব্যের, অর্থাৎ মিলিত শব্দার্থযুগলের নিজস্ব গুণ হইল ভাব ও অর্থধর্মের পরিস্ফুটন, উহা হইতে জাগে রস বা রম্যবোধ। এখানে বলা যায় সঙ্গীত ও চিত্রধর্ম-বর্জিত হইলে ভাব অনেক সময়ে নীরস তত্ত্বমাত্রে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া বাণভট্টের কাদম্বরী কথাকাব্যে কাব্যের সঙ্গীত-ধর্মের, বিশেষভাবে চিত্র-ধর্মের অপূর্ব প্রকাশ-লীলা দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন,—

"ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিষ মিশাইয়া থাকে—চিত্র এবং সঙ্গীত।" —সাহিত্য, পৃঃ ৪

চিত্রধর্মের উদাহরণ দিলেন,—

"দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়"; —বলরাম দাস

তিনিই ব্যাখ্যা করিলেন,—

"ব্যাকুল দৃষ্টির ব্যাকুলতা কেবলমাত্র বর্ণনায় কেমন করিয়া ব্যক্ত হইবে? দৃষ্টি পাখীর মত উড়িয়া ছুটিয়াছে, এই ছবিটুকুতে প্রকাশ করিবার বহুতর ব্যাকুলতা মুহূর্তে শান্তি লাভ করিয়াছে।" —বলরাম দাস

বৈষ্ণব পদাবলী হইতে ঐ দৃষ্টি বুঝাইবার জন্যই আর একখানি ছবির উল্লেখ করা হইতেছে। প্রথম উদাহরণে নয়নের ব্যাকুলতা ও গতি, বর্তমান উদাহরণে দেখা যাইবে সম্ভোগসম্পূর্ণতা ও রসালস স্থিতি। উদাহরণ,—

লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার
মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন পার॥ —বিদ্যাপতি

—'লোচনের তারা যেন স্থির ভৃঙ্গের ন্যায়, মধুতে মাতাল হইয়া আর উড়িতে পারিতেছে না।'

প্রথম উদাহরণে রূপকালঙ্কার, দ্বিতীয়টিতে উপমা। অলঙ্কার দিয়া অপ্রস্তুত উপমানের সাহায্যে প্রস্তুত উপমেয়ের চিত্রাঙ্কন কতই রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের একটি পদ লওয়া হইতেছে,—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
আমারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥
যাঁহা যাঁহা ভাঙ্গুর ভাঙু বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপলবন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ-কুমুদ-পরকাশ॥

কবি গোবিন্দদাসের এই ক্ষুদ্র পদটিতে নিদর্শনা-অলঙ্কারের অবলম্বন উপমান দ্বারা পর পর পাঁচটি চমৎকার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 'অরণ্যে রোদন করা' বা 'চোখে ধূলা দেওয়া' প্রভৃতি বাক্যাংশে, অথবা 'গলিয়া পড়া' কিংবা 'ভাসিয়া যাওয়া' প্রভৃতি ক্রিয়াপদেও চিত্রধর্ম পরিস্ফুট।

ঐ সব চিত্র অলঙ্কারাশ্রিত চিত্র, বক্রোক্তি কাব্যে ঝলমল করে। নিরলঙ্কার চিত্রও সাহিত্যে অল্প নয়; যথা,—

হেরো ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না; শূন্য মাঠ জনহীন;
ঘরে-ফেরা শান্ত গাভী গুটী দুই তিন
কুটীর অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধ প্রায়। গৃহকার্য হল সমাপন,—

কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়া খানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কী জানি
ধূসর সন্ধ্যায় ॥ —চিত্রা, সন্ধ্যা

দৃশ্যখানি এত স্বাভাবিক এবং চিত্র-ধর্ম এত উজ্জ্বল যে কবি নিজেই বর্ণনা করিলেন 'ছবির মতন স্তব্ধপ্রায়'। কবি আবার এই বর্ণনীয় প্রস্তুত বিষয়কেই অপ্রস্তুত উপমানরূপে গণ্য করিয়া তাহার সাহায্যে বৃহৎ বিশাল আর একখানি চিত্র আঁকিলেন,—

অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে
বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম-অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি
দিগন্তের পানে,

—গ্রামের বধূ ধূসর সন্ধ্যায় বেড়াখানি ধরিয়া সম্মুখে চাহিয়া আছে, বসুন্ধরাও মহাকালের প্রান্ত ধরিয়া অনাগত দূর পথের শেষ প্রান্তে চাহিয়া আছে।

শব্দার্থের সম্বন্ধ-বিষয়ে সাধারণতঃ বলা হয় শব্দ দেহ, আর অর্থ প্রাণ। এই তুলনার জের টানিলে মনে হইবে শব্দাশ্রিত সঙ্গীত দেহ এবং অর্থাশ্রিত চিত্র প্রাণ। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পরমরসিক রবীন্দ্রনাথ যেন বিরুদ্ধ কথা বলিলেন,—

"অতএব চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সঙ্গীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ।"

—সাহিত্য, পৃঃ ৫

এখানে একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে,—চিত্র এবং সঙ্গীত উভয়েই উপকরণ মাত্র, অন্তরস্থিত আসল সাহিত্য হইতেছে ভাব। চিত্র যেন তাহার দেহ, দেয় তাহাকে আকার বা রূপ; সঙ্গীত তাহার প্রাণ, দেয় তাহাকে গতি। চিত্র দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ, আত্মা হইতেছে ভাব অর্থাৎ রস বা রম্যবোধ। সাহিত্যের তাই তিনটি ধর্ম,—একটি মূলধর্ম বা আত্মভূত সত্তা, তাহা হইতেছে ভাবধর্ম বা ভাব; দ্বিতীয় তাহার প্রাণ সঙ্গীতধর্ম, এবং তৃতীয় তাহার দেহ চিত্রধর্ম। চিত্র ও সঙ্গীতধর্ম ভাবের উদ্বোধন করাইয়া উহাকে পুষ্ট করে এবং রসতা-প্রাপ্তি ঘটায়।

(৫)

অলঙ্কারশাস্ত্র ও অলঙ্কার

অর্থ-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচ্য অলঙ্কার—অর্থালঙ্কার। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার লইয়া অলঙ্কার-প্রকরণ এত বড় যে, ছন্দের ন্যায়ই তাহার কোনও আলোচনা গ্রন্থের এই খণ্ডে সম্ভবপর নয়। এখানে আমরা কেবলমাত্র অলঙ্কারের স্বরূপার্থ দুইটি সংক্ষেপে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতে পারি।

কাব্যশাস্ত্রে বর্তমান কালে রস-তত্ত্বের পরই অলঙ্কারতত্ত্বের স্থান। পূর্বাচার্যগণের নিকট অলঙ্কার-তত্ত্বই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়, কাব্যশাস্ত্র বা 'Poetics'ও তাই অলঙ্কারশাস্ত্র নামেই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। যে অলঙ্কার-তত্ত্বের জন্য শাস্ত্রের এইরূপ নামকরণ হইল, তাহার বিষয় মূলতঃ উপস্থিত না করিলে আমাদের আরব্ধ গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে না।

কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থে যাযাবরীয় রাজশেখর অলঙ্কারশাস্ত্রকে বলিয়াছেন সপ্তম বেদাঙ্গ। এই শাস্ত্রের পরিবিজ্ঞান ভিন্ন বেদার্থেরও সম্যক্ জ্ঞান হয় না।[১] ইহা তিনি উদাহরণ দিয়াও বুঝাইয়াছেন।

সংস্কৃতে 'অলম্' শব্দের এক অর্থ ভূষণ। অতএব অলম্ বা ভূষণ করা হয় যাহা দ্বারা, তাহাই অলঙ্কার। অলঙ্কার শব্দের ব্যাপক অর্থ তাই সৌন্দর্য, সংকীর্ণ অর্থ অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি বিশিষ্ট অলঙ্কার-বস্তু। 'অলঙ্কার-শাস্ত্র'-এর প্রকৃত অর্থ 'সৌন্দর্য-শাস্ত্র' বা 'কাব্যসৌন্দর্য-বিজ্ঞান', ইংরেজীতে যাহাকে বলা যাইতে পারে *Æsthetic of Poetry*। কারণ, প্রাচীন আচার্যগণ বাস্তবিকই অলঙ্কার-শব্দ সৌন্দর্য-অর্থে গ্রহণ করিয়া কাব্যশাস্ত্র বা *Poetics*-এর তদ্রূপ সার্থক নামকরণ করিয়াছিলেন। অলঙ্কারশব্দ বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করিয়া অনুপ্রাস-উপমাদি, ইংরেজীতে যাহাদের বলে *figures of speech*, তাহাও তাঁহারা বুঝাইয়াছেন, এবং একটি পৃথক্ অধ্যায়ে উহার আলোচনা সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রাচীনদের আলোচনা হইতে মনে হয়, তাঁহারা সকলেই বিশিষ্ট অলঙ্কারকে কাব্যের অনিত্য বা অস্থির ধর্ম মনে করিতেন, তাহা যেন কাব্য-শরীরের আত্ম-ভূত বা অঙ্গ-ভূতও নয়, তাহা শোভাবর্ধক কটককুণ্ডলাদির ন্যায় আরোপ্য বস্তু। এই ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শন করিয়া

(১) উপকারকত্বাদ্ অলঙ্কারঃ সপ্তমম্ অঙ্গম্ ইতি যাযাবরীয়ঃ। ঋতে চ তৎস্বরূপ-বিজ্ঞানাদ্ বেদার্থানবগতিঃ। —কাব্যমীমাংসা, ২য় অঃ, পৃঃ ৩

অলঙ্কারের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করেন ধ্বনিবাদিগণ—ধ্বনিকার, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি।

অলঙ্কার বিষয়ে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মধ্যে দণ্ডী ও বামনের অভিমতই বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। দণ্ডী অলঙ্কারের সংজ্ঞা দিলেন,—

কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে। —কাব্যাদর্শ, ২।১

—'যে সকল ধর্ম কাব্যের শোভা জন্মায়, তাহারা অলঙ্কার বলিয়া কথিত হয়।'

বলা বাহুল্য, ইহা অলঙ্কারের সামান্য লক্ষণ এবং এখানে অলঙ্কার কাব্যসৌন্দর্যই বুঝাইতেছে। দণ্ডীর মতানুযায়ী তাঁহার ব্যাখ্যাত শ্লেষ ও প্রসাদ প্রভৃতি গুণগুলিও অলঙ্কার[১], এবং আতিশয্য বুঝাইবার জন্য যে দ্বিরুক্তি, তাহাও অলঙ্কার[২]। আবার অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতিও অলঙ্কার, তাহারা বিশেষ অলঙ্কার। কারণ, এই সকলই স্বরূপতঃ কাব্যসৌন্দর্য সম্পাদন করে।

(১) কাশ্চিন্ মার্গ-বিভাগার্থম্ উক্তাঃ প্রাগপ্যলঙ্ক্রিয়াঃ।
সাধারণম্ অলঙ্কার-জাতম্ অন্যৎ প্রদর্শ্যতে॥ —কাব্যাদর্শ, ২।৩

—'বিভাগ করিয়া বৈদর্ভী মার্গ দেখাইবার জন্য পূর্বেও কতকগুলি অলঙ্কার (শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য প্রভৃতি দশ প্রকার গুণ) কথিত হইয়াছে। এখন যে সকল অলঙ্কার (স্বভাবোক্তি, উপমা, রূপক প্রভৃতি) বৈদর্ভী ও গৌড়ী উভয় রীতিতে সাধারণ, তাহা প্রদর্শিত হইবে।'

এখানে টীকাকার তরুণ বাচস্পতি যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন,—

পূর্বং শ্লেষাদয়ো দশগুণা ইত্যুক্তম্। কথং তে অলঙ্কারা উচ্যন্তে ইতি চেৎ শোভাকরত্বং হি অলঙ্কার-লক্ষণং, তল্লক্ষণ-যোগাৎ তেঽপ্যলঙ্কারাঃ……গুণা অলঙ্কারা এব ইত্যাচার্যাঃ।

—'পূর্বে শ্লেষ প্রভৃতি দশটি গুণ উক্ত হইয়াছে। তাহারা কি প্রকারে অলঙ্কার বলিয়া কথিত হয়,—এই প্রশ্ন হইলে উত্তর এই :—শোভাকরত্বই অলঙ্কারের লক্ষণ, সেই লক্ষণ আছে বলিয়া গুণগুলিও অলঙ্কার….. আচার্যগণ বলেন গুণসমূহ বাস্তবিকই অলঙ্কার।'

(২) অনুকম্পাদ্যতিশয়ো যদি কশ্চিদ্ বিবক্ষ্যতে।
ন দোষঃ পুনরুক্তোঽপি প্রত্যুতেয়ম্ অলঙ্ক্রিয়া॥ —কাব্যাদর্শ, ৩।১৩৭

—'অনুকম্পাদির আতিশয্য বুঝাইতে হইলে পুনরুক্তি হইলেও দোষ নাই, প্রত্যুত ইহা অলঙ্কার বলিয়াই গণ্য।'

আলোচ্য বিষয়ে উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছেন বামনাচার্য। অলঙ্কারের সংজ্ঞায় তিনি বলেন,—

সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ। —কাব্যালঙ্কার, ১।১।২

—'কাব্যের সৌন্দর্যই হইতেছে অলঙ্কার।'

বৃত্তিতে বামন বলিলেন,—

"অলঙ্কৃতি মাত্রই অলঙ্কার। করণবাচ্যে ব্যুৎপত্তি করিয়া আবার এই অলঙ্কার শব্দই উপমাদি বুঝায়।"[১]

আমাদের মনে হয় বামন বৃত্তিতে অলঙ্কার শব্দের দ্বিবিধ অর্থের কথা বলিতেছেন; প্রথম, সামান্য বা সাধারণ অর্থ, তাহা হইতেছে কাব্যের যে কোন প্রকার সৌন্দর্য; দ্বিতীয়, বিশেষ অর্থ, তাহা হইতেছে উপমা প্রভৃতি বিশেষ সৌন্দর্য। প্রথম অর্থ লইয়াই আমাদের প্রথম আলোচনা। দণ্ডীর সূত্রের শোভা-কর ধর্ম সৌন্দর্য-বাচক, সেখানেও দণ্ডী সাধারণ ও বিশেষ, এই দুই প্রকার শোভার কথাই বলিয়াছেন। সাধারণ সৌন্দর্য কাব্যের আত্মভূত সৌন্দর্য সন্দেহ নাই, বিশেষ সৌন্দর্য আত্মভূতও হইতে পারে, বহিরঙ্গ-ভূতও হইতে পারে। বামনের প্রথম সূত্রটি পড়িলেই বুঝিতে পারিব বামন অলঙ্কারকে প্রধানতঃ কাব্যের আত্ম-ভূত সৌন্দর্যই বলিয়াছেন, সূত্রটি হইতেছে,—

কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ। —কাব্যালঙ্কার, ১।১।১

—'কাব্য সকলের নিকট উপাদেয়, কেননা তাহাতে অলঙ্কার আছে।'

দ্বিতীয় সূত্রের সহিত মিলাইয়া পড়িলে আমরা বলিতে পারি,—

সৌন্দর্য আছে বলিয়া কাব্য সকলের নিকট উপাদেয়।

অন্য ভাষায় বলা যায়,—

কাব্যের উপাদেয় স্বরূপ হইতেছে সৌন্দর্য।

পরবর্তীরা সৌন্দর্য শব্দ না বলিয়া বলিয়াছেন রস, এবং পরে জগন্নাথ আবার সৌন্দর্য-বাচক রমণীয়তা শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। এ একেবারে পাশ্চাত্ত্য কাব্যতত্ত্বজ্ঞগণের কথা! আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে রসের যে মূল্য ও স্থান, পাশ্চাত্ত্য কাব্য-শাস্ত্রে সেই মূল্য ও স্থান হইতেছে সৌন্দর্যের। এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্যের বড় ও ছোট সকল পণ্ডিতই বলেন,—

(১) অলঙ্কৃতিঃ অলঙ্কারঃ। করণব্যুৎপত্ত্যা পুনঃ অলঙ্কারশব্দোঽয়ম্ উপমাদিষু বর্ততে।

"...the poet must never forget that his final quest is beauty."
—Watts-Dunton, *What is Poetry?*

—'কবি কখনও ভুলিবেন না যে, তাঁহার শেষ সন্ধান হইতেছে সৌন্দর্য।'

আমরাও বলিতে পারি আমাদের প্রাচীন আচার্যগণের মতে,—

অলঙ্কার হইতেছে—'the beautiful in poetry'।

এখন আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারি এই কাব্য-শাস্ত্রের নাম প্রাচীন কালে 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' হয় কেন। 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' এক সময়ে যথার্থই 'a treatise on Beauty' বুঝাইত, বামনের আলোচনা হইতেই এই তথ্যটি বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হয়।[১]

বামন দ্বিতীয় অধ্যায়ে আসিয়া বলিলেন,—

রীতি রাত্মা কাব্যস্য ; —কাব্যালঙ্কার, ১।২।৬

—'রীতিই কাব্যের আত্মা।'

এই উক্তি এবং 'কাব্যের উপাদেয় স্বরূপ হইতেছে সৌন্দর্য'—এই পূর্ব উক্তি, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? আমাদের মনে হয় বামন রীতি, গুণ, অলঙ্কার—এই সকলকেই 'অলঙ্কার' বা সৌন্দর্য বলিয়া এবং এই সমস্ত মিলিত হইয়া অপূর্ব কাব্য হয় বলিয়া বুঝিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি প্রথম সূত্রের বৃত্তিতে কাব্য-সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

কাব্যশব্দোঽয়ং গুণালঙ্কার-সংস্কৃতয়োঃ শব্দার্থয়োর্বর্ততে।

—'এই কাব্যশব্দ গুণ ও অলঙ্কার দ্বারা সংস্কৃত শব্দার্থযুগল বুঝায়।'

যাহা হউক কাব্য-গত বিভিন্ন সৌন্দর্যের মধ্যে বামনের মতে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য রীতি, তাই তাহা যেন কাব্যের আত্মা। পরেই স্থান গুণের; গুণকে তাই বলিয়াছেন

(১) সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন,—"শব্দকে অলঙ্কারে, যেমন অনুপ্রাসে, সাজিয়ে সুন্দর করা যায়; অর্থকে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা নানা অলঙ্কারে চারুত্ব দান করা যায়। কাব্য যে মানুষের উপাদেয়, সে এই অলঙ্কারের জন্য। 'কাব্যং গ্রাহ্য মলঙ্কারাৎ'—(বামন)। এ মতকে বালকোচিত বলে উড়িয়ে দেওয়া কিছু নয়। এই মত থেকেই কাব্য-জিজ্ঞাসা শাস্ত্রের নাম হয়েছে অলঙ্কারশাস্ত্র।"
—কাব্যজিজ্ঞাসা (২য় সং), পৃঃ ৫

আমাদের আলোচনা হইতেই স্পষ্ট হইবে সূত্রটির এবং অলঙ্কারশাস্ত্র নামটির ঐরূপ ব্যাখ্যা আমরা যথার্থ মনে করি না। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় উত্তর আরও স্পষ্ট হইবে।

কাব্যশোভাকর ধর্মবিশেষ[১]। গুণ-সমূহ নিত্য।[২] ইহারও পরে স্থান যমক বা উপমা প্রভৃতি বিশিষ্ট অলঙ্কারের, এবং তাহারা অনিত্য।[৩]

(১) কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মা গুণাঃ। —কাব্যালঙ্কার, ৩।১।১

—'কাব্যশোভার জনক ধর্মবিশেষ হইতেছে গুণ।'

(২) পূর্বে নিত্যাঃ।—ঐ, ৩।১।৩ —'পূর্বকথিত গুণগুলি নিত্য।'

(৩) বামন অলঙ্কারের সংজ্ঞা দিতেছেন,—

তদতিশয়হেতব স্বলঙ্কারাঃ। ঐ ৩।১।২

বৃত্তিতে বামন লিখিয়াছেন,—

তস্যাঃ কাব্যশোভায়া অতিশয়ঃ তদতিশয়ঃ, তস্য হেতবঃ। তু শব্দ ব্যতিরেকে। অলঙ্কারশ্চ যমকোপমাদয়ঃ।

—অর্থাৎ যমক, উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার-সমূহ কাব্যশোভার অতিশয়তার কারণ।

বামনের মতে কাব্যশোভার মূল কারণ গুণ-সমূহ, অলঙ্কার-সমূহ তাহাদের শোভা বাড়াইয়া থাকে মাত্র, অতএব কাব্য-বিষয়ে এই যমক-উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার অনিত্যধর্ম, গুণগুলিই নিত্যধর্ম।

টীকাকার শ্রীগোপেন্দ্র তিপ্প ভূপাল কামধেনুটীকায় বলিতেছেন,—"পূর্বে গুণা নিত্যা ইত্যুক্তে অন্যে পুনরলঙ্কারা অনিত্যা ইতি গম্যতে এব।"

—'পূর্বোক্ত গুণগুলিকে নিত্য বলা হইয়াছে, অন্য অলঙ্কারগুলি তাই অনিত্য, ইহা বুঝাই যায়।'

ইহার পরেই টীকাকার লিখিয়াছেন,—

গুণত্বাদ্ ওজঃপ্রভৃতীনাম্ আত্মনি সমবায়বৃত্ত্যা স্থিতিঃ, অলঙ্কারত্বাদ্ যমকোপমাদীনাং শরীরসংযোগবৃত্ত্যা স্থিতিরিতি গ্রন্থকারস্য অভিমতম্।

—'গুণ বলিয়া ওজঃ প্রভৃতির কাব্যাত্মায় সমবায়বৃত্তিতে অবস্থান, অলঙ্কার বলিয়া যমক উপমা প্রভৃতির কাব্যশরীরে সংযোগ-বৃত্তিতে অবস্থান,—ইহাই গ্রন্থকারের অভিমত।'

বস্তুতঃ বামন বিশিষ্ট অলঙ্কারগুলিকে নিজ গ্রন্থেও বিশেষ আমল দেন নাই, মাত্র ৩০টি অলঙ্কার গণনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য তাই সমর্থন-যোগ্য নহে।

কাব্য-সৌন্দর্য অনন্ত বলিয়া দণ্ডীর মতেও,—

তে চাত্মাপি বিকল্প্যন্তে, কস্তান্ কার্ৎস্নেন বক্ষ্যতি। —কাব্যাদর্শ, ২।১

—'তাহারা অর্থাৎ অলঙ্কারসমূহ আজিও সৃষ্ট হইতেছে, কে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে গণনা করিতে পারিবে।'

আনন্দবর্ধন বলেন,—

অলঙ্কারাণাম্ অনন্তত্বাৎ।[১]—'অলঙ্কারসমূহ অনন্ত বলিয়া।'

লোচনটীকায় অভিনবগুপ্ত বলেন,—

প্রতিভানন্ত্যাৎ[২]—'প্রতিভা অনন্ত প্রকার বলিয়া অলঙ্কারও অনন্তপ্রকার।'

কবির প্রতিভা যত প্রকার, অলঙ্কারও তত প্রকার হইতে পারে, তাই তাহারা নব নব কবির নবীন কুশলতায় আজিও সৃষ্ট হইতেছে। নমিসাধু আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—

ততো যাবন্তো হৃদয়াবর্জকা অর্থপ্রকারা, স্তাবন্তঃ অলঙ্কারাঃ।

—রুদ্রট-কৃত কাব্যালঙ্কার, ১১।৩৬, বৃত্তি।

—'হৃদয়াবর্জক যত প্রকার অর্থ আছে, অলঙ্কারও তত প্রকার আছে।'

এই অলঙ্কারকে তাই মূলতঃ কেবলমাত্র কাব্য-সৌন্দর্য না বলিয়া উপায় নাই। বস্তুতঃ অপ্পয্যদীক্ষিত তদীয় কুবলয়ানন্দ গ্রন্থে একশত চব্বিশ প্রকার অলঙ্কারের আলোচনা করিয়াছেন।

আবার দেখা যায়,—কাব্যশাস্ত্রের যত বিভাগ আছে, প্রাচীনগণের আলোচনায় সেই সমস্তই এই বিশিষ্ট অলঙ্কারাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

কেবল অপ্পয্যদীক্ষিত কেন, প্রাচীন আলঙ্কারিকদের অলঙ্কারগ্রন্থসমূহ হইতেই এই তথ্যের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কাব্যশাস্ত্রের বড় দুইটি বিষয়ই রস ও ধ্বনি। রসকে কি ভাবে ভামহ, দণ্ডী ও উদ্ভট অলঙ্কারের অন্তর্গত এবং বামন গুণের অন্তর্গত করিয়াছেন, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভেই প্রদর্শিত হইয়াছে।[৩] এইরূপে আসল ধ্বনি যে প্রাচীনগণের ব্যাখ্যাত পর্যায়োক্ত অলঙ্কারের মধ্যে এবং গুণীভূতব্যঙ্গ্য যে সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের মধ্যে বর্তমান, তাহাও চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে।[৪] বিশিষ্ট অলঙ্কাররাশি তো অবশ্যই অলঙ্কারশাস্ত্রের মধ্যে।

(১) ও (২) ধ্বন্যালোক, পৃঃ ৮৮

(৩) দ্রষ্টব্য—কাব্যালোক, পৃঃ ৬৪

(৪) দ্রষ্টব্য—কাব্যালোক, পৃঃ ২২৮-৩১

রীতি ও গুণের মধ্যেও শব্দালঙ্কারের সম্ভাব অনেকখানি দেখা যায়। অতএব এখন আমরা যাহাকে রস-ধ্বনি-রীতি-ও-অলঙ্কারাত্মক কাব্যশাস্ত্র বলি, তাহা পূর্বে যথার্থভাবেই অলঙ্কারশাস্ত্র দ্বারা বুঝান হইত। যে ভাবেই বিচার করি, অলঙ্কারশাস্ত্র যথার্থ ই কাব্যসৌন্দর্য-বিজ্ঞাপক শাস্ত্র।

অলঙ্কারশাস্ত্র এখনও উক্ত অর্থেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমরা ভাবি শব্দটি বুঝি যোগরূঢ় শব্দ, না হইলে রস ও ধ্বনি বর্জন করিয়া কেবলমাত্র উপমাদি অলঙ্কারের নামে কাব্যশাস্ত্রের নাম অলঙ্কার-শাস্ত্র হইল কেন?

সাহিত্যদর্পণ-কার একটি বচন উদ্ধার করিয়াছেন; নিম্নে তাহা দেওয়া হইল,—

কাব্যস্ত শব্দার্থৌ শরীরম্, রসাদিশ্চাত্মা, গুণাঃ শৌর্যাদয় ইব, দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতয়ঃ অবয়ব-সংস্থান-বিশেষবৎ, অলঙ্কারাশ্চ কটক-কুণ্ডলাদিবৎ।[১]

—'শব্দার্থযুগল কাব্যের শরীর, রসাদি আত্মা, গুণ শৌর্যাদির ন্যায়, দোষ কাণত্বাদির ন্যায়, রীতিসমূহ বিশিষ্ট অবয়বসংস্থানের ন্যায়, অলঙ্কারবর্গ কটককুণ্ডলাদির ন্যায়।'

এই বচন কোন্ সময়ের কাহার রচনা জানি না; কিন্তু অলঙ্কারশাস্ত্রে ইহার ভ্রান্ত প্রভাব তুচ্ছ করিবার নহে। আমাদের মনে হয়, বিশিষ্ট অনুপ্রাস-উপমাদি অলঙ্কার সম্বন্ধে ভামহ-বামন প্রভৃতিরও এইরূপ ধারণাই ছিল, 'কাব্য-শরীর'-এর মূল সেখানেই পাওয়া যাইবে। ভামহেরও পূর্বে অলঙ্কার-বিষয়ে নানা আলোচনা ছিল, বুঝিতে পারা যায়। ভামহ অলঙ্কার সম্বন্ধে বলেন,—

রূপকাদিঃ অলঙ্কার স্তস্যান্যৈ র্বহুধোদিতঃ।
ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতামুখম্॥ —ভামহালঙ্কার, ১।১৩

—'রূপকাদিই হইতেছে কাব্যের অলঙ্কার, অন্য পণ্ডিতগণ বহুপ্রকারে ইহা বুঝাইয়াছেন। বনিতার মুখ মনোহর হইলেও অলঙ্কার-হীন হইয়া শোভা পায় না।'

এখানে মুখের মনোহরত্ব স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা বৃদ্ধি পায় অলঙ্কার-প্রয়োগে,— ইহাই বলা হইতেছে।

বামন যেখানে রীতিকে কাব্যের 'আত্মা' বলিলেন, সেইখানেই প্রকৃত পক্ষে নিত্যগুণধর্মযুক্ত শব্দার্থকে শরীর এবং অনিত্য অলঙ্কারগুলিকে কটক-কুণ্ডলাদিবৎ বলা হইল। টীকা কামধেনুতে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে গুণসমূহ কাব্যের আত্ম-ভূত রীতিতে সমবায়-বৃত্তিতে, এবং অলঙ্কারসমূহ শরীর-ভূত শব্দার্থে সংযোগ-বৃত্তিতে

(১) সাহিত্য-দর্পণ, ১।২, বৃত্তি, পৃ. ১১

অবস্থান করিতেছে। সমবায়বৃত্তি নিত্য, অবিচ্ছেদ্য; সংযোগবৃত্তি অনিত্য, ছেদনযোগ্য। অতএব অনুপ্রাস-উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার কটককুণ্ডলাদি অলঙ্কারেরই ন্যায় দেহের অস্থির, অনিত্য এবং আরোপ্য ধর্ম। কিন্তু একটু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ধ্বনিকার ও আনন্দবর্ধন-কৃত অলঙ্কারের স্বরূপ-সম্বন্ধে তাদৃশ চমৎকার ব্যাখ্যার পরেও দশম শতাব্দীতে রাজশেখর এবং অনেক পরে চতুর্দশ শতাব্দীতে বিশ্বনাথ অলঙ্কারকে কটক-কুণ্ডলাদির ন্যায় শব্দার্থের বহির্ভূষণ বলিয়া বর্ণনা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। রাজশেখর কাব্যপুরুষের শরীর শব্দার্থ-নির্মিত বলিয়া শেষে মন্তব্য করিয়াছেন,—

অনুপ্রাসোপমাদয়শ্চ ত্বাম্ অলঙ্কুর্বন্তি।

—কাব্যমীমাংসা, ৩ অধ্যায়, পৃঃ ৬

—'অনুপ্রাস ও উপমা প্রভৃতি শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার তোমাকে (কাব্যপুরুষকে) অলঙ্কৃত করে।'

বিশ্বনাথও অলঙ্কারের সংজ্ঞায় শেষে মন্তব্য করিলেন,—

রসাদীন্ উপকুর্বন্তোঽলঙ্কারা স্তেঽঙ্গদাদিবৎ ॥—সাহিত্যদর্পণ, ১০।১

—'রসাদির পুষ্টি করিয়াও সেই অলঙ্কার-সমূহ অঙ্গদাদির ন্যায়।'

আমাদের মনে হয় কটককুণ্ডল বা অঙ্গদাদির উপমাটি সীমাবদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা লেখকগণের যথার্থ মনোভাব প্রকাশ করে নাই। অলঙ্কার দেহের বহিঃপ্রসাধন, তাহা খুলিয়া লইলে কাব্যের কাব্যত্ব থাকে কিনা, কাব্যের স্বরূপভূত সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয় কিনা ইহাই প্রশ্ন। বিশ্বনাথ যেখানে বলিয়াছেন 'রসাদীন্ উপকুর্বন্তঃ' —রসাদির উপকার করিয়া—সেখানে বুঝিতে হইবে অলঙ্কার থাকিলে তাহা রসাদির পুষ্টির জন্যই থাকে, সেখানে অলঙ্কার কেবল বাহিরের আরোপিত সৌন্দর্য নয়। আমাদের মনে হয় আসল ভ্রম হইয়াছে অলঙ্কারকে শব্দার্থ হইতে একেবারে পৃথক্ করিয়া বিচার করায়। অলঙ্কারের অলঙ্কারত্ব শব্দার্থের সাধনে শব্দার্থের উপাদানে। বস্তুতঃ অলঙ্কার যেখানে কাব্যের সৌন্দর্যজনক, সেখানে তাহা কাব্যের শরীর শব্দার্থেরই অভিন্ন রূপ মাত্র। সে রূপ বাদ দিয়া রসের প্রকাশ হয় না। অবশ্য স্বভাবোক্তিময় নিরলঙ্কার কাব্য হইতে পারে, কিন্তু অলঙ্কার থাকিলে তাহা হইবে কাব্যের ভাষা বা বাচ্য, রূপেরও রূপ, কাব্যের অভিন্ন সত্তা; অন্ততঃ উত্তম কাব্যে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিলে কাব্যের কাব্যত্ব থাকিবে না। অলঙ্কার থাকিলে কাব্যের রূপই হইবে অলঙ্কারময়, তাহা খসাইয়া লইলে কাব্যের রূপই হয় অন্তর্হিত, সে ক্ষেত্রে কাব্য হয়

রূপহীন রসহীন তত্ত্ব বা তথ্যমাত্র। তাই শ্রেষ্ঠ কাব্যে বাচ্য ও অলঙ্কারে কোন প্রভেদ নাই, কবির রস-প্রকাশের ভাষা, অর্থাৎ ভাবের 'রূপের মাঝারে অঙ্গ' লাভই প্রকৃত অলঙ্কার। এই কথাটিই ধ্বনি-কার ও আনন্দবর্ধন সুন্দর ও সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন।

ধ্বনি-কার অলঙ্কারের সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্-যত্ন-নির্বর্ত্যঃ সোঽলঙ্কারো ধ্বনৌ মতঃ ॥—ধ্বন্যালোক, ২।১৭

'—রস-কর্তৃক আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট হইলে যাহার রচনা সম্ভবপর হয়, রসের সহিত একই প্রযত্নে যাহা সম্পন্ন বা সিদ্ধ হয়, তাহাই ধ্বনিশাস্ত্রে অলঙ্কার বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে।'

এখানে অলঙ্কারের দুইটি লক্ষণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে,—রসাক্ষিপ্ততা ও অপৃথগ্‌যত্ন-সম্পাদ্যতা। প্রকৃত পক্ষে লক্ষণ দুইটি নহে, একটিই মাত্র; কেননা, ফলতঃ উভয়ই এক। অলঙ্কার রসদ্বারা আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট হয়, রস নিজেকে মূর্ত করিতে যাইয়া রূপ-সৃষ্টির পথে অলঙ্কারকে আকর্ষণ করে, অথবা অলঙ্কার যেন রসের রূপে পরিণতির পথে স্বতঃস্ফূর্ত হয়। অতএব রস ও অলঙ্কার মহাকবির অপৃথক্ যত্ন বা একক প্রযত্ন দ্বারাই সিদ্ধ হয়। এই জন্য শ্রেষ্ঠ কাব্যে বাচ্য ও অলঙ্কার ভিন্ন বস্তু হয় না, উপমাদি অলঙ্কার বাচ্যস্বরূপ হইয়া রসময় রূপ সৃষ্টি করে। আনন্দবর্ধন তাই বলেন,—

ন তেষাং বহিরঙ্গত্বং রসাভিব্যক্তৌ।

—ধ্বন্যালোক, ২।১৭, বৃত্তি, পৃঃ ৮৭

—'রসাভিব্যক্তি-ব্যাপারে অলঙ্কারসমূহ কাব্যের বহিরঙ্গ হয় না।'

ভরতের অনুসরণ-ক্রমে ভাষ্যে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, মূলবীজ-স্থানীয় হইতেছে কবি-গত রস, বৃক্ষ-স্থানীয় কাব্য।[১] অতএব বীজ যে প্রকার নিজেকে পরিস্ফূর্ত করিবার আবেগে শাখা-পল্লব-পুষ্প-ফল-সমন্বিত বৃক্ষের সৃষ্টি করে, রসও সেই প্রকার নিজেকে মূর্ত করিবার আবেগে বাচ্য-রীতি-ছন্দ-অলঙ্কারময় কাব্যের নির্মাণ করে। তাই অলঙ্কার প্রভৃতি কাব্যের বহিরঙ্গ নয়, অন্তরঙ্গ। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি কাব্যশরীর শব্দার্থই অলঙ্কারের স্বরূপ। আনন্দবর্ধন এই বিষয়ে একটি সুন্দর উক্তি করিয়াছেন,—

(১) দ্রষ্টব্য:—কাব্যালোক, পৃঃ ১৯৭

অলঙ্কারান্তরাণি হি নিরূপ্যমাণ-দুর্ঘটনান্যপি রস-সমাহিত-চেতসঃ প্রতিভানবতঃ কবেঃ অহংপূর্বিকয়া পরাপতন্তি। —ধ্বন্যালোক, ২।১৭, বৃত্তি, পৃঃ ৮৭

'অলঙ্কার-সমূহ অন্বেষণকারীর দুর্লভ হইলেও প্রতিভানশালী কবির রসসমাহিত চিত্ত হইতে 'আমি আগে, আমি আগে' এই ভাব লইয়া যেন ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইয়া আসে।'

রসের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অলঙ্কার-দেহের উদ্ভব হইতে থাকে এবং অলঙ্কারাত্মক শব্দগুলি যেন স্বতঃস্ফূর্ত বেগে প্রকাশ পাইতে থাকে।

ক্রোচের দুইটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিয়া আলোচ্য বিষয় সমর্থন করা যাইতে পারে। প্রথম,—

"The intuition and expression together of a painter are pictorial ; those of a poet are verbal. But be it pictorial, or verbal, or musical, or whatever else it be called, to no intuition can expression be wanting because it is an inseparable part of intuition." —*Æsthetic, Ch. I.*, pp. 13-14

—'চিত্রশিল্পীর যুগপৎ যে উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি ঘটে, তাহা চিত্রময় ; কবির বেলায় ঐ সকল শব্দময় ; কিন্তু ইহা চিত্রময়, শব্দময়, অথবা সঙ্গীতময়, অথবা আর যাহা বলিয়াই অভিহিত হউক না কেন, কোনও উপলব্ধির সহিতই অভিব্যক্তির অভাব হইতে পারে না ; কেননা, ইহা উপলব্ধিরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।'

সুতরাং কবির বেলায় ভাবের উপলব্ধি ও শব্দময় অভিব্যক্তি বা প্রকাশ একেবারে অভিন্ন, কবির রসোপলব্ধির মধ্যেই রসের রূপময় সত্তা অন্তরঙ্গ হইয়া বিদ্যমান। অতএব রূপ যেখানে অলঙ্কারাশ্রিত, সেখানে রসোপলব্ধি ও অলঙ্কারপ্রকাশ অবিচ্ছেদ্য-ভাবেই এক প্রযত্নে সম্পন্ন হইবে। অবশ্য পূর্বেই বলা হইয়াছে সকল রূপই অলঙ্কারময় নয়, নিরলঙ্কার রূপও আছে।

অলঙ্কারের এই রসাভিন্নতা পরে ক্রোচে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন ; যথা,—

"One can ask oneself how an ornament can be joined to expression. Externally ? In that case it must always remain separate. Internally ? In that case, either it does not assist expression and mars it ; or it does form part of it and is not

ornament, but a constituent element of expression, indistinguishable from the whole." —*Æsthetic, Ch. IX*, p. 113.

'নিজেকেই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে অলঙ্কার কি ভাবে অভিব্যক্তির সহিত যুক্ত হয়। বহিরঙ্গ ভাবে? সে ক্ষেত্রে ইহা অবশ্যই সর্বথা পৃথক্ থাকিবে। অন্তরঙ্গ ভাবে? সে ক্ষেত্রে হয় ইহা অভিব্যক্তিকে সাহায্য করে না; উহাকে নষ্ট করে; অথবা ইহা উহার অঙ্গীভূতই হয়, এবং অলঙ্কার-রূপে থাকে না, ইহা হয় সমগ্র হইতে অবিশেষ অভিব্যক্তির এক মৌলিক উপাদান।'

ইহার উপর আর টিপ্পনী করা অনাবশ্যক। অলঙ্কার বাহির হইতে প্রযুক্ত হইলে প্রকৃত বাচ্য হইতে পৃথক্ থাকিবে। ভিতর হইতে প্রযুক্ত হইলে হয় অভিব্যক্তিতে বাধা ঘটাইবে, নতুবা বাচ্যের অঙ্গস্বরূপ সমগ্রের সহিত অভিন্নরূপে প্রকাশ পাইবে। ইহাকেই ধ্বনিকার এক সহস্র বৎসর পূর্বে 'রসাক্ষিপ্ত' ও 'অপৃথগ্‌যত্ন-নির্বর্ত্য' বলিয়াছেন।

ওয়াল্টার পেটার এইরূপ অলঙ্কারকেই বলিয়াছেন,—

"...permissible ornament being for the most part structural or necessary." —*Appreciations, Style.*

—'গ্রহণ-যোগ্য অলঙ্কার, প্রধানতঃ কাব্যাঙ্গ-ভূত, অথবা প্রয়োজন-ভূত।'

বলা বাহুল্য, আমরা আগাগোড়া আদর্শ-সাহিত্যের অলঙ্কার-সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কাব্যে কটককুণ্ডলাদির ন্যায় আরোপ্য অলঙ্কার সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা লইয়া কোন আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এখন দুই একটি উদাহরণ দিয়া বিষয়টি সমাপ্ত করা যাইতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে শব্দের দুইটি রূপ,—ধ্বনি (sound) ও অর্থ (sense)। ধ্বনির আশ্রয়ে শব্দালঙ্কার, ইহা কাব্যের এক সঙ্গীতধর্ম; এবং অর্থের আশ্রয়ে অর্থালঙ্কার, ইহাতে থাকিতে পারে কাব্যের চিত্রধর্ম। বিভিন্ন শব্দে ধ্বনি-সাম্যে অনুপ্রাস অলঙ্কারের সৃষ্টি, ইহাই শ্রেষ্ঠ শব্দালঙ্কার। এইরূপ বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে অর্থ-সাম্যে উপমা-অলঙ্কারের সৃষ্টি, ইহাই শ্রেষ্ঠ অর্থালঙ্কার। যেখানে শব্দ-গত ধ্বনিসাম্য ঝঙ্কারদ্বারা মূল অর্থকে পরিব্যক্ত করে, সেখানেই অনুপ্রাসের সার্থকতা। এই অনুপ্রাস কবির রূপসৃষ্টির পথে স্বয়ং স্ফূর্ত হইলে বাক্যের ভার না হইয়া রসকে ব্যক্ত ও পরিপুষ্ট করে; যথা,—

যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়,
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার —কাহিনী, ভাষা ও ছন্দ

—এখানে পুনঃ পুনঃ আ-ধ্বনি, বিশেষতঃ ইচ্ছা-পূর্বক ব্যাকরণ লঙ্ঘন করিয়া গঠিত 'দুর্দাম' শব্দে ও পরবর্তী 'দুর্বার' শব্দে আ-ধ্বনি দ্বারা মহানদ ব্রহ্মপুত্রের বন্যার এবং বাল্মীকির নব ছন্দের বিপুলতা বা বিশালতা সঙ্গীতধর্মে পরিস্ফুট হইয়াছে। আমাদের ভাষায় ই-কার ক্ষুদ্রত্ব এবং আ-কার বিশালতা বা বড়ত্ব-সূচক, যেমন,—একটি—একটা, কুশী—কোশা, পুটলি—পোটলা, ছুরি—ছোরা ইত্যাদি। অনাবৃত আ-ধ্বনির মধ্যেই এই বিপুলতা বা বিশালতা রহিয়াছে। এই জন্য মহাকবি কালিদাস সংস্কৃতেও আ-ধ্বনির কুশল সজ্জা করিয়া সমুদ্রের ও তীরবর্তী বনরাজির বিপুলতা বা বিশালতা বুঝাইয়াছেন ; যথা,—

দূরাদ্ অয়শ্চক্র-নিভস্য তন্বী
তমাল-তালী-বনরাজি-নীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্ধারা-নিবদ্ধেব কলঙ্ক-রেখা ॥ —রঘুবংশ, ১৩।১৫

—এখানে বনরাজির বর্ণনায় দ্বিতীয় চরণে চারিটি আ-ধ্বনি এবং সমুদ্র বর্ণনায় তৃতীয় চরণে পাঁচটি আ-ধ্বনির প্রয়োগ দ্রষ্টব্য, আরম্ভ ও সমাপ্তিও লক্ষণীয়।

অপর একটি উদাহরণ :—

"দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে" ইত্যাদি।[১]

—এখানে ঞ্জ ধ্বনি মাধুর্যের মোহ সঞ্চার করিতে থাকে ; লঙ্ক, ঙ্কল, ঙ্কল—ধ্বনি সে মোহ পূর্ণ করিয়া তুলে, সঙ্গে সঙ্গে ন-ধ্বনি, ম-ধ্বনি ও ল-ধ্বনির সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের ক্রিয়াও লক্ষণীয়। তারপর ধ্-ধ্বনির আবৃত্তিতে সে মোহ আঘাত পায়, ভাঙিয়া যায় ছ-ধ্বনির আবৃত্তিতে এবং একেবারে ছিন্ন হয় 'ছিন্ন' শব্দের যুক্তবর্ণ 'ন্ন'-এর আঘাতে। ইহাই ধ্বনির রং দিয়া অর্থ আঁকা। এইখানেই অলঙ্কারের সার্থকতা। শব্দালঙ্কারও ভূষণমাত্র নয়, ধ্বনি দিয়া সে রস আকর্ষণ করে। ইহারই প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় কাকু বা কণ্ঠ-স্বরে, এবং, চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায় কবিতার ছন্দোধর্মে।

এইবার উপমা-অলঙ্কারের উদাহরণ।

ভাবকে বস্তুর আশ্রয়ে রূপ দিতে গিয়া কবির বাসনা-লোক বা অন্তর্লোক হইতে অনুরূপ ধর্ম-সমন্বিত নূতন বস্তু সমাহৃত হয়, তাহাই উপমান। উপমানের রূপ ও গুণ বর্ণনার মধ্য দিয়াই উপমেয় ব্যঞ্জনা-ধর্মে অলৌকিক সৌন্দর্য লাভ করে এবং

(১) দ্রষ্টব্য :—কাব্যালোক, পৃঃ ২৮৩-৮৪।

রসে পরিণত হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্যে বসন্তের বরে অনিন্দ্যসুন্দরী চিত্রাঙ্গদা যেখানে সরোবর-জলে আপনার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, অর্জুনের মুখ হইতে একটি উপমায় সেই স্থলের বর্ণনা শোনা যাইতেছে,—

সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে,
শ্বেত শতদল যেন কোরক বয়স
যাপিল নয়ন মুদি',—যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেই দিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবর জলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে। —চিত্রাঙ্গদা

—এখানে উপমানই কি বাচ্যকে প্রকাশ করিয়া রস আকর্ষণ করে নাই? অথচ কত সহজ স্বাভাবিক এই উপমাটি! উপমা বাদে এই বর্ণনার কোন তাৎপর্য নাই। সমুদয় বর্ণনায় আমাদের চিত্তে রং ও রেখায় একটি সুষ্ঠু চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উক্ত কাব্য হইতেই আর একটি উপমা লওয়া যাইতেছে,—আর একটি চিত্র, স্বল্পাক্ষর হইলেও দেখা যাইবে তাহার শক্তি কত বেশি। চিত্রাঙ্গদা যখন রূপমুগ্ধ অর্জুনকে তাঁহার ব্রতের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, তখন তিনি বিহ্বল হইয়া মাত্র তিন চরণের একটি উপমায় আপনার অবস্থা ব্যক্ত করিলেন,—

তুমি ভাঙ্গিয়াছ ব্রত মোর,
চন্দ্র উঠি যেমন ভেঙ্গে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা-অন্ধকার।

—এখানে কাব্যের সমগ্র অর্থ ও দ্যোতনা বা ধ্বনি ঐ উপমাটি হইতেই আসিতেছে না কি? উপমাটি তুলিয়া লইলে রচনা হইয়া যাইবে শুষ্ক সংবাদ মাত্র। এই উপমার সহিত শক্তিতে তুলিত হইতে পারে কেবল মাত্র মহাকবি কালিদাসের একটি উপমা। কুমারসম্ভব কাব্যে উমামুখ-দর্শনে 'কিঞ্চিৎ-পরিলুপ্ত-ধৈর্য' হরকে চিত্রিত করিবার জন্য তিনি লিখিয়াছেন,—

'চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।' —কুমারসম্ভব, ৩।৬৭

—কত ক্ষুদ্র, কিন্তু কত সুন্দর ঐ চন্দ্র! নামেরই অর্থ আহ্লাদকর! আকাশে তাহার উদয় হইতে না হইতেই অকূল ও অতল জলনিধি উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে, কিন্তু কদাচ বেলা অতিক্রম করে না। অকাল বসন্তের পুষ্প-সম্ভারে সজ্জিতা উমাকে

দেখিয়াও হর সেইরূপ ক্ষণতরে ঈষৎ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, উমার বিম্বাধরে ক্ষণতরে দৃষ্টি ব্যাপৃত করিলেন ; কিন্তু সংযম শিথিল হইল না। চিত্রধর্ম এখানেও অতুলনীয়।

উভয় স্থলেই সমগ্র বাচ্যই উপমার রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতেই রচনার কাব্যত্ব। এখানেই অলঙ্কারাশ্রয়ে ব্যঞ্জনার নব নব উল্লাস, আর বস্তুর রসোল্লাসের পথে রূপায়ণ! এই অলঙ্কারই কবির অপৃথক্ যত্ন-সম্পাদ্য।

দার্শনিক যেখানে সীমাকে অসীমের ভিতর দিয়া বস্তুকে তত্ত্বে পরিণত করেন, কবি সেখানে অসীমকে সীমাবন্ধনে আনিয়া তত্ত্বকে রূপের মধ্যে মুক্তি দেন। এই রূপ মুখ্যতঃ অলঙ্কারেরই সৃষ্টি। রবীন্দ্রকাব্যে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'জীবন-দেবতা', 'বলাকা' এবং আরও অসংখ্য কবিতায় উহার উদাহরণ মিলিবে। তত্ত্বকে পুনঃ পুনঃ উপমান বা অপ্রস্তুত রূপের মধ্য দিয়া ভাব-রূপে অতিসম্পন্ন করিয়া রসে পরিস্ফূর্ত করা হইয়াছে। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অনাবশ্যক।

(৬)

সমাপ্তি

এতক্ষণে আমাদের প্রথম খণ্ডের আলোচনা সমাপ্ত হইল। আমরা প্রারম্ভেই বলিয়াছিলাম,—কাব্যের প্রয়োজন লোকোত্তর আনন্দ, উপায় রস বা রম্যবোধ, তাহা অনেক সময়েই জাগে ধ্বনির আশ্রয়ে, আলম্বন অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের বিচিত্র বস্তু, এবং উপাদান শব্দার্থ। পরপর পাঁচটি অধ্যায়ে এই বিষয়গুলি পরস্পরের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেখাইয়া আলোচিত হইল। কাব্য-কমল কিন্তু একটি। অবশ্য আলোচিত পঞ্চবিষয় ঠিক তাহার পঞ্চ দল নহে। কারণ, আনন্দ আসে রস বা রম্যবোধের আশ্রয়ে, রস বা রম্যবোধ আসে ধ্বনির আশ্রয়ে, ধ্বনি আসে বস্তুর আশ্রয়ে, বস্তু আসে শব্দার্থের আশ্রয়ে। এ যেন প্রাণশক্তির স্ফুরণে জীবের বীজদেহ হইতে পূর্ণাঙ্গ মানবদেহ লাভ। আমাদের বিচার চলিয়াছে সূক্ষ্ম হইতে ক্রমশঃ স্থূলের দিকে। এ যেন কারণ-দেহ হইতে সর্বেন্দ্রিয়শক্তি-সম্পন্ন সূক্ষ্মদেহ, এবং তাহা হইতে সর্বাবয়ব-সম্পন্ন স্থূলদেহের উদ্ভব ; যেন কৌটার মধ্যে কৌটা, তাহার মধ্যে আর এক কৌটা ; আমরা ভিতরের রত্নকৌটা আগে দেখাইয়াছি।

গ্রন্থের সমাপ্তিতে আবার বলি কাব্যের মৌলি-ভূত প্রয়োজন 'বিগলিত-বেদ্যান্তর আনন্দ', তাহা সমুদ্ভূত হয় রসাস্বাদন হইতে, কখনও বা রম্যবোধের দীপ্তি হইতে।

গ্রন্থের শেষ ভাগে রস শব্দ প্রায়ই রস বা রম্যবোধ, এবং ভাব শব্দ ভাব বা রম্যার্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। আলোচ্য প্রসঙ্গে যেখানে এই দুই-এর সূক্ষ্ম ভেদ করিবার প্রশ্ন নিরর্থক, সেখানে সরলতার জন্য প্রচলিত সংস্কারানুযায়ী কেবল মাত্র রস ও ভাব শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে।

এইবার আমরা কাব্যের যে সংজ্ঞা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা পুনরায় স্মরণ করিতে পারি,—

"কবি তাঁহার অপূর্ববস্তু-নির্মাণক্ষম প্রতিভার বলে সহৃদয় সামাজিক বা পাঠকের অন্তরে অলৌকিক আনন্দ-নিস্যন্দী অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের ব্যাপারময় যে শব্দার্থের সাহিত্য বা সহযোগ সৃষ্টি করেন, তাহার নাম সাহিত্য বা কাব্য।"

ইহারই সংক্ষিপ্ততম রূপ,—

"আনন্দময় বাক্যই কাব্য।"

এই কাব্য-সম্বন্ধে ভট্টনায়ক উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছেন,—

বাগ্‌ধেনু র্দুগ্ধ একং হি রসং যদ্‌বালতৃষ্ণয়া।
তেন নাস্য সমঃ স স্যাদ্ দুহ্যতে যোগিভি র্হি যঃ॥[১]

—'বাগ্‌-ধেনু সহৃদয়জন-রূপ বৎসের প্রতি স্নেহবশে স্বয়ং এক অপূর্ব রস-দুগ্ধ বর্ষণ করেন। যোগিগণ যে তত্ত্বরস দোহন করেন, তাহাও উহার সমান নয়।'

কাব্যের এই আনন্দকেই রসাচার্যগণ বলিয়াছেন,—

"পরব্রহ্মাস্বাদ-সচিব", "ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর"।

সমাপ্ত

(১) ধ্বন্যালোকের লোচন টীকায় উদ্ধৃত; ধ্বন্যালোক, ১।৬, টীকা

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থকার ও গ্রন্থসূচী*

সংস্কৃত

* গ্রন্থের নাম গ্রন্থকারের নামের নীচে পাওয়া যাইবে; যে সকল গ্রন্থ নিজ নামেই পরিচিত, যেমন ঋগ্বেদ, তাহাদের নাম মূল তালিকায় উল্লিখিত হইল। সংখ্যা পৃষ্ঠাঙ্ক-সূচক। এই গ্রন্থকার ও গ্রন্থসূচী নির্মাণ করিয়াছেন ডক্টর গুরুদাস ভট্টাচার্য, এম্. এ, ডি. ফিল্.।

ইংরেজী, গ্রীক প্রভৃতি